স্মৃতির আলোয় স্বামীজী

সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা-৩

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৫৯

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দম দম রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৩০

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

স্বামী তুরীয়ানন্দ

॥ ১ ॥

অধ্যাপক গুরুদাস গুপ্ত হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দজীর) ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের দুর্লভ সুযোগ জীবনে বহুবার পেয়েছেন। তিনি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও স্নেহের পাত্র ছিলেন। গুরুদাসবাবুর ব্যক্তিগত দিনলিপি থেকে সঞ্চয়ন করে স্বামীজী-প্রসঙ্গে তুরীয়ানন্দজীর নিজমুখের এই কথাগুলি প্রকাশ করা হলো।— সম্পাদক

স্বামীজী তখন বোম্বাইয়ে এক ব্যারিস্টারের বাড়িতে। খুঁজতে খুঁজতে আমি ও মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সেখানে উপস্থিত। তামাক খাচ্ছিলেন, আমাদের দেখেই হুঁকো হাতে করে ছুটে এলেন। মুখে একটি শ্লোক—

অহংকারঃ সুরাপানং গৌরবং ঘোর-রৌরবম্।
প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্ত্বা সুখী ভব ॥[১]

শ্লোকটি শুনে আমার নিশ্চয়ই ধারণা হলো যে স্বামীজী উক্ত দোষত্রয়- বিমুক্ত হয়েছেন। অতঃপর নানাকথার পর আমাদের সঙ্গেই সেখান থেকে চলে আসেন এবং বলেন, "ভাই, ধর্মকর্ম কতদূর হলো জানি না, কিন্তু বড্ড feel করছি—সকলের জন্যই প্রাণ কেঁদে আকুল হচ্ছে।" স্বামীজীর সেই কথায় আমাদের বুদ্ধদেবের কথাই মনে হচ্ছিল। স্বামীজীর শরীর তখন বেশ সুস্থ—চেহারা কী সুন্দর জ্যোতির্ময়!

স্বামীজী আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁকে একটু দর্শনের জন্য কী প্রচণ্ড ভিড়! G. C. (গিরিশবাবু)-কে তিনি পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দিলেন না। বললেন, "তাতে আমার অকল্যাণ হবে।" আদর করে মাস্টার মহাশয়ের দাড়ি নেড়ে দিলেন।

স্বামীজী কত সময়ে বলেছেন, "এমন সব ভাব দিয়ে গেলাম, যাতে দু-শো বছরের মধ্যে আর কাউকে কিছু করতে হবে না।—কেবল দাগা বুলিয়ে গেলেই চলবে।"

তিনি অনেক সময়ে বলতেন, "এত খেটেখুটে মন প্রস্তুত হলো, কিন্তু মা কেবল বলছেন, 'চলে আয়—চলে আয়।' কাজের কাজ কিছুই করা হলো না।" প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতিও শিকাগো ধর্মসভায় গিয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীজী বলতেন, "ও সব কিছু না—কিছু না। যা কিছু ব্যাপার হবে তা কেবল (নিজের বুকে হাত রেখে) এরই জন্য।"

স্বামীজী আপনার মা-ভাইয়ের জন্য ব্যবস্থা করতে ঠাকুরকে মা-কালীর কাছে

১ অহংকার সুরাপানের তুল্য ক্ষতিকর, গর্ব ভীষণ নরক-যন্ত্রণার ন্যায় কষ্টপ্রদ। প্রতিষ্ঠাকে শূকরের বিষ্ঠাবৎ ঘৃণ্য মনে করবে। এই তিন দোষ মুক্ত হয়ে সুখী হও।

অনুরোধ জানাতে বলেছিলেন। ঠাকুর তাতে উত্তর দিয়েছিলেন, "বলিস কি! আমার যে এসব কথা মাকে বলতে নেই।" বড়ই পীড়াপীড়ি করায় বলেছিলেন, "যা, তুই কালী-ঘরে গিয়ে প্রার্থনা কর, যা চাইবি তাই পাবি।" নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন—বড়ই উদ্বেগ, নরেন কি চায়—অতিশয় উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থান করছেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী কাঁদতে কাঁদতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। "কি রে কাঁদিস কেন? চেয়েছিস্ তো? কি চাইলি, বল দেখি?" কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আর কিছুই চাইতে পারলাম না—বললাম, মা জ্ঞান দাও, বিবেক দাও, ভক্তি দাও।" ঠাকুর তো শুনেই স্বামীজীকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন—খুব খুশি হয়েছিলেন। এরপরে ঠাকুর আমাদের কাছে বলেছিলেন, "দেখ দেখি কেমন অধিকারী পুরুষ! আর কিছুই চাইতে পারলে না! ভেতরে গলদ নেই—বাইরে গলদ কোত্থেকে আসবে?"

স্বামীজী কত বড় মহাপ্রাণ ছিলেন! একবার ঠাকুর একটি লোকের চরিত্রে খুব বিরক্ত হয়ে, তার বাড়িতে কাউকে আহারাদি করতে নিষেধ করেন। অপরের কাছে একথা শুনে স্বামীজী একদিন দু-জন গুরুভাইকে সঙ্গে নিয়ে সেই লোকটির বাড়িতে গিয়ে দিব্যি খেয়ে-দেয়ে এলেন। দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে আবার সব কথা খোলাখুলি-ভাবে ঠাকুরকে নিবেদন করলেন। ঠাকুর তো বেশ রুষ্ট হলেন। স্বামীজী তখন খুব কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর একদিন সেই লোকটিকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে এসে, তার হয়ে খুব কাতর মিনতি করতে লাগলেন—"এর উন্নতি হোক—এই জীবনেই এর ধর্মলাভ হোক।" ঠাকুরের কাছে এইভাবে খুব অনুনয়-বিনয় করেন। ঠাকুর বলেছিলেন, "না, এ জন্মে হবে না।" আবার ধরপাকড়—স্বামীজী তবুও বলেছিলেন, "আপনি না করে দিলে, এ যাবে কোথায়?" ঠাকুর তখনও বললেন, "কী করব? বলছি, হবে না!" পুনরায় অনুরোধ-পীড়াপীড়ি। "আপনি ছেড়ে দিলে ও দাঁড়ায় কোথায়?" ঠাকুর শেষকালে বলছেন, "যা যা, এখন যা।" তারপর আবার বলেই দিলেন, "যা, মৃত্যুকালে মুক্তিলাভ হবে।"

ধ্যান-ধারণার ফল করায়ত্ত হচ্ছে না দেখে স্বামীজী ঠাকুরকে অনুযোগ করেছিলেন, "কিছু হচ্ছে না, কি করি" ইত্যাদি। তদুত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, "কিরে! আমি যে তোকে কত উঁচু বলে জানি। যে খানদানি চাষা, সে হাজা-শুকো মানে না। তার স্বভাবই চাষ করা—তা ফল হোক বা না হোক; ফসল হবার নিশ্চিত আশা থাকুক বা না থাকুক—সে চাষের কাজ ছেড়ে অন্য কিছুই করতে পারে না।"

স্বামীজী তামাক খান, মাছ খান, এজন্য আমাদের মধ্যেই একজন কেউ স্বামীজীকে একবার বলেছিল, "দেখ, তোমার অভ্যাসগুলি শোধরানো দরকার। নতুবা তোমার জন্য আমাকে অনেক লোকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।" সে মনে করেছিল স্বামীজী এই কথায় হয়তো খুব খুশি হয়ে যাবেন আর তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবেন। কিন্তু তিনি অতিশয় শান্তভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, "তুই তোর কাজ কর। আমাকে defend করবার কোন আবশ্যক নেই তোর।" স্বামীজী কী বলিষ্ঠ—কেমন খাড়া হয়ে ছিলেন

বরাবর। কারও উপর ঠেস দেওয়া, কারও recommendation-এর উপর আপনাকে জিইয়ে রাখা তাঁর ধাতে ছিল না।

একবার কোন একটা স্টেশনে যখন স্টেশনমাস্টার কয়েকজন সাহেবের জায়গা করে দেবার জন্য স্বামীজীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি থেকে নামাবার চেষ্টা করেছিল, তখন স্বামীজী তাকে বলেছিলেন, "আমাকে নামিয়ে দিতে তোমার লজ্জা হয় না? ওদের নামিয়ে দাও।" বেচারা স্টেশনমাস্টার সেই ধমকের ফলে সরে পড়তে বাধ্য হয়।

একবার কলকাতায় প্লেগের আক্রমণ খুব বেশি হয়েছিল। স্বামীজী মঠের বাড়ি ও জায়গা বিক্রি করে রোগীদের পরিচর্যার জন্য অর্থদান করতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং সেজন্য বিজ্ঞাপনাদিও দেওয়া হয়েছিল। স্বামীজী বলেছিলেন, "আমরা সন্ন্যাসী, আমরা তো গাছতলায় থাকতে অভ্যস্ত। আবার না হয় গাছতলায় থাকব।"

বৃন্দাবনে পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একবার একটি কুটিরে প্রবেশ করেন। দারুণ বৃষ্টিতে পথচলা অসম্ভব হওয়ায়, সেখানেই অপেক্ষা করতে হয়। মনটা তখন খুব ভেঙে পড়েছিল। সম্ভবতঃ ঐ কুটিরে কোন সাধু বাস করতেন কখনো। স্বামীজী হঠাৎ দেখলেন দেওয়ালে কয়লা দিয়ে লেখা আছে—

'চাহ চামারি চুহারি অতি নীচন্ কী নীচ্
ম্যায় তো ব্রহ্ম হুঁ, যদি তু ন হতে বীচ্।'

—অর্থাৎ হে বাসনা (চাহ্) তুই চামারনী—মেথরানী (চুহারি), তুই অতি অধমেরও অধম। তুই যদি আমার মধ্যে এসে না পড়তিস, তাহলে তো আমি ব্রহ্মই ছিলাম।

এই লেখাটি পড়ে স্বামীজীর খুব উৎসাহ হয়েছিল।

আমি একবার স্বামীজীকে ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে আমায় বললেন, "ঠাকুরের কথা আর কি বলি? তিনি LOVE personified।"

স্বামীজীর শরীর গিয়েছে শুনলাম রেঙ্গুনে পৌঁছে। বুকটা একেবারে ভেঙে গিয়েছিল—হঠাৎ ভাগবতের সেই শ্লোক[২] মনে পড়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান হয়েছে। উদ্ধব আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জলে পড়লে, মাছেরা খেলা করে। তারা মনে করে চন্দ্র তাদেরই মতো। হঠাৎ চন্দ্র অন্তর্হিত হলে বুঝতে পারে চন্দ্রের মধ্যে তাদের মধ্যে কত তফাত। ভগবানের অন্তর্ধানে আমাদেরও সেই অবস্থা।'

তাঁর বইতে তাঁর জীবনের 20th part-ও প্রকাশ হয়নি।

দুর্ভগো বত। লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোডুপম্॥

—ভাগবত, ৩।২।৮

তুরীয়ানন্দজীর চিঠিপত্রাদি ও কথোপকথন থেকে সঙ্কলিত—সম্পাদক

যখন স্বামীজী প্রথমবার আমেরিকায় যান তখন আমি তাঁর সঙ্গে বোম্বাইয়ের পথে কিছুদূরে গিয়েছিলাম। ট্রেনে যেতে যেতে তিনি আমাকে গম্ভীরভাবে বললেন, "এই যে আমেরিকায় এই সব যোগাড়যন্ত্র হচ্ছে শুনেছ, তা সব এইটের (নিজের শরীর দেখিয়ে) জন্য। আমার মন আমায় এ-কথা বলছে, শীঘ্রই দেখতে পাবে।"

স্বামীজী আমাদের বলতেন, "তোমরা কি মনে কর, আমি শুধু লেকচার দিই? I know, I give them something solid. They know that they receive something solid." (আমি জানি, আমি তাদের কিছু দিলাম, তারা জানলে তারা কিছু পেলে)। নিউ ইয়র্কে স্বামীজী একদিন ক্লাসে লেকচার দিচ্ছিলেন···। কা— বলেছিল, ধ্যানের সময় নিচের কুলকুণ্ডলিনীকে যেমন উপর থেকে একটা শক্তি আকর্ষণ করে, স্বামীজীর লেকচার শুনতে শুনতে সেই রকমটা হচ্ছিল। এক ঘণ্টা লেকচারের পর কা— announce (শ্রোতাদের জানিয়ে দিলে) করলে এখন প্রশ্নোত্তর হবে। স্বামীজীর লেকচারের পরই প্রায় সব লোক উঠে গিয়েছিল। স্বামীজী একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "এর পর আর প্রশ্নোত্তর কিরে? বক্তৃতা শুনে লোকের মনে যে উচ্চ ভাব জেগে উঠেছে ওতে যে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে।" গোবিন্দ! গোবিন্দ!! কি একটা শক্তি ঠাকুর তৈরি করে রেখে গেলেন! জগৎটার চিন্তার গতি একেবারে বদলে গেল। যাকে কেউ টানতে পারে না, যে সকলকে টানে তার কত শক্তি!

স্বামীজী একবার স্পর্শ করে কিডির[৩] মনে ঈশ্বরে বিশ্বাস সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। কিডি ভারি নাস্তিক ছিল। কখনো কখনো স্বামীজীর একটা খুব শক্তি এসে যেত। তখন কাউকে স্পর্শ করে তার ভেতর যেন ধর্মভাবটা প্রবেশ করিয়ে দিতেন।

স্বামীজী সত্যই পরকে সাহায্য করতে পারতেন। তাঁর এমন কিছু গোপন জিনিস ছিল না, যা তিনি অপরকে দিতে না পারতেন—আমাদের তো ঐখানেই মুশকিল। যদি কেউ আমাদের থেকে বড় হয়ে যায় ঐ ভয়। তিনি কিন্তু এত উপরে ছিলেন যে, তাঁর ও ভয় ছিল না। তাঁর ঈর্ষা ছিল না। তিনি বলতেন, "যে যে-জায়গায় আছে, তাকে সে-জায়গায় সাহায্য কর। তার যেখানে অভাব সে-জায়গাটা তার পুরিয়ে দাও। না পার জোর করে তাকে তোমার মতো করতে চেষ্টা করো না।"

তাঁর অদ্ভুত শক্তি ছিল! অনেকের উপর তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু খুব কম লোকেই তা স্বীকার করে। অনেকে স্বামীজীর বাণীকেই নিজের বাণীরূপে প্রচার করেন।

৩ সিঙ্গারভেলু মুদালিয়ার—মাদ্রাজী অধ্যাপক। ইনি অনেক সময় ফলমূল খেয়ে থাকতেন বলে স্বামীজী রহস্য করে তাঁকে 'কিডি' বলে ডাকতেন। তামিল ভাষায় 'কিডি' শব্দের অর্থ পাখি।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক। তিনি কোন আপস না করেই সর্বোচ্চ সত্য প্রচার করেছিলেন। তিনি কেবল দিতেন, প্রতিদানে কিছু চাইতেন না। অপরে এক ফোঁটা দেয় এবং তার পরিবর্তে এক বালতি চায়।

* * *

Personality (ব্যক্তিত্বই) হচ্ছে আসল জিনিস। গোটাকতক মানুষই জগৎটা চালাচ্ছে, আর সব ভেড়া। স্বামীজী পৃথিবীটা ঘুরে এসে বললেন, "Democracy-র (গণতন্ত্রের) মাথামুণ্ড নেই—দু-চার জন লোকই কাজ চালাচ্ছে। দেশ যখন কাজ চালাবার উপযুক্ত লোক দিতে না পারে, তখনই গোল্লায় যায়। আমাদের তো ধর্মপ্রাণ দেশ। আমাদের দেশ বরাবর saints produce (সাধুপুরুষ প্রসব) করে আসছে। ইতিহাসে এমন একটা সময় দেখিয়ে দাও, যখন আমাদের দেশে এটি হয়নি। এক-একটা জীবন কত শত বৎসর কত লোককে চালাচ্ছে। দেখ না, নানক, কবীর। দেখ, তুলসীদাস। কতদিন থেকে এ-দেশটা তাঁরা চালাচ্ছেন!"

স্বামীজী বলতেন, "ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভারতের সেই ভাব এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ভারতে চিরকাল ধরে ধর্মবীর সাধুপুরুষ জন্মে আসছেন। ভারতকে সমগ্র জগতে এই ধর্ম বিস্তার করতে হবে।" স্বামীজীর কথা ফলবেই, দেশ আবার উঠবে। স্বামীজী একবার বলেছিলেন, "এবার আর কিছু বলতে বাকি রেখে গেলাম না।" তিনি সব বলে গেছেন। এখন তাঁর সেই সব ভাবই নানাবিধ প্রণালীর মধ্য দিয়ে কার্যে পরিণত হচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী তারই একটি প্রণালী মাত্র। স্বামীজীর সেবাধর্মের প্রবর্তন এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমার বিশ্বাস ভারতের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। আমাদের জীবদ্দশায় দেখে যেতে না পারি, পরে নিশ্চিত হবে। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আরম্ভ হয়েছে। এই অভ্যুত্থান ব্যতীত ঠাকুর স্বামীজীর মতো ব্যক্তির আগমনের কোন মানেই থাকে না। স্বামীজী কতবার সুস্পষ্ট ভাষায় ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরবচিত্র অঙ্কিত করে গেছেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কখনো মিথ্যা হতে পারে না।

* * *

আমি তাই বলি: "সংশয় রেখো না। তাঁর কাজ জেনে সবটা শরীর-মন-প্রাণ তাতে ঢেলে দাও। এ থেকেই সব হয়ে যাবে। সমাধি-টমাধি যা কিছু ভাবছ সব এর থেকেই হবে। সংশয় রেখো না। কাজে লেগে যাও।" স্বামীজী আমায় দার্জিলিঙে বলেছিলেন, "হরি ভাই, এবার নূতন একটা পথ করে দিয়ে গেলুম। এতদিন লোকে জানত, ধ্যান, জপ, বিচার প্রভৃতি দ্বারাই মুক্তি হয়। এবারে এখানকার ছেলে মেয়েরা তাঁর কাজ করে জীবন্মুক্ত হয়ে যাবে।" তাঁর আদেশ সত্য, তাতে আমার কোন সংশয় নেই।

সেবাশ্রমে রোগীর সেবায় সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা হয়। শিবতুল্য স্বামীজীর বাক্যে বিশ্বাস করে, সেবাশ্রমে শিবের সেবায় যেই লাগবে, সে-ই মুক্ত হয়ে যাবে। পূর্ব-পূর্ব জন্মের কর্ম এতে ক্ষয় হয়ে যায়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। নারায়ণজ্ঞানে সেবাই এই যুগের উপযোগী সাধনা। আমি ঠাকুরের কাজ এড়িয়ে ছিলাম বলে আমাকে এত ভুগতে হলো।

আমার স্বামীজীর একটা কথা মনে পড়ছে। স্বামীজী প্রায়ই বলতেন, "We agree to differ". অর্থাৎ আমাদের শত শত মতভেদ থাকলেও পরস্পরের মতভেদ স্বীকার করে নিয়েও এক যোগে আমরা কাজ করব।

স্বামীজী কি সত্ত্বগুণী ছিলেন না? তাঁর মতো সত্ত্বগুণী কে ছিল? সংগে থেকে তো দেখেছি। এ তো শোনা কথা নয়। রাত ন-টায় ধ্যানে বসে ভোর পাঁচটায় উঠে স্নান করতে গেলেন। মশায় গা ছেয়ে ফেলেছে, যেন গায়ে একখানা কালো কম্বল বিছিয়ে দিয়েছে। তবু হুঁশ নেই। যেন শিব ধ্যানে বসেছেন। এই সত্ত্বগুণের লক্ষণ—ইন্দ্রিয় মনের সম্পূর্ণ সংযম—সম্পূর্ণ সাম্য ভাব। তিনি দেখেছিলেন যে রজঃ-র মধ্য দিয়ে না গেলে ভারতের কল্যাণ নেই। সেইজন্যই নিষ্কাম কর্মের ব্যবস্থা করেছেন। এ সত্ত্বের রজঃ।

স্বামীজী একবার আমাদের বললেন, "তোমরা আগে আমাকে বোঝ, তারপর তাঁকে (ঠাকুরকে) বোঝবার চেষ্টা করবে।" স্বামীজী আর কিছু না হলেও একটা সম্পূর্ণ (perfect) মানব। সম্পূর্ণ মানবের ধারণা যদি না করা যায় তবে ভগবানের ধারণা কি করা সম্ভব? তাই স্বামীজী বলতেন, "আগে আমাকে বোঝ, পরে ঠাকুরকে বুঝবে।"

স্বামীজী খুব রসিক লোক ছিলেন। একদিন একটা ছুরি দিয়ে কাজ করতে করতে তার আগাটা গেল ভেঙে। ভেঙে যাওয়ায় আমি মন খারাপ করে বসে আছি। স্বামীজী শুনে বললেন, "ওতো ওরকম করেই যায়, ওর তো আর ওলাওঠা বা বাত-শ্লেষ্মা রোগ হবে না।" আমি কথা শুনে হেসে ফেললাম। কি চমৎকার বললেন!

একবার সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো থেকে জাহাজে চড়ে একটা দ্বীপে যাবার সময় স্বামীজীর সংগী আমেরিকানরা ছুটতে লাগল, তিনি কিন্তু গদাইলস্করি চালে চলেছেন। তারা বলতে লাগল, "স্বামীজী স্টিমার ছুটে যাবে।" তিনি জবাব দিলেন, "আবার আসবে।" তখন তারা বললে, "ভারতবাসী! আপনাদের সময়ের মূল্যজ্ঞান নেই।" স্বামীজী বেপরোয়া, চট করে উত্তর দিলেন, "তোমরা কালের অধীন হয়ে কালে বাস করছ। আমরা ভারতবাসীরা কালাতীতকে ধরে মহাকালে বাস করছি বলে কালের কোন ধার ধারিনি।"

স্বামীজীর সবরকম লোকের সংগে মেশবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। একবার পরিব্রাজক অবস্থায় দুজনে ট্রেনে যাচ্ছি। তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে কয়েকজন ঘোড়ার সহিসদের সংগে নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি সব কথা হচ্ছিল?" বললেন, "ওরা সব অনেক রকম জানে। ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়াগুলোকে কি কি আদব-কায়দায় ডলাই-মলাই করতে হয়, ঘোড়াগুলোর তেজ বাড়াবার জন্য কি কি আহার করায়—সব শুনে নিলাম। বেশ লাগল। সকলেরই কাছে শেখবার আছে।"

আবার একবার কলকাতায় একজনের বাড়ি দুজনে গেছি। টেবিলের উপর

বিদ্যাসাগর মশায়ের একখানা 'প্রথম ভাগ' পড়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে স্বামীজী বসে বসে বইটা উলটে-পালটে দেখলেন। বললেন, "খুব ভাবের সঙ্গে শিশুমনের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা অনুভব করে তাকে ধাপে ধাপে ভাষা শেখাবার চমৎকার ব্যবস্থা। বিদ্যাসাগর মশায়ের মতো পাকা শিক্ষকেরই উপযুক্ত কাজ। ভাষা-শিক্ষানবীশদের জ্ঞানের স্তরভেদ, বর্ণ ও বাক্যবিন্যাস—যথাযথ এর মধ্যে করা হয়েছে।"

আমরা একত্রে হৃষীকেশে রয়েছি। স্বামীজী একটা আলাদা ঝুপড়িতে থাকতেন। সকালবেলা আমাদের কাছে একসঙ্গে চা খেতে আসতেন। প্রত্যহই একজন পশ্চিম-দেশীয় সাধু ঐখানে বসে গীতা পাঠ করতেন। তাঁর লেখাপড়া বিশেষ জানা ছিল না। পাঠে প্রায়ই ভুল হতো। 'গুড়াকেশেন' শব্দটি তিনি 'গুড্ডাকেশেন' বারংবার উচ্চারণ করছেন শুনে স্বামীজী পরম যত্ন ও বিশেষ দরদের সঙ্গে সংশোধন করে দিলেন। আমাদের বললেন, "তোমরা রোজই এই ভুল পড়া শোন? আর শুধরে দাও না? তোমাদের সাধুর উপর এতটুকু সমবেদনা (sympathy) নেই?"—শেষে স্বামীজী তাঁকে আরো বললেন, "মহারাজ! আপনি গীতার চেয়ে সহজ, বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করলে অনায়াসেই শুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারবেন। আর ভগবানের নামোচ্চারণে আনন্দও পাবেন।"

আমেরিকাতে একবার একটি মেয়েকে দেখে স্বামীজীর খুব সুন্দরী বলে মনে হয়েছিল। কোনরূপ খারাপ ভাবে নয়, অমনি; আবার একবার দেখতে ইচ্ছে হলো। সেবার দেখলেন—কোথায় সুন্দরী! একটা বাঁদরের মুখ! আর একবার তিনি বলেছিলেন—তিনি স্বপ্নেও কখনো স্ত্রীলোক দেখতেন না। একদিন কিন্তু স্বপ্নে দেখেন একজন স্ত্রীলোক তার মাথায় ঘোমটা দেওয়া। দেখে তাকে খুব সুন্দরী বোধ হলো। তিনি তার ঘোমটা তুলে তাকে দেখতে গেলেন। যেই ঘোমটা তোলা অমনি দেখেন ঠাকুর! স্বামীজী লজ্জায় মরে গেলেন!

স্বামীজী তখন আমেরিকায় আত্মার অজত্ব ও অমরত্ব উপদেশ দিতেন, 'আমি আত্মা, আমার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। আমার আবার ভয় কাকে?' কতকগুলি কাউবয় (রাখাল বালক) স্বামীজীকে পরীক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করে। স্বামীজী যখন বক্তৃতা দিচ্ছেন, সেই সময় তারা ডেড শট্স (বেপরোয়া গুলি) তাঁর কানের, মাথার নিকট দিয়ে চালাতে আরম্ভ করল; স্বামীজী কিন্তু নির্ভীক, অবিচলিত, তাঁর বক্তৃতারও বিরাম নেই তখন সেই ছেলেরা আশ্চর্য হয়ে তাঁর কাছে দৌড়ে গেল, আর বলতে লাগল, ' Here is our hero." স্বামীজী বলেছিলেন, '২৯ বৎসরের মধ্যে সব সেরে নিয়েছি।' আর আমরা কি করছি? বলছি, বুড়ো হয়েছি—ডায়াবেটিস, ননসেন্স, (বহুমূত্র হয়েছে, বাজে কথা)! ওসব একসকিউজ (ওজর)। স্বামীজী শেষ দিন পর্যন্ত খেটে গিয়েছেন। দেখেছি, শেষ অসুখের সময় বুকে বালিশ দিয়ে হাঁপাচ্ছেন; কিন্তু এদিকে গর্জাচ্ছেন। বলছেন, "ওঠো, জাগো, কি করছ?" স্বামীজী বলতেন, "মনটাকে একেবারে কাদার মতো করতে

হবে।” কাদা যেমন যেখানে মারব সেখানেই থেকে যাবে, মনটা তেমনি যে বিষয়ে দেব, সে বিষয়ে লেগে থাকবে।

স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার নিউ ইয়র্কে গেলেন তখন কা—স্বামীজীকে বলল, “তোমার জায়গা তুমি এবার নাও।” একবার, দুবার—স্বামীজী তাঁর কথায় কান দিলেম না। কা—আবার সেকথা বলতে তিনি বললেন, “তোকে দিয়ে দিয়েছি। আমার জন্য সারা দুনিয়া পড়ে আছে।” কি ত্যাগ স্বামীজীর! সব গুরুভাইদের দিলেন—চেলাদের নয়। প্রথম ট্রাস্টিদের ভেতর সব গুরুভাইয়েরা—একটিও চেলা নেই। আমায় একবার লিখেছিলেন, “সব তোমাদের দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।” কি অদ্ভুত পুরুষ! বলতেন, “পাশ্চাত্যদেশে আমার কাজ বেশি হবে। ওখান থেকে ভারতে তার ধাক্কা লাগবে।” একদিন মঠ থেকে রেগে বেরিয়ে গেলেন। বললেন, “তোরা সব ছোটলোক, তোদের সঙ্গে থাকতে আছে। তোরা সব আলু, পটল, শাক-পাত নিয়ে ঝগড়া করবি।” কিন্তু শেষটা করলেন কি? সেই ছোটলোকদেরই সব দিয়ে গেলেন। আর একদিন ভারি চটে গেছেন। বলছেন, “একাই যাত্রা করতে হলো—বাজানো গাওয়া সব একাই করতে হলো, কেউ কিছু করলে না।” আমাদের তো গালাগাল দিচ্ছেনই—ঠাকুরের ওপরেও ভারি অভিমান হয়েছে, তাঁকেও গাল দিচ্ছেন, “পাগলা বামুন, মুখ্যু-র হাতে পড়ে জীবনটা বৃথা গেল!” তারপরেই বলছেন, “তবে কি জান, যেটা দেওয়া গিয়েছে, সেটা তো আর ফিরিয়ে নেওয়া চলে না। অনন্ত জীবনের একটা না হয় পাগলা বামুনের হাতে দিয়েই নষ্ট হলো।”

স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকায়। রীজলি ম্যানরে মিঃ লেগেটের বাড়িতে আছি। হঠাৎ একদিন স্বামীজী বললেন, “আমার নিকটে টাকা পয়সা বেশি নেই। আমি এখন সানফ্রানসিস্কো যাব—বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আমায় থাকতে হবে। তুমি এখন নিজের পথ দেখ।” আমি তখন বুঝতে পারিনি যে, স্বামীজী এইভাবে তাঁর সঙ্গ ছাড়িয়ে আমাকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করবার অবসর দিচ্ছেন। সুতরাং মনে মনে খুব চটে গেছি, কিন্তু সে-ভাব কিছু প্রকাশ না করে বললাম, “বেশ কথা।” কথা বলবার সময় ভাবিনি কোথায় যাব; কিন্তু স্বামীজী যখন জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথায় যাবে?” তখন মণ্ট ক্লেয়ারের মিসেস হুইলারের কথা মনে পড়ল। বললাম, “তাঁর কাছে যাব।” স্বামীজী বললেন “খুব ভাল। সেখানে একটা সেণ্টার-টেণ্টার কর।” আমি তখন রাগে গরগর করছি। বললাম, “সেণ্টার-টেণ্টার করতে পারব না শুধু থাকব।” স্বামীজী বললেন, “ওরই নাম সেণ্টার করা। তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই সেণ্টার হবে।” এ-সবই তিনি করতেন গুরুভাইদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা থেকে।

তিনি চাইতেন, আমরা যেন সবাই সব দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠি। তাই তিনি আমাদের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব শিক্ষা দিতেন। এদিকে বেদান্ত, উপনিষদ্, সংস্কৃত নাটক প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন, আবার ওদিকে

রান্নাও শেখাতেন। আরও কত কি যে করতেন তা কি বলব। মীরাটের একদিনের ঘটনা চিরদিনের মতো হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। সেদিন পোলাও প্রভৃতি রান্না করেছেন, সে যে কী উপাদেয় হলো তা আর কি বলব! আমরা ভাল হয়েছে বলায় সব আমাদের খাইয়ে দিলেন। নিজে দাঁতেও কাটলেন না। আমরা বলায় বললেন, "আমি ওসব ঢের খেয়েছি—তোমাদের খাইয়ে আমার বড় সুখ হচ্ছে। সব খেয়ে ফেল।" ঘটনা সামান্য, কিন্তু চিরতরে হৃদয়ে গাঁথা আছে। কত যে যত্ন, কত যে ভালবাসা, কত গল্প, কত বেড়ান—সব স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করছে। এখান থেকেই স্বামীজী একাকী চলে যান। যদিও দিল্লীতে আবার একবার দেখা হয়েছিল এবং একসঙ্গে প্রায় একমাস ছিলাম, কিন্তু তারপর আট বছর পরে একেবারে জগজ্জয়ী হয়ে মঠে ফিরেছিলেন। এর মধ্যে আর একবার বম্বেতে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও আমার সঙ্গে কিছুদিনের জন্যে দেখা হয়েছিল মাত্র। এখন স্বামীজী প্রভুর নিকট আছেন। তাঁর স্মৃতি আমাদের জীবনসঙ্গী হয়ে আছে। তা-ই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান, তা-ই আমাদের জপ-তপ, আলাপন।

লাটু মহারাজ যখন তখন ঘুমিয়ে পড়তেন বলে ঠাকুর একবার খুব রেগে যান। তাঁকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেন। শেষে স্বামীজী ধরে পড়ে সব গোল কাটিয়ে দিলেন। লাটু মহারাজ তাই বলতেন, "যদি গুরুভাই হয় তবে বিবেকানন্দ" সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) মঠ ছেড়ে বাড়ি যেতে চাইলে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাকে বোঝাচ্ছেন, "কেন যাবি? নরেনকে ছেড়ে কোথায় যাবি? এত ভালবাসা আর কোথায় পেয়েছিস? আমিও তো ইচ্ছা করলে বাড়ি গিয়ে থাকতে পারি। আমি তবে কেন পড়ে রয়েছি? ঐ এক নরেনের ভালবাসার জন্য।"

শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ সংবাদ উদ্ধব বিদুরকে জানিয়ে বিলাপ করে বলছেন, "কি আশ্চর্য ব্যাপার! তিনি যদুকুলে জন্মগ্রহণ করলেন, কিন্তু যদুবংশের কেউই তাঁকে বুঝতে পারলেন না। দিবারাত্র একসঙ্গে শোওয়া-বসা, খাওয়া-খেলা প্রভৃতি সত্ত্বেও জগচ্চিন্তামণি পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেউ বুঝতে পারলেন না।" শুধু যদুকুল কেন, সমগ্র মনুষ্যসমাজই হতভাগ্য। কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি। উদ্ধব ঠিকই বলেছেন। আমরাও স্বামীজীর সঙ্গে একসঙ্গে কাটালুম, একসঙ্গে খাওয়া-বসা-চলা-ফেরা-শোওয়া, গল্প-গুজব, শাস্ত্রপাঠ, হাসিঠাট্টা দিনের পর দিন বছরের পর বছর করেছি, কিন্তু স্বামীজীকে আমরা একটুও চিনতে পারিনি, তাঁর স্বরূপ আদৌ বুঝতে পারিনি। তিনি যে অত বড় মহাপুরুষ ছিলেন, তার বিন্দু-বিসর্গও আমরা বুঝতে পারিনি যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। এখন আস্তে আস্তে একটু একটু যেন বুঝতে পারছি। ঠাকুর যে কত বড় মহাপুরুষকে সঙ্গে এনেছিলেন, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য! যতই উদ্ধবের কথা শুনছিলাম ততই মনে হচ্ছিল, উদ্ধব ঠিকই বলেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে আমরা কি-না করেছি! কিন্তু আমরা তাঁকে ধরতে পারিনি। তখন আমরা ভাবতুম তিনি আমাদেরই মতন, তবে খুব উঁচু ঘরের, সব

বিষয়ে আমাদের চেয়ে expert (অভিজ্ঞ)—এই পর্যন্ত মনে হতো। আমার মনে হয়, এত বড় মহাপুরুষ, একাধারে এত গুণ ইতিপূর্বে আর জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি কী গুণের আদরই না জানতেন! এতটুকু গুণ দেখলে, তিলকে তাল করে বলবার অভ্যাস তাঁর ছিল। লোককে ঠেলে তুলে দেবার অসীম শক্তি তাঁর ছিল। কী মহাপ্রাণ ছিলেন তিনি! সকলের জন্য কী feel (সমবেদনা অনুভব) করতেন! সকলের জন্য এত প্রীতি, এত সহানুভূতি আর কোন মানুষের মধ্যে দেখিনি, আর দেখবও না। তাঁর কথা শুনলে মরা মানুষ বেঁচে উঠত। লোকের সঙ্গে কথা কইতে ঘুম পেয়ে যায়, কোন উৎসাহ আসে না। কিন্তু স্বামীজীর কথা শুনলে মরা মানুষ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বলত—'দাঁড়াও দাঁড়াও। মরে তো গেছি, কথাটা একবার শুনে যাই।' তাঁর কথার এতই জোর ছিল যে, ভাব ও ভাষা হৃদয়ের অন্তস্তলে তখনই পেঁছিত, একটুও বিলম্ব হতো না। সময়ের ভুল হয়ে যেত। লোকে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেত। সকলের মনকে এক উচ্চ ভাবভূমিতে তিনি তুলে দিতে পারতেন।

স্বামীজী আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। যতই দিন যাচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে, কেন তাঁর সঙ্গে আরও বেশি করে মিশলুম না, তাঁর কথা আরও কেন শুনলুম না।

স্বামী সারদানন্দ

স্বামীজী কাউকে তাচ্ছিল্য করতেন না। আমরা যাঁদের সঙ্গে কথা বলতেও ঘৃণা-বোধ করতাম, তিনি দু-ঘণ্টা বসে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতেন।

এখন ধর্ম সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছি, সবই তো স্বামীজী বলে গেছেন, নতুন কিছুই শুনছি না। ঠাকুর বলতেন, "নরেন ধ্যানসিদ্ধ।" ছেলেবেলা ধ্যানকালে জটা বের হতো কিনা দেখতেন। ধ্যানচ্ছলে ঐ বয়সেই দীর্ঘকাল দরজা বন্ধ করে বসে থাকতেন।

আইন পড়বার জন্য স্বামীজী ফী জমা দিয়েছিলেন। একদিন মনে হলো, "সবই বৃথা, ঠাকুর আর বেশিদিন থাকবেন না।" অস্থির হয়ে নগ্নপদে কাশীপুরের বাগানে এসে উপস্থিত। সে-সময়ে বাড়ির অবস্থা অতিশয় খারাপ। মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে কয়েক মাসের খরচ ধার করে মায়ের হাতে দিয়ে এলেন এবং বললেন, 'আমাকে আর বিরক্ত করো না।" কাশীপুরে উন্মত্তবৎ আসছেন। ন-বাবু (গিরিশবাবুর ভাই) তাঁকে নগ্নপদে যেতে দেখে, কি হয়েছে, জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, "আমার আমি মরেছে।" স্বামীজী গিরিশবাবুকে গোপনে মনের অবস্থা জানিয়ে এসেছিলেন। বাগানে পেঁছে ঠাকুরের কাছে বায়না করা। "তুই কি চাস?"—ঠাকুর হেসে জিজ্ঞাসা করলেন। "সমাধিস্থ হয়ে থাকব, কখনো কদাচিৎ একটু নেমে সৎকিঞ্চিৎ আহারাদি করে পুনরায় সমাধিস্থ হব।" শুনে ঠাকুর বললেন, "তোর কথা শুনে আমার কষ্ট হচ্ছে, তুই অত-বড় আধার! তোর অমন বুদ্ধি হলো কেন? সমাধি অভ্যাস করে ভগবদ্দর্শন করতে যাবি কেন?" "তাহলে মশায় যা ভাল হয় করে দেন।" "আচ্ছা বাড়ির একটু গোছাল করে আয়, সব হবে।"

স্বামীজী ঠাকুরের নির্দেশ মতো সাধনা আরম্ভ করলেন। অবস্থার পর অবস্থা লাভ হলো—অবশেষে একদিন সন্ধ্যার পূর্বে শয়ন অবস্থায় নির্বিকল্প সমাধি। অনেকক্ষণ পরে দেহ-বুদ্ধি একটু ফিরল। তখন নিজের মাথা ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ববোধ যেন নেই। "ও গোপালদা, আমার শরীর কোথায় গেল"—গা টিপে গোপালদা বললেন, "এই তোমার শরীর এখানেই রয়েছে"—কিন্তু হুঁশ হলো না। ঠাকুরের কাছে সংবাদ দেওয়ায় তিনি হেসে বললেন—"থাক শালা, আমাকে প্রতিদিন জ্বালাতন করে, এখন বুঝুক।" অনেক পরে সমগ্র শরীরের অস্তিত্ববোধ ফিরে এল। শরীরের প্রতি মায়া কি সুগভীর! নির্বিকল্প সমাধি হয়েছে, এমন ব্যক্তিরও "শরীর কোথায় গেল" ভয়।

ঠাকুরের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখার দিন স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধিলাভ হয়েছিল। সমাধির আসনে স্বামীজী বলেছিলেন, "তুমি একি করলে! আমার যে মা ভাই আছে।" এবারকার সমাধির পর স্বামীজী ঠাকুরের কাছে এলে ঠাকুর একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে

ঠাণ্ডা করেছিলেন—"সব তো দেখলে। এখন বাক্স বন্ধ, চাবি আমার কাছে রইল, সময় হলেই তা পাবে।"

স্বামীজী সারাজীবন ঐ সমাধিলাভের জন্য ছটফট করে বেড়িয়েছেন। একবার হৃষীকেশে খুব জ্বর হয়েছিল, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল—নাড়ী পাওয়া যায় না। আমরা মনে করলাম এইবার শেষ। যাই হোক শেষে জ্ঞান ফিরে এল। পরে আমাদের বলেছিলেন, "নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। তখন বুঝেছিলাম কাজ করতে হবে এবং মৃত্যুর আগে ছাড়া আর সমাধি লাভ হবে না।" এখন থেকে কি কাজ করতে হবে এবং কিভাবে তা সম্পন্ন করতে হবে, এইসব চিন্তা আসতে লাগল। স্বামীজীর ঠাকুরকে ধ্যানে দেখে তৃপ্তি হতো না। সাদা চোখে অন্য বস্তুর মতো দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। সর্বদা মনে হতো কে তাঁর হাত ধরে রয়েছে। অসুখের সময় ঐ হাত তাঁর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিত। তিনি অসুস্থ অবস্থায় কাউকে গায়ে হাত দিতে দিতেন না। অবশ্য একথা সেবককে জানতে দেননি। দেহরক্ষার কয়েক মাস পূর্বে বলেছিলেন, "এখন আমার হাত ছেড়ে দিয়েছে। আগের মতো কেউ আমার হাত ধরে নেই।" ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে, স্বামীজীকে একমাসের মধ্যে নানা সাধনা করিয়ে নির্বিকল্প সমাধি পাইয়ে দিয়েছিলেন। He was the rock upon which the whole structure was to be built। স্বামীজীকে ভিত্তি করেই রামকৃষ্ণসঙ্ঘ রচিত হয়েছিল।

একবার স্বামীজী বললেন, "কিরে, মঠে (বেলুড়ে) বসে বসে খালি অন্ন ধ্বংসাচ্ছিস। যা, ওপারে দক্ষিণেশ্বরে ভিক্ষা করে খা-গে। আর ধ্যান-ধারণা করগে।" তাই গেলুম। ওমা, দু'তিন দিন যেতে না যেতেই মঠে কার অসুখ করেছে—সেবা করবার জন্য লোকের দরকার। বলে পাঠালেন, "শিগগির আয়।" ফিরে এলুম।

আমি সা-রে-গা-মা সেধে গান শিখিনি। স্বামীজী গেয়ে যেমন শেখাতেন, ঠিক তেমনটি শিখেছি। মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কান খুব ভাল ছিল। আমি স্বামীজীর কাছে শিখে নিয়ে, ঠিক ঠিক হচ্ছে কিনা, মহারাজের কাছে এগজামিন দিতুম। তিনি অনুমোদন যতক্ষণ না করতেন, ছাড়তুম না।

ভারতে বা ভারতের বাইরে একই জায়গায় স্বামীজীর সঙ্গে গেছি, পাঁচমিনিট রইলাম। দুজনেই ফিরে এলাম, কেউ যদি আমাকে বলত, ঐ জায়গাটা সম্বন্ধে কিছু বলতে, আমি বিশেষ কিছুই বলতে পারতাম না। আর স্বামীজী ঐ যে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন—তিনি অন্ততঃ আধঘণ্টা তো টানা বলতে পারতেন।

কাশীপুরে ঠাকুর, স্বামীজীকে বিশেষ বিশেষ নির্দেশ দিয়ে ভক্তিমার্গের ও অন্যান্য মার্গের অনেক রকম সাধন করিয়ে নিয়েছিলেন। আর স্বামীজীও অসাধারণ শক্তিমান ও গ্রহণ-সামর্থ্যবান বলে খুব অল্পের মধ্যেই ঝটপট এক-একটা পথে ফল পেয়েছিলেন।[1] স্বামীজী নিজেও সবরকম উপলব্ধি করে নিয়ে তবে অপর লোককে বুঝিয়েছেন—

১। মাস্টারমশায়ের অপ্রকাশিত নোটেও একথা আছে।

বক্তৃতা দিয়ে। শুধু নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝে বা ঠাকুরের দৃষ্টান্ত সহায়ে মাত্র নয়। সবটাই তাঁর নিজের পরীক্ষিত। তখন আমরাও ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি আসছি। স্বামীজী আগে থেকেই যাতায়াত করছেন। এই সময় একদিন দেখি, তাঁর সিমলার বাড়িতে আনন্দে ডগমগ হয়ে বসে আছেন। প্রসঙ্গাদি করে পরে জানলাম যে, ঠাকুরের কৃপায় তার অব্যবহিত পূর্বে তাঁর শ্রীরাধার দর্শন ঘটেছে। দেবদেবী দর্শনও স্বামীজীর যথেষ্ট হয়েছে। তবে তিনি ভীষণ চাপা মানুষ ছিলেন। এসব অপরকে বলতেন না।

পরিব্রাজক অবস্থায় পশ্চিমে ঘুরতে ঘুরতে পাশ্চাত্যে যাবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ঠাকুরের কাছ থেকে পান। এই কথার উল্লেখ এক পত্রমধ্যে করে শ্রীশ্রীমাকে লিখে-ছিলেন, "আমি এরূপ আদেশ পাচ্ছি। এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?" স্বামীজী এই পত্র আমার মারফত মাকে পাঠান।—"তুই এই চিঠি নিজে গিয়ে মাকে পড়ে শোনাবি এবং মার মত আমাকে জানাবি।"

আদেশমতো শ্রীশ্রীমাকে শোনানোতে তিনি ঘোমটার ভেতর থেকে আমাকে বললেন "দুদিন পরে বলব।"

দুদিন পরে শ্রীশ্রীমা ধ্যানযোগে স্বতন্ত্রভাবে ঠাকুরের ইচ্ছা জানতে পারেন এবং বলেন, "লিখে দাও, ঠাকুর বলছেন, তাকে ওদেশে যেতে হবে।"

স্বামীজী থাকতে থাকতেই আমাদের ভিতর কেউ কেউ তাঁর কাজকর্ম অন্যভাবে দেখতে আরম্ভ করেন। আমি তখন West-এ (পাশ্চাত্যে)। এসে শুনলুম, একদিন বলরামবাবুর বাড়িতে যোগেনস্বামী প্রভৃতি ঐকথা বলাতে তিনি অভিমান করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আর এ শরীর রাখব না।—ছেড়ে দেব!"—এই বলে নির্জনে বসে রইলেন। কারুর সঙ্গে কথাবার্তা নেই। শেষে মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আবার এসে তাঁদের বকাবকি করেন, "সর্বনাশ! তোমরা আবার একি করলে! এই পাগলা ক্ষ্যাপালে?" তিনিই ঠাণ্ডাঠুণ্ডি করেন। আর বাস্তবিকই, যাঁরা তাঁর criticism করেছিলেন, তাঁদেরই বা দোষ কি? তাঁরাও দেখেছেন—স্বামীজী আমেরিকায় গেলেন—যে বক্তৃতা প্রভৃতি করলেন, তাতে বড় একটা ঠাকুরের নামগন্ধ নেই।

স্বামীজীর সম্পর্কে ঠাকুরও বলে গিয়েছেন। তখন ঠাকুরের সেই কয় রাত ঘুম হয়নি। মুখ-চোখ লাল—Flashed হয়ে গেছে। ঘরে আমরা সবাই বসে আছি। স্বামীজী ঘরে ঢুকতেই তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "হাঁ, এঁর মতো কেউ নেই। দ্যাখ! তোকে এখন কেউ বুঝতে পারবে না। তুই ঠিক থাক।"

স্বামীজীর তখন দেওঘরে অসুখ। আমি attend করছি। রোগা হয়ে গেছেন।

২ শ্রীরাধার দর্শনই স্বামীজীর প্রথম সাকার দর্শন কিনা এখন সঠিক কে আর বলবে? কারণ লীলাপ্রসঙ্গে আছে—দিব্যভাবে শ্রীশ্রীকালীকে দেখিয়ে দিয়ে ঠাকুর স্বামীজীকে কালী মানিয়েছিলেন। এটা আগে, না শ্রীরাধার দর্শন আগে তা নির্ণয় করা দুরূহ। পাঠদ্দশায় তিনি গৌতম বুদ্ধের সাক্ষাৎ পান।

আর ওরই ভিতর পাশ-মোড়া দিচ্ছেন শুয়ে শুয়ে, আর বলছেন, "দেখছিস, এই দেখ। এটাকে বলে গরুড়াসন, এটাকে বলে অমুক আসন" ইত্যাদি। একদিন খুব Inspired হয়েছেন। তখন কার সাধ্য কথার প্রতিবাদ করে? বলছেন গাল দিয়ে, "অমুকের কি দরকার ছিল আমাদের কাজ পণ্ড করবার? (যত শান্ত করবার চেষ্টা করি, ততই বেড়ে চলে) ঠাকুরের উদার ভাবকে একটা বদ গোঁড়ামি কিম্ভূত-কিমাকার দাঁড় করালে? বললে, ঠাকুর অবতার, এটা আগে বলা চাই। কিন্তু আমাদের Method অন্যরকম। তাঁর Character, ভাব দিতে হবে। তারপর লোকে আপনা-আপনিই বলবে।"

একবার স্বামীজীর শিষ্য শান্তিরামের (প্রেমানন্দ-ভ্রাতা) বড় অসুখ। প্রাণ টেকে কিনা সন্দেহ। তার মা অত্যন্ত কাতর হয়ে স্বামীজীকে খুব জিদ ধরলেন, একটা কিছু করে শীঘ্র শীঘ্র তাকে আরাম করে দিতে। আমাদের সামনেই তিনি খানিকটা গঙ্গাজল আনতে বললেন, একটা বাটি করে। তারপরে সেই জলটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। আশ্চর্য! জলটা গরম হয়ে তা থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল। তিনি বললেন, "যাও, ওকে খাইয়ে দিও একটু একটু করে। বাকি যেটা থাকবে, ঘরে রেখে দিও। বাড়ির কারুর শক্ত ব্যারাম হলে ব্যবহার করবে।"—Miracle তাঁর যথেষ্টই ছিল। তবে সব জায়গায় ওগুলির ব্যবহার করতেন না। আর ঠাকুরও নিষেধ করতেন।[৩]

দেহত্যাগের কিছুদিন আগে স্বামীজী একদিন আমাকে বলেছিলেন, "ওরে আর সে মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি না। বেটি আমার হাত ছেড়ে দিলে।" আমি তখন তাঁকে বলি, "সেকি ভাই, তা কখনো হতে পারে? মা তোমার হাত সর্বদাই ধরে আছেন।" সেইদিন থেকে আমি বুঝলাম, স্বামীজীর শরীর দিয়ে মার যা কাজ করবার ছিল তা সাঙ্গ হয়েছে।

স্বামীজীই তো একটা অবতার, ঠাকুরের কথা ছেড়েই দাও। একদিন ঠাকুর স্বামীজীকে বার বার তিনবার বলেছিলেন, "তুই ঠিক থাক—তোকে এখন কেউ বুঝতে পারবে না।"

৩ এছাড়া আমরা পাশ্চাত্যদেশে সিস্টার ক্রিস্টিনের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে এইভাবে অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দান সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্তের কথা অবগত আছি। স্বামীজী ক্রিস্টিনকে বলেছিলেন, "দেখ, যখন খুব কষ্ট হবে, দিন চলে না, ঘরে খাবার নেই, খেতে পাচ্ছ না, তখন এই ব্যাগটি খুললেই অর্থ পাবে। কিন্তু এর অপব্যবহার করলে কোন ফল পাবে না। সাবধান।"

স্বামী অখণ্ডানন্দ

বেলুড়ে একদিন তখনো রাত আছে, উঠে পড়েছি। উঠেই স্বামীজীকে দেখতে ইচ্ছা হলো। স্বামীজীর ঘরের দরজায় গিয়ে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছি, ভেবেছি স্বামীজী ঘুমুচ্ছেন। উত্তর না আসলে আর জাগাব না। স্বামীজী কিন্তু জেগে আছেন—ঐটুকু টোকাতেই উত্তর আসছে গানের সুরে···

"Knocking knocking who is there ?

Waiting, waiting, Oh brother dear !"[১]

* * * *

স্বামীজীর কথা কি বলব? তাঁর কাছে আমি এতটুকু। মঠে এমন দিনও গেছে যে আলোচনা করতে করতে রাত দুটো বেজে গেছে স্বামীজী বিছানায় শোননি, চেয়ারে বসেই বাকি রাতটা কাটিয়েছেন। আমাদের সকলের আগে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে জামাটা পরে গঙ্গার ধারে পূর্বদিকের বারান্দায় বেড়াচ্ছেন।

আমি চিরকালই ভোরে উঠি—অতি ভোরে উঠে দেখি তিনি ঐ রকম বেড়াচ্ছেন। স্বামীজীর গর্ভধারিণীর মুখেও শুনেছি বালককালে এবং বড় হয়েও (ঠাকুরের কাছে যাবার আগেও) কখনো বেলা অবধি ঘুমোননি, কখনো নয়; অতি ভোরে উঠতেন।

মঠে স্বামীজী ভোরে উঠে ঠাকুরঘরে গিয়ে ধ্যান করবার নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন। নিজেও আমাদের সঙ্গে গিয়ে ধ্যান করতেন। স্বামী ত্রিগুণাতীতের চারদিন জ্বর; জল-সাগু খেয়ে আছেন। স্বামীজী ধ্যান করতে ঠাকুরঘরে যাবার সময় তাঁকেও ডাকলেন, বললেন, ওরে আয়, জ্বর—তার আর কি? ধ্যান করবি চল। তোরা যদি জ্বর হয়েছে বলে ধ্যান না করিস—লোকে তোদের দেখে কি শিখবে? বলে তাঁকে সঙ্গে করে ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেন।

আর একদিনের কথা। মঠ তখনও নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানে। একদিন দুটো পর্যন্ত বেদ-বেদান্ত আলোচনা হয়েছে: পুনর্জন্ম আছে কিনা—মানবাত্মার অধোগতি হয় কিনা। স্বামীজী তর্ক লাগিয়ে দিয়ে মধ্যস্থ হয়ে চুপ করে হাসছেন। আর যে পক্ষ পারছে না—তাদের নতুন যুক্তি দিয়ে উসকে দিচ্ছেন। দুটোর পর আলোচনা ভেঙে দিলেন। তারপর সব ঘুম। চারটে বাজতে না বাজতেই স্বামীজী

---

১ গানটির বাকি অংশ:

Once for all—Oh, brother receive me !
Once for all—Oh, sinner believe me !
Unto the Cross thy burden fall ;
Once for all—Oh, once for all !

আমাকে তুলে দিলেন—দেখলুম এর মধ্যেই তিনি সব সেরেসুরে পায়চারি করছেন। আর গুন গুন করে গান গাইছেন। আমায় বললেন, "লাগা ঘণ্টা ; সব উঠুক, শুয়ে থাকা আর দেখতে পারছি না।" আমি তাও একবার বললুম, "এই দুটোর সময় সব শুয়েছে, ঘুমোক না একটু।" স্বামীজী কঠোর স্বরে বলছেন, "কি, দুটোর সময় শুয়েছে বলে ছটার সময় উঠতে হবে নাকি ? দাও আমাকে, আমি ঘণ্টা দিচ্ছি—আমি থাকতেই এই ! ঘুমোবার জন্যে মঠ হলো নাকি ?"

তখন আমি খুব জোরে ঘণ্টা দিলাম। সব ধড়মড় করে উঠেই চিৎকার, "কে রে, কে রে ?" আমায় বোধহয় ছিঁড়েই ফেলত ; কিন্তু দেখে আমার পেছনে স্বামীজী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। তখন সব উঠে পড়ল।

* * * *

স্বামীজী মহাবুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁর রাগ একেবারেই ছিল না। তিনি 'অক্রোধপরমানন্দ' ছিলেন। রাজপুতানায় গেছি। সেখানে নাপিত আমায় কামাচ্ছে আর বলছে, "মহারাজ, আপনাদের স্বামীজীর তুলনা নেই। আমরা মূর্খ, তাঁর পাণ্ডিত্যের বিষয় কি বুঝব ? অমন ক্রোধ সম্বরণ করতে কাউকে দেখিনি। পণ্ডিতেরা তাঁকে বিচারে পরাস্ত করতে এসেছে, অপমানসূচক উত্তর দিচ্ছে—আর তিনি মুচকি হাসতে হাসতে তার প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন। শেষে যারা তাঁর নিন্দা করতে এসেছিল তারাই তাঁর গোলাম হয়ে গেল।"

কোন বিষয় শিক্ষা করতে হলে আমাদের মনে হতো না, ও আমার চেয়ে বয়সে ছোট, ওর কাছে কি শিখব ? স্বামীজীর মতো পণ্ডিত, তিনিও খেতড়িতে নারায়ণদাসের নিকট পাণিনি পড়তে আরম্ভ করলেন। খেতড়িতে তাঁর চেয়ে সম্মানের যোগ্য কে ছিল ? রাজার গুরু বলেও বটে, আবার নিজের ত্যাগ তপস্যা পাণ্ডিত্যেও বটে। তিনি আমায় বলেছিলেন, "নারায়ণদাসের কাছে ছাত্রের মতন পড়া শুরু করে দিলাম।"

মন একাগ্র হলে বাহ্যজগতের সম্বন্ধ লোপ হয়ে যায়। স্বামীজীর এই অবস্থা হতো। যখন রাজেন্দ্র মিত্রের লেখা বৌদ্ধযুগের ইতিহাস পড়তেন, তখন কিছুক্ষণ পড়ার পর বই পড়ে থাকত। তাঁর মন এক অজ্ঞাত রাজ্যে চলে যেত। স্বামীজী বলতেন, "ঘর, বাড়ি, বই, চেয়ার, বেঞ্চ সব উড়ে যেত—কিছুই নেই—এক অনন্তরাজ্যে আমার সত্তা হারিয়ে যেত।" শঙ্করাচার্য ও বুদ্ধদেবেরও এই অবস্থা হতো।

স্বামীজী ভীষণ রসিক পুরুষ ছিলেন। হঠাৎ একদিন—১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের কথা। স্বামীজীর সঙ্গে দার্জিলিং-এ আছি । সকালে দেখি—একেবারে গম্ভীর, সারাদিন কিছু খেলেন না, চুপচাপ। ডাক্তার ডেকে আনা হলো, কিন্তু তাঁর রোগ নিরূপণ করতে পারলেন না। একটা বালিশে মাথা গুঁজে বসে রইলেন সারাদিন। তারপর শুনলাম কলকাতায় প্লেগ—তিন ভাগ লোক শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে—শুনে অবধি এই। সে-সময় স্বামীজী বলেছিলেন, সর্বস্ব বিক্রি করেও এদের উপকার করতে হবে। আমরা যে গাছতলার ফকির সেইখানেই যাব।

স্বামীজীর কি প্রাণ। তার শতাংশের একাংশ আমাদের কারও নেই? আমরা তো তাঁর গুরুভাই, অন্যের কা কথা। দেশের দুঃখ-কষ্টের কথা বলতে বলতে স্বামীজী কেমন হয়ে যেতেন। আমি তখন তাঁকে জিগ্যেস করতাম, ভাই, "কেন দেশ জাগছে না?" তার উত্তরে তিনি বলতেন, "ভাই, এ যে পতিত জাত। এদের লক্ষণই এই।" আহা স্বামীজীর তুলনা নেই।

* * *

স্বামীজী যখন যে ভাবের উপর জোর দিতেন, তখন মনে হতো সেইটিই সত্য, একমাত্র সত্য। মঠে প্রায় এ-রকম হতো। তাই হঠাৎ কেউ এসে তাঁর ভাব ধরতে পারত না।

যেদিন সেবাধর্মের কথা উঠল সেদিন এমন বললেন যে মনে হলো—নিষ্কাম কর্ম-যোগই একমাত্র পথ—আর সব মিথ্যা, ভুল। যেদিন শাস্ত্রপাঠ কি ধ্যান-ধারণার কথা উঠল সেদিন আবার আর এক ধরন, মনে হতো জ্ঞানের পথ বা ধ্যানের পথই পথ, আর সব বাজে কাজ। সেদিন স্বামীজীকে মনে হতো—বুঝিবা সাক্ষাৎ শঙ্কর অথবা বুদ্ধ। আর যেদিন তিনি রাধারানী, গোপীভাব বা প্রেমভক্তির কথা বলতেন সেদিন তিনি সম্পূর্ণ আর একটি মানুষ, বলতেন: Radha was not of flesh and blood. She was a froth in the Ocean of Love. (শ্রীমতী রাধা রক্তমাংসের নয়, তিনি প্রেম-সমুদ্রের একটি বুদ্বুদ।)

এ কথা তাঁকে বহুবার বলতে শুনেছি; হয়তো আপন মনে বলছেন, আর জোরে জোরে পায়চারি করছেন। অথচ সাধারণতঃ কেউ রাধাকৃষ্ণ বা গোপীপ্রেম আলোচনা করলে থামিয়ে দিতেন, বলতেন, "শঙ্কর পড়, শিবের ভাবে ভরে যাও।" ত্যাগ, জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম—এগুলির ওপরই জোর দিতেন।

* * *

স্বামীজীর সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণের সময় এক জায়গায় স্বামীজী গেলেন বনের পথ দিয়ে, আমাকে বললেন—একটু ঘুরে যেতে; কিছু দূরে গিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা, দেখি স্বামীজী একা—কিন্তু হাসছেন, কার সঙ্গে যেন কথা কইছিলেন, চোখে মুখে কি এক আনন্দের ভাব। জিগ্যেস করলাম, "ভাই, কার সঙ্গে কথা কইছিলে?" তিনি চুপ করে শুধু মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

স্বামীজী ও আমি একসঙ্গে যেতে যেতে পাহাড়ে এক জায়গায় দেখি এক সাধু ধ্যান করতে বসেছে—বেশ কাপড়চোপড় মুড়ি দিয়ে মাথা পর্যন্ত, আর সজোরে নাক ডাকাচ্ছে। স্বামীজী চেঁচিয়ে উঠেছেন, "ওরে! বেটা বসে বসে ঘুমুচ্ছে—দে বেটার কাঁধে লাঙ্গল জুড়ে। তবে যদি এর কোন কালে কিছু হয়।"

এই সব দেখে শুনেই তিনি বলতেন, "সত্ত্বের ধুয়া ধরে দেশ তমঃ-সমুদ্রে ডুবতে বসেছে, এদের বাঁচাতে হলে চাই আপাদমস্তক শিরায় শিরায় বিদ্যুৎসঞ্চারী রজোগুণ।" তাইতো কর্মের ওপর এত জোর।

পরোপকারে কার উপকার?—আমার নিজের—এইতো স্বামীজীর কর্মযোগ—সেবাধর্ম। সেবায় চিত্তশুদ্ধি, সেবায় হৃদয়ের বিস্তার, সেবায় সর্বভূতে আত্মদর্শন। আত্মজ্ঞান হলে পর বিশ্বপ্রেম। তখন বোঝা যায় সেই অনুভূতি—

'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু—সর্বভূতে সেই প্রেমময়।'

* * *

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

জীবসেবা শিবসেবা। জীব আর আছে কে?—সবই তো শিব।

এযুগে ঠাকুর স্বামীজীই প্রত্যক্ষ দেবতা। ঠাকুর যে সাক্ষাৎ ভগবান এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। স্বামীজীর দেখা পাওয়া সহজ, তিনি দেখা দেবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল। ঠাকুর কিন্তু এত সহজ নয়।

এযুগের লোক স্বামীজীর ভেতর দিয়েই ঠাকুরকে বুঝবে। এইজন্য লোকে স্বামীজীর ভাব আগে নিচ্ছে। এই সব সেবাকার্য, রিলিফ, দেশপ্রেম—এর ভেতর দিয়েই field (ক্ষেত্র) তৈরি হবে, চিত্তশুদ্ধি হবে। তারপর Spiritual (আধ্যাত্মিক)—সবে তো জীবসেবা আরম্ভ—প্রেম এখনো বহুদূরে।

* * *

Hand, Head and Heart (হাত, মস্তিষ্ক ও হৃদয়)—তিনটিরই চর্চা করতে হবে—স্বামীজীর ভিতর তিনটিই ফুটেছিল, আমাদের চেষ্টা করতে হবে প্রথমটি থেকে। স্বামীজীর মতো spiritual (আধ্যাত্মিক) আমরা না হতে পারি—তাঁর মতো heart and intellect (হৃদয় ও বুদ্ধি) না থাকতে পারে, কিন্তু হাতের কাজটার দিক দিয়ে তো আমরা তাঁর অনুসরণ করতে পারি। মঠে তিনি এতবড় হাণ্ডা মেজেছিলেন, এক ইঞ্চি পুরু ময়লা! আমরা কি একটি বাটিও পরিষ্কার করতে পারি না?

তিনি মঠের পায়খানা পরিষ্কার করেছেন! একদিন গিয়ে দেখেন খুব দুর্গন্ধ—বুঝতে আর বাকি রইল না—গামছাটা একটু মুখে বেঁধে দুহাতে বালতি নিয়ে যাচ্ছেন, তখন সব দেখতে পেয়ে বলে, "স্বামীজী আপনি!" স্বামীজী, হাসি হাসি মুখ, বলছেন, "এতক্ষণে স্বামীজী আপনি!!"

স্বামীজী হলেন Principle-এর (উচ্চনীতির) একটি প্রতিমূর্তি। তিনি রক্ত-মাংসে তৈরি ছিলেন না—idea (ভাব) দিয়ে গড়া। তিনি রাধা সম্বন্ধে যেমন বলতেন, 'Radha was a froth in the Ocean of Love. She was not of flesh and blood'—তেমনি তিনিও। Principle (নীতি) বড়ো ভয়ানক জিনিস। তার জন্য সব ত্যাগ করতে হয়। Principle-ই তো ideal (নীতিই তো আদর্শ)।

স্বামীজীর দেশপ্রেম—অত সোজা নয়। এ Patriotism (প্যাট্রিয়টিজম্)নয়—এ দেশাত্মবোধ। সাধারণ লোকের হচ্ছে দেহাত্মবোধ, তাই দেহের সেবাযত্নে বিভোর। তেমনি স্বামীজীর হচ্ছে দেশাত্মবোধ—তাই সারাদেশের সুখ-দুঃখ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান

নিয়ে তাঁর চিন্তা। দেশাত্মবোধ তাঁর শেষ নয়, এর পরও আছে বিশ্বাত্মবোধ। জগতের সকল জীবের জন্য চিন্তা—তাদের ভক্তি মুক্তি কি করে হবে—সেও তাঁর চিন্তা; সবার মুক্তি না হলে তাঁর মুক্তি নেই।[১]

স্বামীজী শেষ দিকটায় মানুষের সংস্রব এক রকম ছেড়ে দিয়েছিলেন। মঠে এক প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা করেছিলেন—চিনে হাঁস (যশোমতী) রাজহাঁস (বোম্বেটে), পাতিহাস, নানা রকমের পায়রা, কুকুর, সারস, বেড়াল, ভেড়া ইত্যাদি পুষেছিলেন। তাদের যত্ন করে খাওয়াতেন, আদর করতেন—একদৃষ্টে সস্নেহে তাকিয়ে থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণ গোধন নিয়ে কি রকম খেলা করতেন—এই দৃশ্য দেখলে তার অনেকটা ধারণা হয়। তখন স্বামীজীর মুখচোখের ভাব কি অদ্ভুত রকম বদলে যেত—তা আর কি বলব। একেই বলে জীবে প্রেম, বিশ্বপ্রেম।

স্বামীজী ইসলামের সামাজিক উদারতা পছন্দ করতেন। (তিনি বলতেন—"Islamic body with Vedantic brain"। তার মানে মুসলমান হয়ে বেদান্ত পড়া নয়; এর মানে সমাজ হবে ওদের মতো উদার। ওদের সমাজে গ্রহণ আছে, বর্জন নেই, যদি একবার গৃহীত হয়, তাহলে ত্যাগ নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে গ্রহণ নেই—যেমন ইহুদীদের, উপরন্তু ত্যাগ আছে। ফলে আমরা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছি। জাঠরা, শিখরা ঠিক ঠিক উদার বটে, কিন্তু তাদের সমাজ খুব ছোট এবং অশিক্ষিত। তিনি মুঘল রক্তকে বলতেন, "আত্মার সুরা"—তলোয়ারের মতো খর, আগুনের মতো উষ্ণ। স্বামীজী শরীর ও মস্তিষ্ক ঐ দুটোর সমন্বয় চাইতেন। বলতেন, "বৈদান্তিক মস্তিষ্ক চাই, সে হলো হিন্দু ব্রাহ্মণদের, কিন্তু তাদের Physique নেই, অর্থাৎ চিন্তাকে কাজে পরিণত করবার দৈহিক শক্তি নেই, হাজার বছর দাসত্ব করে দেহে ঘুণ ধরে গেছে।")

স্বপ্নে দেখলাম—স্বামীজী বহরমপুরের রাস্তা দিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে চলেছেন—প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ মুসলমান ফকিরের দেহ—কোমরে কেবল লোহার শিকল ও কৌপীন, হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা—তার মাথায় একটা লোহার বল—সেই বলটা থেকে ছোট ছোট শিকল ঝুলছে। সেইটি বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছেন। সঙ্গে চার জন শিষ্য।

জিজ্ঞেস করলাম, "এ রকম বেশ কেন?" বললেন, "এ রকম শরীর নইলে কাজ করব

১। লণ্ডনে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে স্বামীজী এরিক হ্যামণ্ডকে বলেছিলেন: "It may be that I shall find it good to get outside my body; to cast it off like a worn-out garment. But I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere until the world shall know that it is one with God." (একদিন হয়তো জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো আমার এই শরীরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাব; কিন্তু আমি কোন দিন কর্ম থেকে ক্ষান্ত হব না। যতদিন পর্যন্ত না জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব অনুভব করছে, ততদিন আমি সর্বত্র মানুষের মনে প্রেরণা যোগাতে থাকব।)

কি করে ? তোদের বাঙলার ভেতুড়ে শরীর সামান্য কঠোরতায় ভেঙে পড়ে। জানলি, আমি বসে নেই, আমি এদের মধ্যে ঠাকুরের উদারভাব ছড়াচ্ছি, তাই ফকির সেজে এদের সঙ্গে মিশি।” বললাম, ‘ওরা কারা ?’ এক এক করে চারজনকে দেখাতে লাগলেন ইরাণ, তুরাণ, খোরাসান, আফগান। জিগ্যেস করলুম, “ওদের দিয়ে তোমার কি হবে ?”

বললেন, “এইরকম শরীরে বেদান্ত পড়লে তবে ধারণা করতে পারবে।” জিগ্যেস করলাম, “এখন তুমি কি করতে চাও ?” বললেন, “যাতে হিন্দুস্থানের সঙ্গে এদের মিল হয়। বেদ, মহাভারত পড়ে দেখ এরা তোদেরই জাতভাই। কিন্তু আর একটা শক্তি ক্রমাগত চেষ্টা করছে যাতে মিলন না ঘটে ওঠে। এইবার তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানের জাগরণ হবে। পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাচ্য জাতিদের জাগরণ হচ্ছে এবং চীন জাপান ও ভারতের অগ্রগতিকে কেউ রোধ করতে পারবে না।”

শ্রীশ্রীঠাকুর জাজ্বল্যমানভাবে মঠে বিরাজমান রয়েছেন। তিনি নিজ মুখে স্বামীজীকে বলেছিলেন, “তুই আমাকে মাথায় করে যেখানে নিয়ে রাখবি, আমি সেখানেই থাকব।” বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার সময় স্বামীজী নিজ মুখে এই কথা বলে আত্মারামের কোটা মাথায় করে এনে ঠাকুরঘরে তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাশী-পুরে ঠাকুরের শরীর যাবার পরেই আকাশের দিকে চেয়ে দেখি চাঁদের চারপাশে জ্যোতির্মণ্ডল। শরীর ঠিক গেছে কিনা তখনো সকলের সন্দেহ। চন্দ্রমণ্ডলের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। স্বামীজী সকলকে ওটি লক্ষ্য করতে বললেন।

একদিন স্বামীজীর সঙ্গে গল্প করছি, “ভাই, হিমালয়ে যেতে যেতে খুব উঁচু পাহাড়ে এক সাধু দর্শন করে অবাক হয়ে গেলুম। গলিত কুষ্ঠ রোগীকে মায়ের মতন নিজের হাতে ঘা ধুইয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছেন।” দরদী সাধুর কাহিনী শুনতে শুনতে স্বামীজীর চোখ ছলছল করে উঠল। বললেন, “কই, আমরা তো অতদূর পারি না।” তারপর যেই বললুম, “কিন্তু ভাই, এ-ও শুনেলুম তাঁর নাকি রক্ষিতা আছে।” শেষের কথা শুনে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, “ওসব কু-লোকের কুৎসায় কান দিবি না। যা-তা রটায়। তুই নিজে যা চোখে দেখেছিস, তার তুলনা কোথায় ?”

(স্বামীজী নিজের সম্বন্ধে বলতেন যে, দেহাবসানে তিনি তাঁর ঘরটিতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করবেন।

স্বামী অভেদানন্দ

অভেদানন্দজীর কথোপকথন থেকে সংকলিত—সম্পাদক

বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য এঁরা সব আদর্শ সন্ন্যাসী। অন্যান্য যুগেও ধর্মের আচার্যেরা অধিকাংশই সন্ন্যাসী ছিলেন। সন্ন্যাসী মানে ত্যাগী। ত্যাগী না হলে তার কথা লোকে শুনতে চায় না। যুগে যুগে ধর্মাচার্যেরা ত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে লোকশিক্ষা দেবার জন্য আসেন। স্বামীজী ছিলেন অখণ্ড ব্রহ্মচারী সর্বত্যাগী। তিনি ছিলেন বুদ্ধের মতো। কি তাঁর হৃদয়! গরিবের জন্য কি না করেছেন। মিশনের এই যে সেবা বিভাগ এতো স্বামীজীই করে গেছেন। গরিবের দুঃখে পরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ বুদ্ধের পরেই স্বামীজী। স্বামীজীর মতো বহুমুখী প্রতিভা জগতে বড় একটা দেখা যায় না। আগের ধারা ছিল গৃহীরা ধর্মের বিনিময়ে সাধুদের ভরণ-পোষণ করবে। স্বামীজীই তো নতুন ভাবে বললেন যে, সন্ন্যাসীরা সমাজের কল্যাণের জন্যে, পরের উপকারের জন্যে জগদ্ধিতায় জীবন উৎসর্গ করবে। কবে এসব ভাবের সন্ন্যাসী ছিল? ঠাকুরের আদর্শে স্বামীজীই তো এসব করলেন। এর পরে এই ভাবধারা সারা পৃথিবী ছড়িয়ে পড়বে। মঠ (বেলুড়) ঠাকুর-স্বামীজীর স্থান তাঁদের একান্ত ইচ্ছাতেই মঠ হয়েছে। তাঁর সব সন্তানরা মঠের জন্যে শরীর-মন দিয়েছে। কালে ওটাও মহাতীর্থ হয়ে দাঁড়াবে।

স্বামীজী আমাদের নাম দিয়েছিলেন। আমার নাম দিলেন অভেদানন্দ। নিজে বিবিদিষানন্দ নাম নিয়েছিলেন। গুরুর পাদুকা সামনে রেখে হোম হয়েছিল। একে বিদ্বৎ সন্ন্যাস বলে। আমরা তখন ছোট ছিলাম। তিনি আমাদের মধ্যে বড় ছিলেন। আমরা তাঁকে বড় ভাইয়ের মতো জানতাম, তাঁকেই আমাদের নেতা বলে মানতাম। মঠের ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের মন্ত্রও স্বামীজী করেন। আমিও কিছু করেছি। শশী মহারাজও করেছেন। পরে সব একত্র করে একটা রূপ দেওয়া হয়েছে। নারায়ণ উপনিষদে সন্ন্যাসের মন্ত্রাদি অনেক আছে। আমরা ঠাকুরের নিকট এসব শিখেছিলুম। ঠাকুর সব শিখিয়েছিলেন। খুব গোপনে ঠাকুর আমাদের এসব শেখাতেন। কারো সামনে এসব কিছু বলতেন না। অধিকারী না হলে ঠাকুর কাউকে কিছু দিতেন না। ঠাকুরের বীজমন্ত্র স্বামীজীই করেন। ঠাকুর খুব সম্ভব তাঁকে এ-বিষয়ে বলেছিলেন।

আমরা ঠাকুরের আদেশে ভিক্ষা করেছি। স্বামীজী, আমি, শরৎ মহারাজ আর দু-একজন প্রথমেই যাই; পরে রাজামহারাজ, শশী মহারাজ আর আর কে গিয়েছিল। তাতে ঠাকুর খুব খুশি হয়েছিলেন। ঠাকুর খেয়ে বলেছিলেন—"এতদিন পর আজ শুদ্ধ অন্ন খেলুম।" আমরা সব কাজ করতে পারি। স্বামীজীই তা আমাদের

শিখিয়েছেন। আমি গান গাইতেও পারি। আমরা তো স্বামীজীর কাছেই গান-বাজনা শিখেছি। আমি তবলা বাজাতেও বেশ পারতাম। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) পাখোয়াজ বেশ বাজাত। স্বামীজী তানপুরা নিতেন, শরৎ মহারাজ পাখোয়াজ নিতেন, তবে গান জমত। সে একদিন গেছে।

কাশীপুরে আমরা খুব সাধন ভজন করতাম। শিবরাত্রির দিন ধ্যান-ভজনে আমরা কয়েকজন গুরুভাই সারারাত কাটিয়েছিলাম। রাত তখন গভীর। স্বামীজী ও আমি পাশাপাশি বসে ধ্যান করছি। এক সময় দেখলাম ধ্যান করতে করতে স্বামীজীর শরীর খুব কাঁপতে লাগল। স্বামীজী আমাকে বললেন, "আমায় ছুঁয়ে থাক তো।" আমি ডানহাত দিয়ে তাঁর উরু ছুঁলাম। স্বামীজী বললেন, "কিছু feel (অনুভব) করছিস কি?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, ইলেকট্রিক কারেন্ট-এর মতো।" ক্রমে ঐ কাঁপুনি এমন প্রবল হলো যে, আমার হাত কাঁপতে লাগল। স্বামীজী বললেন, "একেই কি শক্তি সঞ্চার বলে—ঠাকুর যা বলেন?" আমি বললাম, 'কি জানি।'

গুরুভাইদের প্রতি স্বামীজীর কী ভালবাসা এবং বিশ্বাসই না ছিল। তিনিই তো ঠাকুরের অবর্তমানে তাঁর ভালবাসা ও বিশ্বাস দিয়ে গুরুভাইদের সকলকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছিলেন। কত রকম মজাই না তিনি করতেন গুরুভাইদের সঙ্গে। আমাকে আর শরৎ মহারাজকে স্বামীজী আদর করে বলতেন 'কালুয়া' আর 'ভুলুয়া।' লণ্ডনের কাজের জন্যে যখন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন তখন আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু গুরুভায়েরাও ছাড়লেন না। তাছাড়া স্বামীজীর আহ্বান—তা আমি মাথা পেতে নিলাম, সুতরাং যেতে হলো। স্বামীজী চাইতেন গুরুভায়েরা সকলেই বড় হোক এবং তা হোক নিজেদের শক্তিতেই। লণ্ডনে পেঁছানর পর থেকেই স্বামীজী দৃঢ়ভাবে আমাকে বলেছিলেন, "নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে তোমাকে। আমার উপর নির্ভর করা চলবে না।" বিদেশে গিয়েই স্বামীজীর ঐ কথা শুনে স্বভাবতই আমি কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলাম। লণ্ডনে আমার প্রথম বক্তৃতা আমাকে না জানিয়েই স্বামীজী আমন্ত্রণ পত্রে ছাপিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। জানতে পেরে আমি বললাম, "আমি কি করে লেকচার দেব? কি বলব আমি তো কিছুই জানি না।" সমস্ত দিন ধরে ঝুটোপুটি চলল। স্বামীজীর এক কথা, "ঘোষণা হয়ে গিয়েছে তোমাকে বলতেই হবে।" তখন আমি বললাম, "তবে শিখিয়ে দাও কিরকম করে আরম্ভ করতে হয়, কিরকম করে শেষ করতে হয়।" তখন বললেন, "আমায় কে শিখিয়েছিল? যাঁর মুখ দেখে আমি বলেছি, তুমিও তাঁকে দেখেই বল।" হলোও তাই। দাঁড়ান মাত্র পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে মাথা পর্যন্ত একটা ইলেকট্রিক কারেন্ট বয়ে গেল। লোকে কি বলবে এই ভয় হলো। যাই হোক সেটাকে দাবিয়ে রেখে বলে গেলাম। দেখি স্বামীজী খুব মাথা নাড়ছেন। আমার দেখে ভয় হলো—কি বুঝি ভুল হচ্ছে। আমার বলা হয়ে গেলে স্বামীজী খুব প্রশংসা করলেন।

আনন্দে ডগমগ হয়ে বললেন, "এই হলো বেদান্ত চর্চার ফল বুঝলে?" আমাকে বললেন, "you have a resonant voice which has Carrying Power too" (তোমার কণ্ঠস্বর মধুর এবং শ্রোতাদের মনকে টেনে নিয়ে যাবার শক্তিও তার আছে)। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি যখন বলছিলাম তখন অত মাথা নাড়ছিলে কেন?" বললেন, "খুব আনন্দ হচ্ছিল তাই।" আমার বক্তৃতার পর সেই সভাতে সেদিন স্বামীজী বলেছিলেন, "Even if I perish out of this plane, my message will be sounded through these dear leaps and the world will hear it." (যদি আমি পৃথিবী থেকে চলে যাই তাহলে আমার এই প্রিয় গুরুভ্রাতার কণ্ঠ দিয়ে আমার বাণী প্রচারিত হবে এবং জগৎ তা শুনতে পাবে)।

যখন ইংল্যাণ্ড থেকে আমাকে নিউ ইয়র্ক যেতে হলো তখন স্টার্ডি বলল, "আমি তোমার টিকিট কিনে দিচ্ছি নাও।" আমি বললাম, "না, তোমার টাকা নেব কেন? আমি যেমন করে পারি তুলে নেব।" তখন স্টার্ডি বলল, "এ আমার টাকা নয়, স্বামীজীর টাকা তিনি আমায় দিয়ে বলে গিয়েছেন, 'যদি অভেদানন্দ কোথাও যেতে চায়, দিও।' তুমি নেবে?" আমি বললাম, "নিশ্চয়ই। স্বামীজীর টাকা খুব নেব।" তারপর সেই টাকায় টিকিট কিনে নিউ ইয়র্ক চলে গেলাম। হঠাৎ লণ্ডন থেকে আমেরিকায় চলে আসায় নতুন অচেনা পরিবেশের মধ্যে পড়ে অসুবিধাবোধ করছিলাম। একেবারে নির্বান্ধব, নিঃসঙ্গ অবস্থার ভেতর পড়তে হয়েছিল। স্বামীজী তখন এদেশে (ভারতে)। একদিন সুদীর্ঘ একখানা চিঠি লিখলাম স্বামীজীকে। চিঠিটার মর্ম ছিল, আমেরিকার মতো নতুন জায়গায় স্বামীজী যেন তার পরিচিত বন্ধুদের চিঠিপত্র লেখেন আমাকে সাহায্য করার জন্য। স্বামীজী উত্তরে লিখলেন, "you must stand on your own feet and struggle". (তোমাকে তোমার নিজের পায়ের উপড়েই দাঁড়াতে হবে এবং লড়াই করতে হবে)। প্রথমে ব্যথিত হলেও পরে বুঝেছি স্বামীজী কি চাইছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণা এবং স্বামীজীর একান্ত ভালবাসা ও বিশ্বাসকে সম্বল করে নিজের পায়ে দাঁড়ানর চেষ্টা করেছিলাম। তাঁদের আশীর্বাদে কৃতকার্যও হয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে এলে যখন স্বামীজী নিউ ইয়র্কে যান তখন আমার কাজ দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। আমি বললাম, "এবার তুমি তোমার কোন শিষ্যকে ভার দিয়ে দাও।" তিনি বললেন, "না, তুমি থাক।" ঐদিন বিকেলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বিপুল জনস্রোত লক্ষ্য করে হঠাৎ স্বামীজী বললেন, "এইসব লোক যাচ্ছে যেন সব ইন্দ্রিয়। আত্মা দেখছে, 'সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণঃ।' রাস্তাটা দেখলেই আত্মার এই ভাবটা আমার আসে।"

রবার্ট ইঙ্গারসোল ওদেশে একজন বিখ্যাত বক্তা ছিলেন। উনি খুব যুক্তিবাদী ছিলেন। ধর্মের কোনরূপ গোঁড়ামি পছন্দ করতেন না। সাধারণে তাঁকে নাস্তিক বলে জানত। কিন্তু তা নয়। স্বামীজীর সঙ্গে ওঁর দেখা হয়। উনিই স্বামীজীকে

বলেছিলেন, আগে থেকে এইসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যদি লড়াই না করতাম, তাহলে **you would have been stoned in the streets of New York.**

শিকাগোতে স্বামীজীকে একবার একজন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিল। কোন স্ট্রীট-এ কোথায় নামতে হবে তা তারা স্বামীজীকে বলে দিয়েছিল। তারপর সেখানে যাবার জন্যে স্বামীজী ট্রামে ওঠেন। কনডাকটরকে বললেন—আমাকে অমুক স্ট্রীট-এর কাছে এলে নামিয়ে দিও। সে বললে, আচ্ছা। তারপর তাঁর ইচ্ছা হলো একটু ধ্যান করি। এই ভেবে তিনি ধ্যান করছেন। যথাসময়ে কনডাকটর তাঁকে জানায় সেই স্ট্রীট এসেছে। কিন্তু কোন সাড়া নেই। কয়েকবার কনডাকটর তাঁকে ডাকে। কিন্তু কে শুনছে। তিনি তখন ধ্যানে ডুবে গেছেন। তারপর গাড়ি যখন ডিপোতে ঢুকছে তখন তাঁর হুঁশ হয়েছে। তিনি তখন কনডাকটরকে জিজ্ঞাসা করছেন, "আমাকে সেই স্ট্রীটের কাছে নামিয়ে দিলে না ?" সে বললে, "What, were you dreaming ? আমি তোমাকে কত ডাকলুম। আর কি করব ?" তারপর স্বামীজী তাকে বললেন, "এখন আমি সেখানে কি করে যাব ?" সে বললে, "ডিপো থেকে যে পরের ট্রাম যাবে তাতে করে যাও।"

স্বামীজী দেশ উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বার আমেরিকায় গিয়ে নিউ ইয়র্কে আমাকে বলেছিলেন, আমায় যদি জেলে দেয়, দেশটা জাতে উঠতে পারে। তিনি জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তবে তিনি হুজুগ পছন্দ করতেন না। ইংরেজরা ভারতীয়দের মানুষের মধ্যেই ধরতে চায় না। না হলে এদেশের মানুষের ওপর এত অত্যাচার করে ? তারা বলে কালা-আদমী আবার মানুষ ? ওদের দেশে আগে গেলে ঘৃণা করত, একসঙ্গে বসত না, এমনকি হোটেলে পর্যন্ত না। এখন কিছুটা সে ভাব উঠে গেছে। স্বামীজী ওদেশে গিয়ে যেন ভাবটা মুছে দিয়ে এসেছেন।

রামদত্তের বাড়িতে একবার ঠাকুর এসেছেন। স্বামীজী আসেননি। রামবাবু বললেন বিলের ভীষণ মাথা ধরেছে। কিন্তু ঠাকুর তবুও তাঁকে ডেকে আনতে বলাতে শশী, নিরঞ্জন, আমি, আর বোধ হয় মনোমোহনবাবু (মনোমোহন মিত্র) স্বামীজীকে নিয়ে আসার জন্য যাই। রামবাবুর বাড়ি থেকে তো আর বেশি দূর নয়। গিয়ে দেখি অন্ধকার ঘরে মাথায় গামছা দিয়ে তিনি শুয়ে আছেন। মাথায় যেন শাবল দিয়ে খোঁচাচ্ছে। যেতে বলায় তিনি বললেন, "আমি যাব না। আমি কি করে যাব ? মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।" তারপর নিরঞ্জন জোর করে বোঝালে আর বললে, "তুমি চোখ বুজেই চল। আমি তোমার হাত ধরে ধরে নিয়ে যাব।" শেষকালে ঐরকম করে তাঁকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ঠাকুর তখন স্বামীজীর মাথাটা হাত দিয়ে নেড়ে বললেন, "কিরে, কি হয়েছে রে ?" আশ্চর্য। স্বামীজীর মাথার যন্ত্রণা কোথায় চলে গেল। তিনি তিন ঘণ্টা ধরে গান গাইলেন। ঠাকুরের healing power (আরোগ্য করার ক্ষমতা) ছিল। ঠাকুর স্বামীজীকে খুব সম্মান করতেন। কখনো তাঁকে খাবার জল দিতে বলতেন না ; গাড়ু নিয়ে যেতে বা গাড়ুতে জল দিতে দিতেন না।

স্বামীজী তাঁর কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে করে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে আসতেন। তিনি একদিন ঠাকুরকে বললেন, "আপনি আমার বন্ধুদের দেখেন না কেন?" ঠাকুর বললেন, "ওদের যে এখন কিছু হবে না দেখতেই পাচ্ছি, কি করব?"

রাজা মহারাজ সাকারবাদীর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি হলেন সাকারবাদীর আদর্শ আর স্বামীজী হলেন সাকার নিরাকার দুই-ই। আবার এ-দুয়ের পারেও। আমি হলুম—নিরাকারী। ঠাকুর ছিলেন সর্বভাবের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত—আবার নামরূপাতীত। তিনি কি তিনিই জানেন। বিবেকানন্দ, কি আমি বা আমরা যা-কিছু করেছি বা করছি সেসব তাঁরই শক্তি। অশরীরী হয়ে তাঁরই ভাব আমাদের মধ্যে খেলছে।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

একদিন সকালে বেলুড়ে স্বামীজী ঠাকুরঘর থেকে নেমেছেন। চায়ের টেবিলের সামনে আমাদের মুখ মুখে বলছেন, "শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছ না? দেখ, দেখ—এইখানেই যে তিনি সাক্ষাৎ দাঁড়িয়ে আছেন।" আমরা কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। চুপ করে রইলাম।

ঢাকায় সুশীল মহারাজকে প্রচারে পাঠাবার আগে দুজনেই ঠাকুরঘরে। স্বামীজী ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে সুশীল মহারাজের হাত ধরে বেশ একটা ঝাঁকানি, নাড়া ও হ্যাঁচকা দিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, "আমাদের আর কি শক্তি? গুরুর শক্তি।"

শ্রীশ্রীমায়ের উপর স্বামীজীর অগাধ ভক্তি দেখা যেত। বেলুড় থেকে বাগবাজারে যাবেন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। গঙ্গাজল আনতে বললেন। খুব ভক্তিভরে মাথায় দিলেন।

১৯০১-০২। একদিন স্বামীজী, রাখাল মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতিকে ডেকে বললেন, "কাল থেকে তোমরা মাধুকরী করতে বেরোও। তোমরা নিজেরা না গেলে হবে না। তোমাদের দেখে তবে তো ছেলেরা শিখবে। গঙ্গা পেরোবার জন্য একটি করে আধলা মাত্র মঠ থেকে নাও। ওপারে যাবে। কিন্তু কোন চেনা লোকের বাড়ি ভিক্ষে করবে না।"

কথামতো ওঁরা বেরোলেন। পশ্চিমের সাধুদের মতো গাঁতি দিয়ে গৈরিক বহির্বাস পরিহিত। খালি গা। দেহের দীপ্তি, কান্তি যেন ফেটে পড়ছে। সকলেই তখন পূর্ণ যুবক। আর ওঁদের চেহারাগুলি সব প্রকৃত সাধুর মতো। জ্যোতির্ময় সুঠাম মনোহর বয়ান। গ্রীষ্মকাল। গলদঘর্ম হয়ে ঝুলি কাঁধে রাখাল মহারাজ প্রভৃতি দুপুর করে ফিরে এলেন। আমতলার কাছে বাঁধান চাতালে ছায়ায় দাঁড়িয়ে

সব দম নিচ্ছেন। স্বামীজী এমন সময় ওঁদের দূর থেকে আসতে দেখে এগিয়ে এসে খুব খুশি হয়ে রাখাল মহারাজকে আলিঙ্গন করলেন।—"এসো ভাই রাজা এসো। এই তো চাই। ভিক্ষান্ন—শুদ্ধ অন্ন। অনেকদিন খাইনি।" রুটি আর কি কি, একটু-আধটু গুড়টুড় ঝুলি থেকে নিয়ে স্বামীজী পরম পরিতোষের সঙ্গে খেলেন।

স্বামীজী নিজেই একটি জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া ছিলেন। তিনি পৃথিবীর ও ভারতের স্থপতিবিদ্যার মূল রীতি, ধারাগুলির তত্ত্ব সম্বন্ধে একদিন মুখে যা বর্ণনা করেন তা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই। একদিন বেলুড় মঠে রাত দুটোর সময় স্বামীজীর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। বারান্দায় পায়চারি করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি স্বামীজী, আপনার ঘুম হচ্ছে না?" স্বামীজী বললেন, "দেখ পেসন, আমি বেশ ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা লাগল আর আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হয়, কোন জায়গায় একটা দুর্ঘটনা হয়েছে এবং অনেক লোক তাতে দুঃখকষ্ট পেয়েছে।" স্বামীজীর এই কথা শুনে আমি ভাবলাম, কোথায় কি দুর্ঘটনা হলো আর স্বামীজীর এখানে ঘুম ভেঙে গেল—এটা কি সম্ভব। এরকম চিন্তা করে মনে মনে একটু হাসলাম। কিন্তু আশ্চর্য। পরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখি গত রাত্রে দুটোর সময় ফিজির কাছে একটি দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে বহু লোক মারা গিয়েছে, বহু লোক নিরাশ্রয় হয়েছে, অবর্ণনীয় দুঃখের সম্মুখীন হয়েছে। খবরটি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম সিসমোগ্রাফের (পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কম্পন পরিমাপের যন্ত্রের) চেয়েও স্বামীজীর nervous system (স্নায়বিক গঠন) more responsive to human miseries (মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বামী সদানন্দ

স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে বিখ্যাত বিবেকানন্দ হয়ে ফিরে এলে একদিন তাঁকে বলেছিলাম, "কি মহারাজ, আর কি আমাদের মনে আছে?" স্বামীজী বললেন হাসতে হাসতে, "সেকি রে গুপ্ত, আমি কি ঘোড়ার ডিম হয়েছি যে, তোকে মনে থাকবে না! তোর জুতো যে আমি বয়েছিলুম, সেদিনের কথা তোর মনে পড়ে?"

একদিন বিদ্যাসুন্দরের একটি বয়েৎ স্বামীজী আওড়াচ্ছেন, "বিদ্যে পাবার সাধ থাকে তো চাঁদমুখে ছাই মাখ, যাদু।" ঐ বচন শুনে বাস্তবিকই খপ করে খানিকটা উনুনের ছাই মুখে মেখে কর্তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। স্বামীজী বললেন, "আমি কি তোকে সত্যি-সত্যি ছাই মাখতে বলেছিলাম? আমি গান করছিলাম।"—হাসির গররা উঠল।

হাথরাস স্টেশনে কাজ করতাম। এক রাত্রে সাধুর স্বপন দেখি, তাঁকেই খুঁজছিলুম। তিনদিন পরে এক ট্রেনে দেখি, একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরায়, এক লাল সুন্দর পাগড়ি বাঁধা বড় বড় চোখওয়ালা সাধু যাচ্ছেন। দেখে বুঝলুম হিন্দুস্থানী নন, বাঙালী—আমারই স্বপনের সাধু। তাঁকে দেখেই মুগ্ধ। আমারও খুব লম্বা-চওড়া চেহারা ছিল। বললাম, "মহারাজ আমি বাঙালী। এখানে নেমে আমার বাসায় আপনাকে দুই-একদিন মেহেরবানি করে থেকে যেতে হবে।" তিনি বললেন, "তোমার বাড়ি গেলে তুমি কি খাওয়াবে?" তৎক্ষণাৎ হাফিজ থেকে এক ফারসী বয়েৎ বললাম, ভাবার্থ—"হে প্রেয়সী, তোমায় আর কি খাওয়াব? আমার এ সাধের কলিজাখানার কাবাব করে খাওয়াব।" তাঁর রাঙা মুখ, প্রেমে ঢল ঢল আঁখি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরে ফিরবার পথে নেমে পড়লেন। তিনদিন ছিলেন। প্রথম দেখা হতেই পিরিত। পিরিত জমে গেল। Love at first sight.

We belong to the line of prophets—আমরা সব বড় ঘরের ছেলে। ব্যবহার নিয়ে বড় ঘর। চরিত্র নিয়ে বড় ঘর। ঋষির বেটা আমরা। মানসপুত্র। পয়গম্বরের সন্তান।

স্বামীজীকে আমি বলেছিলাম, "Unknown (অজ্ঞাতনামা) নরেন দত্তের চেলা, আমেরিকান গ্ল্যামার (জলুস) দেখে আসিনি।" শেষের দিকে বেলুড়ে তখন দিন কয়েক তাঁর রুচিমতো রান্না করি। তাঁর শরীর ভাঙনের পথে। একদিন কি কারণে তিনি চটে লাল হয়ে নিজের ঘরে বসে। মেজাজ অত্যন্ত গরম। কার সাধ্যি সামনে এগোয়। খানা তৈরি করে বাবুর্চির কায়দায় কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে ঘরে খাবার নিয়ে সাধাসাধি, "মহারাজ নরম হোন। গুস্সা ছোড় দিজিয়ে!" টেমপারেচার তবু নামে না।—"মেহেরবানি করুন, সব্ কুছ্ কসুর মাফ্ কিজিয়ে।"—"যাঃ শালা, দূর হ, খাব না।" তখন আমি দাঁত দেখালাম। "তুম্ভী মিলিটারি, হাম্ভী মিলিটারি।" আমি

রেগে হাত নেড়ে মুখের উপর বলে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলুম, "যাঃ শালা! ভুখা রহো, হামারা ক্যা পরোয়া!"

আমরা স্বামীজীর কাছে তাঁর শ্ল্যামার দেখে আসিনি। ত্রিতাপতাপিত হয়ে মুক্তির জন্য আসিনি। পিরিতে পড়ে এসেছি, পিরিতে পড়ে এসেছি। আবার বলি নরেন দত্তের পিরিতে পড়ে এসেছি। সাফ কথা! He was all Love—তাঁর সব সত্তাটাই প্রেমময়—ভালবাসা জমাট।

স্বামী শুদ্ধানন্দ

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ বিজয় করে সবে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছেন। যখন থেকে স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের বিজয়কেতন উড়িয়েছেন, তখন থেকেই সে-সম্বন্ধে যেকোন বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তাই সাগ্রহে পাঠ করছি। তখন দুই-তিন বছর মাত্র কলেজ ছেড়েছি—কোনরূপ অর্থোপার্জনাদিও করি না। সুতরাং কখনো বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি গিয়ে, কখনো বা বাড়ির কাছে ধর্মতলায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' অফিসের বহির্দেশে বোর্ডসংলগ্ন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় স্বামীজীর সম্বন্ধে যে-কোন সংবাদ বা তাঁর যে-কোন বক্তৃতা প্রকাশিত হচ্ছে, তাই সাগ্রহে পাঠ করি। এইরূপে স্বামীজী ভারতে পদার্পণ করা পর্যন্ত সিংহলে বা মাদ্রাজে যা কিছু বলেছেন, প্রায় সব পাঠ করেছি। এতদ্ব্যতীত আলমবাজার মঠে গিয়ে তাঁর গুরুভাইদের কাছে এবং মঠে যাতায়াতকারী বন্ধুবান্ধবদের কাছেও তাঁর অনেক কথা শুনেছি ও শুনছি। আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপত্রসমূহ যথা—বঙ্গবাসী, অমৃতবাজার, হোপ, থিওজফিস্ট প্রভৃতি—যাঁর যেরূপ ভাব—তদনুসারে কেউ বিদ্রুপচ্ছলে, কেউ উপদেশদানচ্ছলে, কেউ বা মুরুব্বিয়ানা ধরনে—যিনি তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু লিখছেন, তাও প্রায় কিছুই জানতে বাকি নেই।

আজ সেই স্বামী বিবেকানন্দ শিয়ালদহ স্টেশনে তাঁর জন্মভূমি কলকাতা নগরীতে পদার্পণ করবেন, আজ তাঁর শ্রীমূর্তি দর্শনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে, তাই প্রত্যূষে উঠেই শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হলাম। এত প্রত্যূষেই স্বামীজীর অভ্যর্থনার্থ বহুলোকের সমাগম হয়েছে। অনেক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, তাঁর সম্বন্ধে কথাবার্তা হতে লাগল। দেখলাম, ইংরেজীতে মুদ্রিত দুটি কাগজ বিতরিত হচ্ছে। পড়ে দেখলাম, তাঁর লণ্ডনবাসী ও আমেরিকাবাসী ছাত্রবৃন্দ বিদায়কালে তাঁর গুণগ্রাম বর্ণনা করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে অভিনন্দনপত্রদ্বয় প্রদান করেন, ঐ দুটি তাই। ক্রমে স্বামীজীর দর্শনার্থী লোকসমূহ দলে দলে সমাগত হতে লাগল। স্টেশন-প্লাটফর্ম লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। সকলেই পরস্পরকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করছেন, স্বামীজীর আসবার আর কত বিলম্ব? শোনা গেল, তিনি একখানি স্পেশ্যাল ট্রেনে আসবেন, আসবার আর

বিলম্ব নেই। ঐ যে—গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে, ক্রমে সশব্দে ট্রেন প্লাটফর্মে প্রবেশ করল।

স্বামীজী যে গাড়িখানিতে ছিলেন, সেটি যেখানে এসে থামল, সৌভাগ্যক্রমে আমি ঠিক তার সম্মুখেই দাঁড়িয়েছিলাম। যেই গাড়ি থামল, দেখলাম স্বামীজী দাঁড়িয়ে সমবেত সকলকে করজোড়ে প্রণাম করলেন। এই এক প্রণামেই স্বামীজী আমার হৃদয় আকর্ষণ করলেন। তখন ট্রেনমধ্যস্থ স্বামীজীর মূর্তি মোটামুটি দেখে নিলাম। তার পরেই অভ্যর্থনা-সমিতির শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ এসে তাঁকে ট্রেন থেকে নামিয়ে কিছু দূরবর্তী একখানি গাড়িতে ওঠালেন। অনেকে স্বামীজীকে প্রণাম ও তাঁর পদধূলি গ্রহণ করতে অগ্রসর হলেন। সেখানে খুব ভিড় জমে গেল। এদিকে দর্শকগণের হৃদয় থেকে স্বতঃই "জয় স্বামী বিবেকানন্দজী কী জয়" "জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কী জয়"—এই আনন্দধ্বনি উত্থিত হতে লাগল। আমিও প্রাণভরে সেই আনন্দধ্বনিতে যোগ দিয়ে জনতার সঙ্গে অগ্রসর হতে লাগলাম। ক্রমে যখন স্টেশনের বাইরে পৌঁছেছি, তখন দেখি অনেকগুলি যুবক স্বামীজীর গাড়ির ঘোড়া খুলে নিজেরাই টেনে নিয়ে যাবার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলাম, ভিড়ের জন্য পারলাম না। সুতরাং সে চেষ্টা ত্যাগ করে একটু দূরে দূরে স্বামীজীর গাড়িটির সঙ্গে অগ্রসর হতে লাগলাম। স্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনার্থ একটি হরিনাম-সংকীর্তনদলকে দেখেছিলাম। রাস্তায় একটি ব্যাণ্ড বাজনা বাজাতে বাজাতে স্বামীজীর সঙ্গে চলল, দেখলাম। রিপন কলেজ পর্যন্ত রাস্তা নানাবিধ পতাকা, লতা-পাতা ও পুষ্পে সজ্জিত হয়েছিল। গাড়ি এসে রিপন কলেজের সম্মুখে দাঁড়াল। এইবার স্বামীজীকে বেশ ভাল করে দেখবার সুযোগ পেলাম। দেখলাম, তিনি মুখ বাড়িয়ে কোন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন। মুখখানি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, যেন জ্যোতিঃ ফুটে বেরুচ্ছে, তবে পথের শ্রান্তিতে কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত ও মলিন হয়েছে মাত্র। দুখানি গাড়ি—একটিতে স্বামীজী এবং মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার; চারুচন্দ্র মিত্র ঐ গাড়িতে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। অপরটিতে গুডউইন, হ্যারিসন (সিংহল থেকে স্বামীজীর সঙ্গী জনৈক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাহেব), জি. জি., কিডি ও আলাসিঙ্গা নামক তিনজন মাদ্রাজী শিষ্য এবং ত্রিগুণাতীত স্বামী।

যাই হোক, অল্পক্ষণ গাড়ি দাঁড়াবার পরই অনেকের অনুরোধে স্বামীজী রিপন-কলেজবাড়িতে প্রবেশ করে সমবেত সকলকে সম্বোধন করে দুই-তিন মিনিট ইংরেজীতে একটু বলে আবার ফিরে গাড়িতে উঠলেন। এবার আর শোভাযাত্রা করা হলো না। গাড়ি বাগবাজারে পশুপতিবাবুর বাড়ির দিকে ছুটল। আমিও মনে মনে স্বামীজীকে প্রণাম করে গৃহাভিমুখে ফিরলাম।

* * * *

আহারাদির পর মধ্যাহ্নে চাঁপাতলায় খগেনদের (স্বামী বিমলানন্দের) বাড়িতে গেলাম। সেখান থেকে খগেন ও আমি তাদের একখানি টমটমে চড়ে পশুপতি বসুর

বাড়ির দিকে যাত্রা করলাম। স্বামীজী উপরের ঘরে বিশ্রাম করছেন, বেশি লোকজনকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পরিচিত স্বামীজীর কয়েকজন গুরুভাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। স্বামী শিবানন্দ আমাদের স্বামীজীর কাছে নিয়ে গেলেন এবং পরিচয় করিয়ে দিলেন, "এরা আপনার খুব admirer (মুগ্ধ ভক্ত)।"

স্বামীজী ও যোগানন্দ স্বামী পশুপতিবাবুর দ্বিতলে একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পাশাপাশি দুখানি চেয়ারে বসেছিলেন। অন্যান্য স্বামিগণ উজ্জ্বল গৈরিক-বর্ণের বস্ত্র পরিধান করে এদিক ওদিক ঘুরছিলেন। মেজে কার্পেট-মোড়া ছিল। আমরা প্রণাম করে সেই কার্পেটের উপর উপবেশন করলাম। স্বামীজী যোগানন্দ-স্বামীর সঙ্গে তখন কথা বলছিলেন। আমেরিকা-ইওরোপে স্বামীজী কি দেখলেন, এই প্রসঙ্গ হচ্ছিল। স্বামীজী বলছিলেন ঃ

"দেখ যোগে, দেখলাম কি জানিস ?—সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই খেলা করছে। আমাদের বাপ-দাদারা সেইটেকে religion-এর দিকে manifest (প্রকাশ) করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্যদেশীয়েরা সেইটেকেই মহারজোগুণের ক্রিয়ারূপে manifest করছে। বাস্তবিক সমগ্র জগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন খেলা হচ্ছে মাত্র।"

খগেনের দিকে চেয়ে তাকে খুব রোগা দেখে স্বামীজী বললেন, "এ ছেলেটিকে বড় sickly দেখছি যে।"

স্বামী শিবানন্দ উত্তর করলেন, "এটি অনেক দিন থেকে chronic dyspepsia-তে (পুরনো অজীর্ণ রোগে) ভুগছে।"

স্বামীজী বললেন, "আমাদের বাঙলা দেশটা বড় sentimental (ভাবপ্রবণ) কিনা, তাই এখানে এত dyspepsia."

কিছুক্ষণ পরে আমরা প্রণাম করে উঠে বাড়ি ফিরলাম।

স্বামীজী এবং তাঁর শিষ্য মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে অবস্থান করছেন। স্বামীজীর মুখের কথাবার্তা ভাল করে শোনবার জন্য ঐ স্থানে বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে করে কয়েকদিন গিয়েছিলাম। তার যতগুলি স্মরণ হয়, এইবার তাই বলবার চেষ্টা করব।

স্বামীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ কথোপকথন হয়—প্রথম এই বাগানবাড়ির একটি ঘরে। স্বামীজী এসে বসেছেন, আমিও গিয়ে প্রণাম করে বসেছি, সেখানে আর কেউ নেই। হঠাৎ কেন জানি না—স্বামীজী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই কি তামাক খাস ?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে না।"

তাতে স্বামীজী বললেন, "হাঁ, অনেকে বলে—তামাকটা খাওয়া ভাল নয় ; আমিও ছাড়বার চেষ্টা করছি।"

আর একদিন স্বামীজীর কাছে একটি বৈষ্ণব এসেছেন, তাঁর সঙ্গে স্বামীজী কথা

বলছেন। আমি একটু দূরে রয়েছি, আর কেউ নেই। স্বামীজী বলছেন, "বাবাজী, আমেরিকাতে আমি একবার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতা শুনে একজন পরমাসুন্দরী যুবতী—অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারিণী—সর্বস্ব ত্যাগ করে এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে কৃষ্ণধ্যানে উন্মত্তা হলেন।" তারপর স্বামীজী ত্যাগ সম্বন্ধে বলতে লাগলেন, "যে-সব ধর্মসম্প্রদায়ে ত্যাগের ভাবের তেমন প্রচার নেই, তাদের ভেতর শীঘ্রই অবনতি এসে থাকে—যথা বল্লভাচার্য সম্প্রদায়।"

আর একদিন গেছি। দেখি, অনেকগুলি লোক বসে আছেন এবং একটি যুবককে লক্ষ্য করে স্বামীজী কথাবার্তা বলছেন। যুবকটি বেঙ্গল থিওজফিক্যাল সোসাইটির গৃহে থাকে, সে বলছে, "আমি নানা সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছি, কিন্তু সত্য কি নির্ণয় করতে পারছি না।"

স্বামীজী অতি স্নেহপূর্ণস্বরে বলছেন, "দেখ বাবা, আমারও একদিন তোমারই মতো অবস্থা ছিল, তা তোমার ভাবনা কি? আচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন লোকে তোমাকে কি কি বলেছিল এবং তুমি বা কি রকম করেছিলে বল দেখি?"

যুবক বলতে লাগল, "মহাশয়, আমাদের সোসাইটিতে ভবানীশঙ্কর নামে একজন পণ্ডিত প্রচারক আছেন। তিনি আমায় মূর্তিপূজার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির যে বিশেষ সহায়তা হয়, তা সুন্দররূপে বুঝিয়ে দিলেন। আমিও তদনুসারে দিন কতক খুব পূজা-অর্চনা করতে লাগলাম। কিন্তু তাতে শান্তি পেলাম না। সেইসময় একজন আমাকে উপদেশ দিলেন, দেখ, মনটাকে একেবারে শূন্য করবার চেষ্টা কর দেখি—তাতে পরম শান্তি পাবে। আমি দিন কতক সেই চেষ্টাই করতে লাগলাম। কিন্তু তাতেও আমার মন শান্ত হলো না। আমি, মহাশয়, এখনো একটি ঘরে দরজা বন্ধ করে যতক্ষণ সম্ভব বসে থাকি, কিন্তু শান্তিলাভ কিছুতেই হচ্ছে না। বলতে পারেন, কিসে শান্তি হয়?"

স্বামীজী স্নেহপূর্ণস্বরে বলতে লাগলেন, "বাপু, আমার কথা যদি শোন, তবে তোমাকে আগে তোমার ঘরের দরজাটি খুলে রাখতে হবে। তোমার বাড়ির কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক রয়েছে, তোমায় তাদের যথাসাধ্য সেবা করতে হবে। যে পীড়িত, তাকে ঔষধ-পথ্য যোগাড় করে দিলে এবং শরীরের দ্বারা সেবা-শুশ্রূষা করলে। যে খেতে পাচ্ছে না—তাকে খাওয়ালে। যে অজ্ঞান, তাকে—তুমি যে এত লেখাপড়া শিখেছ, মুখে মুখে যতদূর হয় বুঝিয়ে দিলে। আমার পরামর্শ যদি চাও বাপু, তা হলে, এইভাবে যথাসাধ্য লোকের সেবা করতে পারলে তুমি মনের শান্তি পাবে।"

যুবকটি বলল, "আচ্ছা মহাশয়, ধরুন আমি একজন রোগীর সেবা করতে গেলাম, কিন্তু তার জন্য রাত জেগে, সময়ে না খেয়ে, অত্যাচার করে আমার নিজেরই যদি রোগ হয়ে পড়ে?"

স্বামীজী এতক্ষণ যুবকটির সঙ্গে স্নেহপূর্ণস্বরে সহানুভূতির সঙ্গে কথাবার্তা

বলছিলেন। এই শেষ কথাটিতে একটু বিরক্ত হলেন বোধ হলো। তিনি বলে উঠলেন, "দেখ বাপু, রোগীর সেবা করতে গিয়ে তুমি তোমার নিজের রোগের আশঙ্কা করছ, কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে আর ভাবগতিক দেখে আমার বোধ হচ্ছে এবং উপস্থিত যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও সকলে বেশ বুঝতে পারছেন যে, তুমি এমন করে রোগীর সেবা কোনকালে করবে না, যাতে তোমার নিজের রোগ হয়ে যাবে।"

যুবকটির সঙ্গে আর বিশেষ কথাবার্তা হলো না।

আর একদিন মাস্টারমশায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছে। মাস্টারমশায় বলছেন, "দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বল, সে তো মায়ার রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিলাভ—সমস্ত মায়ার বন্ধন কাটান, তখন ও-সব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি?"

স্বামীজী বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই উত্তর দিলেন, "মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা তো নিত্যমুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি?"

মাস্টারমশায় চুপ করে রইলেন।

আমি বুঝলাম, মাস্টারমশায় দয়া, সেবা, পরোপকার ইত্যাদি ছেড়ে সর্ববিধ অধিকারীর জন্যই জপ তপ ধ্যান ধারণা বা ভক্তির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু স্বামীজীর মতে মুক্তিলাভের জন্য ঐগুলির অনুষ্ঠান একপ্রকার অধিকারীর পক্ষে যেরূপ একান্ত আবশ্যক, এমন অনেক অধিকারী আছে, যাদের পক্ষে আবার পরোপকার, দান, সেবা ইত্যাদির তদ্রূপই প্রয়োজন। একটিকে উড়িয়ে দিতে গেলে অপরটিকেও উড়িয়ে দিতে হয়—একটিকে নিলে অপরটিকে না নিয়ে উপায় নেই। স্বামীজীর ঐরূপ প্রত্যুত্তরে বেশ হৃদয়ঙ্গম হলো। মাস্টারমশায় দয়া সেবাদিকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়ে অথচ ধ্যান ভজনাদিকে রেখে সঙ্কীর্ণভাবের পোষকতা করেছিলেন। স্বামীজীর উদারহৃদয় ও ক্ষুরধার বুদ্ধি যেন তা সহ্য করতে পারল না। তিনি মুক্তিলাভের চেষ্টাকে পর্যন্ত মায়ার অন্তর্গত বলে অদ্ভুত যুক্তিদ্বারা নির্ধারিত করলেন এবং দয়া সেবাদির সঙ্গে তাকে একশ্রেণীভুক্ত করে কর্মযোগের পথিককে পর্যন্ত আশ্রয় দিলেন।

টমাস আ কেম্পিসের Imitation of Christ-এর প্রসঙ্গ উঠল। স্বামীজী সংসার ত্যাগ করবার কিছু পূর্বে এই গ্রন্থখানি বিশেষভাবে চর্চা করতেন এবং বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে তাঁর গুরুভাইরাও স্বামীজীর দৃষ্টান্তে ঐ গ্রন্থটি সাধক-জীবনের বিশেষ সহায়ক জ্ঞানে সদা সর্বদা তার আলোচনা করতেন। স্বামীজী ঐ গ্রন্থের এরূপ অনুরাগী ছিলেন যে, তদানীন্তন 'সাহিত্যকল্পদ্রুম' নামক মাসিকপত্রে তার একটি সূচনা লিখে 'ঈশানুসরণ', নামে ধারাবাহিক অনুবাদ করতেও আরম্ভ করেছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বোধ হয় স্বামীজীর উক্ত গ্রন্থের উপর এখন কিরূপ ভাব জানবার জন্য তার ভিতরে দীনতার যে উপদেশ আছে, তার প্রসঙ্গ পেড়ে বললেন, "নিজেকে এইরূপ একান্ত হীন ভাবতে না পারলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিভাবে

সম্ভবপর হবে?" স্বামীজী শুনে বলতে লাগলেন, "আমরা আবার হীন কিসে? আমাদের আবার অন্ধকার কোথায়? আমরা যে জ্যোতির রাজ্যে বাস করছি, আমরা যে জ্যোতির তনয়।"

গ্রন্থোক্ত ঐ প্রাথমিক সাধনসোপান অতিক্রম করে স্বামীজী সাধনরাজ্যের কত উচ্চ ভূমিতে উপনীত হয়েছেন।

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতাম, সংসারের অতি সামান্য ঘটনাও তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে অতিক্রম করতে পারত না। তার সাহায্যেও তিনি উচ্চ ধর্মভাব প্রচারের চেষ্টা করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়, মঠের প্রাচীন সাধুগণ যাঁকে 'রামলাল-দাদা' বলে নির্দেশ করেন, দক্ষিণেশ্বর থেকে একদিন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। স্বামীজী একখানি চেয়ার আনিয়ে তাঁকে বসতে অনুরোধ করলেন ও স্বয়ং পায়চারি করতে লাগলেন। শ্রদ্ধাবিনম্র দাদা তাতে একটু সঙ্কুচিত হয়ে বলতে লাগলেন, "আপনি বসুন, আপনি বসুন।" স্বামীজী কিন্তু কোন মতে ছাড়বার পাত্র নন, অনেক বলে-কয়ে দাদাকে চেয়ারে বসালেন এবং স্বয়ং বেড়াতে বেড়াতে বলতে লাগলেন, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।" দেখলাম, এত ঐশ্বর্য, এত মান পেয়েও স্বামীজীর এতটুকু অভিমানের আবির্ভাব হয়নি। আরও বুঝলাম—গুরুভক্তি এইভাবেই করতে হয়।

অনেকগুলি ছাত্র এসেছে। স্বামীজী একখানি চেয়ারে ফাঁকায় বসে আছেন। সকলেই তাঁর কাছে বসে তাঁর দুটো কথা শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব। অথচ সেখানে আর কোন আসন নেই, যাতে ছেলেদের বসতে বলা যায়। কাজেই তাদের ভূমিতে বসতে হলো। স্বামীজীর মনে হচ্ছিল এদের বসবার কোন আসন দিতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু আবার বুঝি তাঁর মনে অন্য ভাবের উদয় হলো। তিনি বলে উঠলেন, "তা বেশ, তোমরা বেশ বসেছ, একটু একটু তপস্যা করা ভাল।"

আমাদের পাড়ার চণ্ডীচরণ বর্ধনকে একদিন নিয়ে গেছি। চণ্ডীবাবু Hindu Boys' School নামক একটি ছোটখাট বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী। সেখানে ইংরেজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যাপনা করান হয়। তিনি আগে থেকেই খুব ঈশ্বরানুরাগী ছিলেন। পরে স্বামীজীর বক্তৃতাদি পাঠ করে তাঁর উপর খুব শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে ওঠেন।

চণ্ডীবাবু এসে স্বামীজীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বামীজী, কি রকম ব্যক্তিকে গুরু করা যেতে পারে?"

স্বামীজী বললেন, "যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না, আমার গুরু আমার ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিয়েছিলেন।"

চণ্ডীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা স্বামীজী, কৌপীন পরলে কি কামদমনের বিশেষ সহায়তা হয়?"

স্বামীজী বললেন, "একটু-আধটু সাহায্য হতে পারে। কিন্তু যখন ঐ বৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, তখন কি বাপ কোপীনে আটকায়? মনটা ভগবানে একেবারে তন্ময় না হয়ে গেলে বাহ্য কোন উপায়ে কাম একেবারে যায় না। তবে কি, জান—যতক্ষণ লোকে সেই অবস্থা সম্পূর্ণ লাভ না করে, ততক্ষণ নানা বাহ্য উপায় অবলম্বনের চেষ্টা স্বভাবতই করে থাকে। আমার একবার এমন কামের উদয় হয়েছিল যে, আমি নিজের উপর মহা বিরক্ত হয়ে আগুনের মালসার উপর বসেছিলাম। শেষে ঘা শুকোতে অনেক দিন লাগে।"

ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে চণ্ডীবাবু স্বামীজীকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। স্বামীজীও অতি সরলভাবে সব কথা বুঝিয়ে উত্তর দিতে লাগলেন।

চণ্ডীবাবু একটু ভাবপ্রবণ প্রকৃতির লোক ছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ইংরেজীতে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "Oh Great Teacher, tear up the veil of hypocrisy and teach the world the one thing needful—how to conquer lust." অর্থাৎ "হে আচার্যবর! যে কাপট্যের আবরণে আমাদের যথার্থ স্বভাব গোপন করে আমরা অন্যের কাছে শিষ্ট শান্ত বা সভ্য বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছি, তা নিজ দিব্যশক্তিবলে ছিন্ন করে ফেলুন এবং লোকের ভিতর যে ঘোর কাম-প্রবৃত্তি বিরাজ করছে, যাতে তার সমূলে উৎপাটন হতে পারে—তা শিক্ষা দিন।"

স্বামীজী চণ্ডীবাবুকে শান্ত ও আশ্বস্ত করলেন।

পরে Edward Carpenter-এর প্রসঙ্গ উঠল। স্বামীজী বললেন, "লণ্ডনে ইনি অনেক সময় আমার কাছে এসে বসে থাকতেন। আরও অনেক Socialist, Democrat প্রভৃতি আসতেন। তাঁরা বেদান্তোক্ত ধর্মে নিজ নিজ মতের পোষকতা পেয়ে বেদান্তের উপর খুব আকৃষ্ট হতেন।"

স্বামীজী উক্ত Carpenter সাহেবের 'Adam's Peak to Elephanta' নামক গ্রন্থখানি পড়েছিলেন। এইবার উক্ত পুস্তকে মুদ্রিত চণ্ডীবাবুর ছবিটির কথা তাঁর মনে পড়ল, বললেন, "আপনার চেহারা যে বই-এ আগেই দেখেছি।" আরও কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর সন্ধ্যা হয়ে যাওয়াতে স্বামীজী বিশ্রামের জন্য উঠলেন। উঠবার সময় চণ্ডীবাবুকে সম্বোধন করে বললেন, "চণ্ডীবাবু, আপনারা তো অনেক ছেলের সংস্রবে আসেন, আমায় গুটিকতক সুন্দর সুন্দর ছেলে দিতে পারেন?" চণ্ডীবাবু বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, স্বামীজীর কথার সম্পূর্ণ মর্ম বুঝতে পারেননি। স্বামীজী যখন বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করছেন, তখন অগ্রসর হয়ে বললেন, "সুন্দর ছেলের কথা কি বলছিলেন?" স্বামীজী বললেন, "আমি চেহারা দেখতে ভাল, এমন ছেলে চাইছি না—আমি চাই বেশ সুস্থশরীর, কর্মঠ, সৎপ্রকৃতি কতকগুলি ছেলে—তাদের trained করতে চাই, যাতে তারা নিজেদের মুক্তিসাধনের জন্য ও জগতের কল্যাণসাধনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।"

আর একদিন গিয়ে দেখি, স্বামীজী ইতস্ততঃ বেড়াচ্ছেন, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

(স্বামি-শিষ্য-সংবাদ-প্রণেতা) স্বামীজীর সঙ্গে খুব পরিচিতভাবে আলাপ করছেন। স্বামীজীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমাদের অতিশয় কৌতূহল হলো। প্রশ্নটি এই : অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষে পার্থক্য কি ? আমরা শরৎবাবুকে স্বামীজীর কাছে ঐ প্রশ্নটি উত্থাপিত করতে বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি অগ্রসর হয়ে তা জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা শরৎবাবুর পেছন পেছন স্বামীজীর কাছে গিয়ে তিনি ঐ প্রশ্নের কি উত্তর দেন, তা শুনতে লাগলাম। স্বামীজী উক্ত প্রশ্নের সরাসরি কোন উত্তর না দিয়ে বললেন, "বিদেহমুক্তিই যে সর্বোচ্চ অবস্থা—এ আমার সিদ্ধান্ত। তবে আমি সাধনাবস্থায় যখন ভারতের নানাদিকে ভ্রমণ করতাম, তখন কত গুহায় নির্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তি লাভ হলো না বলে প্রায়োপবেশন করে দেহত্যাগ করবার সঙ্কল্প করেছি, কত ধ্যান—কত সাধন-ভজন করেছি ; কিন্তু এখন আর মুক্তিলাভের জন্য সে বিজাতীয় আগ্রহ নেই। এখন কেবল মনে হয়, যত দিন পর্যন্ত পৃথিবীর একটা লোকও অমুক্ত থাকছে, ততদিন আমার নিজের মুক্তির কোন প্রয়োজন নেই।"

আমি স্বামীজীর এই কথা শুনে তাঁর হৃদয়ের অপার করুণার কথা ভেবে বিস্মিত হতে লাগলাম, আর ভাবতে লাগলাম, ইনি কি নিজ দৃষ্টান্ত দিয়ে অবতারপুরুষের লক্ষণ বোঝালেন ? ইনিও কি একজন অবতার ? আরও মনে হলো—স্বামীজী এক্ষণে মুক্ত হয়েছেন বলেই বোধহয় ওঁর মুক্তির জন্য আর আগ্রহ নেই।

আর একদিন আমি ও খগেন সন্ধ্যার পর গেছি। ঠাকুরের ভক্ত হরমোহনবাবু স্বামীজীর সঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে পরিচিত করে দেবার জন্য বললেন, "স্বামীজী, এঁরা আপনার খুব admirer এবং খুব বেদান্ত আলোচনা করেন।"

স্বামীজী বেদান্তের কথা শুনেই বলে উঠলেন, "উপনিষদ্ কিছু পড়েছ ?"

আমি। আজ্ঞা হ্যাঁ, একটু-আধটু দেখেছি।

স্বামীজী। কোন উপনিষদ্ পড়েছ ?

আমি। কঠ উপনিষদ্ পড়েছি।

স্বামীজী। আচ্ছা, কঠটাই বল, কঠ উপনিষদ্ খুব grand—কবিত্বপূর্ণ।

আমি। কঠটা কণ্ঠস্থ নেই—গীতা থেকে খানিকটা বলি।

স্বামীজী। আচ্ছা, তাই বল।

তখন গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগস্থ "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা" থেকে আরম্ভ করে অর্জুনের সমুদয় স্তবটা আউড়ে দিলাম।

শুনে স্বামীজী উৎসাহ দেবার জন্য "বেশ, বেশ" বলতে লাগলেন। পরদিন বন্ধুবর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজীর দর্শনে গেছি। রাজেনকে বলেছি, "ভাই, কাল স্বামীজীর কাছে উপনিষদ্ নিয়ে বড় অপ্রস্তুত হয়েছি। তোমার কাছে উপনিষদ্ কিছু থাকে তো পকেটে করে নিয়ে চল। যদি কালকের মতো উপনিষদের কথা পাড়েন তো তাই পড়লেই চলবে।" রাজেনের কাছে একখানি প্রসন্নকুমার

শাস্ত্রী-কৃত ঈশকেনকঠাদি উপনিষদ্ ও তার বঙ্গানুবাদ পকেট এডিশন ছিল। সেটি পকেটে করে নিয়ে যাওয়া হলো। আজ অপরাহ্নে একঘর লোক বসেছিলেন; যা ভেবেছিলাম, তাই হলো। আজও, কিভাবে ঠিক স্মরণ নেই—কঠ উপনিষদের প্রসঙ্গ উঠল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বের করে ঐ উপনিষদের গোড়া থেকে পড়তে আরম্ভ করলাম। পাঠের মাঝখানে স্বামীজী নচিকেতার শ্রদ্ধার কথা—যে শ্রদ্ধায় তিনি নির্ভীকচিত্তে যমভবনে যেতেও সাহসী হয়েছিলেন—বলতে লাগলেন। যখন নচিকেতার দ্বিতীয় বর—স্বর্গপ্রাপ্তির কথা পড়া হতে লাগল, তখন সেইখানটা বেশি না পড়ে কিছু কিছু ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বরের স্থানটা পড়তে বললেন।

নচিকেতা বললেন, মৃত্যুর পর লোকের সন্দেহ—দেহ গেলে কিছু থাকে কি না, তারপর যমের নচিকেতাকে প্রলোভন প্রদর্শন ও নচিকেতার দৃঢ়ভাবে তৎসমুদয় প্রত্যাখ্যান। এইসব খানিকটা পড়া হলে স্বামীজী তাঁর স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় ঐ সম্বন্ধে কত কি বললেন।

কিন্তু এই দু-দিনের উপনিষদ্প্রসঙ্গে স্বামীজীর উপনিষদে শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ তারপর থেকে যখনই সুযোগ পেয়েছি, পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উপনিষদ্ অধ্যয়ন করবার চেষ্টা করেছি এবং এখনও করছি। বিভিন্ন সময়ে তাঁর মুখে উচ্চারিত অপূর্ব সুর লয় ও তেজস্বিতার সঙ্গে পঠিত উপনিষদের এক একটি মন্ত্র যেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনতে পাই। যখন পরচর্চায় মগ্ন হয়ে আত্মচর্চা ভুলে থাকি, তখনই শুনতে পাই—তাঁর সেই সুপরিচিত কিন্নর-কণ্ঠোচ্চারিত উপনিষদুক্ত বাণীর দিব্য গম্ভীর ঘোষণা ঃ

"তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ।"[১]

—সেই একমাত্র আত্মাকে জান—অন্য বাক্য সব পরিত্যাগ কর, তিনিই অমৃতের সেতু।

যখন আকাশ ঘোরঘটাচ্ছন্ন হয়ে বিদ্যুল্লতা চমকাতে থাকে, তখন যেন শুনতে পাই—স্বামীজী যেন সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলছেন ঃ

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥[২]

—সেখানে সূর্যও প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-তারাও নয়, এই সব বিদ্যুৎও সেখানে প্রকাশ পায় না—এই সামান্য অগ্নির কথা কি? তিনি প্রকাশিত থাকাতে তাঁর পশ্চাৎ সমুদয় প্রকাশিত হচ্ছে—তাঁর প্রকাশে এই সমুদয় প্রকাশিত হচ্ছে।

অথবা যখন তত্ত্বজ্ঞানকে সুদূরপরাহত মনে করে হৃদয় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়, তখন

১ মুণ্ডক, ২।২।৫
২ কঠোপনিষদ্, ২।২।১৫

যেন শুনতে পাই—স্বামীজী আনন্দোৎফুল্লমুখে উপনিষদের এই আশ্বাসবাণী আবৃত্তি করছেন :

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

—হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরা শ্রবণ কর। আমি সেই মহান পুরুষকে জেনেছি—যিনি আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁকে জানলেই লোকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে—মুক্তির আর দ্বিতীয় পন্থা নেই।

একদিনের ঘটনা। শরৎবাবু তাঁর 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদে' বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। আমি সেদিন দ্বিপ্রহরেই উপস্থিত হয়েছি। দেখি—ঘরের ভিতর একঘর গুজরাটি পণ্ডিত। তাঁদের কাছে স্বামীজী বসে অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় ধর্মবিষয়ক বিচার করছেন। জ্ঞান-ভক্তি নানাবিষয়ে কথা হচ্ছে—ইতিমধ্যে একটা গোল উঠল। লক্ষ্য করে বুঝলাম—স্বামীজী সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে বলতে হঠাৎ কি একটা ব্যাকরণের ভুল করেছেন। তাই পণ্ডিত মহাশয়গণ জ্ঞানভক্তি-বিবেকবৈরাগ্যের চর্চা সব ছেড়ে দিয়ে ঐ ব্যাকরণের খুঁত ধরে "আমরা স্বামীজীকে হারালাম" বলে খুব সোরগোল করছেন ও আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই কথা মনে পড়ল—"চিল শকুনি খুব উঁচুতে ওড়ে, কিন্তু তাদের নজর থাকে গো-ভাগাড়ে।" যা হোক, স্বামীজী বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলে উঠলেন, "দাসোঽহং পণ্ডিতানাং ক্ষন্তব্যমেতৎ স্খলনম্।" খানিকক্ষণ বাদে স্বামীজী উঠে গেলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়গণ গঙ্গায় হাত মুখ ধুতে গেলেন। আমিও বাগানে ইতস্ততঃ বেড়াতে বেড়াতে গঙ্গাতীরে গেছি। শুনতে পেলাম, পণ্ডিতগণ স্বামীজীর সম্বন্ধে কি আলোচনা করছেন। শুনলাম তাঁরা বলছেন, "স্বামীজী তাদৃশ পণ্ডিত নন, তবে ওঁর চক্ষুতে এক মোহিনীশক্তি আছে—সেই শক্তিবলেই তিনি নানাস্থানে দিগ্বিজয় লাভ করেছেন।"

ভাবলাম, পণ্ডিতগণ তো ঠিক ধরেছেন। চক্ষুতে এ মোহিনীশক্তি না থাকলে কি এত বিদ্বান, ধনী-মানী, প্রাচ্য পাশ্চাত্য দেশীয় বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারী দাসের মতো এঁর পেছন পেছন ছুটছে? এ তো বিদ্যায় নয়, রূপে নয়, ঐশ্বর্যে নয়—এ তাঁর চক্ষের সেই মোহিনীশক্তিতে।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষভাগ। আলমবাজার মঠ। সবে চার-পাঁচ দিন হলো বাড়ি ছেড়ে মঠে রয়েছি। পুরাতন সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দ মাত্র আছেন। স্বামীজী দার্জিলিং থেকে এসে পড়লেন

—সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল, কিডি, জি. জি. প্রভৃতি।

স্বামী নিত্যানন্দ অল্প কয়েকদিন হলো স্বামীজীর কাছে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হয়েছেন। ইনি স্বামীজীকে বললেন, "এখন অনেক নূতন নূতন ছেলে সংসার ত্যাগ করে মঠবাসী হয়েছেন। তাঁদের জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়মে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়।"

স্বামীজী তাঁর অভিপ্রায়ের অনুমোদন করে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ—একটা নিয়ম করা ভাল বইকি। ডাক সকলকে।" সকলে এসে বড় ঘরটিতে জমা হলেন। তখন স্বামীজী বললেন, "একজন কেউ লিখতে থাক, আমি বলি।" তখন এ ওকে সামনে ঠেলে দিতে লাগল—কেউ অগ্রসর হয় না, শেষে আমাকে ঠেলে অগ্রসর করে দিল। তখন মঠে লেখাপড়ার উপর সাধারণতঃ একটা বিতৃষ্ণা ছিল। সাধনভজন করে ভগবানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা—এইটিই সার, আর লেখাপড়াটা—ওতে মানযশের ইচ্ছা আসবে; যারা ভগবানের আদিষ্ট হয়ে প্রচারকার্যাদি করবে, তাদের পক্ষে আবশ্যক হলেও সাধকদের পক্ষে ওর প্রয়োজন তো নেইই, বরং হানিকর—এই ধারণাই প্রবল ছিল। যাই হোক, পূর্বেই বলেছি, আমি কতটা forward ও বেপরোয়া—আমি অগ্রসর হয়ে গেলাম। স্বামীজী একবার শূন্যের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কি থাকবে?" (অর্থাৎ আমি কি মঠের ব্রহ্মচারিরূপে সেখানে থাকব, অথবা দুই-এক দিনের জন্য মঠে বেড়াতে এসেছি, আবার চলে যাব।) সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে একজন বললেন, "হ্যাঁ।" তখন আমি কাগজ কলম প্রভৃতি ঠিক করে নিয়ে গণেশের আসন গ্রহণ করলাম। নিয়মগুলি বলবার পূর্বে স্বামীজী বলতে লাগলেন, "দেখ, এই সব নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি? আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সব নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই যে, আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কু-নিয়ম রয়েছে—সু-নিয়মের দ্বারা সেই কু-নিয়মগুলিকে দূর করে দিয়ে শেষে সব নিয়মের বাইরে যাবার চেষ্টা করতে হবে। যেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে শেষে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।"

তারপর নিয়মগুলি লেখান হতে লাগল। প্রাতে ও সায়াহ্নে জপ ধ্যান, মধ্যাহ্নে বিশ্রামান্তে নিজে নিজে শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও অপরাহ্নে সকলে মিলে একজন পাঠকের কাছে কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থাদি শুনতে হবে, এই ব্যবস্থা হলো। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে একটু একটু করে ডেলসার্ট ব্যায়াম করতে হবে, তাও নির্দিষ্ট হলো। মাদক দ্রব্যের মধ্যে তামাক ছাড়া আর কিছু চলবে না—এই ভাবের একটি নিয়ম লেখা হলো। শেষে সব লেখান শেষ করে স্বামীজী বললেন, "দেখ, একটু দেখে শুনে নিয়মগুলি ভাল করে কপি করে রাখ—দেখিস যদি কোন নিয়মটা negative (নেতিবাচক) ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে positive (ইতিবাচক) করে দিবি।"

এই শেষোক্ত আদেশ-প্রতিপালনে আমাদের একটু বেগ পেতে হয়েছিল। স্বামীজীর

উপদেশ ছিল—লোককে খারাপ বলা বা তার বিরুদ্ধে কু-সমালোচনা করা, তার দোষ দেখান, তাকে "তুমি অমুক করো না, তমুক করো না"—এইরূপ negative উপদেশ দিলে তার উন্নতির বিশেষ সাহায্য হয় না, কিন্তু তাকে যদি একটা আদর্শ দেখিয়ে দেওয়া যায়, তা হলেই তার সহজে উন্নতি হতে পারে, তার দোষগুলি আপনা-আপনি চলে যায়। এই স্বামীজীর মূল কথা। স্বামীজীর সব নিয়মগুলিকে positive করে দেবার উপদেশে আমাদের মনে বারবার ঐ কথাই উদিত হতে লাগল। কিন্তু তাঁর আদেশ মতো যখন আমরা সব নিয়মগুলির মধ্য থেকে না' কথাটির সম্পর্ক রহিত করবার চেষ্টা করতে লাগলাম, তখন দেখলাম, আর কোন নিয়মে কোন গোল নেই, কিন্তু মাদক-দ্রব্য-সম্বন্ধীয় নিয়মটাতেই একটু গোল। সেটি প্রথম এইভাবে লেখা হয়েছিল—"মঠে তামাক ব্যতীত কেউ অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করতে পারবেন না।" যখন আমরা ওর মধ্যগত 'না' টিকে বাদ দেবার চেষ্টা করলাম, তখন প্রথম দাঁড়াল—"সকলে তামাক খাবেন।" কিন্তু ঐরূপ বাক্যের দ্বারা সকলের উপর (যে না খায়, তারও উপর) তামাক খাবার বিধি এসে পড়ছে দেখে, শেষে অনেক মাথা খাটিয়ে নিয়মটি এইরূপ দাঁড়াল —"মঠে কেবলমাত্র তামাক সেবন করতে পারবেন"। যাই হোক এখন মনে হচ্ছে, আমরা একটা বিকট আপস করেছিলাম। Detail-এর (খুঁটিনাটির) ভিতর এলে বিধিনিষেধের মধ্যে নিষেধটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তবে এও সত্য যে, এই বিধিনিষেধ-গুলি যত মূলভাবের অনুগামী হয়, ততই তার অধিকতর উপযোগিতা দাঁড়ায়। আর স্বামীজীরও ঐরূপ অভিপ্রায়ই ছিল।

একদিন অপরাহ্নে বড়ঘরে একঘর লোক। ঘরের মধ্যে স্বামীজী অপূর্ব শোভা ধারণ করে বসে আছেন, নানা প্রসঙ্গ চলছে। আমাদের বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ বসু (আলিপুর আদালতের স্বনামখ্যাত উকিল) মশায়ও আছেন। তখন বিজয়বাবু সময়ে সময়ে নানা সভায়—এমন কি, কখনো কখনো কংগ্রেসে দাঁড়িয়েও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করতেন। তাঁর এই বক্তৃতাশক্তির কথা কেউ স্বামীজীর কাছে উল্লেখ করলে স্বামীজী বললেন, "তা বেশ বেশ। আচ্ছা, অনেক লোক এখানে সমবেত আছেন—এখানে দাঁড়িয়ে একটু বক্তৃতা কর দেখি। আচ্ছা—soul (আত্মা) সম্বন্ধে তোমার যা idea (ধারণা), তাই খানিকটা বল।" বিজয়বাবু নানা ওজর করতে লাগলেন—স্বামীজী এবং আরো অনেকে তাঁকে খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অন্ততঃ পনের মিনিট অনুরোধ-উপরোধের পরও যখন কেউ তাঁর সঙ্কোচ ভাঙতে কৃতকার্য হলেন না, তখন অগত্যা হার মেনে তাঁদের দৃষ্টি বিজয়বাবু থেকে আমার উপর পড়ল। আমি মঠে যোগ দেবার পূর্বে কখনো কখনো ধর্মসম্বন্ধে বাংলাভাষায় বক্তৃতা করতাম। আর আমাদের এক ডিবেটিং ক্লাব ছিল, তাতে ইংরেজী বলবার অভ্যাস করতাম। আমার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় কেউ উল্লেখ করাতেই এবার আমার উপর চোট পড়ল, আর পূর্বেই বলেছি, আমি অনেকটা বেপরোয়া। অথবা অন্য ভাষায় বলতে গেলে দু-কান-কাটা। "Fools rush in where angels fear to tread"—আমাকে আর

বেশি বলতে হলো না—আমি একেবারে দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদ-অন্তর্গত আত্মতত্ত্বের বিষয় থেকে আরম্ভ করে আত্মা সম্বন্ধে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে যা মুখে এল, বলে গেলাম। ভাষা বা ব্যাকরণের ভুল হচ্ছে বা ভাবের অসামঞ্জস্য হচ্ছে, এ সব খেয়ালই করলাম না। দয়ার সাগর স্বামীজী আমার এই হঠকারিতায় কিছুমাত্র বিরক্ত না হয়ে আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন। আমার পরে স্বামীজীর কাছে নূতন সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত প্রকাশানন্দ স্বামী প্রায় দশ মিনিটকাল ধরে আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে বললেন। তিনি স্বামীজীর বক্তৃতার প্রারম্ভের অনুকরণ করে বেশ গম্ভীরস্বরে নিজ বক্তব্য বলতে লাগলেন। তাঁর বক্তৃতারও স্বামীজী খুব প্রশংসা করলেন।

আহা! স্বামীজী বাস্তবিকই কারও দোষ দেখতেন না। যার যেটুকু সামান্য গুণ বা শক্তি দেখতেন, তাতেই উৎসাহ দিয়ে যাতে তার ভিতরের অব্যক্ত শক্তিগুলি প্রকাশিত হয়, তারই চেষ্টা করতেন। কিন্তু পাঠকবর্গ, আপনারা একথা থেকে যেন এই ভেবে বসবেন না যে, তিনি সকলকে সকল কার্যেই প্রশ্রয় দিতেন। কারণ, বহুবার দেখেছি, লোকেরা, বিশেষতঃ অনুগত গুরুভ্রাতা বা শিষ্যগণের দোষপ্রদর্শনে তিনি সময়ে সময়ে মহা কঠোর মূর্তি ধারণ করতেন। কিন্তু সেটি আমাদের দোষ সংশোধনের জন্য—আমাদের সাবধান করবার জন্য—আমাদের নিরুৎসাহ করবার বা আমাদের মতো কেবল পরদোষানুসন্ধানবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য নয়। আর এরূপ উৎসাহদাতা, ভরসাদাতা কোথায় পাব? কোথায় পাব এমন ব্যক্তি, যিনি শিষ্যবর্গকে লিখতে পারেন, "I want each one of my children to be a hundred times greater than I could ever be. Everyone of you must be a giant—*must*, that is my word!"—আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে, আমি যা হতে পারতাম, তদপেক্ষা শতগুণে বড় হও তোমাদের প্রত্যেককেই শূরবীর হতে হবে—হতেই হবে, নইলে চলবে না।

সেই সময়ে স্বামীজীর ইংলণ্ডে প্রদত্ত জ্ঞানযোগসম্বন্ধীয় বক্তৃতাসমূহ লণ্ডন থেকে ই. টি. স্টার্ডি সাহেব কর্তৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হচ্ছে—মঠেও তার দু-এক কপি প্রেরিত হচ্ছে। স্বামীজী দার্জিলিং থেকে তখনও ফেরেননি। আমরা পরম আগ্রহসহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ অদ্বৈততত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যা-স্বরূপ বক্তৃতাগুলি পাঠ করছি। বৃদ্ধ স্বামী অদ্বৈতানন্দ ভাল ইংরেজী জানেন না, কিন্তু তাঁর বিশেষ আগ্রহ, 'নরেন' বেদান্তসম্বন্ধে বিলাতে কি বলে লোককে মুগ্ধ করেছে, তা শোনেন। তাঁর অনুরোধে আমরা তাঁকে সেই পুস্তিকাগুলি পড়ে তার অনুবাদ করে শোনাই। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বললেন, "তোমরা স্বামীজীর এই বক্তৃতাগুলির বাংলা অনুবাদ কর না।" তখন আমরা অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামতো উক্ত pamphlet-গুলির মধ্যে যার যা ইচ্ছা সেইখানি পছন্দ করে অনুবাদ আরম্ভ করলাম। ইতিমধ্যে স্বামীজী এসে পড়েছেন। একদিন প্রেমানন্দ

স্বামী স্বামীজীকে বললেন, "এই ছেলেরা তোমার বক্তৃতাগুলির অনুবাদ আরম্ভ করেছে।" পরে আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা কে কি অনুবাদ করেছ, স্বামীজীকে শোনাও দেখি।" তখন সকলেই নিজ নিজ অনুবাদ এনে কিছু কিছু স্বামীজীকে শোনাল। স্বামীজীও অনুবাদ সম্বন্ধে দু-একটি মন্তব্য প্রকাশ করলেন— "এই শব্দের এইরূপ অমুবাদ হলে ভাল হয়" এইরূপ দু-একটি কথাও বললেন। একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আমিই রয়েছি। তিনি হঠাৎ আমায় বললেন, "রাজযোগটা তর্জমা কর না।" আমার মতো অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ আদেশ স্বামীজী কেন করলেন? আমি তার বহুদিন পূর্ব থেকে রাজযোগের অভ্যাস করবার চেষ্টা করতাম। ঐ যোগের উপর কিছুদিন এত অনুরাগ হয়েছিল যে, ভক্তি, জ্ঞান বা কর্মযোগকে একরকম অবজ্ঞার চোখেই দেখতাম। মনে ভাবতাম মঠের সাধুরা যোগ-যাগ কিছু জানেন না, সেইজন্যই তাঁরা যোগসাধনে উৎসাহ দেন না। স্বামীজীর রাজযোগ গ্রন্থ পড়ে ধারণা হয় যে, স্বামীজী শুধু যে রাজযোগে বিশেষ পটু তা নন, উক্ত যোগ সম্বন্ধে আমার যে-সকল ধারণা ছিল, সে-সকল তো তিনি উত্তমরূপেই বুঝিয়েছেন, তদ্ব্যতীত ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য যোগের সঙ্গে রাজযোগের সম্বন্ধও তিনি অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। স্বামীজীর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার এটি অন্যতম কারণ হয়েছিল। রাজযোগের অনুবাদ করলে উক্ত গ্রন্থের উত্তম চর্চা হবে এবং তাতে আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হবে, তদুদ্দেশ্যেই কি তিনি আমাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত করলেন? অথবা বঙ্গদেশে যথার্থ রাজযোগের চর্চার অভাব দেখে সর্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের যথার্থ মর্ম প্রচার করবার জন্যই তাঁর বিশেষ আগ্রহ হয়েছিল? তিনি প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত একখানি পত্রে বলেছেন, "বাঙলা দেশে রাজযোগের চর্চার একান্ত অভাব—যা আছে, তা দমটানা ইত্যাদি বই আর কিছু নয়।"

যাই হোক, স্বামীজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভেবে অনুবাদে তখনই প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।

একদিন অপরাহ্নে এক ঘর লোক বসে আছে। স্বামীজীর খেয়াল হলো, গীতা পাঠ করতে হবে। অমনি গীতা আনা হলো। সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে স্বামীজী গীতা সম্বন্ধে কি বলেন, শুনতে লাগলেন। গীতা সম্বন্ধে সেদিন তিনি যা যা বলেছিলেন, তা দু-চার দিন পরেই স্বামী প্রেমানন্দের আদেশে স্মরণ করে যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করেছিলাম। তা 'গীতাতত্ত্ব' নামে প্রথমে 'উদ্বোধনের' দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হয় ও পরে 'ভারতে বিবেকানন্দে'র অঙ্গীভূত হয়।

যখন স্বামীজী আলোচনা আরম্ভ করলেন, তখন তিনি একজন কঠোর সমালোচক—কৃষ্ণার্জুন, ব্যাস, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ-পরম্পরা যখন তন্নতন্নরূপে বিবৃত করতে লাগলেন, তখন সময়ে সময়ে বোধ হতে লাগল, এ ব্যক্তির কাছে অতি কঠোর সমালোচকও হার মেনে যায়। ঐতিহাসিকত্বের এইরূপ তীব্র বিশ্লেষণ করলেন বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ে স্বামীজী নিজ মতামত বিশেষভাবে

কিছু প্রকাশ না করেই পরে বোঝালেন, ধর্মের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক নেই। ঐতিহাসিক গবেষণায় শাস্ত্রবিবৃত ব্যক্তিগণ কাল্পনিক প্রতিপন্ন হলেও সনাতন ধর্মের অঙ্গে তাতে একটা আঁচড়ও লাগে না। আচ্ছা, যদি ধর্মসাধনের সঙ্গে ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক না রইল, তবে ঐতিহাসিক গবেষণার কি কোন মূল্য নেই?—এই প্রশ্নের সমাধানে স্বামীজী বোঝালেন, নির্ভীকভাবে এই সকল ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানেরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। উদ্দেশ্য মহান হলেও তার জন্য মিথ্যা ইতিহাস রচনা করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। বরং যদি লোকে সর্ববিষয়ে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, তবে সে একদিন সত্যস্বরূপ ভগবানেরও সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারে। তারপর গীতার মূলতত্ত্বস্বরূপ সর্বমত-সমন্বয় ও নিষ্কাম কর্মের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে করে শ্লোক পড়তে আরম্ভ করলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ" ইত্যাদি অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধার্থ উত্তেজনা-বাক্য পড়ে তিনি স্বয়ং সর্বসাধারণকে যেভাবে উপদেশ দেন, তা তাঁর মনে পড়ল—"নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে", এ তো তোমার সাজে না। তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি ব্রহ্ম, তোমাতে যে নানারূপ ভাববিকৃতি দেখছি—তা তো তোমার সাজে না। প্রফেটের মতো ওজস্বিনী ভাষায় এই তত্ত্ব বলতে বলতে তাঁর ভিতর থেকে যেন তেজ বের হতে লাগল। স্বামীজী বলতে লাগলেন, "যখন অপরকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখতে হবে—তখন মহাপাপীকেও ঘৃণা করলে চলবে না।" "মহাপাপীকে ঘৃণা করো না"—এই কথা বলতে বলতে স্বামীজীর মুখের যে ভাবান্তর হলো, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মুদ্রিত হয়ে আছে—যেন তাঁর মুখ থেকে প্রেম শতধারে প্রবাহিত হতে লাগল। মুখখানা যেন ভালবাসায় ডগমগ হয়েছে—তাতে কঠোরতার যেন লেশমাত্র নেই।

এই এক শ্লোকের মধ্যেই স্বামীজী সমগ্র গীতার সার নিহিত দেখিয়ে শেষে এই বলে উপসংহার করলেন, "এই একটি মাত্র শ্লোক পড়লেই সমগ্র গীতা পাঠের ফল হয়।"

একদিন ব্রহ্মসূত্র আনতে বললেন। বললেন, "ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য না পড়ে এখন স্বাধীনভাবে সকলে সূত্রগুলির অর্থ বুঝবার চেষ্টা কর।" প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সূত্রগুলি পড়া হতে লাগল। স্বামীজী যথাযথভাবে সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষা দিতে লাগলেন; বললেন, "সংস্কৃত ভাষা আমরা ঠিক ঠিক উচ্চারণ করি না, অথচ এর উচ্চারণ এত সহজ যে, একটু চেষ্টা করলে সকলেই শুদ্ধ সংস্কৃত যথাযথ উচ্চারণ করতে পারে। কেবল আমরা বাল্যকাল থেকে অন্যরূপ উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়েছি—তাই ঐ-রকম উচ্চারণ এখন আমাদের এত বিসদৃশ ও কঠিন বোধ হয়। আমরা 'আত্মা'-শব্দকে 'আত্‌মা' এইরূপ উচ্চারণ না করে 'আত্তা' এই ভাবে উচ্চারণ করি কেন? মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে বলেছেন, অপশব্দ-উচ্চারণকারীরা ম্লেচ্ছ—আমরা সকলেই তো পতঞ্জলির মতে ম্লেচ্ছ হয়েছি।" তখন নূতন ব্রহ্মচারি-সন্ন্যাসিগণ এক

এক করে যথাসাধ্য ঠিক ঠিক উচ্চারণ করে ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি পড়তে লাগলেন। পরে স্বামীজী যাতে সূত্রের প্রত্যেক শব্দটি ধরে তার অক্ষরার্থ করতে পারা যায়, তার উপায় দেখিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, "সূত্রগুলি যে কেবল অদ্বৈতমতেরই পোষক, একথা কে বললে? শঙ্কর অদ্বৈতবাদী ছিলেন—তিনি সকল সূত্রগুলিকে কেবল অদ্বৈতমতেই ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তোরা সূত্রের অক্ষরার্থ করবার চেষ্টা করবি—ব্যাসের যথার্থ অভিপ্রায় কি, বোঝবার চেষ্টা করবি—উদাহরণস্বরূপ দেখ—'অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি'[৩]। এই সূত্রের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় যে, এতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত উভয় বাদই ভগবান বেদব্যাস কর্তৃক সূচিত হয়েছে।"

স্বামীজী একদিকে যেমন গম্ভীরাত্মা ছিলেন, তেমনি অপরদিকে সুরসিকও ছিলেন। পড়তে পড়তে "কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা" সূত্রটি এল। স্বামীজী এই সূত্রটি পেয়েই স্বামী প্রেমানন্দের কাছে এর বিকৃত অর্থ করে হাসতে লাগলেন। সূত্রটির প্রকৃত অর্থ এই—যখন উপনিষদে জগৎ-কারণের প্রসঙ্গ উঠিয়ে 'সোঽকাময়ত'—তিনি (অর্থাৎ সেই জগৎকারণ) কামনা করলেন, এইরূপ কথা আছে, তখন অনুমানগম্য (অচেতন) প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎকারণরূপে স্বীকার করবার কোন প্রয়োজন নেই। যারা শাস্ত্রগ্রন্থের নিজ নিজ অদ্ভুত রুচি অনুযায়ী কদর্থ করে এমন পবিত্র সনাতন ধর্মকে ঘোর বিকৃত করে ফেলেছে, যা কোনকালে গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল না, স্বামীজী কি তাদের উপহাস করছিলেন?

যাই হোক, পাঠ চলতে লাগল। ক্রমে "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ"[৪] সূত্র এল। এই সূত্রের ব্যাখ্যা করে স্বামীজী প্রেমানন্দ স্বামীর দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, "দেখ তোর ঠাকুরও যে নিজেকে ভগবান বলতেন, সে ঐ ভাবে বলতেন।" এই কথা বলেই কিন্তু স্বামীজী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে লাগলেন, "কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর নাভিশ্বাসের সময় বলেছিলেন, যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" এই বলে আবার অন্য সূত্র পড়তে বললেন।

এখানে ঐ সূত্রটি সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কৌষীতকী উপনিষদে ইন্দ্রপ্রতর্দনসংবাদ নামক একটি আখ্যায়িকা আছে। তাতে লিখিত আছে, প্রতর্দন নামক জনৈক রাজা দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করাতে ইন্দ্র তাঁকে বর দিতে চান। প্রতর্দন তাতে এই বর প্রার্থনা করেন যে আপনি যা মানবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর মনে করেন, তাই বর দিন। তাতে ইন্দ্র তাঁকে এই উপদেশ দেন, "মাং বিজানীহি"—আমাকে জান। এক্ষণে সূত্রকার ঐ 'আমাকে' অর্থে ইন্দ্র কাকে লক্ষ্য

৩ ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১৯

৪ ঐ, ১।১।৩০

করেছেন এই প্রশ্ন উঠিয়েছেন। সমস্ত আখ্যায়িকাটি অধ্যয়ন করলে প্রথমেই কতকগুলি সন্দেহ হয়—'আমাকে' বলতে স্থানে স্থানে বোধ হয় যেন ইন্দ্র-দেবতাকে বোঝাচ্ছে, স্থানে স্থানে আবার প্রাণকে বোঝাচ্ছে, কোথাও বা জীবকে বোঝাচ্ছে, কোথাও বা আবার ব্রহ্মকে বোঝাচ্ছে—এইরূপ বোধ হয়। এক্ষণে নানাপ্রকার বিচারের দ্বারা সূত্রকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ঐ স্থলে 'আমাকে' অর্থ ব্রহ্মকে। "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সূত্রকার এমন একটি উদাহরণ দেখাচ্ছেন, যার সঙ্গে ইন্দ্রের এইরূপ ভাবে উপদেশ সঙ্গত হয়। উপনিষদের স্থলবিশেষে আছে, বামদেব ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে বলেছিলেন, আমি মনু, আমি সূর্য হয়েছি। ইন্দ্র এইরূপে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে বলেছিলেন, "আমাকে জান"। এখানে আমি ও ব্রহ্ম এক কথা।

স্বামীজীও স্বামী প্রেমানন্দকে বলছিলেন, পরমহংসদেব যে কখনো কখনো নিজেকে ভগবান বলে নির্দেশ করতেন, তা উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা থেকেই করতেন। এই কথা বলেই কিন্তু জনান্তিকে বললেন, "রামকৃষ্ণ স্বয়ং নিজের সম্বন্ধে বলতেন, আমি শুধু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নই—আমি অবতার।"

স্বামীজীর কথায় আমার একটা বিশেষ উপকার হলো। সামান্য ইংরেজী পড়ে আর কিছু হোক না হোক, সন্দেহ করতে বিশেষ শিখেছিলাম। মহাপুরুষগণের শিষ্যগণ তাঁদের গুরুকে বাড়াতে গিয়ে নানারূপ কল্পনা ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় করে, এই অন্তরে অন্তরে সংস্কার ছিল। স্বামীজীর অদ্ভুত sincerity, সত্যনিষ্ঠা দেখে, তিনি যে কোনরূপ অতিরঞ্জন করতে পারেন, এধারণা একেবারে দূর হয়েছিল, স্বামীজীর বাক্য ধ্রুবসত্য বলে ধারণা হয়েছিল। সুতরাং তাঁর বাক্যে পরমহংসদেব সম্বন্ধে এক নূতন আলোক পেলাম। 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ'—এই কথা তিনি স্বয়ং বলেছেন, এখন এই কথা বুঝবার চেষ্টা করছি। স্বামীজীর অপার দয়া, তিনি আমাদের সন্দেহ ত্যাগ করতে বলেননি, ফস করে কারও কথা বিশ্বাস করতে বলেননি। তিনি বলেছেন, "এই অদ্ভুত রামকৃষ্ণ-চরিত্র তোমার ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যতদূর সাধ্য আলোচনা কর, অধ্যয়ন কর—আমি তো তাঁর লক্ষাংশের একাংশও এখনো বুঝতে পারিনি। ও যত বুঝবার চেষ্টা করবে, ততই সুখ পাবে, ততই মজবে।"

(একদিন আমাদের সকলকে ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে স্বামীজী সাধনভজন শেখাতে লাগলেন—বললেন, "প্রথম সকলে আসন করে বস; ভাব—আমার আসন দৃঢ় হোক, এই আসন অচল অটল হোক, এর সহায়তাতেই আমি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হব।" সকলে বসে কয়েক মিনিট এইরূপ চিন্তা করলে তার পর বললেন, "ভাব—আমার শরীর নীরোগ ও সুস্থ, বজ্রের মতো দৃঢ়—এই দেহসহায়ে আমি সংসারের পারে যাব।" এইরূপ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ভাবতে বললেন—"এইরূপ ভাব যে, আমার কাছ থেকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চতুর্দিক প্রেমের প্রবাহ যাচ্ছে—হৃদয়ের ভিতর থেকে সমগ্র জগতের জন্য শুভকামনা হচ্ছে—সকলের কল্যাণ হোক, সকলে সুস্থ ও নীরোগ হোক। এইরূপ

ভাবনার পর কিয়ৎক্ষণ প্রাণায়াম করবি, অধিক নয়, তিনটি প্রাণায়াম করলেই হবে। তারপর হৃদয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ ইষ্টমূর্তির চিন্তা ও মন্ত্রজপ—এইটি আধ ঘণ্টা করবি।" সকলেই স্বামীজীর উপদেশমতো চিন্তাদির চেষ্টা করতে লাগল)।

এইভাবে সমবেত সাধনানুষ্ঠান মঠে দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর আদেশে নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে নিয়ে বহুকাল যাবৎ "এইবার এইরূপ চিন্তা কর, তারপর এইরূপ কর", বলে দিয়ে এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করে স্বামীজীপ্রোক্ত সাধন-প্রণালী অভ্যাস করিয়েছিলেন।

* * * *

একদিন সকালবেলা নটা-দশটার সময় আমি একটা ঘরে বসে কি করছি। হঠাৎ তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ) এসে বললেন, "স্বামীজীর কাছে দীক্ষা নেবে?" আমিও বললাম, "আজ্ঞা হাঁ।" ইতিপূর্বে আমি কুলগুরু বা অপর কারো কাছে কোন প্রকার মন্ত্র গ্রহণ করিনি। এখন নির্মলানন্দ স্বামীর এইরূপ অযাচিত আহ্বানে প্রাণে আর দ্বিধা রইল না। "নেব" বলেই তাঁর সঙ্গে ঠাকুরঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। জানতাম না যে, সেদিন শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী দীক্ষা নিচ্ছেন। তখনো দীক্ষাদান শেষ হয়নি বলে, বোধ হয় ঠাকুরঘরের বাইরে একটু অপেক্ষাও করতে হয়েছিল। তারপর শরৎবাবু বের হয়ে আসামাত্র তুলসী মহারাজ আমাকে নিয়ে গিয়ে স্বামীজীকে বললেন, "এ দীক্ষা নেবে।" স্বামীজী আমাকে বসতে বললেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, "তোর সাকার ভাল লাগে, না, নিরাকার ভাল লাগে?" আমি বললাম, "কখনো সাকার ভাল লাগে, কখনো বা নিরাকার ভাল লাগে।" তিনি এর উত্তরে বললেন, "তা নয়; গুরু বুঝতে পারেন, কার কি পথ; হাতটা দেখি।" এই বলে আমার দক্ষিণ হস্ত কিছুক্ষণ ধরে অল্পক্ষণ যেন ধ্যান করতে লাগলেন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, "তুই কখনো ঘটস্থাপনা করে পুজো করেছিস?" আমি বাড়ি ছাড়বার কিছু পূর্বে ঘটস্থাপনা করে কোন পুজো অনেকক্ষণ ধরে করেছিলাম—তা বললাম। তিনি তখন একটি দেবতার মন্ত্র বলে দিয়ে বেশ করে বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, "এই মন্ত্রে তোর সুবিধা হবে। আর ঘটস্থাপনা করে পুজো করে তোর সুবিধে হবে।" তারপর আমার সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করে পরে সম্মুখে কয়েকটা লিচু পড়েছিল—সেইগুলি নিয়ে আমায় গুরুদক্ষিণাস্বরূপ দিতে বললেন।

আমি দেখলাম, যদি আমাকে ভগবচ্ছক্তিস্বরূপ কোন দেবতার উপাসনা করতে হয়, তবে স্বামীজী যে দেবতার কথা আমায় উপদেশ দিলেন, তাই আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতি-সঙ্গত। শুনেছিলাম যে, যথার্থ গুরুরা শিষ্যের প্রকৃতি বুঝে মন্ত্র দেন—স্বামীজীতে আজ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম।

দীক্ষাগ্রহণের কিছু পরে স্বামীজীর আহার হলো। স্বামীজীর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ আমি ও শরৎবাবু উভয়েই ধারণ করলাম।

মঠে তখন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র বিনামূল্যে প্রদত্ত হতো। কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীদের এরূপ সংস্থান ছিল না যে, ওর ডাক-খরচটা দেন। উক্ত পত্র পিয়ন দ্বারা বরাহনগর পর্যন্ত বিলি হতো। বরাহনগরে 'দেবালয়ের' প্রতিষ্ঠাতা সেবাব্রতী শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত একটি বিধবাশ্রম ছিল। সেখানে একখানি করে ঐ আশ্রমের জন্য উক্ত পত্র আসত। 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র পিয়নের ঐ পর্যন্ত 'বিট' বলে মঠের কাগজখানিও ঐখানে আসত এবং সেখান থেকে তা প্রত্যহ মঠে নিয়ে আসতে হতো। উক্ত বিধবাশ্রমের উপর স্বামীজীর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তাঁরই ইচ্ছানুসারে তাঁর আমেরিকায় অবস্থানকালে এই আশ্রমের সাহায্যের জন্য স্বামীজী একটি benefit বক্তৃতা দেন এবং উক্ত বক্তৃতার টিকিট বেচে যা কিছু আয় হয়, তা এই আশ্রমেই প্রদত্ত হয়। যাই হোক, তখন মঠের বাজার করা, ঠাকুরসেবার আয়োজন প্রভৃতি সমুদয় কার্যই কানাই মহারাজ বা স্বামী নির্ভয়ানন্দকে করতে হতো। বলা বাহুল্য এই 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজ আনার ভারও তাঁর উপরেই ছিল। তখন আমরা মঠে অনেকগুলি নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী জুটেছি। কিন্তু তখনও মঠের প্রয়োজনীয় সমুদয় কর্মের একটা প্রণালীপূর্বক বিভাগ করে সকলের উপর অল্পাধিক পরিমাণে কাজের ভার দেওয়া হয়নি। সুতরাং নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে যথেষ্ট কাজ করতে হচ্ছে। তাঁরও তাই মনে হয়েছে যে, তাঁর কর্তব্য কার্যগুলির ভিতর কিছু কিছু যদি নূতন সাধুদের উপর দিতে পারেন, তবে তাঁর কতকটা অবকাশ হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে বললেন, "যেখানে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' আসে, তোমাকে সেই স্থান দেখিয়ে আনব —তুমি রোজ গিয়ে কাগজখানি এনো।" আমিও এ অতি সহজ কাজ জেনে এবং এতে একজনের কার্যভার কিঞ্চিৎ লাঘব হবে ভেবে সহজেই স্বীকৃত হলাম। একদিন দ্বিপ্রহরের প্রসাদ-ধারণান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর নির্ভয়ানন্দ আমাকে বললেন, "চল, সেই বিধবাশ্রমটি তোমায় দেখিয়ে দিই।" আমিও তাঁর সঙ্গে যেতে উদ্যত হয়েছি, ইতিমধ্যে স্বামীজী দেখতে পেয়ে বললেন, "বেদান্তপাঠ করা যাক—আয়।" আমি অমুক কাজে যাচ্ছি বলায় আর কিছু বললেন না। আমি কানাই মহারাজের সঙ্গে বের হয়ে সেই স্থান চিনে এলাম। ফিরে এসে মঠে আমাদের জনৈক ব্রহ্মচারী বন্ধুর নিকট শুনলাম—আমি চলে যাবার কিছু পরে স্বামীজী অপরের নিকট বলছিলেন, "ছোঁড়াটা গেল কোথায়? স্ত্রীলোক দেখতে গেল নাকি?" এই কথা শুনেই আমি কানাই মহারাজকে বললাম, "ভাই, চিনে এলুম বটে, কিন্তু কাগজ আনতে সেখানে আমার আর যাওয়া হবে না।"

শিষ্যগণের, বিশেষতঃ নূতন নূতন ব্রহ্মচারিগণের যাতে চরিত্র রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে স্বামীজী এত সাবধান ছিলেন। কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মঠের কোন সাধু ব্রহ্মচারী বাস করে বা রাত কাটায়—এ তাঁর আদৌ অভিপ্রেত ছিল না; বিশেষ করে যেখানে স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে আসতে হয়। এর শত শত উদাহরণ দেখেছি।

যেদিন মঠ থেকে রওনা হয়ে আলমোড়া যাত্রার জন্য কলকাতা যাবেন, সেদিন

সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে নূতন ব্রহ্মচারিগণকে সম্বোধন করে ব্রহ্মচর্যসম্বন্ধে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা আমার কানে যেন এখনও বাজছে :

"দেখ বাবা, ব্রহ্মচর্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্মজীবন লাভ করতে হলে ব্রহ্মচর্যই তার একমাত্র সহায়। তোরা স্ত্রীলোকের একদম সংস্পর্শে আসবি না। আমি তোদের স্ত্রীলোকদের ঘেন্না করতে বলছি না। তারা সাক্ষাৎ ভগবতীস্বরূপা ; কিন্তু নিজেদের বাঁচবার জন্যে তাদের কাছ থেকে তোদের তফাত থাকতে বলছি। তোরা যে আমার লেকচারে পড়েছিস—আমি সংসারে থেকে ধর্ম হয় অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে মনে করিসনি যে, আমার মতে ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস ধর্মজীবনের জন্য অত্যাবশ্যক নয়। কি করব, সে-সব লেকচারের শ্রোতৃমণ্ডলী সব সংসারী, সব গৃহী—তাদের কাছে যদি পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের কথা একেবারে বলি, তবে তারপর দিন থেকে আর কেউ আমার লেকচারে আসত না। তাদের মতে কতকটা সায় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশঃ পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের দিকে ঝোঁক হয়, সেইজন্যই ঐ ভাবে লেকচার দিয়েছি। কিন্তু আমার ভেতরের কথা তোদের বলছি—ব্রহ্মচর্য ছাড়া এতটুকু ধর্মলাভও হবে না। কায়মনোবাক্যে তোরা এই ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন করবি।"

একদিন বিলাত থেকে কি একখানা চিঠি এসেছে সেই চিঠিখানি পড়ে সেই প্রসঙ্গে ধর্মপ্রচারকের কি কি গুণ থাকলে সে কৃতকার্য হতে পারে, বলতে লাগলেন। নিজের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন—ধর্মপ্রচারকের এই এইগুলি খোলা থাকা আবশ্যক, এই এইগুলি বন্ধ থাকা প্রয়োজন। তার মাথা, হৃদয় ও মুখ খোলা থাকা আবশ্যক—তার প্রবল মেধাবী, হৃদয়বান ও বাগ্মী হওয়া উচিত। আর তার অধোদেশের কার্য যেন বন্ধ থাকে—যেন সে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যবান হয়। জনৈক প্রচারককে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, তার অন্যান্য সমুদয় গুণ আছে। কেবল একটু হৃদয়ের অভাব—যাই হোক, ক্রমে হৃদয়ও খুলে যাবে।

সেই পত্রে সিস্টার নিবেদিতা (তখন মিস নোবল) বিলাত থেকে শীঘ্র ভারতে রওনা হবেন, এই সংবাদ ছিল। মিস নোবলের প্রশংসায় স্বামীজী শতমুখ হলেন। বললেন, "বিলাতের ভিতর এমন পূতচরিতা, মহানুভবা রমণী অতি দুর্লভ। আমি যদি কাল মরে যাই, তথাপি এ আমার কার্য বজায় রাখবে।" স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল।

বেদান্তের শ্রীভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদক, স্বামীজীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন' পত্রিকার প্রধান লেখক, মাদ্রাজের বিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গাচার্য তীর্থভ্রমণোপলক্ষে শীঘ্র কলকাতায় আসবেন, স্বামীজীর কাছে পত্র এসেছে। স্বামীজী মধ্যাহ্নে আমাকে বললেন, "চিঠির কাগজ কলম এনে লেখ দিকি ; আর একটু খাবার জল নিয়ে আয়।" আমি এক গ্লাস জল স্বামীজীকে দিয়ে ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বললাম, "আমার হাতের লেখা তত ভাল নয়।" আমি মনে করেছিলাম, বিলাত আমেরিকায় কোন চিঠি লিখতে হবে। স্বামীজী অভয় দিয়ে বললেন, "লেখ—foreign

letter (বিলাতী চিঠি) নয়।" তখন আমি কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলাম। স্বামীজী ইংরেজীতে বলে যেতে লাগলেন, আমি লিখতে লাগলাম। একখানি অধ্যাপক রঙ্গাচার্যকে লেখালেন; আর একখানি পত্রও লিখিয়েছিলেন, কাকে—ঠিক মনে নেই। রঙ্গাচার্যকে অন্যান্য কথার ভিতর এই কথা লিখিয়েছিলেন মনে আছে যে—বাঙলা দেশে বেদান্তের তেমন চর্চা নেই, অতএব আপনি যখন কলকাতায় আসছেন, তখন "give a rub to the people of Calcutta"—কলকাতাবাসীকে একটু উসকিয়ে দিয়ে যান। কলকাতায় যাতে বেদান্তের চর্চা বাড়ে, কলকাতাবাসী যাতে একটু সচেতন হয়, সেজন্য স্বামীজীর কি দৃষ্টি ছিল। নিজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে চিকিৎসকগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী কলকাতায় দুটি মাত্র বক্তৃতা দিয়ে স্বয়ং বক্তৃতাদানে বিরত হয়েছেন। তথাপি যখনই সুবিধা পাচ্ছেন, তখনই কলকাতাবাসীর ধর্মভাব জাগরিত করবার চেষ্টা করছেন। স্বামীজীর এই পত্রের ফলেই, এর কিছুকাল পরে কলকাতাবাসিগণ স্টার-রঙ্গমঞ্চে উক্ত পণ্ডিতবরের 'The Priest and the Prophet' (পুরোহিত ও ঋষি) নামক সারগর্ভ বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

একটি বয়স্ক বাঙালী যুবক এই সময় মঠে এসে সেখানে সাধুরূপে বাস করবার প্রস্তাব করেছিল। স্বামীজী ও মঠের অন্যান্য সাধুবর্গ তার চরিত্র পূর্ব থেকেই বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাকে আশ্রমভুক্ত হবার অনুপযুক্ত জেনে কেউই তাকে মঠভুক্ত করতে সম্মত ছিলেন না। তার পুনঃপুনঃ প্রার্থনায় স্বামীজী তাকে বললেন, "মঠে যে-সকল সাধু আছেন, তাঁদের যদি সকলের মত হয়, তবে তোমায় রাখতে পারি।" এই কথা বলে পুরাতন সাধুবর্গকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "একে মঠে রাখতে তোমাদের কার কিরূপ মত?" তখন সকলেই একবাক্যে তাকে রাখতে অমত প্রকাশ করলে উক্ত যুবককে আর মঠে রাখা হলো না।

একদিন অপরাহ্নে মঠের বারান্দায় আমাদের সকলকে নিয়ে বেদান্ত পড়াতে বসেছেন। সন্ধ্যা হয় হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এর কিছুকাল পূর্বে স্বামীজী-কর্তৃক প্রচারকার্যের জন্য মাদ্রাজে প্রেরিত হওয়ায় তাঁর অপর একজন গুরুভ্রাতা তখন মঠে পূজা আরাত্রিকাদির কার্যভার নিয়েছেন। আরাত্রিকাদি কার্যে যাঁরা তাঁকে সাহায্য করতেন, তাঁদের নিয়েও স্বামীজী বেদান্ত পড়াতে বসেছিলেন। হঠাৎ উক্ত গুরুভ্রাতা এসে নূতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বললেন, "চল হে চল, আরতি করতে হবে, চল।" তখন একদিকে স্বামীজীর আদেশে সকলে বেদান্তপাঠে নিযুক্ত, অপরদিকে এঁর আদেশে ঠাকুরের আরাত্রিকে যোগদান করতে হবে, নূতন সাধুরা একটু গোলে পড়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল। তখন স্বামীজী তাঁর ঐ গুরুভ্রাতাকে সম্বোধন করে উত্তেজিতভাবে বলতে লাগলেন, "এই যে বেদান্ত পড়া হচ্ছিল, এটা কি ঠাকুরের পূজা নয়? কেবল একখানা ছবির সামনে সলতে-পোড়া নাড়লে আর কাঁজ পিটলেই মনে করছিস বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়?—তোরা অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি"। এইরূপ বলতে বলতে আরো উত্তেজিত হয়ে তাঁকে ঐভাবে বেদান্তপাঠে ব্যাঘাত দেওয়াতে আরও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করতে

লাগলেন। ফলে বেদান্তপাঠ ভঙ্গ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আরতিও হয়ে গেল। আরতির পরে কিন্তু উক্ত গুরুভ্রাতাকে আর কেউ দেখতে পেল না। তখন স্বামীজীও অতিশয় ব্যাকুল হয়ে "সে কোথায় গেল, সে কি আমার গালাগাল খেয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গেল"—ইত্যাদি বলতে বলতে সকলকেই চতুর্দিকে তাঁর অনুসন্ধানে পাঠালেন। বহুক্ষণ পরে তাঁকে মঠের উপরের ছাদে চিন্তান্বিতভাবে বসে থাকতে দেখতে পেয়ে স্বামীজীর কাছে নিয়ে আসা হলো। তখন স্বামীজীর ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তিনি তাঁকে কত আদর, কত যত্ন করলেন, তাঁকে কত মিষ্ট কথা বলতে লাগলেন। আমরা গুরুভাইয়ের প্রতি স্বামীজীর অপূর্ব ভালবাসা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বুঝলাম, গুরুভাইদের উপর স্বামীজীর অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা। কেবল যাতে তাঁরা তাঁদের নিষ্ঠা বজায় রেখে উদারতর হতে পারেন, এই তাঁর বিশেষ চেষ্টা। পরে স্বামীজীর মুখে অনেকবার শুনেছি, যাঁকে স্বামীজী বেশি গালাগাল দিতেন, তিনিই তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র।[৫]

একদিন বারান্দায় বেড়াতে বেড়াতে (স্বামীজী) আমাকে বললেন, "দেখ, মঠের একটা ডায়েরী রাখবি, আর হপ্তায় হপ্তায় মঠের একটা করে রিপোর্ট পাঠাবি।" স্বামীজীর এই আদেশ আমি প্রতিপালন করেছিলাম।

৫ স্বামী নির্লেপানন্দের সংযোজন : একদিন কি একটা ব্যাপারে বেলুড়ে স্বামীজী শরৎ মহারাজকে ভীষণ বকতে শুরু করলেন। সে বড় ভয়ানক প্রচণ্ড রকমের বকুনি। তখন স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভগ্ন। শরৎ মহারাজ শান্ত স্থির হয়ে সব কথা শুনে যেতে লাগলেন। এমন সময় কলকাতা থেকে ঠাকুরের একজন ভক্ত এলেন। স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে সামলে গেলেন। শরৎ মহারাজ তো চুপ করে ছিলেনই। ভক্তের সঙ্গে স্বামীজীর খানিকটা হাসাহাসি চলল। শরৎ মহারাজও দিব্যি তাতে মন খুলে যোগ দিলেন। লোকটি চলে গেলে আবার স্থগিত বকুনির বাকি বম্বার্টমেন্ট-পর্যায়টুকু শুরু হলো। শরৎ মহারাজও পূর্ববৎ স্থাণু হয়ে শুনে যেতে লাগলেন। ব্র্যাকেটে যেন মাঝখান থেকে হাসিটা দুইজন সন্ন্যাসীরই হয়ে গেল।

স্বামী অচলানন্দ

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রথম আমি শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে অবগত হই। সেই সময়ে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামীজী তখন বেলুড়েই ছিলেন। তখন স্বামীজীকে দেখবার জন্য তত আগ্রহ হয়নি। ঐ বৎসরের শেষভাগে আমি বেলুড়ে গিয়েছিলাম। স্বামীজীর সঙ্গে তখন দেখা হয়নি, কারণ তিনি ইওরোপ চলে গিয়েছিলেন। তারপর ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে রাজপুতানায় দুর্ভিক্ষে রিলিফ কার্য করে যখন বৃন্দাবনে উপনীত হই, তখন শুনলাম যে, স্বামীজী ভারতে ফিরে এসেছেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ স্বামী কল্যাণানন্দকে লিখলেন, "ইচ্ছা করলে তোমরা এখন স্বামীজীকে দর্শন করতে পার।" তারপর কাশীতে আসি। এখানে এসে দেখি যে, অনাথ-আশ্রমটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে আছে। চারুবাবু একাই আছেন, সুতরাং কাজের অসুবিধা হচ্ছে। এজন্য তাঁকে ছেড়ে মঠে যেতে আর প্রবৃত্তি হলো না। অতঃপর নয় মাস পরে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের আশ্বিন মাসে শারদীয়া পূজার পূর্বে স্বামীজীকে দর্শন করবার জন্য অন্তরে প্রবল আগ্রহ অনুভব করলাম।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ভারতে এসেই পূজ্যপাদ স্বামীজী অবগত হলেন কাশীতে মঠের কয়েকটি যুবক-ভক্ত মিলে দরিদ্রদের সাহায্যার্থে একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করেছে। এদের মধ্যে একটি যুবক কর্মী বেলুড়ে তাঁর শ্রীচরণ দর্শনের জন্য গেলে তিনি তার কাছে আশ্রমের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর নিয়ে তাকে অতিশয় উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলেছিলেন, "এরূপ আশ্রম ভারতের প্রত্যেক তীর্থস্থানে হওয়া উচিত।" সেই সময়ে তিনি অনাথাশ্রমের প্রত্যেক কর্মীর বিষয় অবগত হন এবং এই কার্যে এত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, কর্মীটিকে শরীর সুস্থ রাখবার উপদেশ দেন এবং তাকে মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করেন। ইতিমধ্যে স্বামীজী তুলসী মহারাজকে অনাথাশ্রম পরিদর্শন করে বিস্তারিত সংবাদ জানাবার জন্য কাশীতে পাঠালেন। তুলসী মহারাজ কাশীতে এসে অনাথাশ্রম দেখবার পর বিস্তারিত খবর স্বামীজীকে জানিয়েছিলেন।

পূর্বে বলেছি, ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে শারদীয়া পূজার পূর্বেই স্বামীজীকে দর্শন করবার জন্য মন একান্ত ব্যাকুল হয়েছিল। চারুবাবুকে আমার আন্তরিক ইচ্ছা জানালাম। তিনি আমাকে পনের দিনের ছুটি দিলেন। আশ্রম থেকে পনের দিনের জন্য আমি বেলুড় রওনা হলাম।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে শারদীয়া পূজার ষষ্ঠীর দিন আমি বেলুড় মঠে উপস্থিত হই। সেবার যে মঠে পূজা হবে, তা আমি পূর্ব থেকে অবগত ছিলাম না। হাওড়ায় নেমেই আমি বাগবাজারে বোসপাড়ায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করবার জন্য যাই। মার দর্শন সেখানে পেলাম না। ভাবলাম তিনি বেলুড়ে গিয়েছেন। তিনি তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের ভাড়াটিয়া বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। মঠে এসে দেখলাম পূজার

আয়োজন চলছে। পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজও খুব ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল। প্রথমেই তাঁর চরণ দর্শন করলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি পূজ্যপাদ স্বামীজীর কাছে আমার পরিচয় দেন। বেলুড় মঠে তাঁর দোতলার ঘরে মুণ্ডিত-মস্তক কৌপীনমাত্র-পরিহিত স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করি। তাঁর পরিধানে অন্য কোন পোশাক ছিল না। আমি তাঁর শ্রীচরণ-বন্দনা করলাম। তিনি আমার কাছে কাশীর বিস্তারিত সংবাদ নিলেন।

আমি মঠে রইলাম। সপ্তমীর দিন পূজা বিশেষ আড়ম্বরে সম্পন্ন হলো। শ্রীশ্রীমার নামে পূজার সঙ্কল্প হলো। কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজক ও পূজনীয় শশী মহারাজের (রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর) পিতা তন্ত্রধারক ছিলেন। প্রথম দিনের পূজায় স্বামীজী খুব আনন্দ করেছিলেন। অষ্টমীর দিন তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি সর্বদা আনন্দ ও হাস্য-পরিহাস করতেন, বিশেষ কষ্ট হলে কেবল খানিকটা চুপ করে থাকতেন। যদি কখনো হাঁপানি হতো, তখন একটু চুপ করে থাকতেন এবং তা কেটে গেলে আবার যথাপূর্ব স্ফূর্তি ও হাস্যরসে নিমগ্ন হতেন। নবমীর দিন 'নল-দময়ন্তী' নাট্যাভিনয়ের সময় তিনি কতই রঙ্গ ও হাস্য-পরিহাসাদি করেছেন। এতে বেশ বোঝা যায় যে, শারীরিক অসুস্থতা বা কষ্ট তাঁকে বড় একটা কাতর করতে পারত না। আশ্রিতদের প্রতি তাঁর ভালবাসা অসুখের সময়েও হীনপ্রভ না হয়ে বরং বেড়ে যেত। তাঁর অসুখের সময় একটি সেবকেরও অসুখ হয়। স্বামীজীর ১০৫° ডিগ্রী জ্বর। সে সময়ে তাঁর পার্শ্বে অনেক লোকজন দেখতে পেয়ে তিনি অসুস্থ সেবকের খবর নিতেন এবং তার সেবা করতে বলতেন। এই দারুণ রোগযন্ত্রণায়ও তিনি আশ্রিতদের অসুখের নিয়মিত সংবাদ নিতেন।

দশমীর দিন বিসর্জনের সময় প্রতিমা মুন্সীদের নৌকায় তুলে পূজনীয় রাখাল মহারাজ বৃন্দাবনী আঁচলা পরে মা-দুর্গার সামনে ব্যাণ্ড বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সুমধুর নৃত্য করেছিলেন, তা দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। মনে হলো শ্রীকৃষ্ণ যেন মার সম্মুখে লীলায়িত ভঙ্গিতে নৃত্য করছেন। স্বামীজী মঠের বারান্দা থেকে শ্রীমহারাজের সেই অপূর্ব নৃত্য উপভোগ করেছিলেন। পূজার পরই স্বামীজীর শরীর সুস্থ হয়। কোজাগরী পূর্ণিমায় স্বামীজী মঠে প্রতিমায় প্রথম লক্ষ্মীপূজা করেন। তারপর কালীপূজা এল। স্বামীজী বললেন, "এবার আর মার নামে সঙ্কল্প হবে না। আমাদের নামে পূজা হবে।" বিশেষ সমারোহে কালীপূজা হলো। সেবার কালীপূজায় যে আনন্দপ্রবাহ ছুটেছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কালীপূজার দিন রাত্রির প্রথম ভাগে—তখনও পূজা আরম্ভ হয়নি—স্বামীজী পূজার দালানে ধ্যান করতে বসেছিলেন। ধ্যান করতে করতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সমাধি-মগ্ন হলেন। তাঁর আর বাহ্যজ্ঞান রইল না। অনেকক্ষণ এইভাবে চলবার পর স্বামীজীর সংজ্ঞা ফিরছে না দেখে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ তাঁর কানে বারংবার ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করলেন। এতে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তারপর জগদ্ধাত্রীপূজা

এল। এই পূজা স্বামীজীর গর্ভধারিণী মাতার কলকাতায় সিমলার বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো। আমরা সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। স্বামীজী নিজে তত্ত্বাবধান করেন। সেখানেও বেশ আনন্দ হয়েছিল। তারপর স্বামীজী মঠে প্রতিমা আনিয়ে সরস্বতীপূজারও অনুষ্ঠান করেন। এর পূর্বে মঠে প্রতিমায় সরস্বতীপূজা হয়নি।

আমাদের প্রতি পূজ্যপাদ স্বামীজীর যে কী গভীর ভালবাসা ছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করবার নয়। আমার পক্ষে তার গভীরতা পরিমাপ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। ভালবাসা প্রাণের জিনিস, তা মুখে বা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, কেবল অনুভব করা যেতে পারে। স্বামীজীর ভালবাসা পাওয়ার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল, তাঁরা তা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন।

শ্রীশ্রীমার পরে স্বামীজীর ভালবাসা আমাকে অভিভূত করেছিল। এরূপ ভালবাসা কোথাও পাইনি। শুনেছি, মহাপুরুষদের চরিত্রে দুটি বিপরীত ভাবের সমাবেশ থাকে। স্বামীজীর চরিত্রেও এইরূপ দুইটি বিপরীত ভাব প্রত্যক্ষ করেছি। একদিকে তিনি যেমন প্রেমের প্রতীক, অন্যদিকে তেমনি কঠোরতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। যখন তাঁকে প্রেমের প্রতীকরূপে দেখতাম, তখন তিনি সকলকেই একেবারে প্রেমরসে ডুবিয়ে দিতেন, সকলকেই কোল দিতেন এবং বালক-সুলভ আনন্দে মুগ্ধ করতেন। আবার যখন তিনি রুদ্ররূপ ধারণ করতেন, তখন সকলেই তাঁর নিকট থেকে ভয়ে দূরে সরে দাঁড়াত। কারও সাধ্য ছিল না যে, তাঁর কাছে অগ্রসর হয়। এমনকি পূজনীয় রাখাল মহারাজ পর্যন্ত তাঁর কাছে যেতে ভয় পেতেন।

স্বামীজীর ভালবাসা কেবল মানুষেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছাগল গরু প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের প্রতিও প্রসারিত হতো। জন্তু-জানোয়ারের প্রতি তাঁর ভালবাসার উদাহরণ দিচ্ছি। স্বামীজীর মন শারীরিক অসুস্থতায়ও সব সময় উচ্চভাবে থাকে দেখে ডাক্তাররা তাঁর শরীর সম্বন্ধে একটু চিন্তিত হলেন। এজন্য তাঁরা তাঁর গুরুভ্রাতা রাখাল মহারাজকে জানালেন যে, স্বামীজীর মন যাতে উচ্চভাব থেকে নেমে জাগতিক ব্যাপারে থাকে, সেজন্য জন্তু-জানোয়ার—যেমন কুকুর প্রভৃতি কাছে রাখা প্রয়োজন। তদনুসারে মঠে ছাগল, গরু, কুকুর, হাঁস প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী পোষা হতো। তাঁর একটি ছাগল ছিল—নাম 'মটরু'। তিনি ছাগলটিকে এত ভালবাসতেন যে, ছাগলটি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। ছাগলটি অনেক দূরে থাকলেও 'মটরু' বলে ডাক দিলে দূর থেকে দৌড়ে স্বামীজীর কাছে এসে উপস্থিত হতো। ছাগলটি এত ভাগ্যবান যে, শেষ সময়ে স্বামীজীর কোলে মাথা রেখে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। তাঁর দুটি কুকুর ছিল—একটির নাম 'বাঘা', অপরটির নাম 'লায়ন'। কুকুর দুটিও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। একবার বাঘাকে তিনি কি এক কারণে মঠ থেকে তাড়িয়ে ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সে দু-দুবার খেয়া নৌকায় পুনরায় মঠে এসে উপস্থিত হলো। গরু, ভেড়া, হাঁস প্রভৃতির প্রতিও তাঁর ভালবাসা ঠিক এইরূপই

ছিল। তিনি এগুলির সঙ্গে এমনভাবে খেলা করতেন যে, তারা তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেত।

জন্তু-জানোয়ারের প্রতিই তাঁর যখন এত ভালবাসা ছিল, তখন মানুষের প্রতি ভালবাসা কী অপার ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। কুলি, মজুর, চাকর-বাকরের প্রতি তাঁর ব্যবহার অতিশয় সৌহার্দপূর্ণ ছিল। সাঁওতাল কুলি, চাকর প্রভৃতি যারা মঠে কাজ করত, তাদের সঙ্গে তিনি একত্র গল্পগুজব করতেন এবং তাদের খাওয়া-দাওয়া, সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। তিনি তাদের সঙ্গে এমনভাবে মিশতেন যে, তারাও যেন তাঁকে নিজেদের জন বলে মনে করত এবং তাঁর কাছে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা প্রাণ খুলে বলত।

আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অপার। আমরা তাঁর ভালবাসা প্রাণে প্রাণে অনুভব করতাম। সেই ভালবাসা কাগজে কলমে বা ভাষায় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। তাঁর আশ্রিতেরা প্রত্যেকেই তা মনে প্রাণে বুঝেছে। আমি নিজে যা অনুভব করেছি, তাই বলছি। আমি তখন মঠে নূতন গেছি। সামান্য একটু অসুখ করেছে। বেদানা খেতে খেতে স্বামীজীর হয়তো আমার কথা মনে পড়েছে। তাড়াতাড়ি সেই বেদানার অংশটুকু তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অথবা কোন সময়ে অন্য কোন খাবার জিনিস খেতে হয়তো তাঁর ভাল লেগেছে, তখনই তিনি ঐ জিনিসটির অংশ পদাশ্রিতদের দিয়েছেন। এরূপও ঘটেছে যে, যেসব ছেলেকে অন্য মহারাজগণ বেশি আমল দিতেন না—তারা স্বামীজীর শরণাপন্ন হলে তিনি তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। লোকের গুণাবলীর প্রতিই তাঁর দৃষ্টি ছিল, দোষগুলি তিনি দেখতেন না। কারও সামান্য গুণ দেখলে তাই তিনি অতিশয় বড় করে দেখতেন। কেউ একটু ভাল কাজ করলে তিনি তাতেই মুগ্ধ হয়ে যেতেন। ফলে সেই ব্যক্তি দ্বিগুণ উৎসাহে সৎকার্যে মন দিত এবং স্বামীজীর গুণগ্রাহিতায় মুগ্ধ হয়ে পরমানন্দে কাজে আত্মনিয়োগ করত। তাঁর ভালবাসা সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে বলবার শক্তি আমার নেই, অধিকারও নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি, তাঁর সঙ্গে অল্পদিনের জন্যও যে মিশেছে, সে-ই তাঁর ভালবাসা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছে। এক কথায় বলতে গেলে তিনি প্রেমের প্রতিমূর্তি ছিলেন।

একবার কানাই মহারাজ (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) তাঁর সেবা করতে করতে তাঁর বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। পাছে সেবকের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় স্বামীজী অনেকক্ষণ শান্ত হয়ে শুয়ে থাকেন। পরে কানাই মহারাজের ঘুম ভাঙলে স্বামীজীও বিছানা হতে উঠলেন। তাঁর শিষ্যদের তিনি যখন "বাবা, বাবা" বলে ডাকতেন, তখন যে কী স্বর্গীয় আনন্দ অনুভূত হতো, তা আর কি বলব! একবার তিনি আমাকে বললেন, "বাবা, তুই আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারিস ? তুই যা চাস, তোকে আমি তাই দেব।" আমার এমন কি শক্তি ছিল যে, তাঁর ঘুম পাড়িয়ে দিই ? তাঁর তখন নিদ্রা বেশি হতো না। শারীরিক গ্লানি ছিল যথেষ্ট। তিনি আমাকে

বললেন, "জ্ঞান হওয়ার পর হতে আমি জীবনে কখনও চার ঘণ্টার বেশি ঘুমুইনি।" ইদানীং তো তাঁর একেবারেই ঘুম হতো না।

স্বামীজী যখন উগ্রমূর্তি ধারণ করতেন, তখনো তাঁর মধ্যে একটা মাধুর্য থাকত। তাঁর বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ক্রোধের পর মুহূর্তেই তাঁর উগ্রভাব চলে যেত, আবার সেই প্রেমপূর্ণ মধুর ভাব আত্মপ্রকাশ করত। কেউ বুঝতে পারত না যে, তিনি একটু আগেই রেগে গিয়েছিলেন। তাঁর রুদ্র ভাবের সময় কেউ নিকটে যেতে সাহস করত না, এমনকি তাঁর গুরুভ্রাতারাও দূরে সরে দাঁড়াতেন। কিন্তু সেই রুদ্রমূর্তি শান্ত হবার পর যার প্রতি তিনি রুষ্ট হয়েছিলেন, সেও কাছে এসে বুঝতে পারত না যে, তাঁর মধ্যে রুদ্রতা থাকা সম্ভব। তিনি আবার সকলের সঙ্গে সপ্রেম ব্যবহার করতেন। গুরুভ্রাতা ও আশ্রিত শিষ্য-ভক্ত সকলেই সমভাবে তা উপলব্ধি করেছেন।

কি একটা অন্যায় কাজের দরুন স্বামীজী একবার কানাই মহারাজের উপর অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করেন। স্বামীজী একটি ছড়ি নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে কিছু সময় ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েন। পরক্ষণেই তাঁর ক্রোধের ভাব একেবারে চলে গেল। আর একবার বৃষ্টির সময় মঠে ব্রহ্মচারীরা বৃষ্টির পরিস্রুত জল (distilled water) ধরছিল। কি একটা কারণে স্বামীজী দুজন ব্রহ্মচারীকে খুব গালি দিচ্ছিলেন। তাঁর গালির চোটে আমি কাঁপতে লাগলাম এবং আমার হাত থেকে পরিস্রুত জলের বোতলটি পড়ে গেল। এই দেখে স্বামীজীর ভাবের পরিবর্তন হলো। সেই মুহূর্তে তাঁর রাগ চলে গেল। তিনি বললেন, "বাবা, তুই nervous হয়ে (ঘাবড়িয়ে) পড়েছিস? যা, আমার ঘরে একটা ঔষধ আছে, খেয়ে শুয়ে পড়্‌গে যা।"

আশ্রিতদের প্রতি স্বামীজীর শিক্ষাদান সম্বন্ধে কিছু বলব। স্বামীজী আশ্রিত-গণকে যে শুধু শিক্ষাই দিয়েছেন তা নয়, অহরহঃ তাদের মঙ্গলকামনা করতেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করব। আমি কাশী সেবাশ্রম থেকে পনের দিনের ছুটি নিয়ে মঠে গিয়েছিলাম। সেবাশ্রমে লোকজনের অভাব এবং সেজন্য কাজের অসুবিধা হওয়ায় সেবাশ্রমে ফিরে যাবার জন্য সংবাদ এল। আমি অসুখের পর তখন সামান্য সুস্থ হয়েছি। স্বামীজী আমার যাওয়ার তাগিদ শুনে বললেন, "আগে ওর শরীর সুস্থ হোক, তারপর ঢের সেবাশ্রম হবে।" স্বামীজীর ইচ্ছা যে, আমার কল্যাণের জন্য তিনি আমাকে তাঁর কাছে আরও কিছুদিন রাখেন। তিনি এইভাবে সকলের কল্যাণের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখতেন।

গুরুভ্রাতাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, স্বামীজী তাও তাঁর আশ্রিত শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের তিনি একটি বৃহৎ 'ঠাকুরের সংসার' বলে মনে করতেন। ঠাকুর যাঁদের 'ঈশ্বরকোটি' বলে নির্দেশ করে গেছেন, স্বামীজী তাঁদের যথোচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে বলতেন। ঠাকুরকেই তিনি এ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বা মূল বলে ধরে নিতেন। ঠাকুর যাঁদের যে পর্যায়ভুক্ত বলে গেছেন, স্বামীজী তাঁদের সেইরূপ সম্মান করতে বলতেন। স্বামীজীর আশ্রিত ভক্তেরা যাতে

ঠাকুরের সন্তানগণকে বাবা, খুড়ো, জ্যেঠা ইত্যাদিরূপে যথাযোগ্য সম্মানের চোখে দেখে, সেজন্য তিনি তাদের উপদেশ দিতেন। একবার মঠে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ এসেছিল। আমার উপর তা বিতরণের ভার পড়ল। গুরুজনদের আমি বাবা, খুড়ো, জ্যেঠা হিসাবে বিবেচনা করে মহাপ্রসাদ বিতরণ করলাম। স্বামীজীর শিষ্য জনৈক বৃদ্ধ সাধু আগে প্রসাদ না পাওয়ায় চটে গেলেন। ফলে একটু বচসা শুরু হলো। স্বামীজী বিষয়টির তদন্তের ভার পূজনীয় শরৎ মহারাজের উপর অর্পণ করলেন। শরৎ মহারাজের কাছে সমস্ত বিষয় শুনে স্বামীজী বললেন, "সে ঠিক কাজই করেছে। যাকে আগে দেবার কথা তাকে আগে, যাকে পরে দেবার কথা তাকে পরে দিয়ে ন্যায্য কাজই করেছে।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাব ও শিক্ষা যাতে গুরুভ্রাতাগণ ও আশ্রিত ভক্তেরা কার্যে পরিণত করেন, এ-বিষয়ে স্বামীজীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ঠাকুর যে ভাব ও শিক্ষা জগৎকে দিয়ে গেছেন, সেই ভাব ও শিক্ষা যাতে তারা জীবনে ও কার্যে প্রতিফলিত করেন, সে বিষয়ে তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। ঠাকুরের নাম প্রচারের জন্য তিনি তত ব্যগ্র ছিলেন না। একবার কাশী সেবাশ্রম থেকে মঠে যাবার পর অনাথ আশ্রমের নাম কি হবে, তা স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করবার জন্য কাশীর লোকেরা আমাকে লিখেছিলেন। স্বামীজী "Home of Service" নাম প্রস্তাব করলেন। শুনে রাখাল মহারাজ বললেন, "Ramakrishna Home of Service নাম হোক।" এতে স্বামীজী বললেন, "এই তোমাদের কেবল ঠাকুরের নাম প্রচারের চেষ্টা। ঠাকুরের ভাব ও উপদেশ-প্রচারই আসল কথা। ঠাকুরের নাম প্রচারের জন্য এত ব্যগ্রতা কেন?"

কাশী সেবাশ্রম রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে আসার প্রাক্কালে স্বামীজী সকলকে সেবাশ্রমের সঠিক হিসাব রাখতে বলেছিলেন। তাঁর আরও নির্দেশ ছিল: "যিনি যে উদ্দেশ্যে অর্থ দেন, তাঁর সেই অর্থ সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। 'শাকের কড়ি মাছে, মাছের কড়ি শাকে' যাওয়া উচিত নয়।"

স্বামীজী যেমন উচ্চ আদর্শের শিক্ষা দিতেন, গুরুভ্রাতা ও আশ্রিতদের সর্বাঙ্গীণ নৈতিক পবিত্রতা বা উৎকর্ষ যাতে হয়, সে বিষয়েও তাঁর তেমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ছোটখাট সামান্য কাজেও শিক্ষা দেবার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। অন্যের চিঠি পড়া, অন্যে চিঠি লিখতে থাকলে গায়ে পড়ে তা দেখা, অন্যে আলাপ করতে থাকলে গোপনে তা শোনা—এসব তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। উপরন্তু কেউ এরূপ কাজ করলে অতিশয় তিরস্কার করতেন। এবিষয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

একবার স্বামীজী চিঠি লিখছিলেন, আমি কাছে বসেছিলাম। তাঁর চিঠি দেখবার দিকে আমার মন ছিল না বটে, তবে হয়তো অন্যমনস্কভাবে একবার আমার দৃষ্টি তাঁর চিঠিতে পড়ে থাকবে। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ রুষ্ট হয়ে বললেন, "খবরদার, কখনো অন্যের চিঠি পড়িসনি। এ ভারি অন্যায়।" পূজ্যপাদ হরি মহারাজের কাছে শুনেছি, একবার স্বামীজী তাঁকে একখানা চিঠি ডাকে ফেলতে দিয়েছিলেন। হরি মহারাজ চিঠির

ঠিকানাটা দেখেছিলেন। স্বামীজী তা লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "হরি ভাই, তোমাকে আমি চিঠিটা ডাকে ফেলতে দিয়েছিলাম, address (ঠিকানা) পড়তে তো বলিনি। অন্যের চিঠির address তুমি কেন পড়, একাজ তোমার ঠিক নয়।" স্বামীজীর সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা হরি মহারাজের নিকট শুনেছিলাম। স্বামীজী ও হরি মহারাজ সেবার আমেরিকা যাচ্ছিলেন। জাহাজের কেবিনে টেবিলের উপর ঘড়ি রেখে অনেক সময় হরি মহারাজ অন্য কাজে যেতেন। দু-একবার স্বামীজী তা লক্ষ্য করলেন। পরে হরি মহারাজকে বললেন, "হরিভাই, what right have you (তোমার কি অধিকার আছে) যে, তুমি একটি দরিদ্র cabin-boy-কে (কেবিন-বালক) এরূপ চুরি করতে প্রলুব্ধ করছ? ও গরিব, ঘড়িটি দেখে ওর চুরি করবার লোভ হওয়া স্বাভাবিক।" এই প্রকার তাঁর শিক্ষণ-প্রণালী ছিল।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে স্বামীজীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মঠে অগোছালো ভাব তিনি মোটেই দেখতে পারতেন না। প্রত্যেক জিনিস যাতে যথাস্থানে থাকে, বিছানাপত্র, কাপড়চোপড় সুপরিষ্কৃত থাকে, সেবিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখতেন। প্রত্যেকের বিছানার চাদর রোজ সকালে ঝাড়তে হতো এবং রোদ হাওয়া লাগাতে হতো, যাতে বিছানা পরিষ্কার থাকে ও ছারপোকা না থাকতে পারে। এজন্য তিনি কারো কারো বিছানায় শুয়ে পরীক্ষা করতেন। একবার মঠে স্বামীজী কি একটা অপরিষ্কার জিনিস দেখেছিলেন। আমি কাছে ছিলাম। তিনি রাখাল মহারাজকে ডেকে বললেন, "রাজা, এমন অপরিচ্ছন্নতা কেন? মঠ যদি পরিষ্কার না রাখতে পার, তবে গাছতলায় থাকলেই তো হয়। মঠ যখন হয়েছে, তখন ঠিক ঠিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।" এইভাবে তিনি সামান্য বিষয়েও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিতেন।

কারো নখে ময়লা থাকলে তিনি তার হাতে জল খেতে চাইতেন না। একদিন এজন্য তিনি আমাকে তিরস্কারই করেছিলেন। বলেছিলেন, "দেখ, তোর নখে যদি ময়লা থাকে, তবে তোর হাতে জল খাব না।" হাতে জল লাগিয়ে কাপড়ের কোঁচায় হাত মুছলে তিনি রাগ করতেন। একবার তাঁর বেদানা ছাড়িয়ে হাত ধুয়ে পরবার কাপড়ে হাত মুছেছিলাম। তা দেখে তিনি বললেন, "ঐ কাপড়ে হাত মুছে আবার আমাকে খাবার দিবি? খবরদার, কখনো এরূপ করিসনি।" এ-সবের জন্য তিনি তীব্র ভাষায় গালি দিয়েছেন। প্রস্রাব করবার সময় তিনি জল নিতে বলতেন। বলতেন, "যদি জল না নিস, তবে ঠাকুর বড় রাগ করেন। কাজেই প্রস্রাবের সময় জল নিবি এবং আমাকেও মনে করিয়ে দিবি।" এইরূপে তিনি ঠাকুরের নাম করে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। শুনেছি, ঠাকুর নাকি এইরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন এবং শিষ্যদের তা শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যেখানকার জিনিস সেখানে রাখা, গোছানো ভাব ঠাকুরও পছন্দ করতেন। হরি মহারাজ বলতেন, "যার ভিতরে গোছানো ভাব আছে, তার বাইরেও গোছানো আছে। যার ভিতরে গোছানো নেই, তার বাইরেও গোছানো নেই।'

অভ্যাগত সাধু-ব্রহ্মচারীদের মধ্যে সাধুভাব জাগিয়ে রাখার জন্য তিনি যেভাবে শিক্ষা

দিতেন এবং গুরুভ্রাতাদের যা বলতেন, তাই এখন বলছি। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল—মঠে দুই শ্রেণীর সাধু থাকবে। একদল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, আর একদল সন্ন্যাসী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা আজীবন নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী থাকবে। তারা দাড়ি-গোঁফ রাখবে, আত্মপাকী হবে, পঠন-পাঠন করবে এবং খুব নিষ্ঠার সংগে চলবে। আর একদল সন্ন্যাসী থাকবে, তারা "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" এবং "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" (নিজের মুক্তি ও জগতের হিতের জন্য) জীবন যাপন করবে। কোন নূতন ব্রহ্মচারী মঠে প্রথম এলে তিনি তাকে বেলুড় গ্রাম ও তার নিকটবর্তী স্থানে ভিক্ষা করতে পাঠাতেন। তাকে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল নিজে পাক করে ঠাকুরকে ভোগ দিতে হতো এবং পরে তা প্রসাদরূপে গ্রহণ করতে হতো। সন্ন্যাসীদের মাঝে মাঝে তিনি মাধুকরী অন্নগ্রহণ করতে বলতেন। "আমরা সাধু"—এই ভাবটা সব সময় রাখতে বলতেন। এই ভাবটা কার্যে পরিণত করবার জন্য শরীরত্যাগের একমাস পূর্বে তিনি পূজনীয় রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতিকে মাধুকরী করে আনতে বলেছিলেন। তাঁরা মাধুকরী করে আনলে স্বামীজী তা থেকে একটু অতি আনন্দের সংগে গ্রহণ করেন। সেই সময় স্বামীজী পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে বলেছিলেন, "মাধুকরী-বৃত্তি ত্যাগ করবেন না, সহ্য হোক আর নাই হোক।" মহাপুরুষ মহারাজের তখন কাশীতে আসবার কথা হচ্ছিল। আমরা যে সাধু—এই ভাবটি জাগিয়ে রাখাই স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল।

সাধু-ব্রহ্মচারীর পক্ষে মেয়েদের সংগে মেলামেশা করা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না, ঐরূপ করতে নিষেধ করতেন। তিনি সাধুদের সংগে গৃহস্থদের বিশেষ মেশামেশি বা ঘনিষ্ঠতা করাও বেশি পছন্দ করতেন না। সাধুদের বিছানায় গৃহস্থদের বসা—তাঁর অপছন্দ ছিল। এমনকি গৃহস্থদের সংগে এক পঙ্ক্তিতে বসে সাধুদের আহার করাও তিনি অপছন্দ করতেন। এজন্য মঠে প্রত্যেক সাধুকে তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটি মুখস্থ করতে বলতেন :

মেরুসর্ষপয়োর্যদ্ যৎ সূর্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্ যৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥

গৃহস্থদের সংগে সাধুদের এক পঙ্ক্তিতে খাওয়া সম্বন্ধে তিনি কত strict (কড়া) ছিলেন, তা নিম্নলিখিত ঘটনাটি থেকে বোঝা যাবে। তখন মঠে ঠাকুরঘরের নিচের হলে খাওয়া হতো। ভিতরে সাধুরা এবং বারান্দায় গৃহস্থরা বসতেন। একবার স্বামীজীর গৃহস্থ ভক্ত-শিষ্য সাঁতরাগাছির গোবিন্দবাবু ভিতরে বসলে স্বামীজী তাঁকে বললেন, "তুমি সাধুদের সংগে বসেছ কেন? বাইরে এসে বোস।" পরে ভক্তটি বাইরে বারান্দায় এসে বসলেন। এইরূপে তিনি গৃহস্থদের সংগে সাধুদের পৃথক্‌ভাব বজায় রাখতে চেষ্টা করতেন।

স্বামীজী কাজ-কর্ম ও ধ্যান-ধারণা—দুটিই একসংগে করতে বলতেন; বলতেন, "একসংগে তো বেশিক্ষণ ধ্যান-ধারণা করতে পারবে না, অতএব ধ্যান-ধারণার পর বাকি সময় কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকবে। কাজ-কর্মে মন শুদ্ধ হয়।" ধ্যান-ধারণা বা কাজ-কর্ম

না করে শুধু গল্প করা বা আড্ডা দেওয়া তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। কুঁড়েমি তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। যখন কোন কাজ-কর্ম থাকত না, তখন কোন কাজ আবিষ্কার করে আমাদের তাতে লাগিয়ে দিতেন। চুপ করে থাকা বা গল্প করা তাঁর একেবারে রীতিবিরুদ্ধ ছিল। স্বামীজী নিজে পঠন-পাঠন পড়াশুনার চর্চা যেমন করতেন, তেমনি মঠে যাতে এসব নিয়মিতভাবে হয়, তাতেও উৎসাহ দিতেন। নিয়মিত পঠন-পাঠন, রাত্রে আহারের পর আলোচনা-ক্লাস তাঁর সময়ে খুবই হতো। সেবাকার্যের জন্য পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের অনাথাশ্রম ও কাশীর সেবাশ্রম—এই দুই প্রতিষ্ঠানই তখন আরম্ভ হয়েছিল। কাশীর সেবাশ্রমের প্রতি তাঁর খুবই সহানুভূতি ছিল এবং এবিষয়ে সেবকদের তিনি খুব উৎসাহ দিতেন। এজন্য তিনি নিজে আবেদন পর্যন্ত লিখে দিয়েছিলেন। আগে সেবাশ্রমের নাম ছিল "Home of Relief—Poormen's Relief Association"। এটি তখন গৃহস্থদের অধীনে ছিল। তিনি বললেন, 'Home of Relief' কিরে? কেউ কি কাউকে রিলিফ দিতে পারে? 'Home of Service' নাম দে। ত্যাগীদের হাতে এসব কাজ দে। তা না হলে কি এসব জিনিস স্থায়ী হতে পারে?" স্বামীজীর দেহত্যাগের পর কাশী সেবাশ্রমের নাম 'Home of Service' রাখা হলো এবং কর্মীরা এটি রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে দিয়ে দিলেন। জীবৎকালে কলকাতার প্রসিদ্ধ ধনী কালীকৃষ্ণ ঠাকুর পূজনীয় স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে বলেছিলেন, "আমি কাশীর অনাথাশ্রমের যা কিছু দরকার, করে দেব।" এই সংবাদ শুনে স্বামীজী স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে এক পত্রে অন্যান্য খবরের মধ্যে এ কথাও লেখেন, "কালীকৃষ্ণ ঠাকুর যদি কাশীর অনাথাশ্রমের জন্য কিছু করে দেন, তবে তাঁর সহস্র শিব-প্রতিষ্ঠার ফল হবে।"

স্বামীজী নিজেও একদিন কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের কাছে যেতে মনঃস্থ করেছিলেন। তাতে গঙ্গাধর মহারাজ বললেন, "একজনের কাছ থেকে আমরা সব নেব কেন? সকলে মিলে দেবে, তাই হচ্ছে ঠিক।" ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী যখন কাশীতে আসেন, তখন তিনি সেবাশ্রমের কার্য দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, "গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী—যত কর্মী আছে, সব আমার কাছে নিয়ে আয়। সবাইকে দীক্ষা দেব।" সেসময় যে-কয়জন কর্মী ও সেবক ছিলেন, সবাইকেই তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার আমেরিকা হতে ফিরে আসার পর কাশী সেবাশ্রমের কাজের বিবরণাদি শুনে স্বামীজী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেছিলেন, "এরূপ সেবার কাজ প্রত্যেক তীর্থস্থানে হওয়া উচিত।" তাঁর নির্দেশমতো কনখলে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে সেবার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের সেবাকার্যের প্রতি তাঁর খুব সহানুভূতি ছিল। তবে সেবার কাজ কলকাতায় হয়, এও তাঁর ইচ্ছা ছিল। একথা স্বামীজীর কাছে শুনেছিলাম। এসব কাজে তিনি খুবই উৎসাহ দিতেন। একদিন তিনি নিজেই বলেন, "ছোঁড়ারা কেউ কিছু করলে না। যাই হোক, তবু কাশীর ছেলেরা আমার spirit-এ (ভাবানুযায়ী) কিছু কাজ করছে।" তিনি এইসব কাজে

বুলডগের মতো নাছোড়বান্দার ভাব (Bulldog's tenacity) নিয়ে লেগে থাকতে বিশেষ করে বলতেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, "দেখ, আমি বার বছর হন্যে হয়ে ঘুরেছি—ঠাকুরকে গঙ্গার ধারে বসাব বলে। তোরা কোন কাজে লেগে থাকতে পারিস না, তবুও এই বুড়োর (সচ্চিদানন্দ স্বামীর) কাজে লেগে থাকার ক্ষমতা আছে।" যাতে সেবার কাজগুলি ঠিক ঠিক ভাবে হয়, সেবিষয়ে তিনি খুব উপদেশ দিতেন। একদিন আমি কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় স্বামীজী কল্যাণানন্দ স্বামীকে বলছেন, "দেখ কল্যাণ, আমার কেমন ইচ্ছা হয় জান? একদিকে ঠাকুরের মন্দির থাকবে, সাধু-ব্রহ্মচারীরা তাতে ধ্যান-ধারণা করবে, তারপর যা ধ্যান-ধারণা করলে, তা Practical field-এ (ব্যবহারিক জগতে) কাজে লাগাবে।" তাঁর আসল ভাব ছিল Practical (কার্যকরী) বেদান্ত। শুধু Theoretical (তাত্ত্বিক) নয়, বেদান্তকে কাজে পরিণত করতে হবে। শুধু কথায় বা বিচারে চলবে না।

পঠন-পাঠন, শাস্ত্রালোচনার দিকে স্বামীজীর অতিশয় অনুরাগ ছিল। এসব তিনি নিজে তো করতেনই, অধিকন্তু মঠের সকলকেই এবিষয়ে উৎসাহ দিতেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন, "আর কিছু পারিস না পারিস, গীতাটা পড়িস।" তাঁর ইচ্ছা ছিল, মঠে পাণিনির টোল হয়। পাণিনির বিশেষ পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মঠের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি একবার মঠে এসেছিলেন। স্বামীজী তখন তাঁকে এ-বিষয়ে বলেছিলেন এবং টোল খুলবার জন্য তাঁকে বিশেষ উৎসাহিত করেছিলেন।

বাঙলা দেশে বেদের প্রচার হোক, এও তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। এই-সব পঠন-পাঠন, শাস্ত্রাদির ক্লাস ইত্যাদি করতে তিনি সুধীর (স্বামী শুদ্ধানন্দকে) খুব উৎসাহ দিতেন। সুধীর মহারাজের উপর তিনি এই বিষয়ের ভার দেন। স্বামীজী তাঁকে এই আশীর্বাদও করেছিলেন, "আশীর্বাদ করি, তুই পণ্ডিত হ।" আমি যখন স্বামীজীর কাছে ছিলাম, তখন সুধীর মহারাজ উদ্বোধনেও কাজকর্ম করতেন। পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য তিনি তাঁকে উদ্বোধন থেকে ছাড়িয়ে এনে মঠে রেখেছিলেন। স্বামীজীর পঠন-পাঠনের প্রতি এতটা ঝোঁক ছিল।

প্রচার সম্বন্ধে স্বামীজীর কাছ থেকে যা শুনেছিলাম, তাই বলছি। 'মণ্ডলী' বের করার কথা তিনি বলতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, ঠাকুরের flag (পতাকা) নিয়ে মঠ থেকে সাধুদের মণ্ডলী গ্রামে গ্রামে যাবে এবং ঠাকুরের ভাব প্রচার করবে।

ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে স্বামীজী খুব strict (কড়া) ছিলেন। তাঁর সময়ে ভোর চারটায় ধ্যানের ঘণ্টা পড়ত। তাঁর সেবক প্রত্যেক সন্ন্যাসীর—এমনকি গুরুভাইদের কানের কাছে গিয়ে ঘণ্টা বাজাত। প্রত্যেককেই তখন ঠাকুরঘরে এসে ধ্যান-ধারণা করতে হতো। তিনি নিজে এসে বসতেন এবং কে এল, না এল—খবর নিতেন। কেউ না এলে তিনি প্রথম প্রথম কারো ঘরের কাছে গিয়ে বিদ্রূপচ্ছলে বলতেন, "ওহে সন্ন্যাসী-বাবুরা, আর কতক্ষণ নিদ্রা যাবে?" তিনি ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে এত strict ছিলেন যে, ঠাকুর-ঘরে গিয়ে ধ্যান-ধারণা না করলে কড়া শাসন করতেন। একদিন ধ্যানের সময় ঠাকুরঘরে

খুব অল্পসংখ্যক সাধু দেখে তিনি নিচে এসে খুব অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভাণ্ডারীকে ডেকে বলেন, "দেখি, চাবি আমাকে দাও, আজ কেউ খেতে পাবে না। ভিক্ষা করে খাক।" বিজ্ঞান মহারাজ সেদিন ঠাকুরঘরে গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে চাবি দিয়ে স্বামীজী কলকাতা চলে আসেন। পরে মঠে ফিরে গিয়ে খবর নিলেন—কে কি করেছিল। সেদিন যারা ঠাকুরঘরে যায়নি, তারা ভিক্ষা করেই খেয়েছিল।

এবিষয়ে তিনি এত কড়া ছিলেন যে, পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকেও আমার সামনেই বলেছিলেন, "তারকদা, আপনি মহাপুরুষ হয়েছেন, তবু লোকশিক্ষার্থ আপনার ঠাকুরঘরে যাওয়া উচিত।" সেই অবধি মহাপুরুষ মহারাজ—যতদিন তাঁর শরীরে সামর্থ্য ছিল, ততদিন ঠাকুরঘরে গিয়ে বসতেন। একথা পুরাতন সাধুরা বিদিত আছেন। সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষেও স্বামীজী জপ-ধ্যান ইত্যাদি করতে বলতেন এবং উৎসাহ দিতেন। তিনি নিজে শেষ জীবনেও ধ্যান-ধারণাদি খুব করতেন। অসুস্থ হলেও বাদ দিতেন না। সকলকে দু-বেলা ধ্যান-ধারণাদি করতে বলতেন এবং অন্য সময় কাজকর্ম করতে বলতেন।

যতদূর দেখেছি, তাতে পূজ্যপাদ স্বামীজীর গুরুভাবও আমার কাছে অদ্ভুত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। সেসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলছি। তিনি একদিন স্বরূপানন্দ-স্বামীকে বলছেন, "দেখ স্বরূপ, আমি যার মাথায় হাত বুলিয়েছি, তার কোন ভাবনা নেই। এ নিশ্চিত জানবি।" শিষ্য গুপ্ত-মহারাজের (স্বামী সদানন্দ) কথা উঠলে একদিন স্বামীজী পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে বলেন, "আমার চেলারা যদি হাজারবার নরকে যায়, তাহলে আমি হাজারবার তাদের হাত ধরে তুলব। এ যদি সত্য না হয়, তবে ঠাকুরাদি সব মিথ্যা জানবি।"

একদিন দেখি পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের নিত্য পূজায় বসেছেন, এমন সময় স্বামীজী গিয়ে উপস্থিত। স্বামীজী বাবুরাম মহারাজকে উঠিয়ে দিলেন। উঠিয়ে নিজেই পূজা করতে বসে গেলেন। এক-আধবার ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্ঘ্য দিয়েই নিজের মাথায় অর্ঘ্য দিতে আরম্ভ করলেন। তখনই আবার ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। তারপর আসন ত্যাগ করে ঠাকুরঘর হতে বাইরে আসবার সময় তাঁর কী এক অপূর্ব গদ্‌গদভাব। আমরা সকলে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম।

একদিন একজন কাকে বলছেন, "দেখবি, দু-শ বছর পরে বিবেকানন্দের এক একটি চুলের জন্য লোক অস্থির হয়ে পড়বে।"

গুরু আর সঙ্ঘের অধ্যক্ষ যে এক—এ-কথা তিনি একদিন আমাকে বুঝিয়ে দেন। একদিন তিনি গম্ভীর হয়ে মঠে ঠাকুরঘরের নিচে বসে আছেন আর পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি ঐ দিক অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিলাম। আমাকে দেখে স্বামীজী বললেন, "এই দিকে আয়। যা, ফুল তুলে নিয়ে আয়।" আমি ফুল তুলে আনলাম। পরে আমাকে বললেন, "আমাকে পূজা কর—নিত্য পূজো করবি।" আবার বললেন, "ফুল তুলে নিয়ে আয়।" ফুল তুলে আনার পর আমাকে

বললেন, "অধ্যক্ষের পূজা কর। গুরু আর অধ্যক্ষ এক—জানবি। নিত্য পূজো করবি।" এরূপ নানাভাবে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

একদিন শাস্ত্রালোচনা হচ্ছিল। প্রশ্ন হয়েছিল—"ধ্যান-জপ বড়, না কাজ বড়?" এই বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনার পর (স্বামীজী বরাবর চুপ করেই ছিলেন) শেষকালে তিনি বললেন, "যা হয় বাবা, একটা কর দেখি ভাল করে। তাহলেই এর মীমাংসা আপনা হতেই হয়ে যাবে।" একদিন স্বামী স্বরূপানন্দ প্রশ্ন করেন, "আপনারা বরাহনগর মঠে কিভাবে জীবন কাটিয়েছেন?"—সেটা ভাল, না আমরা এখন যেভাবে কাটাচ্ছি, সেটা ভাল? অনেকে বলেন, বরাহনগর মঠে সময়টা খুব ভাল কেটেছে।" তাতে স্বামীজী উত্তর দেন, "তখনকার জন্য বরাহনগর মঠের life (জীবন) আবশ্যক ছিল। এখনকার জন্যে এরূপই আবশ্যক, ওভাবে থাকলে আর চলবে না।"

সন্ন্যাসকে স্বামীজী খুব উচ্চ স্থান দিতেন। যখন সন্ন্যাস দিতে যেতেন, তখন বলতেন, "ঠাকুরের কাছে বলিদান দিতে হবে।" ধ্যানান্তে একটা ভাব নিয়ে তিনি আসতেন। সন্ন্যাসের মন্ত্রাদি তিনি নিজেই সব বলতেন। মন্ত্রপাঠ করে শিখাসূত্র আহুতি দিয়ে তার একটু ভস্ম খেতে বলতেন। আর বলতেন, "আজ হতে তোকে ছত্রিশ জাতের অন্ন খাবার অধিকার দেওয়া হলো।"

স্বামীজীর সঙ্গে মঠে বাস করবার কালে সন্ন্যাস-গ্রহণ যে আমার প্রাণের ইচ্ছা, তা তাঁকে একদিন জানাই। তিনি বললেন "দশ বাড়ি ভিক্ষা করে খেতে পারবি?" আমি বললাম, "আপনার আশীর্বাদ হলেই পারি।" শুনে বললেন, "এইখানে পড়ে থাক, সব হয়ে যাবে।" স্বামীজীর তখন মায়াবতী যাবার কথা হচ্ছিল, পরে তা স্থগিত হয়। আমি এই অবকাশে আবার একবার সন্ন্যাস-গ্রহণের ইচ্ছা নিবেদন করলাম। তিনি বুদ্ধপূর্ণিমা-দিবস সন্ন্যাসের দিন স্থির করে স্বামী বোধানন্দকে সমস্ত ব্যবস্থা করতে বললেন। সেই রাত্রি এমন উদ্বেগে কাটিয়েছিলাম যে, ভোর ভোর উঠবার কথা ছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙায় ঘড়ি দেখলাম—৪-১০, আসলে কিন্তু তখন ২-২০ মিঃ, কাটা দুটির স্থান দেখতে ভুল। উঠতে দেরি হয়েছে মনে করে স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে ঘণ্টা বাজাতে বলি। তিনি ঘণ্টা বাজালে স্বামী বোধানন্দ ঠাকুরঘরের দিকে যাচ্ছেন, এমন সময় স্বামীজী উঠে বাথরুমে যাবার সময় তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "এতরাত্রে ঠাকুরঘরে কে যায়?" স্বামী বোধানন্দ ঘণ্টার কথা বলায় স্বামীজী বললেন, "সে খুব nervous হয়ে (ঘাবড়িয়ে) গেছে।" কিছু পরে স্বামীজী নিজেই ঠাকুরঘরে গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করলেন এবং বিরজাহোম নিজেই করলেন। আহুতি দেবার পর বললেন, "আজ হতে তোর সমস্ত সাংসারিক কাজ নাশ হয়ে গেল।" আমার সন্ন্যাস নাম দেন 'অচলানন্দ'। আমিই তাঁর শেষ সন্ন্যাসী শিষ্য।

স্বামীজী নানাভাবে অনেককে অনেক রকম শিক্ষা দিয়েছেন। যাকে দিয়ে যতটুকু করিয়েছেন, সে ততখানি করে ধন্য হয়েছে। ভবিষ্যতে যাঁরা আসছেন, তাঁরা

যদি এই ভাবে ভাবিত হয়ে নিজেদের জীবন তৈরি করতে পারেন, তাঁদের জীবন ধন্য হবে এবং পরমার্থ লাভ হবে।

স্বামীজীর আর একটি শিক্ষা ছিলঃ জাগতিক কাজকর্ম যে ঠিক ঠিক করতে পারে, তার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান-লাভও সম্ভব।

ব্রহ্মচারী জ্ঞান

উনিশ-শো একের কথা। মুঙ্গেরের প্রবাসী বাঙালী আমরা। অভিভাবকদের ব্যবস্থামতো আমার 'পাকা দেখা' স্থির। আমি কিন্তু উদ্বাহ-বন্ধনে গলা দিতে একান্ত নারাজ। সাধু হব—ঐকান্তিক, সুস্পষ্ট অভিপ্রায়। অতএব রক্ষা পাবার অনন্য উপায়—গৃহত্যাগ। পাকা দেখার আগের দিন তা করতে হলো। উদ্বোধন পাক্ষিক পত্র প্রথম বৎসর হতেই পড়ি। স্বামীজীর চারখানা যোগ-গ্রন্থও ক্রমে ক্রমে পাঠ করেছিলাম।

এর আগে কলকাতায় বাগবাজারে ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে রামকৃষ্ণ মিশনের সভায় উপস্থিত হই। স্বামীজী তখন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে। একখানা লম্বা বেঞ্চির ওপর রাখাল মহারাজ ও শরৎ মহারাজকে উপবিষ্ট দেখলাম। দেখেই মনে হলো—হ্যাঁ, চেহারা বটে। আমারও পালোয়ানী-করা মজবুত দেহ ছিল।

খানিকটা কীর্তন হলো। একটু পাঠ ও আলোচনা হলঘরে হলো। শুনলাম। দুটো রসগোল্লা প্রসাদ পেলাম। রাখাল মহারাজের সঙ্গে আলাপ হলো। কথায় কথায় তখুনি বুঝলাম যে, ওঁর গাছের বড় সখ। মুঙ্গেরে বাড়ি শুনে বললেন, ওদিকের আম বিখ্যাত। আমাদের জন্য কয়েকটা আমের চারা যোগাড় করে পাঠাতে পারবে?

উত্তর করলাম—হ্যাঁ, ওদিককার আম ভাল বটে। কিন্তু চারাটারা যোগাড় করে পাঠান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুনে শরৎ মহারাজ হাসতে লাগলেন।

উদ্বোধনের একখানা বিজ্ঞপ্তিপত্র হতে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অস্তিত্ব জানতে পারি। তাতে লেখা ছিল যে, ওখানে ব্রহ্মচারীদের রেখে শিক্ষা দেওয়া হবে। আমি বাড়ি ছেড়ে মায়াবতী যাব মনে মনে ঠিক করলুম। কর্তৃপক্ষকে দরখাস্ত করা গেল। তাঁরা জবাব দিলেন, "হাঁ, ওরূপ আমাদের কল্পনা ছিল বটে। কিন্তু হঠাৎ ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের মৃত্যু হওয়াতে ওসব ওলট-পালট হয়ে গেছে। এখন ব্রহ্মচারীরূপে কাউকে নেওয়া হবে কিনা ঠিক নেই।"

স্বামীজী তাঁর দ্বিতীয় পাশ্চাত্য ভ্রমণ থেকে ফিরে এলেন। আমিও মুঙ্গের থেকে মায়াবতী পাড়ি দিলাম। যাবার আগে মঠে জানালাম, যাচ্ছি। একেবারে টানা গেলাম না পাছে আত্মীয় কেউ ধরে ফেলে। খানিক-খানিক ছাড়া-ছাড়া যাত্রা হলো। পরিশেষে টনকপুর এলাম। সেখান থেকে হেঁটে মায়াবতী। কয়েক দিন রইলাম। স্বরূপানন্দ স্বামী গীতা, চণ্ডী পড়াতেন। একটি ঘরে ঠাকুরের পুজোও আমি করতাম।

স্বামীজী এলেন। আমার থাকা হবে কিনা সন্দেহ ছিল। তিনি মঞ্জুর করবেন কিনা। যেদিন কানে এল তিনি অপরকে বলছেন, "এ থাকবে"—তখন যেন কূল পেলাম। গম্ভীর মোটেই নয়—তাঁকে দেখলাম। আমার বাবা বেলুড়ে তাঁর সংগে ইতি-পূর্বেই দেখা করেছিলেন। বিয়ের ব্যাপার জানিয়েছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে বন্ধুর মতো আমায় বললেন, "কিরে বউ পছন্দ হয়নি নাকি ? না, ঘড়ি, ঘড়ির চেন বা অপর কিছু দেওয়া-থোওয়া তোর মনঃপূত হয়নি ? বলি ব্যাপার কিরে ?" দেখলাম বেশ রসিক, আর আমুদে। আমার শক্ত দেহ দেখে ভারি আহ্লাদ। মস্ত আমার বুক। তিনি হাত বোলাতে লাগলেন। বললেন, "বাঃ বাঃ বাঃ। বাঙলায় এমন শরীর হয় না।"

দিন পনের তিনি রইলেন। রোজ রোজ বৃষ্টি। বেড়াতে পারতেন না।

প্রথম প্রথম আমি সকলের সংগে ওপরে দোতলায় টেবিলে খেতাম। তাতে আচার-বিচার তত মানা হতো না। কম্বল পেতে খাওয়া হতো। স্বামীজী পছন্দ করলেন না যে, নবাগত ব্রহ্মচারী আমি—গোড়া থেকেই ঐভাবে খাই। বললেন, "ওকে কাল থেকে রান্না-ঘরে নিচে খেতে দেবে।" তিনি কারোর নিষ্ঠা সহজে ভাঙতে চাইতেন না।

মায়াবতীর পাহাড়ীরা ওখানের আশ্রমস্থ সব সন্ন্যাসীকেই 'স্বামীজী' সম্বোধনে ডাকত। খালি আমাকে 'বাবু' বলত। স্বামীজী বললেন, "তা হবে না। তোরা সব ওকে 'মহারাজ' বা 'দাদা' বলে ডাকবি।" সেই থেকে ওঁদের মধ্যে খালি আমাকেই ওরা 'মহারাজ' সম্বোধন করত।

মিসেস সেভিয়ার একদিন স্বামীজীর লেকচার শুনতে চাইলেন। খালি তাঁরই অনুরোধে আমাদের মাত্র আট দশজনের সামনেই তিনি পায়চারি করতে করতে, কখনো মাঝে মাঝে সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে খুব চড়া আওয়াজেই বক্তৃতা করলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা। এমনি সাধারণ বিষয়ে বললেন। মনে হলো যেন তিনি এক প্রকাণ্ড জন-সভাতে ভাষণ দিচ্ছেন। বলতে বলতে খুব মেতে উঠলেন। উদ্দীপ্ত হতে লাগলেন। হিমাচলের সমস্ত নিস্তব্ধ বেষ্টনী, শান্ত বায়ুমণ্ডল তাঁর আওয়াজে ভুরি ভুরি কাঁপতে লাগল—দিকে দিকে সেই অনবদ্য কণ্ঠধ্বনির প্রতিধ্বনি হতে লাগল। এ-ই আমার জীবনে একমাত্র তাঁর বক্তৃতা শোনা। ইংরেজী উচ্চারণ চোস্ত-দুরস্ত, ঠিক সাহেবদের মতো। কোথাও এতটুকু খিঁচ নেই।

মধ্যে মধ্যে গুরুগম্ভীর স্বরে প্রগাঢ়ভাবের সংগে তিনি স্তব-পাঠ করতেন ও পায়চারি করতে করতে গান গাইতেন। তিনি বলতেন পাশ্চাত্যে অনেক বক্তৃতা করে তাঁর কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ কর্কশ হয়ে গিয়েছিল।

আমাকে গীতা, চণ্ডী ও কতকগুলি স্তব মুখস্থ করতে বলেছিলেন। তাঁর কথায় আমি করেও ছিলাম।

প্রথম দিন তিনি যেতেই পাহাড়ীরা একটা থালায় খানিকটা কর্পূর জেলে তাঁকে আরতি করল। তিনি তাদের অতি প্রাচীন মান্ধাতা আমলের পদ্ধতি দেখে রসিকতা

করে বললেন, "বাবা, ভূতেও এরকম আরতি সহ্য করতে পারবে না—মানুষ তো কোন্ ছার !" তারপরে তারা থামে।

তিনি মায়াবতী থেকে চলে আসছেন। আমারও মন টিকল না। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দু-মাইল হেঁটে চললুম। মতলব—তাঁর দলেই নামব। তিনি তখন ডাণ্ডীতে। আমি হেঁটে।

দেখে বললেন, "তুই আমার সঙ্গে এখন কোথায় যাবি ? আমি তো এখন মঠে (বেলুড়) যাচ্ছি না। নানা জায়গা ঘুরব যে রে। তুই এখানে থাক। সাধু হবি যে, তা আমার কথা শুনে চলতে পারবি তো ?"

"হাঁ—নিশ্চয়ই।"

"আচ্ছা, এই খাড়াই বা ঢালু থেকে যদি বলি, লাফ দে—পারবি ?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা, তা আর দিতে হবে না। আমি বলছি, তুই আশ্রমে ফিরে যা। এখন ওখানে থাক। আমি যখন ঠাকুরের উৎসবের সময় মঠে ফিরব, খবর নিবি। মঠে আমি গেলে তখন এখান থেকে নামবি।"

অগত্যা প্রবল অনিচ্ছা থাকলেও তাই করতে হলো।

ইতিপূর্বে আশ্রমের সব ঘর তাঁকে একদিন দেখানো হচ্ছিল। যে ঘরে ঠাকুরপুজো আমি করতাম—ঢুকে বললেন, "বুড়ো এখানেও জুড়ে বসেছে দেখছি।" বাবুরাম মহারাজ ওখানে এর আগে যাওয়াতে কীর্তন ও পূজো জোর চলছিল। স্বামীজীর অভিপ্রায় মতো অতঃপর তা বন্ধ হয়।

একদিন মায়াবতী আশ্রম থেকে তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন। বৃষ্টি পড়ছিল। আমি তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে তাঁর মাথায় ছাতা ধরেছিলাম। তিনি তখুনি নেমে পড়লেন। ভারি খুশি। বললেন, "সাবাস। এই তো চাই !"

স্বরূপানন্দ স্বামী পছন্দ করতেন না যে, কোন নতুন ছেলে বাড়ি থেকে এসেই স্বামীজীর কাছে থাকে। স্বামীজীর advanced thikning, বিধি-নিষেধ বহির্ভূত পরমহংসোপম ব্যবহার ও অত্যুচ্চ ভাবধারা ঠিক ঠিক হয়তো নিতে পারবে না। ভাব গুলিয়ে যাবে। নিজের গঠনের জন্য ওরূপ ছেলের প্রথমে আলাদা থাকা দরকার এরূপ মনোভাব তিনি পোষণ করতেন।

মায়াবতীতে স্বামীজীর ঘরের জানালা দিয়ে চির-তুহিন গিরিমালা দেখা যেত। তিনি নিরালায় বসে বসে উপভোগ করতেন। একদিন আমাকে ঐ সৌন্দর্য দেখালেন, "দ্যাখ দ্যাখ। কি চমৎকার। শিবের স্তব জানিস ?"—বলেই একটি স্তব অতীব শুদ্ধ-বাণী সমন্বিত অশ্রুতপূর্ব অপরূপ কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন।[১] ভাবটা এই—মহাদেবের সবই সাদা—আর তিনি জ্যোতির্ময়।

---

১ গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং। / খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে॥ গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধণি। / সোঽয়ং সর্বসিতো

আবৃত্তি করতে করতেই কেমন যেন বাহ্যহারা হয়ে গেলেন—স্থির, নিশ্চল।

তাঁর সঙ্গে হিমাচলের কোলে এই রকম আমার প্রথম পরিচয়। মায়াবতীতে আমি তো তাঁর বেশ সুন্দর bright শরীর দেখেছি। তবে যাঁরা তার আগে তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন তিনি তখন খুব reduced—কাবু।

তারপর বেলুড় মঠে। তাঁর ঘরে যাব। কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না, তাঁর শরীর খারাপ। নিরঞ্জন মহারাজ—লম্বা-চওড়া চেহারা—দু-হাত তুলে দরজা আটকে রেখেছেন। আমি বাধা মানলুম না। তলা দিয়ে গলে ঢুকে পড়লুম। ভেতরে রাখাল মহারাজ ও শরৎ মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে বসে কথা কইছিলেন। আমি ঢোকাতে তাঁরা নিরঞ্জন মহারাজকে হাসতে হাসতে বললেন, "কি হে, খুব তো গার্ড দিচ্ছ। এই ছোঁড়াটা এল কি করে?"

স্বামীজী বললেন, "কি রে তুই চলে এলি যে?" আমাকে দেখেই চিনেছেন।

বললাম, "আপনার সঙ্গে কথা ছিল যে, আপনি মঠে এলে আসব।" তখন চুপ করলেন। সেভিয়ার-পত্নীর কাছ থেকে তিনি বেলুড়ে ঠাকুর ঘরে রাখবার জন্যে একখানি ছবি চেয়েছিলেন। তা আমার মারফত পাঠান হয়। পথে আমি ছবির কাঁচখানি ভেঙে ফেলি। ভয় ছিল—কি জানি বকবেন। ছবি পেয়ে খুব খুশি হলেন, বকলেন না মোটেই।

বেলুড়ে ঠাকুরপুজো আমি করতুম। তিনি তখন রোজ ঠাকুরঘরে যেতেন। একদিন আমাকে ডেকে দীক্ষা দেন। আমি চাইনি। আমাকে গেরুয়া পরে থাকতে তিনি পরে আদেশ দেন। আমার কাপড় নেই দেখে শিবানন্দ স্বামী তাঁর দু-খানি গেরুয়া কাপড়ের একখানি আমাকে প্রথমে দেন। তারপরে কখনো লাল, কখনো নীল, যেমন কাপড় পেতুম পরতুম। গোপালদা বহুরূপী বলে ঠাট্টা করতেন। স্বামীজী শুনে শুধু গেরুয়া পরতে বলেন।

ইদানীং দেহত্যাগের আগে শরীর খারাপ যাচ্ছিল বলে স্বামীজীর ঘরে যাবার আগে রাখাল মহারাজ আমাদের কাছে প্রথম খবর নিতেন—ওঁর মেজাজ কেমন। মাস আটেক বেলুড়ে তাঁর কাছে থাকবার পর ওঁর দেহ গেল।

স্বামীজীর সঙ্গে কলকাতায় কয়েকবার বেড়াতে ও নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছি। তাঁর বোনের বাড়ি। বোন তাঁকে বড় ভালবাসত। তিনি শেষটায় বিশেষ খেতে পারতেন না। আমি বেশ খেতাম।

দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা ॥—পশুপতির গায়ে শুভ্র ভস্ম! হাস্য শুভ্র। হাতে শুভ্র নরকপাল। দণ্ড শুভ্র। বাহন বৃষভ—শুভ্র। কর্ণে দুই শুভ্র কুণ্ডল। মাথায় জটা—গাঙ্গ-ফেনসমূহ দ্বারা শুভ্র। ভালে শুভ্র অর্ধচন্দ্র।—তিনি সর্ব শুভ্র। তিনি আমাদের সর্বদা পাপক্ষয়রূপ বিভব দান করুন।—শঙ্করাচার্য বিরচিত।

কেদারবাবা[২] ও নিশ্চয় স্বামীর[৩] সন্ন্যাস এই সময়ে বেলুড়ে হলো। আমাকে বলেছিলেন, "তুই এইভাবেই যেমন আছিস থাকবি।"

যত শেষের দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল, ততই তাঁর শ্রীমুখে "জয় প্রভো, জয় প্রভো," "মা, মা, মা"—মহাশব্দ ঝঙ্কৃত হতো। আর শুনতাম—"শিব—শিব—শিব।"

যেসব ছেলেরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেলুড়ে তাঁর কাছে সাধু হতে আসতেন, তাঁদের উপরে স্বামীজীর অগাধ ভালবাসা দেখা যেত। কোন পাশ্চাত্য ভক্ত একবার স্বামীজীকে একটি সৌখীন কাঁচের গ্লাস উপহার দেন। স্বামীজী ঐ গ্লাসে কমলালেবুর রস করবার জন্য ঐরূপ এক বালককে বলেন। ঐ কাজ করতে অনবধানবশতঃ বালক গ্লাসটি ভেঙে ফেলল। কোন বয়স্ক সাধু তা দেখে বালককে অতীব চড়া রকমের তিরস্কার করতে লাগলেন। স্বামীজীর কর্ণগোচর হলে তিনি বালকের দিক নিয়ে বললেন, "ঠাকুরের কাছে আমরা গিছলাম, তিনি কত ভালবাসা দিয়ে আমাদের আপন করে নিয়েছিলেন। এরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে আমাদের এখানে এসেছে। এদের ওরকম ভীষণ বকুনি দিলে চলবে কেন? এরা থাকতে পারবে কেন? গেলাস তো ঐভাবেই যাবে, গেলাসের তো আর কলেরা হবে না, থাইসিসও হবে না।"

গৃহত্যাগীর উপর তাঁর মমতার পারাপার ছিল না। ঠাকুরের নামে যাঁরা ত্যাগ-ব্রতধারী, তিনি মনে করতেন তিনি তাঁদের গোলাম।

বেলুড় মঠে আর একটি সেবক ছেলের একশো চার জ্বর। স্বামীজী আমাকে ডেকে বললেন, "ওরে, এর জন্যে একটু ঠাকুরের চরণামৃত নিয়ে আয় তো বাবা।" আমি শুনে চাপা হাসি হাসতে লাগলাম—চরণামৃতের কী গুণ থাকতে পারে যাতে জ্বর আরাম করবে? অথচ উনি বলছেন। সুতরাং আনতে যাচ্ছি। স্বামীজী তাচ্ছিল্যভাব লক্ষ্য করে বললেন, "যা যা তোকে আর আনতে হবে না।" নিজেই সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ঘরে গিয়ে নিয়ে এলেন।

চরণামৃত খাওয়ার পরে অবশ্য রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

২ স্বামী অচলানন্দ

৩ স্বামী নিশ্চয়ানন্দ

হরিপদ মিত্র

বেলগাঁ—১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ, ১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার। প্রায় দুই ঘণ্টা হলো সন্ধ্যা হয়েছে। এক স্থূলকায় প্রসন্নবদন যুবা সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক ঐ দেশীয় উকিলের সঙ্গে আমার বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। উকিল বন্ধুটি বললেন, "ইনি একজন বিদ্বান বাঙালী সন্ন্যাসী, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।" ফিরে দেখলাম—প্রশান্তমূর্তি, দুই চক্ষু থেকে যেন বিদ্যুতের আলো বের হচ্ছে, গোঁফদাড়ি কামান, অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বাহানা চটিজুতো, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ি। সন্ন্যাসীর সে অপরূপ মূর্তি স্মরণ হলে এখনো যেন তাঁকে চোখের সামনে দেখি।

কিছুক্ষণ পরে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলাম, "মশায় কি তামাক খান? আমি কায়স্থ, আমার একটি ভিন্ন আর হুঁকা নেই। আপনার যদি আমার হুঁকায় তামাক খেতে আপত্তি না থাকে, তাহলে তাতে তামাক সেজে দিতে বলি।" তিনি বললেন, "তামাক চুরুট—যখন যা পাই, তখন তাই খেয়ে থাকি, আর আপনার হুঁকায় খেতে কিছুই আপত্তি নেই।" তামাক সেজে দিলাম।

তাঁকে আমার বাসায় থাকতে বললাম ও তাঁর জিনিসপত্র আমার বাসায় আনব কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "আমি উকিলবাবুর বাড়িতে বেশ আছি। আর বাঙালী দেখেই তাঁর কাছ থেকে চলে এলে তাঁর মনে দুঃখ হবে; কারণ তাঁরা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করেন—অতএব আসবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাবে।"

সে-রাত্রে বড় বেশি কথাবার্তা হলো না; কিন্তু দু-চার কথা যা বললেন, তাতেই বেশ বুঝলাম, তিনি আমার থেকে হাজারগুণে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান; ইচ্ছা করলে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারেন, তথাপি টাকাকড়ি ছোঁন না এবং সুখী হবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্ত্বেও আমার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।

আমার বাসায় থাকবেন না জেনে পুনরায় বললাম, "যদি চা খাবার আপত্তি না থাকে, তাহলে কাল প্রাতে আমার সঙ্গে চা খেতে এলে সুখী হব।" তিনি আসতে স্বীকার করলেন এবং উকিলের সঙ্গে তাঁর বাড়ি ফিরে গেলেন। রাত্রে তাঁর বিষয় অনেক ভাবলাম; মনে হলো—এমন নিস্পৃহ, চিরসুখী, সদা সন্তুষ্ট, প্রফুল্লমুখ পুরুষ তো কখনো দেখিনি।

পরদিন ১৯ অক্টোবর। প্রাতে ছটার সময় উঠে স্বামীজীর প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে আটটা বেজে গেল, কিন্তু স্বামীজীর দেখা নেই। আর অপেক্ষা না করে আমি একটি বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী যেখানে ছিলেন সেখানে

গেলাম। গিয়ে দেখি এক মহাসভা; স্বামীজী বসে আছেন এবং কাছে অনেক সম্ভ্রান্ত উকিল ও বিদ্বান লোকের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। স্বামীজী কারো সঙ্গে ইংরেজীতে, কারো সঙ্গে সংস্কৃতে এবং কারো সঙ্গে হিন্দুস্থানীতে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর একটুমাত্র চিন্তা না করেই একেবারে দিচ্ছেন। আমার মতো কেউ কেউ হাক্সলীর ফিলজফিকে প্রামাণিক মনে করে তদবলম্বনে স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করতে উদ্যত। তিনি কিন্তু কাউকে ঠাট্টাচ্ছলে, কাউকে গম্ভীরভাবে যথাযথ উত্তর দিয়ে সকলকেই নিরস্ত করছেন। আমি গিয়ে প্রণাম করলাম এবং অবাক হয়ে বসে শুনতে লাগলাম—ভাবতে লাগলাম ইনি কি মানুষ, না দেবতা?

কোন গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ উকিল প্রশ্ন করলেন, "স্বামীজী, সন্ধ্যা-আহ্নিক প্রভৃতির মন্ত্রাদি সংস্কৃতভাষায় রচিত; আমরা সেগুলি বুঝি না। আমাদের ঐ সব মন্ত্রোচ্চারণের কিছু ফল আছে কি?"

স্বামীজী উত্তর করলেন, "অবশ্যই উত্তম ফল আছে; ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে ঐ কয়টি সংস্কৃত মন্ত্রাদি তো ইচ্ছা করলে অনায়াসে বুঝে নিতে পার, তথাপি নাও না। এ কার দোষ? আর যদি মন্ত্রের অর্থ নাই বুঝতে পার, যখন সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বস, তখন ধর্ম-কর্ম করছ মনে কর, না কিছু পাপ করছ মনে কর? যদি ধর্ম-কর্ম করছ মনে করে বস, তাহলে উত্তম ফল লাভ করতে তাই যথেষ্ট।"

অন্য একজন এই সময়ে সংস্কৃতে বললেন, "ধর্ম সম্বন্ধে কথোপকথন ম্লেচ্ছভাষায় করা উচিত নয়, অমুক পুরাণে এরূপ লেখা আছে।"

স্বামীজী উত্তর করলেন, "যে-কোন ভাষাতেই হোক ধর্মচর্চা করা যায়" এবং এই বাক্যের সমর্থনে শ্রুতি প্রভৃতির বচন প্রমাণস্বরূপ দিয়ে বললেন, "হাইকোর্টের নিষ্পত্তি নিম্ন আদালত দ্বারা খণ্ডন হতে পারে না।"

এইভাবে নটা বেজে গেল। যাঁদের অফিস বা কোর্টে যেতে হবে তাঁরা চলে গেলেন, কেউ বা তখনো বসে রইলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি আমার উপর পড়ায়, পূর্বদিনের চা খেতে যাবার কথা স্মরণ হওয়ায় বললেন, "বাবা, অনেক লোকের মন ক্ষুণ্ণ করে যেতে পারিনি, মনে কিছু করো না।" পরে আমি তাঁকে আমার বাসায় এসে থাকবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় অবশেষে বললেন, "আমি যাঁর অতিথি, তাঁর মত করতে পারলে আমি তোমারই কাছে থাকতে প্রস্তুত।" উকিলটিকে বিশেষ বুঝিয়ে স্বামীজীকে সঙ্গে নিয়ে আমার বাসায় এলাম। সঙ্গে মাত্র একটি কমণ্ডলু ও গেরুয়া কাপড়ে বাঁধা কাপড়ে বাঁধা একখানি পুস্তক। স্বামীজী তখন ফ্রান্স দেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করতেন। পরে বাসায় এসে দশটার সময় চা খাওয়া হলো; তার পরেই আবার এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলও চেয়ে খেলেন। আমার নিজের মনে যেসমস্ত কঠিন সমস্যা ছিল সেসকল তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে সহসা ভরসা হচ্ছে না বুঝতে পেরে তিনি নিজেই আমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দু-কথাতেই বুঝে নিলেন।

ইতিপূর্বে 'টাইমস' সংবাদপত্রে একজন একটি সুন্দর কবিতায় ঈশ্বর কি, কোন

ধর্ম সত্য প্রভৃতি তত্ত্ব বুঝে ওঠা অত্যন্ত কঠিন, লিখেছিলেন। সেই কবিতাটি আমার তখনকার ধর্মবিশ্বাসের সংগে ঠিক মিল হওয়ায় আমি তা যত্ন করে রেখেছিলাম ; তাই তাঁকে পড়তে দিলাম। পড়ে তিনি বললেন, "লোকটা গোলমালে পড়েছে।" আমারও ক্রমে সাহস বাড়তে লাগল। "ঈশ্বর দয়াময় ও ন্যায়বান, এককালে দুই-ই হতে পারেন না"—খ্রীস্টান মিশনরীদের সংগে এই তর্কের মীমাংসা হয়নি ; মনে করলাম এ সমস্যা-পূরণ স্বামীজীও করতে পারবেন না।

স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "তুমি তো Science (বিজ্ঞান) অনেক পড়েছ দেখছি। প্রত্যেক জড়পদার্থে দুটি opposite forces—centripetal and centrifugal কি act করে না ? যদি দুটি opposite forces (বিপরীত শক্তি) জড়বস্তুতে থাকা সম্ভব হয়, তাহলে দয়া ও ন্যায় opposite (বিপরীত) হলেও কি ঈশ্বরে থাকা সম্ভব নয় ? All I can say is that you have a very poor idea of your God."

আমি তো নিস্তব্ধ। আমার পূর্ণ বিশ্বাস—Truth is abosolute (সত্য নিরপেক্ষ)। সমস্ত ধর্ম কখনো এককালে সত্য হতে পারে না। তিনি সে-সব প্রশ্নের উত্তরে বললেন ঃ

"আমরা যে বিষয়ে যা কিছু সত্য বলে জানি বা পরে জানব, সেসকলই আপেক্ষিক সত্য (Relative truths). Absolute truth-এর (নিরপেক্ষ সত্যের) ধারণা করা আমাদের সীমাবদ্ধ মন-বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। অতএব সত্য Absolute (নিরপেক্ষ) হলেও বিভিন্ন মন-বুদ্ধির নিকট বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি নিত্য (Absolute) সত্যকে অবলম্বন করেই প্রকাশিত থাকে বলে সবগুলিই এক দরের বা এক শ্রেণীর। যেমন দূর এবং সন্নিকট স্থান থেকে photograph (ফোটো) নিলে একই সূর্যের ছবি নানারূপ দেখায়, মনে হয়—প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন সূর্যের—সেরূপ আপেক্ষিক সত্য (Relative truth)-সকল, নিত্য সত্যের (Absolute truth) সম্পর্কে ঠিক ঐ ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্মই নিত্য সত্যের আভাস বলে সত্য।"

বিশ্বাসই ধর্মের মূল বলায় স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করে বললেন, "রাজা হলে আর খাওয়া-পরার কষ্ট থাকে না, কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন ; বিশ্বাস কি কখনো জোর করে হয় ? অনুভব না হলে ঠিক ঠিক বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব।" কোন কথাপ্রসংগে তাঁকে 'সাধু' বলায় তিনি উত্তর করলেন, "আমরা কি সাধু ? এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁদের দর্শন বা স্পর্শমাত্রেই দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়।"

"সন্ন্যাসীরা এরূপ অলস হয়ে কেন কালক্ষেপ করেন ? অপরের সাহায্যের উপর কেন নির্ভর করে থাকেন ? সমাজের হিতকর কোন কাজকর্ম কেন করেন না ?" প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বললেন, "আচ্ছা, বল দেখি—তুমি এত কষ্টে অর্থ উপার্জন করছ, তার যৎসামান্য অংশ কেবল নিজের জন্য খরচ করছ ; বাকি অন্য

কতকগুলি লোককে আপনার মনে করে তাদের জন্য খরচ করছ। তারা সেজন্য না তোমার কৃত উপকার মানে, না যা ব্যয় কর তাতে সন্তুষ্ট! বাকি যখের মতো প্রাণপণে জমাচ্ছ; তুমি মরে গেলে অন্য কেউ তা ভোগ করবে, আর হয়তো আরো টাকা রেখে যাওনি বলে গাল দেবে। এই তো গেল তোমার হাল। আর আমি ওসব কিছু করি না। ক্ষুধা পেলে পেট চাপড়ে, হাত মুখে তুলে দেখাই; যা পাই, তা খাই; কিছুই কষ্ট করি না, কিছুই সংগ্রহ করি না। আমাদের ভিতর কে বুদ্ধিমান?—তুমি না আমি?" আমি তো শুনে অবাক, এর পূর্বে আমার সম্মুখে এরূপ স্পষ্ট কথা বলতে তো কারও সাহস দেখিনি।

আহারাদি করে একটু বিশ্রামের পর পুনরায় সেই বন্ধু উকিলটির বাসায় যাওয়া হলো ও সেখানে অনেক বাদানুবাদ ও কথোপকথন চলল। রাত্রি নটার সময় স্বামীজীকে নিয়ে পুনরায় আমার বাসায় ফিরলাম। আসতে আসতে বললাম, "স্বামীজী, আপনার আজ তর্কবিতর্কে অনেক কষ্ট হয়েছে।"

তিনি বললেন, "বাবা, তোমরা যেরূপ utilitarian (উপযোগবাদী), যদি আমি চুপ করে বসে থাকি, তাহলে তোমরা কি আমাকে এক মুঠো খেতে দেবে? আমি এইরূপ গলগল করে বকি, লোকের শুনে আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেনো, যেসব লোক সভায় তর্কবিতর্ক করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তারা বাস্তবিক সত্য জানবার ইচ্ছায় ওরূপ করে না। আমিও বুঝতে পারি, কে কি ভাবে কি কথা বলে এবং তাকে সেইরূপ উত্তর দিই।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা স্বামীজী, সকল প্রশ্নের অমন চোখা চোখা উত্তর আপনার তখনি যোগায় কি ভাবে?"

তিনি বললেন, "ঐ সকল প্রশ্ন তোমাদের পক্ষে নূতন; কিন্তু আমাকে কত লোকে কতবার ঐ প্রশ্নসকল জিজ্ঞাসা করেছে, আর সেগুলির কতবার উত্তর দিয়েছি।"

রাত্রে আহার করতে বসে আবার কত কথা বললেন। পয়সা না ছুঁয়ে দেশভ্রমণে কত জায়গায় কত কি ঘটনা ঘটেছে, সেসব বলতে লাগলেন। শুনতে শুনতে আমার মনে হলো—আহা! ইনি কতই কষ্ট, কতই উৎপাত না জানি সহ্য করেছেন! কিন্তু তিনি সেসব যেন কত মজার কথা, এইরূপ ভাবে হাসতে হাসতে সব বলতে লাগলেন। কোথাও তিন দিন উপবাস, কোন স্থানে লঙ্কা খেয়ে এমন পেটজ্বালা যে, এক বাটি তেঁতুল গোলা খেয়েও থামে না, কোথাও "এখানে সাধু-সন্ন্যাসী জায়গা পায় না"—এই বলে অপরের তাড়না, বা গুপ্ত পুলিসের সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি প্রভৃতি, যা শুনলে আমাদের গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়, সেইসব ঘটনা তাঁর পক্ষে যেন তামাসামাত্র।

রাত্রি অনেক হয়েছে দেখে তাঁর বিছানা করে দিয়ে আমিও ঘুমোতে গেলাম, কিন্তু সে রাত্রে আর ঘুম হলো না। ভাবতে লাগলাম, এত বৎসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্বামীজীকে দেখে ও তাঁর দুই-চার কথা শুনেই সব দূর হলো! আর জিজ্ঞাসা করবার কিছুই নেই। ক্রমে যত দিন যেতে লাগল, আমাদের কেন—আমাদের চাকর-বাকরেরও

তাঁর প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা হলো যে, তাদের সেবায় ও আগ্রহে স্বামীজীকে সময়ে সময়ে বিরক্ত হতে হতো।

২০ অক্টোবর। সকালে উঠে স্বামীজীকে নমস্কার করলাম। এখন সাহস বেড়েছে, ভক্তিও হয়েছে। স্বামীজীও অনেক বন, নদী, অরণ্যের বিবরণ আমার কাছে শুনে সন্তুষ্ট হয়েছেন। এই শহরে আজ তাঁর চার দিন বাস হলো। পঞ্চম দিনে তিনি বললেন, "সন্ন্যাসীদের নগরে তিন দিনের বেশি ও গ্রামে এক দিনের বেশি থাকতে নেই। আমি শীঘ্রই যেতে ইচ্ছা করছি।" কিন্তু আমি ও-কথা কোনমতেই শুনব না, তর্ক করে তা বুঝিয়ে দিতে চাই। পরে অনেক বাদানুবাদের পর বললেন, "এক স্থানে বেশি দিন থাকলে মায়া মমতা বেড়ে যায়। আমরা গৃহ ও আত্মীয়বন্ধু ত্যাগ করেছি সেইরূপ মায়ায় মুগ্ধ হবার যত উপায় আছে, তা থেকে দূরে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল।"

আমি বললাম, "আপনি কখনো মুগ্ধ হবার নন।" শেষে আমার অতিশয় আগ্রহ দেখে আরও দু-চার দিন থাকতে স্বীকার করলেন। ইতিমধ্যে আমার মনে হলো, স্বামীজী যদি সাধারণের জন্য বক্তৃতা দেন, তাহলে আমরাও তাঁর লেকচার শুনি এবং অপর কত লোকেরও কল্যাণ হয়। অনেক অনুরোধ করলাম, কিন্তু লেকচার দিলে হয়তো নামযশের ইচ্ছা হবে, এই বলে তিনি কোনমতে তাতে স্বীকৃত হলেন না। তবে সভায় প্রশ্নের উত্তর দান (conversational meeting) করতে তাঁর কোন আপত্তি নেই, এ কথা জানালেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী Pickwick Papers[১] থেকে দু-তিন পাতা মুখস্থ বললেন। আমি তা অনেকবার পড়েছি, বুঝলাম—পুস্তকের কোন্ স্থান থেকে তিনি আবৃত্তি করলেন। শুনে আমার বিশেষ আশ্চর্য বোধ হলো। ভাবলাম, সন্ন্যাসী হয়ে সামাজিক গ্রন্থ থেকে কি করে এতটা মুখস্থ করলেন? পূর্বে বোধ হয় অনেকবার ঐ পুস্তক পড়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "দুবার পড়েছি—একবার স্কুলে পড়বার সময় ও আজ পাঁচ-ছয় মাস হলো আর একবার।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "তবে কেমন করে স্মরণ রইল? আমাদের কেন থাকে না?"

স্বামীজী বললেন, "একান্ত মনে পড়া চাই; আর খাদ্যের সারভাগ থেকে প্রস্তুত রেতের অপচয় না করে পুনরায় তা assimilate করা চাই।"

আর একদিন স্বামীজী মধ্যাহ্নে একাকী বিছানায় শুয়ে একখানি পুস্তক নিয়ে পড়ছিলেন। আমি অন্য ঘরে ছিলাম। হঠাৎ এরূপ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন যে, আমি এ হাসির বিশেষ কোন কারণ আছে ভেবে তাঁর ঘরের দরজার কাছে এসে

১ চার্লস ডিকেন্স লিখিত উপন্যাস

উপস্থিত হলাম। দেখলাম বিশেষ কিছু হয়নি। তিনি যেমন বই পড়ছিলেন, তেমনি পড়ছেন। প্রায় পনের মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম, তথাপি তিনি আমায় দেখতে পেলেন না। বই ছাড়া অন্য কোন দিকে তাঁর মন নেই। পরে আমাকে দেখে ভিতরে আসতে বললেন এবং আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি শুনে বললেন, "যখন যে কাজ করতে হয়, তখন তা একমনে, একপ্রাণে—সমস্ত ক্ষমতার সঙ্গে করতে হয়। গাজিপুরের পওহারী বাবা ধ্যান-জপ পূজা-পাঠ যেমন একমনে করতেন, তাঁর পিতলের ঘটিটি মাজাও ঠিক তেমনি একমনে করতেন। এমনি মাজতেন যে, সোনার মতো দেখাত।"

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "স্বামীজী, চুরি করা পাপ কেন? সকলধর্মে চুরি করতে নিষেধ করে কেন? আমার মনে হয়, 'এ আমাদের', 'এ অপরের'—ইত্যাদি মনে করা কেবল কল্পনামাত্র। কই, আমায় না জানিয়ে আমার আত্মীয়-বন্ধু কেউ আমার কোন দ্রব্য ব্যবহার করলে তো তা চুরি করা হয় না। তারপর পশু-পক্ষী-আদি আমাদের কোন জিনিস নষ্ট করলে তাকেও তো চুরি বলি না।"

স্বামীজী বললেন, "অবশ্য সর্বাবস্থায় সকল সময়ে মন্দ এবং পাপ বলে গণ্য হতে পারে, এমন কোন জিনিস বা কার্য নেই। আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেক জিনিস মন্দ এবং প্রত্যেক কার্যই পাপ বলে গণ্য হতে পারে। তবে যাতে অপর কারো কোন প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয় এবং যা করলে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার দুর্বলতা আসে, সে কর্ম করবে না; এই পাপ, আর তদ্বিপরীত কর্মই পুণ্য। মনে কর, তোমার কোন জিনিস কেউ চুরি করলে তোমার দুঃখ হয় কিনা? তোমার যেমন, সমস্ত জগতেরও তেমনি জানবে। এই দু-দিনের জগতে সামান্য কিছুর জন্য যদি তুমি এক প্রাণীকে দুঃখ দিতে পার, তা হলে ক্রমে ক্রমে ভবিষ্যতে তুমি কি মন্দ কর্ম না করতে পারবে? আবার পাপ-পুণ্য না থাকলে সমাজ চলে না। সমাজে থাকতে হলে তার নিয়মাদি পালন করা চাই। বনে গিয়ে উলঙ্গ হয়ে নাচ ক্ষতি নেই—কেউ তোমাকে কিছু বলবে না; কিন্তু শহরে ঐরূপ করলে পুলিস দিয়ে ধরিয়ে তোমায় কোন নির্জন স্থানে বন্ধ করে রাখাই উচিত।"

স্বামীজী অনেক সময় ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভিতর দিয়ে বিশেষ শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হলেও তাঁর কাছে বসে থাকা মাস্টারের কাছে বসার মতো ছিল না। খুব রঙ্গরস চলছে; বালকের মতো হাসতে হাসতে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কইছেন, সকলকে হাসাচ্ছেন; আবার তখনই এমনি গম্ভীরভাবে জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করতেন যে, উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে ভাবত—এঁর ভিতর এত শক্তি! এই তো দেখছিলাম, আমাদের মতোই একজন। সব সময়েই তাঁর কাছে লোকে শিক্ষা নিতে আসত। সব সময়েই তাঁর দ্বার অবারিত ছিল। নানা লোকে নানা ভাবেও আসত—কেউ বা তাঁকে পরীক্ষা করতে, কেউ বা খোশগল্প শুনতে, কেউ বা তাঁর কাছে এলে অনেক ধনী বড়লোকের সঙ্গে আলাপ করতে পারবে বলে আবার

কেউ বা সংসার-তাপে জর্জরিত হয়ে তাঁর কাছে দুই দণ্ড জুড়োবে এবং জ্ঞান ও ধর্ম লাভ করবে বলে। কিন্তু তাঁর এমনি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যে যে-ভাবেই আসুক না কেন, তিনি তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারতেন এবং তাঁর সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করতেন। তাঁর মর্মভেদী দৃষ্টির হাত থেকে কারও এড়াবার বা কিছু গোপন করবার সাধ্য ছিল না। এক সময়ে কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর একমাত্র সন্তান ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা এড়াবে বলে স্বামীজীর কাছে ঘন ঘন আসতে লাগল এবং সাধু হবে, এই ভাব প্রকাশ করতে লাগল। সে আবার আমার এক বন্ধুর পুত্র। আমি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ঐ ছেলেটি আপনার কাছে কি মতলবে এত বেশি বেশি আসে? ওকে কি সন্ন্যাসী হতে উপদেশ দেবেন? ওর বাপ আমার একজন বন্ধু।"

স্বামীজী বললেন, "ওর পরীক্ষা কাছে, পরীক্ষা দেবার ভয়ে সাধু হবার ইচ্ছা। আমি ওকে বলেছি, এম্-এ. পাশ করে সাধু হতে এস। বরং এম্-এ. পাশ করা সহজ, কিন্তু সাধু হওয়া তার চেয়ে কঠিন।"

স্বামীজী আমার বাসায় যতদিন ছিলেন, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় তাঁর কথোপকথন শুনতে যেন সভা বসে যেত, এতই অধিক লোকসমাগম হতো। ঐ সময় একদিন আমার বাসায় একটি চন্দনগাছের তলায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন, জন্মেও তা ভুলতে পারব না। সে প্রসঙ্গের উত্থাপনে অনেক কথা বলতে হবে।

কিছু পূর্ব থেকে আমার স্ত্রীর ইচ্ছা হয়, গুরুর কাছে মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করে। আমার তাতে আপত্তি ছিল না। তবে আমি তাকে বলেছিলাম, "এমন লোককে গুরু করো, যাঁকে আমিও ভক্তি করতে পারি। গুরু বাড়ি ঢুকলেই যদি আমার ভাবান্তর হয়, তাহলে তোমার কিছুই আনন্দ বা উপকার হবে না। কোন সৎপুরুষকে যদি গুরুরূপে পাই, তাহলে উভয়ে মন্ত্র নেব, নতুবা নয়।" সেও তা স্বীকার করে। স্বামীজীর আগমনে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই সন্ন্যাসী যদি তোমার গুরু হন, তাহলে তুমি শিষ্যা হতে ইচ্ছা কর কি?" সেও সাগ্রহে বলল, "উনি কি গুরু হবেন? হলে তো আমরা কৃতার্থ হই।"

স্বামীজীকে একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "স্বামীজী, আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করবেন?" স্বামীজী প্রার্থনা জানাবার আদেশ করতে আমাদের উভয়কে দীক্ষা দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, "গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল।" গুরু হওয়া বড় কঠিন, শিষ্যের সমস্ত ভার গ্রহণ করতে হয়, দীক্ষার পূর্বে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের অন্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক—প্রভৃতি নানা কথা বলে আমায় নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন। যখন দেখলেন, আমি কোনপ্রকারে ছাড়বার নই, তখন অগত্যা স্বীকার করলেন এবং ২৫ অক্টোবর, ১৮৯২ আমাদের দীক্ষাপ্রদান করলেন। তখন আমার ভারি ইচ্ছা হলো, স্বামীজীর ফোটো তুলে নিই। তিনি সহজে স্বীকৃত হলেন না। পরে অনেক বাদানুবাদের পরে আমার অত্যন্ত

আগ্রহ দেখে ২৮ তারিখে ফোটো তোলাতে সম্মত হলেন এবং ফোটো নেওয়া হলো। ইতিপূর্বে তিনি এক ব্যক্তির আগ্রহসত্ত্বেও ফোটো তুলতে দেন-নি বলে দুই কপি ফোটো তাকে পাঠিয়ে দেবার কথা আমাকে বললেন। আমিও সে-কথা সানন্দে স্বীকার করলাম।

একদিন স্বামীজী বললেন, "তোমার সঙ্গে জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে আমার কিছুদিন থাকবার ইচ্ছা। কিন্তু শিকাগোয় ধর্মসভা হবে, যদি তাতে যাবার সুবিধা হয় তো সেখানে যাব।" আমি চাঁদার লিস্ট করে টাকাসংগ্রহের প্রস্তাব করায় তিনি কি ভেবে স্বীকার করলেন না। সে-সময় স্বামীজীর ব্রতই ছিল, টাকাকড়ি স্পর্শ বা গ্রহণ করবেন না। আমি অনেক অনুরোধ করে তাঁর মারহাট্টি জুতোর পরিবর্তে এক জোড়া জুতো ও একগাছি বেতের ছড়ি দিয়েছিলাম। ইতিপূর্বে কোলাপুরের রানী অনেক অনুরোধ করেও স্বামীজীকে কিছুই গ্রহণ করাতে না পেরে অবশেষে দুখানি গেরুয়া বস্ত্র পাঠিয়ে দেন। স্বামীজীও গেরুয়া দুখানি গ্রহণ করে যে বস্ত্রগুলি পরিধান করেছিলেন, সেগুলি সেইখানেই ত্যাগ করেন এবং বলেন, সন্ন্যাসীর বোঝা যত কম হয় ততই ভাল।

ইতিপূর্বে আমি ভগবদ্গীতা অনেকবার পড়তে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু বুঝতে না পারায় পরিশেষে তাতে বুঝবার বড় কিছু নেই মনে করে ছেড়ে দিয়েছিলাম। স্বামীজী গীতা নিয়ে আমাদের একদিন বোঝাতে লাগলেন। তখন দেখলাম, কি অদ্ভুত গ্রন্থ! গীতার মর্ম গ্রহণ করতে তাঁর কাছে যেমন শিখেছিলাম, তেমনি আবার অন্যদিকে জুল ভার্ন (Jules Verne)-এর Scientific Novels এবং কার্লাইল (Carlyle)-এর Sartor Resartus তাঁর কাছেই পড়তে শিখি।

তখন স্বাস্থ্যের জন্য ঔষধাদি অনেক ব্যবহার করতাম। সেকথা জানতে পেরে একদিন তিনি বললেন, "যখন দেখবে কোন রোগ এত প্রবল হয়েছে যে শয্যাশায়ী করেছে, আর উঠবার শক্তি নেই, তখনই ঔষধ খাবে, নতুবা নয়। Nervous debility (স্নায়বিক দুর্বলতা) প্রভৃতি রোগের শতকরা ৯০টা কাল্পনিক। ঐ-সব রোগের হাত থেকে ডাক্তারেরা যত লোককে বাঁচান, তার চাইতে বেশি লোককে মারেন। আর ওরূপ সর্বদা রোগ রোগ করেই বা কি হবে? যত দিন বাঁচো আনন্দে কাটাও। তবে যে আনন্দে একবার সন্তাপ এসেছে, তা আর করো না। তোমার আমার মতো একটা মরলে পৃথিবীও আপনার কেন্দ্র থেকে দূরে যাবে না, বা জগতের কোন বিষয়ের কিছু ব্যাঘাত হবে না।"

এই সময়ে আবার অনেক কারণবশতঃ উপরিস্থ কর্মচারী সাহেবদের সঙ্গে আমার বড় একটা বনত না। তাঁরা সামান্য কিছু বললে আমার মাথা গরম হয়ে উঠত এবং এমন ভাল চাকরি পেয়েও একদিনের জন্য সুখী হইনি। তাঁকে এ-সমস্ত কথা বলায় তিনি বললেন, "কিসের জন্য চাকরি করছ? বেতনের জন্য তো? বেতন তো মাসে মাসে ঠিক পাচ্ছ, তবে কেন মনে কষ্ট পাও? আর ইচ্ছা হলে যখন চাকরি

ছেড়ে দিতে পার, কেউ বেঁধে রাখেনি, তখন বিষম বন্ধনে পড়েছি ভেবে দুঃখের সংসারে আরও দুঃখ বাড়াও কেন ? আর এক কথা, বল দেখি, যার জন্য বেতন পাচ্ছ অফিসের সেই কাজগুলি করে দেওয়া ছাড়া তোমার উপরওয়ালা সাহেবদের সন্তুষ্ট করবার জন্য কখনো কিছু করেছ কি ? কখনো সেজন্য চেষ্টা করনি, অথচ তারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নয় বলে তাদের উপর বিরক্ত ! একি বুদ্ধিমানের কাজ ? জেনো, আমরা অন্যের উপর হৃদয়ের যে ভাব রাখি, তাই কাজে প্রকাশ পায় ; আর প্রকাশ না করলেও তাদের ভিতরে আমাদের উপর ঠিক সেই ভাবের উদয় হয়। আমাদের ভিতরকার ছবিই জগতে প্রকাশিত হয়েছে—আমরা দেখি। 'আপ্ ভালা তো জগৎ ভালা'—এ-কথা যে কতদূর সত্য কেউই জানে না। আজ থেকে মন্দটি দেখা একেবারে ছেড়ে দিতে চেষ্টা কর। দেখবে, যে পরিমাণে তুমি তা করতে পারবে, সেই পরিমাণে তাদের ভিতরের ভাব এবং কার্যও পরিবর্তিত হয়েছে।" বলা বাহুল্য, সেই দিন থেকে আমার ঔষধ খাবার বাতিক দূর হলো এবং অপরের উপর দোষদৃষ্টি ত্যাগ করতে চেষ্টা করায় ক্রমে জীবনের একটা নূতন পৃষ্ঠা খুলে গেল।

একবার স্বামীজীর কাছে ভালই বা কি এবং মন্দই বা কি—এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত করায় তিনি বললেন, "যা অভীষ্ট কার্যের সাধনভূত তাই ভাল ; আর যা তার প্রতিরোধক তাই মন্দ। ভাল-মন্দের বিচার আমরা জায়গা উঁচু-নিচু বিচারের ন্যায় করে থাকি। যত উপরে উঠবে তত দুই-ই এক হয়ে যাবে। চন্দ্রে পাহাড় ও সমতল আছে—বলে, কিন্তু আমরা সব এক দেখি, সেইরূপ।" স্বামীজীর এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল—যে যা কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, তার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ তাঁর ভিতর থেকে এমন যোগাত যে, মনের সন্দেহ একেবারে দূর হয়ে যেত।

আর একদিনের কথা—কলকাতায় একটি লোক অনাহারে মারা গেছে, খবরের কাগজে এই কথা পড়ে স্বামীজী এত দুঃখিত হয়েছিলেন যে, তা বলবার নয়। বার বার বলতে লাগলেন, "এইবার বা দেশটা উৎসন্ন যায়!" কেন—জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "দেখছ না, অন্যান্য দেশে কত poor-house, work-house, charity fund প্রভৃতি সত্ত্বেও শত শত লোক প্রতিবৎসর অনাহারে মরে, খবরের কাগজে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিন্তু এক মুষ্টিভিক্ষার পদ্ধতি থাকায় অনাহারে লোক মরতে কখনো শোনা যায়নি। আমি এই প্রথম কাগজে একথা পড়লাম যে, দুর্ভিক্ষ ভিন্ন অন্য সময়ে কলকাতায় অনাহারে লোক মরে।"

ইংরেজী শিক্ষার কৃপায় আমি দু-চার পয়সা ভিক্ষুককে দান করাটা অপব্যয় মনে করতাম। মনে হতো, ঐরূপে যৎসামান্য যা কিছু দান করা যায়, তাতে তাদের কোন উপকার তো হয়ই না, বরং বিনা পরিশ্রমে পয়সা পেয়ে, তা মদ-গাঁজায় খরচ করে তারা আরও অধঃপাতে যায়। লাভের মধ্যে দাতার কিছু মিছে খরচ বেড়ে যায়। সেজন্য আমার মনে হতো, অনেক লোককে কিছু কিছু দেওয়া অপেক্ষা একজনকে বেশি দেওয়া

ভাল। স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "ভিখারি এলে যদি শক্তি থাকে তো যা হয় কিছু দেওয়া ভাল। দেবে তো দু-একটি পয়সা ; সেজন্য সে কিসে খরচ করবে, সদ্ব্যয় হবে কি অপব্যয় হবে, এসব নিয়ে এতো মাথা ঘামাবার দরকার কি ? আর সত্যই যদি সেই পয়সা গাঁজা খেয়ে ওড়ায়, তা হলেও তাকে দেওয়ায় সমাজের লাভ বই লোকসান নেই। কেন না, তোমার মতো লোকেরা তাকে দয়া করে কিছু কিছু না দিলে সে তা তোমাদের কাছ থেকে চুরি করে নেবে। তা থেকে দুই পয়সা ভিক্ষা করে গাঁজা টেনে সে চুপ করে বসে থাকে, তা কি তোমাদেরই ভাল নয় ? অতএব ঐ-প্রকার দানেও সমাজের উপকার বই অপকার নেই।"

প্রথম থেকেই স্বামীজীকে বাল্যবিবাহের উপর ভারি চটা দেখেছি। সর্বদাই সকল লোককে বিশেষতঃ যুবকদের সাহস বেঁধে সমাজের এই কলঙ্কের বিপক্ষে দাঁড়াতে এবং উদ্যোগী হতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের প্রতি এরূপ অনুরাগও কোন মানুষের দেখিনি। পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফিরবার পর যাঁরা স্বামীজীর প্রথম দর্শন পেয়েছেন, তাঁরা জানেন না—সেখানে যাবার পূর্বে তিনি সন্ন্যাস-আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন করে, কাঞ্চনমাত্র স্পর্শ না করে কতকাল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করে বেড়াতেন। তাঁর মতো শক্তিমান পুরুষের এত বাঁধাবাঁধি নিয়মাদির আবশ্যক নেই— কোন লোক একবার এই কথা বলায় তিনি বলেন, "দেখ, মন বেটা বড় পাগল—ঘোর মাতাল, চুপ করে কখনই থাকে না, একটু সময় পেলেই আপনার পথে টেনে নিয়ে যাবে। সেইজন্য সকলেরই বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতরে থাকা আবশ্যক। সন্ন্যাসীরও সেই মনের উপর দখল রাখবার জন্য নিয়মে চলতে হয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর তাঁদের খুব দখল আছে। তবে ইচ্ছা করে কখনো একটু আলগা দেন মাত্র। কিন্তু কার কতটা দখল হয়েছে, তা একবার ধ্যান করতে বসলেই টের পাওয়া যায়। এক বিষয়ের উপর চিন্তা করব মনে করে বসলে দশ মিনিটও ঐ বিষয়ে একক্রমে মন স্থির রাখা যায় না। প্রত্যেকেই মনে করেন, তিনি স্ত্রৈণ নন, তবে আদর করে স্ত্রীকে আধিপত্য করতে দেন মাত্র। মনকে বশে রেখেছি মনে করাটা ঠিক ঐ রকম। মনকে বিশ্বাস করে কখন নিশ্চিন্ত থেকো না।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললাম, "স্বামীজী, দেখছি ধর্ম ঠিক ঠিক বুঝতে হলে অনেক লেখাপড়া জানা আবশ্যক।"

তিনি বললেন, "নিজে ধর্ম বুঝবার জন্য লেখাপড়ার আবশ্যক নেই। কিন্তু অন্যকে বোঝাতে হলে এর বিশেষ আবশ্যক। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব 'রামকেষ্ট' বলে সই করতেন, কিন্তু ধর্মের সারতত্ত্ব তাঁর অপেক্ষা কে বুঝেছিল ?"

আমার বিশ্বাস ছিল, সাধু-সন্ন্যাসীর স্থূলকায় ও সদা সন্তুষ্টচিত্ত হওয়া অসম্ভব। একদিন হাসতে হাসতে তাঁর দিকে কটাক্ষ করে ঐ কথা বলায় তিনিও বিদ্রূপচ্ছলে উত্তর করলেন, "এ-ই আমার Famine Insurance Fund—যদি পাঁচ-সাত দিন খেতে না পাই, তবু আমার চর্বি আমাকে জীবিত রাখবে। তোমরা একদিন না খেলেই

সব অন্ধকার দেখবে। আর যে ধর্ম মানুষকে সুখী করে না, তা বাস্তবিক ধর্ম নয়, dyspepsia (অজীর্ণতা)-প্রসূত রোগবিশেষ বলে জেনো।"

স্বামীজী সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন একটি গান আরম্ভও করেছিলেন, কিন্তু আমি 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস'; তারপর শুনবার আমার অবসরই বা কোথায় ? তাঁর কথা ও গল্পই আমাদের মোহিত করেছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁর বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুচার কথায় বুঝিয়ে দিতেন। আবার ধর্মবিষয়ক মীমাংসাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে ও দৃষ্টান্তে বিশদভাবে বোঝাতে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের যে একই লক্ষ্য—একই দিকে গতি, তাও দেখাতে তাঁর মতো ক্ষমতা আর কারও দেখিনি।

লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য তাঁর বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলেছিলেন, "পর্যটনকালে সন্ন্যাসীদের দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার দূষিত জল পান করতে হয়; তাতে শরীর খারাপ করে। এই দোষ নিবারণের জন্য তাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরস প্রভৃতি নেশা করে থাকে। আমিও সেজন্য এত লঙ্কা খাই।"

রাজোয়ারা ও খেতড়ির রাজা, কোলাপুরের ছত্রপতি ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজা-রাজড়া তাঁকে বিশেষ ভক্তি করতেন; তাঁদেরও তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। অসামান্য ত্যাগী হয়ে রাজা-রাজড়ার সঙ্গে অত মেশামিশি তিনি কেন করেন, এ-কথা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হতো না। কোন কোন নির্বোধ লোক এ-জন্য তাঁকে কটাক্ষ করতেও ছাড়ত না।

কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বললেন, "হাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়ে সৎকার্য করাতে পারলে যে ফল হবে, একজন শ্রীমান্ রাজাকে সেইদিকে আনতে পারলে তদপেক্ষা কত অধিক ফল হবে ভাব দেখি! গরিব প্রজার ইচ্ছা হলেও সৎকার্য করবার ক্ষমতা কোথায় ? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মঙ্গলবিধানের ক্ষমতা পূর্ব থেকেই রয়েছে, কেবল তা করবার ইচ্ছা নেই। সেই ইচ্ছা যদি কোনরূপে তার ভিতর একবার জাগিয়ে দিতে পারি, তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে তার অধীন সকল প্রজার অবস্থা ফিরে যাবে এবং জগতের কত বেশি কল্যাণ হবে।"

বাগ্‌বিতণ্ডায় ধর্ম নেই, ধর্ম অনুভব-প্রত্যক্ষের বিষয়, এই কথাটি বোঝাবার জন্য তিনি কথায় কথায় বলতেন, "Test of pudding lies in eating; অনুভব কর; তা না হলে কিছুই বুঝবে না।" তিনি কপট সন্ন্যাসীদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। বলতেন, ঘরে থেকে মনের উপর অধিকার স্থাপন করে তবে বাইরে যাওয়া ভাল; নতুবা নবানুরাগটুকু কমবার পর প্রায় গাঁজাখোর সন্ন্যাসীদের দলে মিশে পড়তে হয়।

আমি বললাম, কিন্তু ঘরে থেকে সেটি হওয়া যে অত্যন্ত কঠিন; সর্বভূতকে সমান চোখে দেখা, রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করা প্রভৃতি যে-সকল কাজ ধর্মলাভের প্রধান

সহায়—আপনি যা বলেন, তা যদি আমি আজ থেকে অনুষ্ঠান করতে থাকি, তবে কাল থেকে আমার চাকর ও অধীন কর্মচারিগণ এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দণ্ড শান্তিতে থাকতে দেবে না।

উত্তরে তিনি পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্প ও সন্ন্যাসীর গল্পটি বলে বললেন, কখনো ফোঁস ছেড়ো না, আর কর্তব্য পালন করছ মনে করে সকল কর্ম করো। কেউ দোষ করে, দণ্ড দেবে ; কিন্তু দণ্ড দিতে গিয়ে কখনো রাগ করো না। পরে পূর্বের প্রসঙ্গ পুনরায় উঠিয়ে বললেন :

"এক সময়ে আমি এক তীর্থস্থানের পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের অতিথি হয়েছিলাম ; লোকটির বেশ ধর্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাঁর বেতন একশো পঁচিশ টাকা, কিন্তু দেখলাম, তাঁর বাসার খরচ মাসে দু-তিনশো টাকা হবে। যখন বেশি জানাশোনা হলো, জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার তো আয় অপেক্ষা খরচ বেশি দেখছি—চলে কিরূপে ?' তিনি ঈষৎ হাস্য করে বললেন, 'আপনারাই চালান। এই তীর্থস্থলে যে-সকল সাধু-সন্ন্যাসী আসেন, তাঁদের ভিতরে সকলেই কিছু আপনার মতো নন। সন্দেহ হলে তাঁদের কাছে কি আছে না আছে, তল্লাস করে থাকি। অনেকের কাছে প্রচুর টাকাকড়ি বের হয়। যাদের চোর সন্দেহ করি, তারা টাকাকড়ি ফেলে পালায়, আর আমি সেই সমস্ত আত্মসাৎ করি। অপর ঘুষঘাস কিছু নিই না'।"

স্বামীজীর সঙ্গে একদিন 'অনন্ত' (Infinity) সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। সেই কথাটি বড়ই সুন্দর ও সত্য ; তিনি বললেন, "There can be no two infinities." আমি সময় অনন্ত (time is infinite) ও আকাশ অনন্ত (space is infinite) বলায় তিনি বলেন, "আকাশ অনন্তটা বুঝলাম, কিন্তু সময় অনন্তটা বুঝলাম না। যাই হোক, একটা পদার্থ অনন্ত, এ কথা বুঝি, কিন্তু দুটো জিনিস অনন্ত হলে কোন্‌টা কোথায় থাকে ? আর একটু এগোও, দেখবে—সময়ও যা, আকাশও তাই ; আরও অগ্রসর হয়ে বুঝবে, সকল পদার্থই অনন্ত, এবং সেইসকল অনন্ত পদার্থ একটা বই দুটো-দশটা নয়।"

এইরূপে স্বামীজীর পদার্পণে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত আমার বাসায় আনন্দের স্রোত বয়েছিল। ২৭ তারিখে বললেন, "আর থাকব না ; রামেশ্বর যাব মনে করে অনেক দিন হলো এই দিকে চলছি। যদি এইভাবে অগ্রসর হই, তাহলে এ জন্মে আর রামেশ্বর পৌঁছান হবে না।" আমি অনেক অনুরোধ করেও আর রাখতে পারলাম না। ২৭ অক্টোবর মেল ট্রেনে, তিনি মর্মাগোয়া যাত্রা করবেন, স্থির হলো। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কত লোককে মোহিত করেছিলেন, তা বলা যায় না। টিকিট কিনে তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। বললাম, "স্বামীজী, জীবনে আজ পর্যন্ত কাউকে আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করিনি, আজ আপনাকে প্রণাম করে কৃতার্থ হলাম।"

স্বামীজীর সঙ্গে আমার তিনবার মাত্র দেখা হয়। প্রথম—আমেরিকা যাবার পূর্বে; সেবারকার দেখার কথা অনেকটা বললাম। দ্বিতীয়—যখন তিনি দ্বিতীয়বার বিলেত এবং আমেরিকা যাত্রা করেন, তার কিছু পূর্বে। তৃতীয় এবং শেষবার দেখা হয়, তাঁর দেহত্যাগের ছয়-সাত মাস পূর্বে। এই কয়বারে তাঁর কাছে যা কিছু শিক্ষা করেছিলাম, তার আদ্যোপান্ত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। যা মনে আছে, তার ভেতর সাধারণ পাঠকের উপযোগী বিষয়গুলি জানাতে চেষ্টা করব।

বিলেত থেকে ফিরে এসেই তিনি হিন্দুদের জাতিবিচার সম্বন্ধে ও কোন কোন সম্প্রদায়ের ব্যবহারের উপর তীব্র কটাক্ষ করে যে বক্তৃতাগুলি মাদ্রাজে দিয়েছিলেন, তা পাঠ করে আমি মনে করেছিলাম, স্বামীজীর ভাষাটা একটু বেশি কড়া হয়েছে। তাঁর কাছে সেকথা প্রকাশও করেছিলাম। শুনে তিনি বললেন, যা কিছু বলেছি, সমস্ত সত্য। আর যাদের সম্বন্ধে ঐ ভাষা ব্যবহার করেছি তাদের কাজের তুলনায় তা বিন্দুমাত্রও বেশি কড়া নয়। সত্য কথার সঙ্কোচ বা গোপন করার তো কোন কারণ দেখি না; তবে ঐরূপ কার্যের ঐরূপ সমালোচনা করেছি বলে মনে করো না যে, তাঁদের উপর আমার রাগ ছিল বা আছে অথবা কেউ কেউ যেমন ভেবে থাকেন, কর্তব্যবোধে যা করেছি, তার জন্য এখন আমি দুঃখিত। ও কথার একটাও সত্য নয়। আমি রেগেও ঐ কাজ করিনি এবং করেছি বলেও দুঃখিত নই। এখনো যদি ঐরূপ কোন অপ্রিয় কাজ করা কর্তব্য বলে মনে হয়, তাহলে এখনো ঐরূপ নিঃসঙ্কোচে তা নিশ্চয় করব

ভণ্ড সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আর একদিন কথা ওঠায় বললেন, "অবশ্য অনেক বদমায়েস লোক ওয়ারেণ্টের ভয়ে কিংবা উৎকট দুষ্কর্ম করে লুকোবার জন্য সন্ন্যাসীর বেশে বেড়ায় সত্য; কিন্তু তোমাদেরও একটু দোষ আছে। তোমরা মনে কর, কেউ সন্ন্যাসী হলেই তার ঈশ্বরের মতো ত্রিগুণাতীত হওয়া চাই। সে পেট ভরে ভাল খেলে দোষ, বিছানায় শুলে দোষ, এমনকি জুতো বা ছাতি পর্যন্ত তার ব্যবহার করার জো নেই। কেন, তারাও তো মানুষ, তোমাদের মতে পূর্ণ পরমহংস না হলে তার আর গেরুয়া বস্ত্র পরবার অধিকার নেই—এও ভুল। এক সময়ে আমার একটি সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ হয়। তাঁর ভাল পোশাকের উপর ভারি ঝোঁক। তোমরা তাঁকে দেখলে নিশ্চয়ই ঘোর বিলাসী মনে করবে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী।"

স্বামীজী বলতেন, "দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে মানসিকভাব ও অনুভবের অনেক তারতম্য হয়। ধর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রত্যেক মানুষেরই আবার একটা-না-একটা বিষয়ে বেশি ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায়। জগতে সকলেই আপনাকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করে। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমিই কেবল বুঝি, অন্যে বোঝে না, এতেই যত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। প্রত্যেকেই চায়, প্রত্যেক বিষয়টা অপর সকলে তারই মতো দেখুক ও বুঝুক। সে যেটা সত্য বুঝেছে বা যা জেনেছে, সেটা ছাড়া আর কোন সত্য

থাকতে পারে না। সাংসারিক বিষয়েই হোক বা ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন বিষয়েই হোক, ওরূপ ভাব কোন মতে মনে আসতে দেওয়া উচিত নয়।

"জগতের কোন বিষয়েই সকলের উপর এক আইন খাটে না। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে মানুষের নীতি এবং সৌন্দর্যবোধও বিভিন্ন দেখা যায়। তিব্বতে এক স্ত্রীলোকের বহু পতি থাকার প্রথা প্রচলিত আছে। হিমালয়ে ভ্রমণকালে আমার ঐরূপ একটি তিব্বতীয় পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। ঐ পরিবারে ছয়জন পুরুষ এবং ঐ ছয়জনের একমাত্র স্ত্রী ছিল। ক্রমে পরিচয় গাঢ় হলে আমি একদিন তাদের ঐ কুপ্রথা সম্বন্ধে বলায় তারা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'তুমি সাধু সন্ন্যাসী হয়ে লোককে স্বার্থপরতা শেখাতে চাইছ? এটি আমারই উপভোগ্য, অন্যের নয়—এরূপ ভাবা কি অন্যায় নয়?' আমি তো শুনে অবাক।

"নাসিকা এবং পায়ের খর্বতা নিয়েই চীনের সৌন্দর্য বিচার, একথা সকলেরই জানা আছে। আহারাদি সম্বন্ধেও ঐরূপ। ইংরেজ আমাদের মতো সুবাসিত চালের অন্ন ভালবাসে না। এক সময়ে কোন স্থানের জজসাহেবের অন্যত্র বদলি হওয়ায় সেখানকার কতকগুলি উকিল মোক্তার, তাঁর সম্মানে উত্তম সিধা পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে কয়েক সের সুবাসিত চাল ছিল। জজসাহেব সুবাসিত চালের ভাত খেয়ে পচা চাল মনে করেন এবং উকিলদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বলেন, 'You ought not to have given me rotten rice' (তোমাদের পচা চালগুলি আমাকে উপঢৌকন দেওয়া ভাল হয়নি।)

"কোন এক সময়ে ট্রেনে যাচ্ছিলাম; সেই কামরায় চার-পাঁচটি সাহেব ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তামাকের বিষয়ে আমি বললাম, 'সুবাসিত গুড়ুক তামাক জলপূর্ণ হুঁকায় ব্যবহার করাই তামাক সেবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ।' আমার কাছে খুব ভাল তামাক ছিল, তাদের দেখতেও দিলাম। তারা আঘ্রাণ নিয়েই বলল, 'এতো অতি দুর্গন্ধ। একে তুমি সুগন্ধ বল?' এই ভাবে গন্ধ, আস্বাদ, সৌন্দর্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমাজ দেশ কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত।"

আপনার মত বজায় রাখতে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ জেদ দেখা যায়। ধর্মমত সম্বন্ধে আবার তার বিশেষ প্রকাশ। স্বামীজী ঐ সম্বন্ধে একটি গল্প বলতেন: এক সময়ে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করবার জন্য অন্য এক রাজা সদলবলে উপস্থিত হলো। কাজেই, শত্রুর হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় স্থির করবার জন্য সেই রাজ্যে এক মহাসভা আহূত হলো। সভায় ইঞ্জিনিয়ার, সূত্রধর, চর্মকার, কর্মকার, উকিল, পুরোহিত প্রভৃতি সভাসদগণ উপস্থিত হলেন। ইঞ্জিনিয়ার বললেন, "শহরের চারিদিকে বেড় দিয়ে এক বৃহৎ খাল খনন কর।" সূত্রধর বলল, "কাঠের দেওয়াল দেওয়া যাক।" চামার বলল, "চামড়ার মতো মজবুত কিছুই নেই; চামড়ার বেড়া দাও।" কামার বলল, "ও সব কাজের কথা নয়; লোহার দেওয়ালই ভাল; ভেদ করে গুলি-গোলা আসতে পারবে না।" উকিল বললেন, "কিছুই করবার দরকার নেই; আমাদের রাজ্য নেবার শত্রুদের কোন অধিকার নেই—এই কথাটি তাদের তর্কযুক্তি

দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া যাক।” পুরোহিত বললেন, “তোমরা সকলেই বাতুলের মতো প্রলাপ বকছ। হোম, যাগ কর, স্বস্ত্যয়ন কর, তুলসী দাও, শত্রুরা কিছুই করতে পারবে না।” এইভাবে রাজ্য বাঁচাবার কোন উপায় স্থির না করে তারা নিজ নিজ মত নিয়ে মহা হুলস্থূল তর্ক আরম্ভ করল। এই রকম করাই মানুষের স্বভাব।

এই গল্পটি শুনে আমারও মানুষের মনের একঘেয়ে ঝোঁক সম্বন্ধে একটি কথা মনে পড়ল। স্বামীজীকে বললাম, “স্বামীজী, আমি ছেলেবেলায় পাগলের সঙ্গে আলাপ করতে ভারি ভালবাসতাম। একদিন একটি পাগল দেখলাম, বেশ বুদ্ধিমান; ইংরেজীও একটু-আধটু জানে; তার চাই কেবল জল খাওয়া। সঙ্গে একটি ভাঙা ঘটি। যেখানে জল পায়, খাল হোক, হোউজ[২] হোক, নূতন একটা জলের জায়গা দেখলেই সেখানকার জল পান করত। আমি তাকে এত জল খাবার কারণ জিজ্ঞাসায় বলল, ‘Nothing like water, sir!’ (জলের মতো কোন জিনিসই নেই, মশাই।) তাকে আমি একটি ভাল ঘটি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম, সে কোনমতে নিল না। কারণ জিজ্ঞাসায় বলল, ‘এটি ভাঙা ঘটি বলেই এতদিন আছে। ভাল হলে অন্যে চুরি করে নিত’।”

স্বামীজী গল্প শুনে বললেন, “সে তো বেশ মজার পাগল! ওদের Monomaniac বলে। আমাদের সকলেরই ঐ রকম এক-একটা ঝোঁক আছে। আমাদের সেটা চেপে রাখবার ক্ষমতা আছে, পাগলের তা নেই। পাগলের সঙ্গে আমাদের এইটুকু মাত্র প্রভেদ। রোগ-শোক-অহঙ্কারে, কাম-ক্রোধ-হিংসায় বা অন্য কোন অত্যাচার বা অনাচারে মানুষ দুর্বল হয়ে ঐ সংযমটুকু হারালেই মুস্কিল। মনের আবেগ আর চাপতে পারে না। আমরা তখনি বলি, ও ব্যাটা খেপেছে, এই আর কি!”

স্বামীজীর স্বদেশানুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল; এ কথা পূর্বেই বলেছি। একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হলে তাঁকে বলা হয় যে, সংসারী লোকের আপন আপন দেশের প্রতি অনুরাগ নিত্যকর্তব্য হলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করা এবং সকল দেশের উপর সমদৃষ্টি অবলম্বন করে সকল দেশের কল্যাণচিন্তা হৃদয়ে রাখা ভাল। ঐ কথার উত্তরে স্বামীজী যে জ্বলন্ত কথাগুলি বলেন, তা কখনো জন্মেও ভুলতে পারব না। তিনি বললেন, “যে আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অন্যের মাকে আবার কি পুষবে?”

আমাদের প্রচলিত ধর্মে, আচার-ব্যবহারে, সামাজিক প্রথায় যে অনেক দোষ আছে, স্বামীজী একথা স্বীকার করতেন, বলতেন, “সে-সকল সংশোধন করবার চেষ্টা করা আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য; কিন্তু তাই বলে সংবাদপত্রে ইংরেজের কাছে সে-সকল ঘোষণা করবার আবশ্যক কি? ঘরের গলদ বাইরে যে দেখায়, তার মতো গর্দভ আর

২ ক্ষুদ্র জলাশয়

কে আছে? Dirty linen must not be exposed in the street. (ময়লা কাপড়-চোপড় রাস্তার ধারে, লোকের চোখের সামনে রাখাটা উচিত নয়)।"

খ্রীস্টান মিশনরীগণের সম্বন্ধে একদিন কথাবার্তা হয়। তাঁরা আমাদের দেশে কত উপকার করেছেন ও করছেন, প্রসঙ্গক্রমে আমি এই কথা বলি। শুনে তিনি বললেন, "কিন্তু অপকারও বড় কম করেননি। দেশের লোকের মনের শ্রদ্ধাটি একেবারে গোল্লায় দেবার বিলক্ষণ যোগাড় করেছেন। শ্রদ্ধানাশের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও নাশ হয়। একথা কেউ কি বোঝে? আমাদের দেবদেবীর নিন্দা, আমাদের ধর্মের কুৎসা না করে কি তাঁদের নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান যায় না? আর এক কথা, যিনি যে ধর্মমত প্রচার করতে চান, তাঁর তাতে পূর্ণ বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কার্য করা চাই। অধিকাংশ মিশনরী মুখে এক, কাজে আর। আমি কপটতার উপর ভারি চটা।"

একদিন ধর্ম ও যোগ সম্বন্ধে অনেক কথা অতি সুন্দরভাবে বলেছিলেন। তার মর্ম যতদূর মনে আছে, এইখানে লিখলাম ঃ

সকল প্রাণীই সতত সুখী হবার চেষ্টায় বিব্রত। কিন্তু খুব কম লোকেই সুখী। কাজকর্মও সকলে অনবরত করছে; কিন্তু তার অভিলষিত ফল পাওয়া প্রায় দেখা যায় না। এরূপ বিপরীত ফল পাবার কারণ কি, তাও সকলে বুঝবার চেষ্টা করে না। সেইজন্যই মানুষ দুঃখ পায়। ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস হোক না কেন, কেউ যদি ঐ বিশ্বাসবলে আপনাকে যথার্থ সুখী বলে অনুভব করে, তাহলে তার ঐ মত পরিবর্তন করবার চেষ্টা করা কারও উচিত নয় এবং করলেও তাতে সুফল ফলে না। তবে, মুখে যে যাই বলুক না কেন যখন দেখবে, কারও ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা শুনবার কেবলমাত্র আগ্রহ আছে, তার কোনকিছু অনুষ্ঠানের চেষ্টা নেই তখনই জানবে যে, তার কোন একটা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হয়নি।

ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে সুখী করা। পরজন্মে সুখী হব বলে ইহজন্মে দুঃখ ভোগ করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই জন্মে, এই মুহূর্ত থেকেই সুখী হতে হবে। যে ধর্ম দ্বারা তা সম্পাদিত হবে, তাই মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম। ইন্দ্রিয়ভোগজনিত সুখ ক্ষণস্থায়ী ও তার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী দুঃখও অনিবার্য। শিশু, অজ্ঞানী ও পশুপ্রকৃতির লোকেরাই ঐ ক্ষণস্থায়ী দুঃখমিশ্রিত সুখকে বাস্তবিক সুখ মনে করে থাকে। যদি ঐ সুখকেও কেউ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করে চিরকাল সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত ও সুখী থাকতে পারে, তাও মন্দ নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এরূপ লোক দেখা যায়নি। সচরাচর এই দেখা যায় যে, যারা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাকেই সুখ মনে করে, তারা আপনাদের অপেক্ষা ধনবান, বিলাসী লোকদের অধিক সুখী মনে করে দ্বেষ করে থাকে এবং তাদের বহুব্যয়সাধ্য উচ্চশ্রেণীর ইন্দ্রিয়ভোগ দেখে তা পাবার জন্য লালায়িত হয়ে অসুখী হয়। সম্রাট আলেকজাণ্ডার সমস্ত পৃথিবী জয় করে পৃথিবীতে আর জয় করবার দেশ নেই ভেবে দুঃখিত হয়েছিলেন। সেজন্য বুদ্ধিমান

মনীষীরা অনেক দেখে শুনে বিচার করে অবশেষে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কোন এক ধর্মে যদি পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তবেই মানুষ নিশ্চিন্ত ও যথার্থ সুখী হতে পারে।

বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। সেইজন্য তাদের উপযোগী ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশ্যক; নতুবা কিছুতেই তা তাদের সন্তোষপ্রদ হবে না—কিছুতেই তারা সেই ধর্মের অনুষ্ঠান করে যথার্থ সুখী হতে পারবে না। নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী সেই সেই ধর্মমত, নিজেকেই ভেবে চিন্তে, দেখে ঠেকে বেছে নিতে হবে। এছাড়া অন্য উপায় নেই। ধর্মগ্রন্থপাঠ, গুরূপদেশ, সাধুদর্শন, সৎপুরুষের সঙ্গ প্রভৃতি ঐ বিষয়ে তাকে সাহায্য করে মাত্র।

ধর্ম সম্বন্ধেও জানা আবশ্যক যে, কোন-না-কোন প্রকার কর্ম না করে কেউই থাকতে পারে না এবং কেবল ভাল বা কেবল মন্দ, জগতে এরূপ কোন কর্মই নেই। ভালটা করতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু মন্দ করতেই হবে। আর সেজন্য কর্ম দ্বারা যেমন সুখ আসবে, কিছু না কিছু দুঃখ এবং অভাববোধও সেই সঙ্গে আসবেই আসবে; এবং তা অবশ্যম্ভাবী। সে দুঃখটুকু যদি না নিতে ইচ্ছা থাকে, তাহলে বিষয়-ভোগ-জনিত আপাত সুখলাভের আশাটাও ছাড়তে হবে। অর্থাৎ স্বার্থ-সুখ অন্বেষণ না করে কর্তব্যবুদ্ধিতে সকল কার্য করে যেতে হবে। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম। গীতাতে ভগবান অর্জুনকে তারই উপদেশ দিয়ে বলেছেন, "কাজ কর, কিন্তু ফলটা আমাকে দাও; অর্থাৎ আমার জন্যই কাজ কর।"

গীতা, বাইবেল, কোরান, পুরাণ প্রভৃতি অতি প্রাচীন গ্রন্থ-নিবন্ধ ঘটনাবলীর যথাযথ ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আমার আদৌ বিশ্বাস হতো না। স্বামীজীকে একদিন জিজ্ঞাসা করি, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অনতিপূর্বে অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম-উপদেশ, যা ভগবদ্গীতায় লিপিবদ্ধ আছে, তা যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা কিনা।" উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন, তা বড় সুন্দর। তিনি বললেন, "গীতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীনকালে ইতিহাস লেখার বা পুস্তকাদি ছাপার এখনকার মতো এত ধুমধাম ছিল না; সেজন্য তোমাদের মতো লোকের কাছে ভগবদ্গীতার ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু গীতোক্ত ঘটনা যথাযথ ঘটেছিল কিনা, সেজন্য তোমাদের মাথা ঘামাবার কারণও দেখছি না। কেননা, যদি কেউ—শ্রীভগবান সারথি হয়ে অর্জুনকে গীতা বলেছিলেন, অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগে তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারে, তাহলেই কি তোমরা গীতাতে যা কিছু লেখা আছে, তা বিশ্বাস করবে? সাক্ষাৎ ভগবান যখন তোমাদের কাছে মূর্তিমান হয়ে এলেও তোমরা তাঁকে পরীক্ষা করতে ছোট ও তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করতে বল, তখন গীতা ঐতিহাসিক কিনা, এ বৃথা সমস্যা নিয়ে কেন ঘুরে বেড়াও? পার যদি তো গীতার উপদেশগুলি যতটা সম্ভব জীবনে পরিণত করে কৃতার্থ হও। পরমহংসদেব বলতেন, 'আম খা, গাছের পাতা

গুণে কি হবে ?' আমার বোধ হয় ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ঘটনার উপর বিশ্বাস অবিশ্বাস করা is a matter of personal equation (ব্যক্তিগত ব্যাপার) অর্থাৎ মানুষ কোন এক অবস্থাবিশেষে পড়ে তা থেকে উদ্ধারকামনায় পথ খুঁজতে থাকে এবং ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কোন ঘটনার সঙ্গে তার নিজের অবস্থা ঠিক ঠিক মিলছে দেখতে পেলে ঐ ঘটনা ঐতিহাসিক বলে নিশ্চয় বিশ্বাস করে। আর ধর্মশাস্ত্রোক্ত ঐ অবস্থার উপযোগী উপায়ও আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে।"

স্বামীজী একদিন শারীরিক এবং মানসিক শক্তি অভীষ্ট কার্যের নিমিত্ত সংরক্ষণ করা যে প্রত্যেকের কতদূর কর্তব্য, তা অতি সুন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়েছিলেন, "অনধিকার চর্চায় বা বৃথা কাজে যে শক্তিক্ষয় করে, অভীষ্ট কার্যসিদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত শক্তি সে আর কোথায় পাবে। The sum total of the energy which can be exhibited by an ego is a constant quantity. অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরে নানাভাবে প্রকাশ করবার যে শক্তি বর্তমান রয়েছে, তা সীমাবদ্ধ; সেই শক্তির অধিকাংশ একভাবে প্রকাশিত হলে ততটা আর অন্যভাবে প্রকাশিত হতে পারে না। ধর্মের গভীর সত্যসকল জীবনে প্রত্যক্ষ করতে হলে অনেক শক্তির প্রয়োজন; সেইজন্যই ধর্মপথের পথিকদের প্রতি—বিষয়ভোগ ইত্যাদিতে শক্তিক্ষয় না করে ব্রহ্মচর্যাদির দ্বারা শক্তিসংরক্ষার উপদেশ সকল জাতির ধর্মগ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়।"

স্বামীজী বাঙলার পল্লীগ্রামের লোকদের কতকগুলি আচরণের উপর বড় একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। পল্লীগ্রামের একই পুষ্করিণীতে স্নান, জলশৌচ প্রভৃতি এবং সেই পুষ্করিণীর জলই পান করার প্রথার উপর তিনি ভারি বিরক্ত ছিলেন।

স্বামীজীর এক এক দিনের এইরূপ কথাবার্তা ধরে রাখতে পারলে এক একখানি পুস্তক হতো। একই প্রশ্নের বারবার একইভাবে উত্তর দেওয়া এবং একই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝান তাঁর রীতি ছিল না। যতবারই সেই প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ততবারই নূতনভাবে দৃষ্টান্ত সহায়ে এমনি বলবার তাঁর ক্ষমতা ছিল যে, তা সম্পূর্ণ নূতন বলে লোকের বোধ হতো এবং তাঁর কথা শুনতে ক্লান্তি বোধ দূরে থাকুক, আগ্রহ ও অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত। বক্তৃতা সম্বন্ধেও তাঁর ঐ প্রথা ছিল। ভেবে চিন্তে বলবার বিষয়গুলি (points) লিখে তিনি কোনকালে বক্তৃতা করতে পারতেন না। বক্তৃতার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত হাসি-তামাসা, সাধারণভাবে কথাবার্তা, বক্তৃতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধহীন বিষয়সকল নিয়েও চর্চা করতেন। বক্তৃতায় কি যে বলবেন, তা তিনি নিজেই জানতেন না।

পূর্বেই বলেছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দিয়ে হিন্দু ধর্ম বোঝাতে এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য দেখাতে স্বামীজীর মতো আর কাউকে দেখা যায়নি। সে-বিষয়ে দু-চারটি কথা উপহার দেব।

স্বামীজী বলতেন, "চেতন অচেতন, স্থূল সূক্ষ্ম সবই একত্বের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান। প্রথমে মানুষ যতরকম জিনিস দেখতে লাগল, তাদের প্রত্যেকটিকে

বিভিন্ন জিনিস মনে করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিলে। পরে বিচার করে ঐ সমস্ত জিনিস-গুলো ৯৩টা মূলদ্রব্য (element) হতে উৎপন্ন হয়েছে, স্থির করল।

"ঐ মূল দ্রব্যগুলোর মধ্যে আবার অনেকগুলো মিশ্রদ্রব্য (compound) বলে এখন অনেকের সন্দেহ হয়েছে। আর যখন রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) শেষ মীমাংসায় পৌঁছিবে, তখন সকল জিনিসই এক জিনিসেরই অবস্থাভেদ মাত্র বোঝা যাবে। প্রথমে তাপ, আলো ও তাড়িৎ (heat, light and electricity) বিভিন্ন জিনিস বলে সকলে জানত। এখন প্রমাণ হয়েছে যে, ওগুলো সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। লোকে প্রথমে সমস্ত পদার্থগুলো চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করলে। তার পর দেখলে যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অন্যসকল চেতন প্রাণীর ন্যায় গমনশক্তি নেই মাত্র। তখন খালি দুই শ্রেণী রইল—চেতন ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা যাবে, আমরা যাকে অচেতন বলি, তাদেরও স্বল্প বিস্তর চৈতন্য আছে।*

"পৃথিবীতে যে উচ্চ-নিম্ন জমি দেখা যায়, তাও সতত সমতল হয়ে একভাবে পরিণত হবার চেষ্টা করছে। বর্ষার জলে পর্বতাদি উচ্চ জমিগুলো ধুয়ে গিয়ে গহ্বর সব পলিতে পূর্ণ হচ্ছে। একটা উষ্ণ জিনিস কোন জায়গায় রাখলে তা ক্রমে চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যের মতো সমান উষ্ণভাব ধারণ করতে চেষ্টা করে। উষ্ণতাশক্তি এইরূপে সঞ্চালন, সংবাহন, বিকিরণাদি (conduction, convection and radiation) উপায়-অবলম্বনে সর্বদা সমভাব বা একত্বের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

"গাছের ফল ফুল পাতা শেকড় আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখলেও বাস্তবিক তারা যে এক, বিজ্ঞান তা প্রমাণ করেছে। ত্রিকোণ কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখলে এক সাদা রঙ রামধনুর সাতটা রঙের মতো পৃথক পৃথক বিভক্ত দেখায়। সাদা চোখে দেখলে এক রঙ, আবার লাল বা নীল চশমার ভেতর দিয়ে দেখলে সমস্তই লাল বা নীল দেখায়।

"এইরূপ যা সত্য, তা এক। মায়া দ্বারা আমরা পৃথক পৃথক দেখি মাত্র। অতএব দেশকালাতীত অবিভক্ত অদ্বৈত সত্যাবলম্বনে মানুষের যত কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থজ্ঞান উপস্থিত হলেও মানুষ সেই সত্যটাকে ধরতে পারে না, দেখতে পায় না।"

এই সব কথা শুনে আমি বললাম, "স্বামীজী, আমাদের চোখের দেখাটাই কি সব সময় ঠিক সত্য? দুখানা রেল লাইন সমান্তরালে, দেখায় যেন ক্রমে এক জায়গায় মিলে গেছে! মরীচিকা, রজ্জুতে সর্পভ্রম প্রভৃতি optical illusion (দৃষ্টিবিভ্রম) সর্বদাই হচ্ছে। Fluorspar নামক পাথরের নিচে একটা রেখাকে double

* স্বামীজী যখন পূর্বোক্ত কথাগুলি বলেন, তখন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু প্রচারিত তাড়িত-প্রবাহযোগে জড়বস্তুর চেতনবৎ আচরণ (Response of Inorganic Mattor to Electric Currents) এই তত্ত্ব প্রকাশিত হয়নি।

refraction-এ দুটো দেখায়। একটা উড পেন্সিল আধ-গ্লাস জলে ডুবিয়ে রাখলে পেন্সিলের জলমগ্ন ভাগটা উপরের ভাগ অপেক্ষা মোটা দেখায়। আবার সকল প্রাণীর চোখগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাবিশিষ্ট এক একটা লেন্স (lens) মাত্র। আমরা কোন জিনিস যত বড় দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী তাই তদপেক্ষা বড় দেখে থাকে, কেননা তাদের চোখের লেন্স বিভিন্ন শক্তিবিশিষ্ট। অতএব আমরা যা স্বচক্ষে দেখি, তাই যে সত্য, তারও তো প্রমাণ নেই। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, মানুষ 'সত্য সত্য' করে পাগল, কিন্তু প্রকৃত সত্য (Absolute Truth) মানুষের বোঝবার ক্ষমতা নেই। কারণ, ঘটনাক্রমে প্রকৃত সত্য মানুষের হস্তগত হলে তাই যে বাস্তবিক সত্য, এটি সে বুঝবে কি করে? আমাদের সমস্ত জ্ঞান relative (আপেক্ষিক), Absolute বোঝবার ক্ষমতা নেই। অতএব Absolute ভগবান বা জগৎকারণকে মানুষ কখনই বুঝতে পারবে না।"

স্বামীজী। তোমার বা সচরাচর লোকের Absolute জ্ঞান না থাকতে পারে, তা বলে কারো নেই, একথা কি করে বল? জ্ঞান এবং অজ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান বলে দু-রকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন তোমরা যাকে জ্ঞান বল, বাস্তবিক তা মিথ্যাজ্ঞান। সত্যজ্ঞানের উদয় হলে তা অন্তর্হিত হয়, তখন সব এক দেখায়। দ্বৈতজ্ঞান অজ্ঞানপ্রসূত।

আমি। স্বামীজী, এ তো বড় ভয়ানক কথা! যদি জ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান দুই জিনিস থাকে, তাহলে আপনি যাকে সত্যজ্ঞান ভাবছেন, তাও তো মিথ্যাজ্ঞান হতে পারে, আর আমাদের যে দ্বৈতজ্ঞানকে আপনি মিথ্যাজ্ঞান বলছেন, তাও তো সত্য হতে পারে?

স্বামীজী। ঠিক বলেছ, সেইজন্যই বেদে বিশ্বাস করা চাই। পূর্বকালে আমাদের মুনিঋষিগণ সমস্ত দ্বৈতজ্ঞানের পারে গিয়ে ঐ অদ্বৈত সত্য অনুভব করে যা বলে গেছেন, তাকেই বেদ বলে। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থার মধ্যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য, আমাদের বিচার করে বলবার ক্ষমতা নেই। যতক্ষণ না ঐ দুই অবস্থার পারে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দুই অবস্থাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারব—ততক্ষণ কেমন করে বলব—কোনটা সত্য, কোনটা অসত্য। শুধু দুটো বিভিন্ন অবস্থার অনুভব হচ্ছে এটি বলা যেতে পারে। এক অবস্থায় যখন থাক, তখন অন্যটাকে ভুল মনে হয়। স্বপ্নে হয়তো কলকাতায় কেনাবেচা করলে, উঠে দেখ—বিছানায় শুয়ে আছ। যখন সত্যজ্ঞানের উদয় হবে, তখন এক ভিন্ন দুই দেখবে না এবং পূর্বের দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা বলে বুঝতে পারবে। কিন্তু এসব অনেক দূরের কথা, হাতেখড়ি হতে না হতেই রামায়ণ, মহাভারত পড়বার ইচ্ছা করলে চলবে কেন? ধর্ম অনুভবের জিনিস, বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার নয়। হাতে নাতে করতে হবে, তবে এর সত্যাসত্য বুঝতে পারবে। একথা তোমাদের পাশ্চাত্য Chemistry (রসায়ন), Physics (পদার্থবিদ্যা), Geology (ভূতত্ত্ববিদ্যা) প্রভৃতির অনুমোদিত। দু-বোতল Hydrogen (উদজান)

আর এক বোতল Oxygen (অম্লজান) নিয়ে 'জল কই' বললে কি জল হবে, না, তাদের একটা শক্ত জায়গায় রেখে electric current (তড়িৎ-প্রবাহ) তার ভিতর চালিয়ে তাদের combination (সংযোগ, মিশ্রণ নয়) হলে তবে জল দেখতে পাবে এবং বুঝবে যে, জল Hydrogen ও Oxygen নামক গ্যাস হতে উৎপন্ন। অদ্বৈত-জ্ঞান উপলব্ধি করতে গেলেও সেইরূপ ধর্মে বিশ্বাস চাই, আগ্রহ চাই, অধ্যবসায় চাই, প্রাণপণ যত্ন চাই, তবে যদি হয়। এক মাসের অভ্যাস ত্যাগ করাই কত কঠিন, দশ বৎসরের অভ্যাসের তো কথাই নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির শত শত জন্মের কর্মফল পিঠে বাঁধা রয়েছে। একমুহূর্ত শ্মশানবৈরাগ্য হলো, আর বললে কিনা, 'কই, আমি তো সব এক দেখছি না।'

আমি। স্বামীজী, আপনার ঐ কথা সত্য হলে যে Fatalism (অদৃষ্টবাদ) এসে পড়ে। যদি বহু জন্মের কর্মফল একজন্মে যাবার নয়, তবে আর চেষ্টা, আগ্রহ কেন? যখন সকলের মুক্তি হবে, তখন আমারও হবে।

স্বামীজী। তা নয়। কর্মফল তো অবশ্যই ভোগ করতে হবে। কিন্তু অনেক কারণে ঐ সকল কর্মফল খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হতে পারে। ম্যাজিক লণ্ঠনের পঞ্চাশ খানা ছবি দশ মিনিটেও দেখান যায়, আবার দেখাতে দেখাতে সমস্ত রাতও কাটান যায়। এটা নিজের আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধেও স্বামীজীর ব্যাখ্যা অতি সুন্দর, "সৃষ্ট বস্তুমাত্রেই চেতন ও অচেতন (সুবিধার জন্য) দুইভাগে বিভক্ত। মানুষ সৃষ্ট বস্তুর চেতনভাগের শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিশেষ। কোন কোন ধর্মের মতে ঈশ্বর আপনার মতো রূপবিশিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্মাণ করেছেন; কেউ বলেন, মানুষ ল্যাজবিহীন বানরবিশেষ; কেউ বলেন, মানুষেরই কেবল বিবেচনাশক্তি আছে, তার কারণ মানুষের মস্তিষ্কে জলের ভাগ বেশি। যাই হোক, মানুষ প্রাণিবিশেষ ও প্রাণিসমূহ সৃষ্ট পদার্থের অংশমাত্র, এবিষয়ে মতভেদ নেই। এখন সৃষ্ট পদার্থ কি, বোঝবার জন্য একদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণরূপ উপায় অবলম্বন করে এটা কি, ওটা কি, অনুসন্ধান করতে লাগলেন; আর অন্যদিকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতবর্ষের উষ্ণ আবহাওয়ায় ও উর্বরা ভূমিতে শরীররক্ষার জন্য যৎসামান্য সময় মাত্র ব্যয় করে কৌপীন পরে প্রদীপের মিটমিটে আলোয় বসে আদা-জল খেয়ে বিচার করতে লাগলেন—'এমন জিনিস কি আছে, যা জানলে সব জানা যায়?' তাঁদের মধ্যে অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাজেই চার্বাকের দৃশ্যসত্য মত থেকে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতমত পর্যন্ত সমস্তই আমাদের ধর্মে পাওয়া যায়। দুই দলই ক্রমে এক জায়গায় উপনীত হচ্ছেন এবং এক কথাই এখন বলতে আরম্ভ করছেন। দুই দলই বলছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এক অনির্বচনীয় অনাদি অনন্ত বস্তুর প্রকাশমাত্র। কাল এবং আকাশও (Time and space) তাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কল্প, বৎসর, মাস, দিন ও মুহূর্ত প্রভৃতি সময়জ্ঞাপক পদার্থ, যার অনুভবে সূর্যের গতিই আমাদের প্রধান সহায়, ভেবে দেখলে

সেই কালটাকে কি মনে হয়? সূর্য অনাদি নয়। এমন সময় অবশ্য ছিল, যখন সূর্যের সৃষ্টি হয়নি। আবার এমন সময় আসবে, যখন আবার সূর্য থাকবে না, এ নিশ্চিত। তাহলে অখণ্ড সময় একটি অনির্বচনীয় ভাব বা বস্তুবিশেষ ভিন্ন আর কি? আকাশ বা অবকাশ বললে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎসম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জায়গাবিশেষ বুঝি। কিন্তু তা সমগ্র সৃষ্টির অংশমাত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। এমন অবকাশও থাকা সম্ভব, যেখানে কোন সৃষ্ট বস্তুই নেই। অতএব অনন্ত আকাশও সময়ের মতো অনির্বচনীয় একটি ভাব বা বস্তুবিশেষ। এখন সৌরজগৎ ও সৃষ্টবস্তু কোথা হতে কিরূপে এল? সাধারণতঃ আমরা কর্তা ভিন্ন ক্রিয়া দেখতে পাই না। অতএব মনে করি, এই সৃষ্টির অবশ্য কোন কর্তা আছেন। কিন্তু তাহলে সৃষ্টিকর্তারও তো সৃষ্টিকর্তা আবশ্যক। তা থাকতে পারে না। অতএব আদিকারণ, সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরও অনাদি অনির্বচনীয় অনন্ত ভাব বা বস্তুবিশেষ। অনন্তের তো বহুত্ব সম্ভব নয়, তাই ঐসকল অনন্ত পদার্থই এক এবং একই ঐসকলরূপে প্রকাশিত।”

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “স্বামীজী মন্ত্রাদিতে বিশ্বাস—যা সাধারণে প্রচলিত আছে, তা কি সত্য?”

তিনি উত্তর করলেন, “সত্য না হবার তো কোন কারণ দেখি না। তোমাকে কেউ করুণ স্বরে মিষ্টভাষায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে তুমি সন্তুষ্ট হও, আর কঠোর তীব্রভাষায় কোন কথা বললে তোমার রাগ হয়। তখন প্রত্যেক ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও যে সুললিত উত্তম শ্লোক (যাকে মন্ত্র বলে) দ্বারা সন্তুষ্ট হবেন না, তার মানে কি?”

এই সব কথা শুনে আমি বললাম, “স্বামীজী, আমার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় তো আপনি সবই বুঝতে পারছেন। এখন আমার কি করা কর্তব্য, আপনি বলে দিন।”

স্বামীজী বললেন, “প্রথমে মনটাকে বশে আনতে চেষ্টা কর, তা যে-উপায়েই হোক। পরে সব আপনিই হবে। আর জ্ঞান—অদ্বৈত জ্ঞান ভারি কঠিন; জেনো রেখে যে, ঐটেই মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (highest ideal)। কিন্তু ঐ লক্ষ্যে পৌঁছবার পূর্বে অনেক চেষ্টা ও আয়োজনের আবশ্যক। সাধুসঙ্গ ও যথার্থ বৈরাগ্য ভিন্ন তা অনুভবের অন্য উপায় নেই।”*

* লেখক বর্ধমান জেলার অধিবাসী, বেলগাঁর ফরেস্ট অফিসার ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ইন্দুমতী মিত্র স্বামীজীর প্রথম নারী-শিষ্যা। তাঁদেরকে লেখা স্বামীজীর কয়েকখানি পত্র 'পত্রাবলী'তে পাওয়া যায়।

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-প্রণেতা।

স্বামীজী আমাদের যোগ-উপনিষদের এই শ্লোকটি বলতেন ঃ

'মেরুসর্ষপয়োর্যদ্ যৎ সূর্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্ যৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ ॥'

অর্থাৎ মেরু ও সর্ষপের সঙ্গে যে প্রভেদ, সূর্য ও খদ্যোতে (জোনাকিতে) যে পার্থক্য, সরিৎ (ক্ষুদ্র জলাশয়) ও সাগরে যেরূপ পার্থক্য, ভিক্ষু ও গৃহস্থের সঙ্গে তদ্রূপ পার্থক্য।

তিনি নিত্য আমাদের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করতে বলতেন।

স্বামীজী কে ছিলেন ? আমি নিম্নলিখিত ঘটনাটি বহুপূর্বে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের মুখ থেকে শুনেছিলাম, আবার এবার (১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে) মঠে গিয়ে তাঁর কাছে ঐ বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করে শুনে এসেছি ঃ

একদিন অনেক রাত্রে বরাহনগর মঠে স্বামীজী ও মহাপুরুষ মহারাজ একই মশারির নিচে শুয়ে আছেন। উভয়েই নিদ্রিত, এমন সময়ে একটি আলোর ঝলকে মহাপুরুষ মহারাজের ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখেন, মশারির বাইরের দিকে শিবাকৃতি ছোট ছোট মূর্তি ত্রিশূল-হাতে বসে আছেন, তাঁদের শরীর ও ত্রিশূল থেকে অদ্ভুত জ্যোতিঃ নির্গত হচ্ছে। এ তাঁর মনের ভ্রম মনে করে তিনি পুনরায় চক্ষু বুজলেন, কিন্তু আলোর ঝলকে ঘুম হলো না। চেয়ে দেখেন, সেই মূর্তিগুলি সেই ভাবেই ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। ব্যাপার কি সঠিক বুঝতে না পেরে তিনি স্বামীজীকে ডেকে সব বললেন, ও তাঁদের দিকে তাঁকে লক্ষ্য করতে অনুরোধ করলেন। স্বামীজী কিন্তু ওতে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করে পাশ ফিরে শুলেন এবং তাঁকেও ঐরূপ করতে বললেন। অগত্যা এইভাবে রাত্রিটি কেটে গেল। সকালে উঠে পুনরায় মহাপুরুষ মহারাজ স্বামীজীকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামীজী নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলেন, "ওঁরা আর কেউ নন, বটুকভৈরব, ছেলেবেলা থেকে ওঁরা এইভাবে আমাকে রক্ষা করে আসছেন।"

আর একদিনের কথা আমি তখন কলকাতায় চাকরি করি, প্রায়ই মঠে গিয়ে স্বামীজী ও অন্যান্য মহারাজদের দর্শন করে আসি। একদিন দ্বিপ্রহরে মঠে রয়েছি, স্বামীজী আহারের পর আমাকে ডেকে বললেন, "দেখ বাঙাল। (স্বামীজী আমাকে 'বাঙাল' বলে ডাকতেন) আজ তুই আমাকে একটু massage করে দে তো।" স্বামীজীর কাছ থেকে তৎপূর্বে আমার দীক্ষা হয়েছে, গুরুসেবা করবার সুযোগ পেলাম বলে আনন্দে তাঁকে massage করতে লাগলাম। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই স্বামীজী বললেন, "না, এ

তোর কাজ না, তুই একটু রাজা (মহারাজ ব্রহ্মানন্দজী)-কে ডেকে দে।" তখন মহারাজ আহার করে শুয়ে পড়েছেন। ধীরে ধীরে তাঁর ঘরের কাছে গিয়ে তাঁর দরজায় টোকা মারলাম। মহারাজ জেগে ছিলেন, "কে ?" বলে দরজা খুলে দিলেন এবং আমার টোকা দেবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামীজী massage করবার জন্য তাঁকে ডাকছেন, সসঙ্কোচে তা বললাম। মহারাজ কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফতুয়াটি গায়ে দিয়ে কাপড় মালকোঁচা করে পরে স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করলেন। স্বামীজী বললেন, "দেখ রাজা, আজ শরীরটা খারাপ বোধ করছি। তাই এই বাঙালটাকে massage করতে বলেছিলাম, কিন্তু ও কিছুই করতে পারল না, তাই তোকে ডেকেছি।" মহারাজ আর দ্বিরুক্তি না করে তখনই স্বামীজীকে ডলাই-মলাই করতে লাগলেন ও পুরো দু-ঘণ্টা ঐরূপ করে ঘর্মাক্ত শরীরে বাইরে এলেন এবং তাঁর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে তাঁর গা হাত পা ধুতে আরম্ভ করলেন, আমি ঘরের বাইরেই ছিলাম। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে পুনরায় ধীরে ধীরে তাঁর দরজায় টোকা দিলাম। মহারাজ পুনরায় "কে ?" বলে দরজা খুলে দিলেন ও আমাকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুনরায় ঘা দেবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করলেন। তখন অতিশয় সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁকে বললাম, "মহারাজ, আজ আমার মনে বড় একটা সংশয় উঠেছে, তা দূর করবার জন্য আপনার কাছে আবার এই সময়ে এসে বিরক্ত করছি।" মহারাজ অভয় দিয়ে বললেন, "কি বল্ ।" তদুত্তরে বললাম, "মহারাজ, শুনেছি—আপনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মানসপুত্র, স্বামীজীর গুরুভাই, স্বামীজীও আপনাকে শ্রদ্ধা করেন, অনেক সময়ে দেখেছি। কিন্তু আজ আপনাকে ডেকে এইরূপ massage করালেন কেন বুঝছি না।" শুনেই শ্রীশ্রীমহারাজ জিব কেটে বললেন, "বলিস কি রে ! সাক্ষাৎ শিব। তুই কি জানিস নে ?"

একবার স্বামীজী নিয়ম করলেন মঠবাসী সকলকেই রাত্রি চারটায় উঠতে হবে। আমার উপরেই ভার পড়ল ঘণ্টা বাজিয়ে ঐরূপে সকলকে উঠাবার। স্বামীজী সকলকে ডেকে বলে দিলেন, "ঘণ্টা বাজাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে কেউ মন্দিরে না গেলে তাঁকে সেইদিন ভিক্ষা করে খেতে হবে।" স্বামীজী নিজেও যথাসময়ে মন্দিরে যেতেন ও অন্যান্য সকলেও নির্দিষ্ট সময়ে মন্দিরে উপস্থিত হতেন। একদিন কিন্তু পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের মন্দিরে যেতে কিছু দেরি হয়ে গিয়েছিল। স্বামীজী তা লক্ষ্য করেছিলেন এবং ধ্যান হতে সকলে উঠে নিজ নিজ কাজে গেলে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে ডেকে বললেন, "তারকদা, আজ আপনার তো মন্দিরে যেতে দেরি হয়েছে।" পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "হাঁ স্বামীজী, দশ মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছিল।" স্বামীজী ধীরে ধীরে তখন বললেন, "তারকদা, আমরা তো নিয়ম করেছি, ঐরূপ দেরি হলে ঐ দিন ভিক্ষা করে খেতে হবে।" পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তৎক্ষণাৎ বললেন, "নিশ্চয়ই, আমি এখনই ভিক্ষায় বার হচ্ছি এবং যা পাব তাই খাব।" এই বলে তিনি বার হয়ে গেলেন। যথাসময়ে মঠে ভোগ উঠল ও খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল, সকলেই খেতে গেলেন, কিন্তু স্বামীজী গেলেন না। মঠের পশ্চিমে বারান্দায় বসে রইলেন। কিছু পরে

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ভিক্ষা করে ফিরলেন। তাঁকে দেখেই স্বামীজী সোল্লাসে বলে উঠলেন, "দেখি তারকদা, কি কি এনেছেন? অনেক দিন ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিনি, আসুন আজ আমরা দুই-ভাইয়ে বসে ভাগ করে খাই।" এই বলে দুই জনে পরম পরিতোষ সহকারে সেই পক্ক ভিক্ষান্ন খেতে লাগলেন।

আমার প্রতি স্বামীজীর অপার স্নেহের কথা আর কি বলব! কাশ্মীরে অমরনাথ দর্শনের পর স্বামীজীর মন যেন বাহ্য জগৎ হতে একেবারে উঠে গিয়েছিল, সর্বদাই তাঁর খাটে তন্ময় হয়ে বসে থাকতেন। মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান করতেন ও প্রায়ই 'শিব শিব' বলে উঠতেন। মঠের মহারাজগণ তাঁর এইরূপ তন্ময় অবস্থা দেখে অতিশয় শঙ্কিত হয়ে আমাকে কলকাতা থেকে মঠে ডেকে আনালেন। অসময়ে তাঁদের এইরূপ আহ্বানে একটু বিস্মিত হয়েছিলাম এবং মঠে পেঁছে তাঁদের এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম; তাঁরা স্বামীজীর সেই তন্ময় ভাবের কথা সোদ্বেগে বর্ণনা করলেন এবং এই-ভাবে বেশি দিন থাকলে তাঁর শরীর থাকবে না, এও আশঙ্কা করলেন। তাঁরা—তাঁর গুরুভাইরা থাকতে এ-বিষয়ে আমি কি করতে পারি, নিবেদন করলাম। তদুত্তরে শ্রীশ্রীমহারাজ বললেন, "দেখ, তিনি তোকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। স্নেহ নিম্নগামী, তাই আমরা যা করতে পারিনি, তোকে দেখলে হয়তো তাঁর মন একটু নিম্নগামী হবে।" তাঁদের কথায় যথাসময়ে স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে প্রণাম করলাম। স্বামীজী তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। আমার শব্দ শুনেই চক্ষু ধীরে ধীরে উন্মীলন করলেন, দেখলাম—চক্ষু দুটি জবাফুলের মতো রক্তবর্ণ। আমার দিকে চেয়েই কিন্তু পুনরায় চক্ষু বন্ধ করলেন। আমি তখন কেঁদে ফেললাম এবং উচ্চৈস্বরে বললাম, "স্বামীজী, আপনি কেন এরূপ করছেন? আপনার এ অবস্থা দেখে মঠের সকল মহারাজই অত্যন্ত শঙ্কিত, আপনি এইভাবে কিছুতেই থাকতে পারবেন না।" এই বলে আবদার করতে লাগলাম, দেখলাম—ধীরে ধীরে তাঁর মন একটু বহির্মুখ হচ্ছে, পরে বললেন, "যা, একটু তামাক সেজে আন।" স্বামীজীর এই কথা শুনে আমি আনন্দে ঘর হতে বের হলাম। স্বামীজী তামাক খেতে চেয়েছেন শুনে সকলেই আনন্দিত হয়ে বললেন, "দেখলি, তোর প্রতি স্নেহবশেই তিনি মনটিকে নামিয়েছেন, নতুবা কি হতো কে জানে।"

মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

এলাহাবাদের সরকারি কর্মচারী। এলাহাবাদে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচার করার উদ্দেশে 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাব' স্থাপন করেছিলেন।

বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ির দ্বিতলে, রাস্তার দিকে বড় হলে একদিন সকালে গিয়ে বসলাম। শুনলাম স্বামীজী হলঘরের পাশের একটি কক্ষে আছেন। কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে দেখলাম মিস নোবল (সিস্টার নিবেদিতা) একটি দরজা দিয়ে হলঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরিধানে ছিল হালকা হলদে রঙের পুরো-হাতা আলখাল্লা, পা পর্যন্ত লম্বা। তাঁর গলায় ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। মনে হলো যেন সাক্ষাৎ দেবীমূর্তি।

স্বামীজী যে ঘরে ছিলেন তার চৌকাঠের কাছে গিয়ে সিস্টার হলঘরের মধ্যেই নতজানু হয়ে বসলেন, দুই হাত জোড় করে স্বামীজীকে প্রণাম করলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বসে রইলেন। স্বামীজী নিজ কক্ষ থেকেই তাঁর সঙ্গে অল্পক্ষণ কথাবার্তা কইলেন। তার পর স্বামীজীকে পুনর্বার প্রণাম করে সিস্টার চলে গেলেন।

এর কিছুক্ষণ পরে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হলঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন এবং তাঁদের কাছে খোল ও করতাল ছিল। হলের একটি পাশে তাঁরা সকলে বসলেন। গোঁসাইজী এসে বসতেই স্বামীজী নিজ প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং গোঁসাইজী ও তাঁর সঙ্গিগণ সকলেই এককালে উঠে দাঁড়ালেন। গোঁসাইজী স্বামীজীকে প্রণাম করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু স্বামীজী সরে গিয়ে তাঁকেই প্রণাম করতে চেষ্টা করলেন। কেউই কাউকে প্রণাম করতে পারলেন না।

অবশেষে স্বামীজী গোঁসাইজীর হাত ধরে সতরঞ্চির উপর বসালেন। গোঁসাইজী সে সময় ভাবমগ্ন, একেবারে বিভোর অবস্থা। কিছুক্ষণ সকলেই নীরবে রইলেন, পরে স্বামীজী গোঁসাইজীকে বললেন, "ঠাকুর সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।" গোঁসাইজী সেইরূপ বিভোর থেকে অতি ধীরে শুধু বললেন, "ঠাকুর! —আমাকে কৃপা করেছিলেন।" এর অধিক তিনি বলতে পারলেন না। তাঁর দুই চক্ষে প্রেমাশ্রু এবং গদগদ-বাণী সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হলো। তখন গোঁসাইজীর সঙ্গিগণ উঠে দাঁড়ালেন ও সঙ্কীর্তন আরম্ভ হলো। কিছুক্ষণ কীর্তন হলে পর তাঁরা গোঁসাইজীকে নিয়ে চলে গেলেন। তখন আমি স্বামীজীকে দূর থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম।

একদিন বেলুড় মঠে গেছি। তখন ডিসেম্বর মাসের শেষ। স্বামীজী রান্নাবাড়ির সম্মুখে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন—মাথায় গেরুয়া রঙের উলের টুপি এবং পরনে ড্রেসিং গাউন। তাঁর গায়ের রঙ খুব সুন্দর—ফর্সা। চক্ষু খুবই বড়, এত সুন্দর চোখ আর কখনো দেখিনি। কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। কাছেই একটি তাঁবু ছিল। তার মধ্যে একটি সাধারণ টেবিল ও কয়েকখানি চেয়ার পাতা ছিল। স্বামীজী একজন ব্রহ্মচারীকে বললেন চা আনতে। তাঁবুর মধ্যে আমাকে চা ও ঠাকুরের প্রসাদ দেওয়া হলো।

এর পর স্বামীজী আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। কোথায় থাকি, কি করি ইত্যাদি প্রশ্ন করলেন এবং আমি জানালাম এলাহাবাদে থাকি। মঠে এর পূর্বেও আমি যেতাম এবং সম্ভবতঃ কারও কাছে আমার নাম শুনেছিলেন। এলাহাবাদে আমার কয়েকটি বন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো রেখে পূজা করতেন। আমরা যেখানে পূজা করতাম, সেইখানেই জপ ধ্যান ও ধর্মগ্রন্থাদির পাঠ ও আলোচনা হতো। এর নাম ছিল 'ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাব'। স্বামীজীর সঙ্গে সেই সময় এই বিষয় কিছু আলোচনা হয়নি, তবে ভাবে মনে হলো এই কথা তিনি শুনেছেন। এর পর স্বামীজী মঠের ভিতরে চলে গেলেন এবং আমি অন্যান্য ভক্তদের কাছে বসে রইলাম।

এর কিছুক্ষণ পর—তখন বেলা আন্দাজ দশটা—মঠের ভিতরকার বারান্দায় একটি চেয়ারে স্বামীজী বসেছিলেন ও তাঁর সম্মুখে একটি ছোট টেবিল ছিল। বারান্দার তিন পাশে তিনখানি বেঞ্চ পাতা ছিল। মহাপুরুষ মহারাজ, রাখাল মহারাজ ও শরৎ মহারাজ একটি বেঞ্চে বসে ছিলেন। অদূরে অন্য একটিতে আমি বসলাম। স্বামীজী সম্মুখে আসীন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং আমি নীরবে শ্রোতারূপেই বসে রইলাম। কারণ স্বামীজীকে খুব ভাল লাগলেও তাঁকে ভয় ও সমীহ করতাম এত বেশি যে উপযাচক হয়ে কথা বলার মতো সাহস ছিল না।

স্বামীজী বলছিলেন, "শিকাগোতে যখন হিন্দুধর্মই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে প্রমাণিত হলো, তখন পাদ্রীদের ভীষণ গাত্রদাহ। তারা স্থির করলে ফ্রান্সে আর একটা **Parliament of Religion** (ধর্মসভার আয়োজন করা) হবে। তারা ভেবেছিল এ (স্বামীজী) তো আর ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা দিতে পারবে না, অতএব এইবার তাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।"

প্রথমবার আমেরিকা থেকে ফিরে স্বামীজী অধিক কাল ভারতে থাকেননি। দ্বিতীয়বার হরি মহারাজকে সঙ্গে করে আমেরিকা নিয়ে গেলেন। তারপর ইওরোপ যাত্রার সময়ে ফ্রান্সে যান ও অল্পকাল মধ্যে ফরাসী ভাষা শিখে বক্তৃতা দিলেন। তাঁকে ঐ ভাষায় এত সুন্দরভাবে বক্তৃতা দিতে দেখে ইওরোপবাসীরা আশ্চর্য হলো। তখন তারা বুঝল তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার আর কোন আশা নেই।

স্বামীজী যখন আমেরিকায় ছিলেন, সে সময়কার নানা ঘটনা বলতে লাগলেন। তাঁর ঘরের বাইরে একটি লেটার-বক্স থাকত। পোস্ট-পিওন এসে তাঁর সকল পত্রাদি তাতে ফেলে যেত। স্বামীজী সেটি চাবি বন্ধ রাখতেন। মাঝে মাঝে চাবি খুলে পত্রাদি বার করতেন। অন্যান্য পত্রের সঙ্গে সময় সময় উচ্চ শিক্ষিতা ও ধনী (মার্কিন) কন্যারা তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে পত্র দিতেন। স্বামীজী সে সকল পত্রের উত্তর দিতেন না, পড়ে ছিঁড়ে ফেলতেন।

অবশেষে কেউ কেউ তাঁর কাছে এসে সাক্ষাতে ঐ প্রস্তাব করেছিলেন। স্বামীজী তাঁদের বলতেন, "আমি সন্ন্যাসী। ভারতে সন্ন্যাসীরা বিবাহ করেন না। সকল স্ত্রীলোকই আমার মা বা ভগিনীর সমান। অতএব বিবাহ করবার প্রশ্ন উঠতেই পারে

না।” তাঁর এই ভাবটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন না এবং আশ্চর্য হয়ে ফিরে যেতেন।

সেদিন আরও একটি আশ্চর্য ঘটনা স্বামীজীর মুখে শুনেছিলাম। আমেরিকার নানা শহরে অনেক বক্তৃতা দিতে দিতে স্বামীজীর মনে হলো “আর কি বলব। বলার যা সবই তো বলেছি।” সে সময় একস্থানে যে বিষয়ের অবতারণা করতেন, অন্যত্র আর সেই কথা উত্থাপন করতেন না। একটি বড় শহরে বক্তৃতা দেবেন এবং ঠিক কি বিষয় বলবেন, তা যেন ভেবে পেলেন না। গভীর রাত্রে একটি আরাম-কেদারায় বসে ভাবছেন, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের বাণী শুনতে লাগলেন। সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমূর্তি তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। কেবল তাঁর অশরীরী বাণী বেশ উচ্চৈঃস্বরে অনর্গল উচ্চারিত হচ্ছিল। সেই সকল কথা স্বামীজী স্পষ্টভাবে শুনেছিলেন; বক্তৃতায় কি কি বলতে হবে তা বেশ কিছু সময় ধরে ধ্বনিত হলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বাংলায় যেমন কথা কইতেন সেইরূপই বলেছিলেন। পরদিন বক্তৃতাকালে স্বামীজী সেই বিষয় অবতারণা করে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

ঐদিন প্রভাতে স্বামীজীর পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক থাকতেন, তিনি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কাল রাত্রে আপনার ঘরে কে এসেছিলেন?” কি ভাষায় কথা হয়েছিল বা কি কথা হয়েছিল, তা তিনি বুঝতে পারেননি। এই ভদ্রলোকের কথা শুনে স্বামীজী নিজেই অবাক হয়ে রইলেন।

কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলতে লাগলেন যে আমেরিকায় একবার তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের অদ্ভুত ত্যাগের বিষয় বলছিলেন।—ঠাকুর টাকা পয়সা ছুঁতে পারতেন না। যদি স্পর্শ করতেন তাহলে আঙুল বেঁকে যেত এবং অব্যক্ত যন্ত্রণাভোগ করতেন। একদিন তিনি রাত্রে ঘুমোচ্ছিলেন। এমন সময় একটি টাকা ঠাকুরের অঙ্গে (পায়ে) স্পর্শ করাতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর ঘুম তো ভাঙলই এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা হতে লাগল। বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেন যে এই ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। পরিশেষে তিনি বললেন, “নিদ্রিত অবস্থায়ও ঠাকুরের কাঞ্চন-স্পর্শে কেন এমন হতো, তা দার্শনিকরা গবেষণা করে আবিষ্কার করুন।”

এর কিছুক্ষণ পরেই রাখাল মহারাজ স্বামীজীকে অনুরোধ করলেন—ঠাকুরের জীবনী লিখতে। তা শুনে স্বামীজী চমকে উঠে বললেন, “ও আমার দ্বারা হবে না। আমি কি শিব গড়তে বাঁদর গড়ব!” তা শুনে মহারাজ বললেন, “তুমি যদি না পার তো ঠাকুরের জীবনী আর লেখা হবে না।” উত্তরে স্বামীজী বললেন, “ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হয় তো অন্য কাকেও দিয়ে লিখিয়ে নেবেন।”

স্বামীজী একদিন আমাকে বললেন, “তুই এলাহাবাদে থাকিস, ডাক্তার নন্দীকে জানিস?” আমি বললাম, “হ্যাঁ।” স্বামীজী বলতে লাগলেন, “আমি যখন ঝুঁসিতে ছিলাম, কখন কখন ডাক্তার নন্দীর বাড়িতে ভিক্ষা করে আসতাম। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল।” ডাঃ নন্দী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি ঠাকুরের

কাছে যেতেন। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তাঁরই কাছে শুনেছিলাম—ঠাকুরের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কয়েক মাস গঙ্গার অপর পারে—যেখানে সাধুসন্ন্যাসীরা থাকেন—সেইখানে ছিলেন। সেই সময়টা ছিল দারুণ গ্রীষ্মকাল। দুপুরবেলা খালি-পায়ে আধখানা ভোটকম্বল কোমরে জড়ানো আর আধখানা গায়ে দিয়ে ডাঃ নন্দীর বাড়ি পাঁচ ছয় মাইল পথ হেঁটে যেতেন এবং ভিক্ষা গ্রহণের পর হেঁটে ফিরতেন। এইরূপ তিতিক্ষা উত্তর পশ্চিমের সাধুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু স্বামীজীর কঠোরতা তাঁদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

প্রায়ই কলকাতা থেকে বেলুড় মঠে যেতাম। যুবা ও প্রৌঢ় বহু ব্যক্তি স্বামীজীর দর্শন পাবার আশায় মঠে যেতেন। কিন্তু সদা সর্বদা তাঁর 'দর্শন' হতো না। অধিকাংশ সময় স্বামীজী নিজ কক্ষে থাকতেন ; সে সময় তাঁর কাছে যাবার অনুমতি ছিল না। তিনি নিজেই যখন বাইরে আসতেন, সর্বসাধারণ তখনই তাঁর কাছে আসতে পারত। স্বামীজীর গুরুভ্রাতারাও যখন তখন তাঁর কাছে যেতেন না। সাধারণতঃ স্বামীজী ঘরের বাইরে থাকলে তাঁদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আলাপ-আলোচনা, হাস্য-পরিহাস—সবই হতো।

একদিন সকালে স্বামীজীর মাতাঠাকুরানী মঠে এলেন। তাঁকে দেখবামাত্র আমারও মনে তাঁর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধার উদ্রেক হলো। তাঁর শরীরের গঠন ছিল বলিষ্ঠ, চক্ষু দুইটি বৃহৎ এবং আয়ত—চলিত ভাষায় যাকে বলে 'পটলচেরা চোখ'। তাঁর মধ্যে সবল দৃঢ় চিত্ত ও তেজস্বিতার ভাব যেন ঠিকরে বের হতো। দেখে মনে হলো, এমন মাতারই স্বামীজীর মতো পুত্র হওয়া সম্ভব। মঠের দ্বিতলে উঠে তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, "বিলু-উ-উ।" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। অল্পক্ষণেই দেখি, স্বামীজী মায়ের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলেন। বাইরের বাগানে উভয়ে বেড়াতে লাগলেন এবং মাতা ও পুত্রের নিম্নস্বরে কথাবার্তা হতে লাগল।

স্বামীজী বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ি মাঝে মাঝে যেতেন। সেখানে গেলে মায়ের কাছে গিয়ে তাঁকে দর্শন করে আসতেন। যখন মঠে থাকতেন, তখনো মাঝে মাঝে কলকাতায় গিয়ে মাকে দেখা দিয়ে আসতেন। কদাচিৎ অনেকদিন না দেখলে তাঁর মা নিজে মঠে এসে তাঁকে দেখে যেতেন। তবে মঠে তিনি খুব কম আসতেন। সেদিন সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে মঠে দেখতে পেলাম। আরও দেখলাম মার কাছে সেই জগদ্বিখ্যাত স্বামীজী যেন একটি ছোট শিশু।

জাপানের কনসাল একদিন প্রায় বেলা চারটের সময় মঠে এসে স্বামীজীর দর্শন-প্রার্থী হলেন। মঠের উঠোনের পাশের বারান্দায় যে বেঞ্চগুলি পাতা থাকত, তিনি এবং তাঁর দোভাষী সেখানেই বসলেন। স্বামীজীকে খবর দেওয়া হলো। এরূপ করা সাধারণ নিয়ম না হলেও কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এলে তাঁকে খবর দেওয়া হতো। কিন্তু সকল সময়ে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বাইরে আসতেন না। দেখা করা বা না করা সম্পূর্ণ তাঁর তাৎকালিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করত। কখনো তিনি অল্পক্ষণেই নেমে আসতেন, আবার কখনো বা

দেখাই হতো না। সেদিন তাঁকে খবর দেওয়া হলে আমরা ভাবলাম, তিনি তখনি আসবেন; কিন্তু তা হলো না। বহুক্ষণ অতিবাহিত হলো এবং জাপানের রাজদূত নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে স্বামীজী এলেন এবং শিষ্টাচার সম্ভাষণ শেষ হলে দোভাষী মারফত রাজদূত বললেন, "আমাদের মিকাডো আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন, আপনি জাপানে চলুন। যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। হিন্দুধর্ম সেখানে প্রচার করবেন এবং তাতে জাপানের মঙ্গল হবে। আপনি সম্মত হলেই সেখানে রাজোচিত সম্বর্ধনার জন্য মিকাডো ব্যবস্থা করবেন।"

স্বামীজী উত্তর দিলেন, "শরীর আমার অসুস্থ। এখন জাপান যাওয়া সম্ভব হবে না।" রাজদূত জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি সুস্থ হলে যাবেন, এই কথা কি মিকাডোকে জানাতে পারি?" তাতে স্বামীজী বললেন, "এ শরীর জাপানে যাবার মতো আবার হবে, তা আমার মনে হয় না।"

স্বামীজী ডায়াবিটিস্ রোগে ভুগছিলেন এবং তাঁর দেহ কৃশ হয়েছিল, মুখের চেহারাও খারাপ হয়ে গিয়েছিল। রাজদূত তখন ফিরে গেলেন এবং স্বামীজী পুনরায় নিজ কক্ষে প্রবেশ করলেন। সাধারণতঃ এই সময় তিনি একটু বেড়াতে বের হতেন। কিন্তু সেদিন আর গেলেন না।

এর পর অল্পদিনের মধ্যে কলকাতা থেকে এলাহাবাদ ফিরে এলাম। ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে তখন আমি থাকতাম। পূজনীয় বিজ্ঞান মহারাজ আমাদের ক্লাবে এসে থাকতেন। 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকা তখন মঠ থেকে বের হতো। ঐ নামটি আমাদের মনে ধরেছিল এবং তদনুসারে ক্লাবের নামকরণ হয়েছিল। ছুটি পেলেই কলকাতা ও বেলুড় যেতাম। কিন্তু সব সময় স্বামীজীর দেখা পেতাম না। একবার এইরূপ বেলুড় গিয়ে শুনলাম, তিনি অন্যত্র গিয়েছেন। পূঃ রাখাল মহারাজ মঠে ছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁর কাছে বহুবার গেছি। তাঁকে দেখতাম, কথা খুব কম বলতেন এবং অনেক সময় ভাবস্থ হয়ে থাকতেন। শুনেছিলাম তাঁর আধ্যাত্মিক অবস্থা খুব উচ্চ। ঠাকুর স্বয়ং তাঁকে মানস-পুত্র বলেছেন; কিন্তু একথার গভীরতা বুঝবার সাধ্য আমার ছিল না। তিনি অন্তর্যামী, একথা শুনতাম এবং বিশ্বাসও করতাম। এই সময় আমার মনে কয়েকটি সংশয় ছিল। আমি না বললেও তিনি তা বুঝে আমার সংশয় নিবৃত্তি করে দেবেন—এই আশা নিয়ে আমি তাঁর কাছে চুপচাপ বসে রইলাম। তিনিও কোন কথা না বলে আপনার ভাবে বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি আমাকে বললেন, "মন্মথ! এস একটু বেড়িয়ে আসি।" তখন সন্ধ্যা হয় হয়। মঠ থেকে গেট পর্যন্ত রাস্তা। গঙ্গাতীরে তখনো কোন মন্দিরাদি হয়নি। অধিকাংশ স্থান ফাঁকা। দক্ষিণে জাহাজ-ঘাটের দিকের গেট পর্যন্ত আমরা বারকয়েক হেঁটে গেলাম আবার ফিরলাম। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমার সব প্রশ্নেরই সুমীমাংসা করে দিলেন।

তার পর মঠের সামনে ঘাটের উপর একটি রানার উপর নিজে বসলেন এবং

আমাকেও পাশে বসতে ইসারা করলেন। আমি একটি সিঁড়ি নিচে তাঁর পায়ের কাছে বসলাম। 'স্বামীজী' বললে যেমন স্বামী বিবেকানন্দকে, বোঝায়, সেইরূপ 'মহারাজ' বললে রাখাল মহারাজ বা স্বামী ব্রহ্মানন্দকেই বোঝাত। মহারাজের প্রতি আমার তখন অতিশয় শ্রদ্ধা হয়েছে। আমিও ভাবলাম এঁর কাছে দীক্ষা পেলেই আমার জীবন সার্থক হবে। আমি তাঁকে কাতরভাবে বললাম, "ঠাকুরের পূজা, জপ, ধ্যান করি, কিন্তু মনে হয় দীক্ষা হলে ভাল হয়। আপনি আমায় দীক্ষা দিন।"

রাখাল মহারাজ অল্পক্ষণ অন্তর্মুখী হয়ে বসে রইলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, "তোর গুরু আমি নই। তোর গুরু স্বামীজী।"

একথা শুনে আমি হতাশ হলাম। মনে হলো তাহলে দীক্ষা আর হলো না। বামন হয়ে চাঁদ ধরাও যেমন, স্বামীজীর শিষ্য হওয়াও আমার পক্ষে তেমন। মন্ত্র-শিষ্য তাঁর খুব কম ছিল। আমার আর কি সুকৃতি, যে তিনি মন্ত্র-দীক্ষা দেবেন। মনটা খুবই দমে গেল এবং অল্পদিনে এলাহাবাদ ফিরলাম।

এর পর যে সময় বেলুড় মঠে গেলাম, দেখলাম স্বামীজী মঠেই আছেন। তাঁর স্বাস্থ্যেরও একটু উন্নতি হয়েছে—মনে হলো। আর এক দিন সকালে এসে দেখি, স্বামীজী মঠের পুরনো ঠাকুরঘরের সামনে পায়চারী করছেন। বারে বারে এই শ্লোকটি অস্ফুট স্বরে বলে উঠছেন :

গর্জন্তং রাম রামেতি, ব্রুবন্তং রামরামেতি।
গর্জন্তং রাম রামেতি, ব্রুবন্তং রামরামেতি ॥

শ্রীরাম-জানকীর দেউড়ি পাহারা দিচ্ছেন স্বামীজী—স্বয়ংই যেন তিনি মহাবীর হয়ে গেছেন। মহাবীরের হুঙ্কারে একমাত্র 'রাম রাম' ধ্বনি শোনা যেত। তাঁর প্রতিবাক্যেই 'রাম রাম' এই কথাটিই প্রতিধ্বনিত হতো।

মহাবীরজীকে স্বামীজী মহাশক্তিমান বলতেন। স্বামীজীকে সেদিন দেখে মনে হলো তিনি মহাবীরের মতোই বিরাট শক্তিশালী। তাঁর প্রতি হাবভাব ও পদক্ষেপে সেই শক্তিরই প্রকাশ হচ্ছিল। তাঁর মুখ ভাবে থম থম করছে, হাত দুটি বুকের কাছে, শিকাগোতে লেকচার দেওয়ার যে ছবি দেখা যায়—সেইরূপ। ঈষৎ মাতোয়ারা হলে পা যেরূপ পড়ে—সেইরূপ। অথচ গতি ক্ষিপ্র এবং তির্যক। কখনো হাত-দুটি পাশে দুলিয়ে চলছেন, কিন্তু সেই একই ভাবে ক্রমান্বয়ে পরিক্রমণ করছেন। হঠাৎ তিনি বাইরের দরজার কাছে এসে থামলেন। তার পর বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে দুই বাহু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে মহা পরাক্রমে বলে উঠলেন, "আমি সূর্য চন্দ্রের গতি রোধ করতে পারি।"

অপূর্ব সেই দৃশ্য। একদা লক্ষ্মণ শক্তিশেলে বিদ্ধ হলে মহাবীর সূর্যকে কুক্ষিগত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কার্যের জন্য স্বামী বিবেকানন্দও পুনর্বার তা করতে প্রস্তুত। হেন অসাধ্য কর্ম নেই, যা তিনি করতে পারেন না। সূর্য বা চন্দ্রের গতি-রোধ করবেন, এ আর আশ্চর্য কি ?

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দশ বার জন যুবক এসে স্বামীজীকে দর্শন করবার অভিপ্রায়ে উপরের বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। স্বামীজী ঘর থেকে বাইরে এলে তাঁরা তাঁকে প্রায় ঘিরে ফেললেন, স্বামীজীও সহজভাবে সকলের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কখনো কারও কাঁধে হাত দিয়ে, কখনো কারও পিঠে চাপড় মেরে এমনভাবে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল মনে কথাবার্তা বলছিলেন, যেন তিনি তাদেরই একজন। তাঁর গলায় ছিল একটি সোনার ঘড়ির চেন। সেকালে সোনার ঘড়ি ও ঘড়ির চেন ব্যবহার করার প্রথা ছিল, কিন্তু স্বামীজীকে কখনো এই ঘড়ি ও চেন ব্যবহার করতে দেখিনি। তাঁর সুন্দর রঙে এই সোনার চেনটি দিব্যি মানিয়েছিল। একটি যুবক ঐ চেনে হাত দিয়ে বললেন, "এ চেনটি তো ভারি সুন্দর!" স্বামীজী তাঁর দিকে একবার চেয়ে দেখলেন; পরক্ষণে ঘড়ি ও চেনটি খুলে ফেলে বললেন, "নে, এটা তোকে দিলুম। তোর খুব পছন্দ হয়েছে—তা তুই-ই এটা রাখ।" ছেলেটি বিস্ময়ে হতবাক। ঘড়ি ও ঘড়ির চেন নিয়ে তিনি কি করবেন বা কি বলবেন, ভেবে পেলেন না। পরক্ষণে স্বামীজী তাঁকে বললেন, "এটা তোকে দিলুম; কিন্তু দেখিস—বিক্রি করিসনে যেন। নিজের কাছেই রাখিস।"

শুনেছি বিলেতে থাকাকালে কোন বিশিষ্ট মহিলা স্বামীজীকে ঘড়িটি উপহার দিয়েছিলেন। এমন মহামূল্য বস্তুটি স্বচ্ছন্দে এক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে দান করে দিলেন কেন, তা আমরা ভেবে পেলাম না। তবে তাঁর ত্যাগ দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হলো, সন্দেহ নেই। একবার তিনি বলেছিলেন, "প্রাপ্ত বস্তুর ত্যাগই ত্যাগ। যার সব আছে—অথচ উদাসীন, তারই ঠিক ত্যাগ। যে নিজেই ভিখিরি—তার আবার ত্যাগ?"

কিন্তু আমরা ত্যাগ বলতে যে ধারণা করি, স্বামীজী তার বহু ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাঁর মনটি ছিল অতি সূক্ষ্ম ভাবগ্রাহী যন্ত্রের মতো; তাঁর কোন বস্তুর প্রতি অপরের মনের ছায়াপাত হলেও তা তিনি কাছে রাখা কষ্টকর মনে করতেন। যুবকটির মনে যে লুক্কায়িত ভাবটি ছিল, তা লোভ হতে পারে অথবা সন্ন্যাসীর নিকট সুবর্ণ আছে বলে বিরূপতাও হতে পারে। তাঁর ভাব বুঝে স্বামীজী সহজেই তাঁকে ঘড়িটি দান করে নিশ্চিন্ত হলেন। কে জানে স্বামীজী এই সুবর্ণ ঘড়ি দেওয়ার সঙ্গে মনোজগতে সেই যুবককে আর কি সম্পদ দিয়েছিলেন?

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই স্বামীজীকে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে ইচ্ছা হতো; এজন্য বড়দিনের ছুটিতে দূর থেকেও তাঁরা আসতেন। আগ্রা থেকে কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক এসেছেন, এঁদের মধ্যে দুই একজন অধ্যাপক ছিলেন। মঠের উঠানে কয়েকটি সাধারণ বেঞ্চির উপর তাঁরা বসলেন এবং অদূরে একটি চেয়ারে স্বামীজী ছিলেন। অধ্যাপকবৃন্দ নানা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছিলেন এবং স্বামীজীও হাসতে হাসতে যথাযথ উত্তর দিচ্ছিলেন। দার্শনিক সূক্ষ্ম তত্ত্ব থেকে রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি—কিছুই বাদ গেল না। অবশেষে আগন্তুকগণ উঠলেন। তাঁদের মুখ দেখে মনে হলো তাঁদের চিত্তে প্রসাদ এসেছে।

এই সময় একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। একই সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে প্রশ্ন বর্ষণ করছিলেন, স্বামীজী সে সকলের এমন একটা মীমাংসা করে দিলেন, যার সূত্র ধরে সব কিছুর সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সকলেই স্বামীজীর কথায় পরিতৃপ্ত হলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব নিশ্চিতই ছিল, কিন্তু তাঁর কথাগুলি এমন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, তা সিদ্ধান্তরূপে মেনে নিতে বুদ্ধিমান ব্যক্তির অসুবিধা হতো না।

একবার স্বামীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এলাহাবাদে সাধু অমূল্য থাকে—তাকে চিনিস?" আমি বললাম, "হাঁ।" "তার সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে? সে কেমন আছে? তার কথা আমায় বল।" সংক্ষেপে তাঁর সব কথা জানালাম। অমূল্য-সাধু এককালে প্লেগ ও কলেরা রোগীর খুব সেবা করেছিলেন। তখন তিনি গেরুয়া পরতেন না। লোকের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। পরে তিনি একদল গঞ্জিকা-সেবীর 'গুরুজী' হয়ে পড়লেন, তখন গেরুয়া পরলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি অধঃপতনের শেষ সীমায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। অঘোর-সম্প্রদায়ীদের মতো কতকটা তাঁর আচরণ ছিল। বস্ত্র ত্যাগ করে তিনি নাগাদের মতো থাকতে আরম্ভ করলেন। নিজেকে সোঽহং-সম্প্রদায়ের বলতেন।

একবার প্রয়াগের কুম্ভমেলায় সাধু অমূল্যকেও দেখলাম। কিন্তু তাঁকে ঘিরে তাঁর ভক্তদের অদ্ভুত আচরণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। এক সময় তাঁর সেবাভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম, পরে তাঁর চূড়ান্ত পতন দেখে তাঁর সঙ্গে সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করেছিলাম।

স্বামীজী এ-সকল কথা শুনে অত্যন্ত..দুঃখিত হলেন; কিছুক্ষণ গুম্‌ হয়ে বসে রইলেন। পরে আপন মনে বলে উঠলেন, "Ah! a great soul! a great soul!" (আহা, একটি মহান আত্মা)।

এমন অধঃপতনের পরও স্বামীজী সাধু অমূল্যের নির্ভীক হৃদয় ও সেবাগত প্রাণটাই দেখলেন। তাঁর দোষের কথা একবারও মনে করলেন না। আমাকে বললেন, "তার এ জন্মটা নষ্ট হলো। যাক, পরজন্মে মুক্ত হয়ে যাবে।" প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বললেন, অমূল্য তাঁর সঙ্গে একই কলেজে পড়ত। সে ছাত্র-জীবনে ভাল ছেলে ছিল—মেধাবী ও বুদ্ধিমান। তখনই তার হৃদয় উদার ও জ্ঞানমার্গের প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল। সে গুরুকরণে বিশ্বাসী ছিল না। তার সাধনার জীবনে পুস্তক ও নিজের সংস্কারই প্রধান অবলম্বন হয়েছিল।

কলেজ-জীবনে অমূল্য নরেন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন, মনে হয়। শেষ দিকে অঘোর ও নাগা সম্প্রদায়ের দ্বারাও কিছুটা প্রভাবান্বিত হওয়া সম্ভব। তবে তাঁর ভক্ত ও স্তাবকবৃন্দ বিশেষ মার্জিতরুচি ছিল না। এজন্য বেদান্তের 'সোঽহং' ভাবের সঙ্গে নিম্নস্তরের সাধনা-পদ্ধতির সংমিশ্রণ হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়।

যা হোক, স্বামীজীকে তার জন্য বিশেষ বিচলিত হতে দেখে আমি চুপ করে বসে রইলাম। স্বামীজী বললেন, "মন্মথ! তুই এলাহাবাদে গিয়ে একবার অমূল্যর সঙ্গে দেখা করিস। আর তাকে বলিস, তোকে আমিই পাঠিয়েছি। তাকে জিগ্যেস করবি, তার কি চাই। সে যা বলবে, তা তুই তাকে এনে দিস।"

এলাহাবাদে ফিরেই 'গুরুজী'র কাছে অনেককাল পরে গেলাম। গিয়েই বললাম, "মশাই! আপনার কাছে এসেছি স্বামীজী পাঠিয়েছেন বলে; তা না হলে আসতাম না। আপনার কি কি চাই আমাকে বলুন; তা আমি এনে দেব। স্বামীজী আমাকে এই রকম আদেশ করেছেন।"

অমূল্য আমার কথায় শ্লেষের দিকে দৃক্‌পাত না করে উৎফুল্ল স্বরে বললেন, "অ্যাঁ, স্বামীজী তোকে পাঠিয়েছে? স্বামীজী! তা সে কি বললে আমার কথা?" আমি যথাযথ সবিস্তারে জানালে তিনি চুপ করে রইলেন এবং তাঁর দুই চোখে অশ্রু প্রবাহিত হলো। কিছুটা ভাবাবেগ সংবরণ করে বললেন, "তুই আমাকে চার পাঁচ সের গাওয়া ঘি এনে দিস, আর কিছু ফল এনে দিস।" কয়েক দিনেই এক ভাঁড় গাওয়া ঘি সংগ্রহ করলাম। পশ্চিমে গাওয়া ঘি দুষ্প্রাপ্য বস্তু, ভয়সা ঘি প্রচুর পাওয়া যায়। কোনক্রমে গাওয়া ঘি কয়েক সের এবং কিছু ফল নিয়ে তাঁকে দিয়ে এলাম। জিনিসগুলি সামান্যই। কিন্তু অমূল্য সাধু সেগুলি পেয়ে বিশেষ প্রসন্ন হলেন। এই আমার তাঁর কাছে শেষবার যাওয়া। কিছুদিন তাঁর কোন খোঁজ রাখিনি। পরে শুনলাম তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে।

সাধু অমূল্য স্বামীজীর কথাগুলি শুনে অদৃশ্যভাবে তাঁর কৃপা অনুভব করেছিলেন। কৈশোরে যে বেদান্তদর্শন তাঁর লক্ষ্যবস্তু ছিল, তার আভাস স্বামীজীর কৃপাবলে তাঁর লাভ হয়ে থাকবে। বন্ধুভাবে স্মরণ করলেও স্বামীজী তাঁকে গুরুকৃপা করেছিলেন মনে হয়। শেষের দিকে অমূল্য প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প নিয়ে জাহ্নবীতটে মাতা ভাগীরথীর কোলে তাঁর পাপপুণ্যের সংস্কার ফেলে দিয়ে সাধনার জগতে প্রবেশ করলেন। কে জানে, পুনরায় জন্মগ্রহণ করে ব্রহ্মলাভের জন্য আবার কোথায় তপস্যা করছেন!

স্বামীজী বলেছিলেন, "সাধু অমূল্য গুরু করেনি, তাই এ-রকম হলো। সাধকের পতনের উপক্রম হলে তার গুরুই তাকে unbalanced (বে-সামাল) হতে দেন না। গুরুই তাকে রক্ষা করেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মশায়, আমার যদি পতন হয়, তাহলে কি আপনি আমাকে রক্ষা করবেন?"

স্বামীজী গম্ভীর স্বরে বললেন, "নিশ্চয় করব। তোর সাধ্য কি তোর পতন হয়। আর যদি তুই নরকেও যাস, তোর টিকি ধরে তোকে তুলে আনব।"

স্বামীজীর স্বভাব ছিল অত্যন্ত রাশভারী। দেখলেই সমীহ হয় এমনই ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাঁর মধ্যে অনেক সময় লুকিয়ে থাকত আর একটি ব্যক্তিত্ব। সে যেন দুরন্ত শিশু

—না আছে মান, না অপমান। দুনিয়ার সব কিছুই যেন তাঁর কাছে খেলা। যারা কখনো তাঁর এই নিরভিমান শিশুভাব-মূর্তিটি দেখেছে, তারাই বুঝতে পারবে—'বাল-গোপাল'-ভাবটি কি।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের পর স্বামীজীর স্বাস্থ্য ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। এক বৎসরে গাল চুপসে এমন রোগা হয়ে গেলেন যে দেখলে কষ্ট হয়। সেই কালে ডায়াবিটিস্ রোগের ভাল চিকিৎসাও ছিল না। স্বামীজীরও রোগ মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল। এই সময় কিছুকাল তাঁর জন্য টাটকা ছাগলদুধের ব্যবস্থা করা হলো। মঠেই একটি ছাগল পোষা হলো। একদিন তাঁর খেয়াল চাপল, নিজেই দুধ দুইবেন। শুধু পা, হাঁটুর উপর বহির্বাস তোলা—ঘটিটা দুই হাঁটুর মধ্যে—এমন করে দুধ দুইলেন যেন ও-কাজে তিনি কতকাল অভ্যস্ত। ঠিক এই সময় একটি যুবক এসে উপস্থিত। সে দেখতে এসেছিল বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মিপ্রবর স্বামী বিবেকানন্দকে। তাঁকে এই কাজে ব্যাপৃত দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল। স্বামীজী অল্পক্ষণে ঘটি রেখে চলে গেলেন ভিতরে। তখন সেই ছোকরাটি তার সঙ্গীকে আশ্চর্য হয়ে বলছে, "ইনিই বিবেকানন্দ!"

বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীজী চুরুট খেতেন। সেটাও প্রথম প্রথম বেশি—পরে তা কমিয়ে দিয়েছিলেন। হুঁকায় কলকে বসিয়ে সুখটান দেওয়াই ছিল তাঁর চিরন্তন অভ্যাস। অনেক সময় তামাক হয়তো পুড়ছে, কদাচিৎ ঈষৎ টান দিচ্ছেন অভ্যাসবশে, কিন্তু মন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। তামাকটা হয়তো পুড়েই গেল। তখন সেবক ব্রহ্মচারী কাউকে ডেকে হয়তো বললেন, "তামাকটা পালটে দে তো।"

রাখাল মহারাজও তামাক খেতে ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর তাম্রকূট সেবন করা দেখলে মনে হতো খুব তোয়াজ করে আয়েস করে টান দিচ্ছেন।

তাঁর সব কাজেই একটা রাজকীয় ভাব ছিল। স্বামীজী তাই তাঁকে বলতেন, 'রাজা' (রাখালরাজের অপভ্রংশ)। কখনো বলতেন, 'মহারাজা'। তাঁকে আমরা সংক্ষেপে বলতাম, 'মহারাজ'। তামাক খেতে খেতে মহারাজকে প্রায়ই দেখা যেত একেবারে অন্য জগতে মন চলে গেছে। ডাকলে কখনো বলতেন—'হুঁ', আবার কখনো কোন সাড়া নেই। তাঁর মনটি সহজেই যেন অন্তর্মুখী থাকত মনে হয়। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকলে পরে আবার নিজেই কথা বলতেন।

স্বামীজীর কিন্তু সচরাচর এই রকমটি দেখা যেত না। তাঁর স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পূর্ণ বহির্জগৎকে দেখছে বলে মনে হতো। কিন্তু একটা নিরাসক্তভাবে যেন সব দেখে যাচ্ছে—ভাসা-ভাসা। খুব একটা মজা দেখে সে-চোখে আনন্দ যেন বিচ্ছুরিত হতে থাকত। চোখের দৃষ্টিতেও এক এক সময় যেন বিদ্যুতের ঝলক দিয়ে যেত। সেই দৃষ্টি যে দেখত, তারই মনে একটা ত্রাস বা সম্ভ্রম জেগে উঠত, মন আপনিই বলে দিত—ইনি পরম শক্তিমান পুরুষ—সাবধান!

কিন্তু এই মানুষটিই যখন দিন-মজুরদের সঙ্গে বসে গল্প করতেন এবং তাদেরই মতো ছিলিম ধরে দা-কাটা তামাক খেতেন আর হাতে কলকে ধরে লম্বা টান দিয়ে এক

মুখ ধোঁয়া বার করতেন, তখন কে বলবে তিনি তাদেরই কেউ একজন নন। তখন তাঁর মুখের হাসি গল্প কথা শুনে মনে হতো, তাদের জীবনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন। পরিব্রাজক-জীবনেও কখনো কখনো রাস্তার ধারে কারও কাছে তামাক চেয়ে খেয়েছেন, শোনা যায় ; অথচ এক নাগাড়ে তিনদিন অবধি উপবাস করেছেন, কিন্তু কারও কাছে চেয়ে কিছু খাননি।

তাঁর নিজের মুখেই বলতে শুনেছি—পরিব্রাজক-জীবনে এক আধ দিন উপবাস করাকে তিনি উপেক্ষাই করেছেন, তবে কখনো তিন দিনের বেশি উপবাসও করতে হয়নি। সেই সময় একবার 'বাঘে খেয়ে ফেলুক' ভেবে বনে বসেছিলেন। বাঘ কিন্তু ফিরে চলে গেল দেখে দুঃখিতস্বরে বললেন, "বাঘেও খেল না।"

একবার স্বামীজী ট্রেনে যাচ্ছেন—সেকেণ্ড ক্লাসে ; বারে বারে বাথরুমে যেতে হতো এই একটা কারণ, তাছাড়া ভিড় সহ্য করতে পারতেন না ; স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল—তাই ট্রেনেও একটু বিশ্রাম প্রয়োজন হতো। সেবক ব্রহ্মচারী অন্য কামরায়—কখনো ইণ্টার কখনো বা থার্ড ক্লাসে যেতেন, স্টেশনে ট্রেন থামলে এসে খবরাখবর নিয়ে যেতেন। শরীর ভাল নয়, তাই সেবার অধিকাংশ সময় বার্থে শুয়েই ছিলেন। সেই কম্পার্টমেণ্টে মাত্র আর একজন আরোহী। তিনি বাঙালী ভদ্রলোক, কিন্তু সাহেবী-ভাবাপন্ন। পোস্ট অফিসের একজন বড় কর্মচারী। স্বামীজী নিজে থেকে কোন কথা বলেননি। ইংরেজী-কেতায় কেউ পরিচয় না করালে আবার কথা বলা যায় না, তাই সেই বাঙালী-সাহেবও কয়েক ঘণ্টা একসঙ্গে থাকলেও কথা বলেননি। গন্তব্যস্থল আসায় তিনি নেমে গেলেন।

জীবনে সেই একটিবার মাত্র তিনি স্বামীজীকে দেখেছিলেন। পরে তিনি স্বামীজীর পুস্তকাদি পাঠ করে আকৃষ্ট হন। তিনি বলতেন, "স্বামীজীকে দেখে তখন কিছুই বুঝতে পারিনি। কত বড় লোক তিনি! কিন্তু তাঁর চোখদুটি দেখে বারে বারে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। মনে হলো—হাঁ, খুব শক্তিমান পুরুষ! কিন্তু কি আধ্যাত্মিক সম্পদের কাছে এতক্ষণ কাটালাম, তা তখন মোটেই বুঝতে পারিনি!"

স্বামীজী যখন আমেরিকায় তখন বাঙালী শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই মনে তাঁর প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব জেগেছিল। একজন ভারতবাসী বিদেশে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছেন—এইটাই ছিল স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধার প্রধান কারণ। কিছু লোকে তাঁর লেখাও কিছু কিছু পড়েছিলেন। তাঁরা অবাক হতেন তাঁর অভিনব ভাব ও ভাষায়। এ রকম জোরালো ভাষা পূর্বে কেউ শোনেনি।

কিন্তু স্বামীজী যখন বিদেশ থেকে ফিরে এলেন, তখন এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হলো। সবাই কি যে করবে, আনন্দে তা ভেবে পেল না। কলকাতায় তাঁর গাড়ির ঘোড়া খুলে ফেলে যুবকেরা রথের মতো টেনে নিয়ে চললেন। সে-ঘটনা আমি চোখে দেখিনি। কিন্তু বাঙলার বাইরেও সর্বত্র বাঙালী-সমাজে সেই আলোড়নের ঢেউ গিয়ে লেগেছিল।

স্বামীজী তখনও ভারতে ফেরেননি। রামবাবু (শ্রীরামচন্দ্র দত্ত) খোল-করতাল সহকারে বহুলোক-সমেত 'রামকৃষ্ণ'-নাম-সঙ্কীর্তন বার করতেন। সে-কীর্তন আমি দেখেছি। রামবাবু নিজে ভাবে মাতোয়ারা হয়ে যেতেন। উচ্চৈঃস্বরে—'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলে লাফাতেন। দেখে মনে হতো, তাঁর ভিতরের ভাব যেন চেপে রাখতে পারছেন না। তিনি বক্তৃতাও দিতেন খুব ভাল। বহু লোক তাঁর বক্তৃতা শুনতে যেতেন—আমিও গেছি। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল—শ্রীরামকৃষ্ণ এ-যুগে অবতার হয়ে এসেছেন। এই আনন্দ-সংবাদ পারলে তিনি প্রত্যেক ঘরে ঘরে দিয়ে আসেন।

শুনেছি এই খবর বিদেশে থাকতে স্বামীজী শোনেন এবং রামবাবুকে এভাবে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে বারণ করেন। কিন্তু রামবাবুকে তখন যেভাবে দেখেছি, তাতে মনে হয়, তিনি সে-সময় ভাবোন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। বারণ শুনে চলার মতো বোধ হয় তাঁর অবস্থাই ছিল না। রামবাবুর প্রতি আমার খুব শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর মুখে ঠাকুরের কথা শুনে আমি প্রথম প্রেরণা পাই; এবং মঠে যেভাবে ঠাকুরের ছবি রেখে পুজো করা হতো—সেইভাবে এলাহাবাদে একটি ঘর ভাড়া করে আমরাও তাই আরম্ভ করি। ক্রমে তা 'ব্রহ্মবাদিন্' ক্লাবে রূপান্তরিত হয়।

সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একজন উচ্চকোটির সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ একথা সকলেই মেনে নিতেন। স্বামীজী স্বয়ং একজন অতি শক্তিমান মহাপুরুষ— তাও লোকে মানতেন। কিন্তু 'রামকৃষ্ণ অবতার', একথা তাঁরা নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্বামীজী বিলাত হতে ফিরে এসেও ঠাকুর-সম্বন্ধে বিশেষ প্রচার করেননি। এ নিয়ে তাঁর গুরুভাইরাও তাঁকে অনুযোগ করেছেন। স্বামীজী যে ঠাকুরকে কি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে দেখতেন, তা তিনি নিজের মুখেই বলেছেন, "শেষে কি শিব গড়তে বাঁদর গড়ব?"

তাই তিনি চেয়েছিলেন কতকগুলি জীবন গঠন করতে—তাঁর অবর্তমানে তাঁর কাজ যাঁরা করে যেতে পারবেন আর ভবিষ্যতের জন্যও অন্য জীবন গড়ে তুলবেন। এঁদের মধ্যে সুধীর মহারাজ, কালীকৃষ্ণ মহারাজ প্রভৃতি গোড়া থেকেই যোগ দেন। সুধীর মহারাজ বয়সে কিছু বড় ছিলেন। তাঁরা চিরদিন আমাকে স্নেহ করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি—স্বামীজী ধ্যান-ধারণা ও ব্রহ্মচর্যের উপর বিশেষ জোর দিতেন। বাইরে কর্মের ভাবের উপর জোর দিলেও অন্তরঙ্গদের কাছে আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠতা-সম্বন্ধে বলতেন। ধ্যান-ধারণা স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান—এইগুলি তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

গুপ্ত মহারাজের প্রেরণায় আর একদল সেবাব্রতী গড়ে ওঠে। 'পরের জন্য হৃদয় কাঁদা চাই'—এইভাবে সেবা করতে হবে: এইটা ছিল গুপ্ত মহারাজের শিক্ষা। যাদের মধ্যে এই ভাবটা ছিল, তাদের প্রতি স্বামীজী ও অন্য মহারাজদের বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ ছিল। এই সেবাব্রত যাঁরা নিয়েছিলেন, তাঁরা স্বামীজীকেই জীবনের আদর্শ

বলে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের যে গভীরতা ছিল, তার পরিচয় পাবার সৌভাগ্য হয়েছে খুব কম লোকেরই। তাঁর মতো এত বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকও নিজেকে এই বিষয়ে অতি প্রচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। তাই সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁর আধ্যাত্মিক স্বরূপ অধিক প্রকাশিত ছিল না।

স্বামীজী সর্বপূজ্য ছিলেন তাঁর বাগ্মিতার জন্য এবং শক্তিমান পুরুষ হিসেবে—তবে তাঁর স্বদেশপ্রেম সকলের হৃদয় জয় করেছিল। এত বড় প্রাণ আর দেখা গেছে বলে মনে হয় না। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর এই স্বদেশপ্রেমকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। তেমনই আবার মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর আধ্যাত্মিক গভীরতার ও শক্তির উপর বেশি জোর দিতেন। ভারতবর্ষে এসে তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। তাঁর এক বন্ধু সন্ন্যাসী আমাকে বলেছিলেন, "তোদের স্বামীজী যে কি করে গেল, তা বুঝতে এক হাজার বছর লাগবে।" প্রকৃতপক্ষে স্বামীজীর মধ্যে বহু জিনিস এমন রয়ে গেছে, যা সর্বসাধারণের নিকট আজও সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয়নি।

স্বামীজী আমাকে বললেন, "আমার কাছে যা জানতে ইচ্ছে করিস, আমাকে জিগ্যেস কর।" আমি বললাম, "ইংলণ্ডে আপনি 'মায়া' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তা অনেকবার পড়েছি; কিন্তু মায়া কি বুঝতে পারিনি।" "কিসে পড়লি?" "Indian Mirror-এ।"

"দেখ! মায়া কি তা বোঝা এক, আর মায়া অনুভব করা আর এক রকম।" আমি বললাম, "আপনার কাছে মায়ার রহস্যের কথা বুঝতে চাই।" কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে থেকে বললেন, "ও থাক! অন্য কিছু জানতে চাস তো বল।" আমি বললাম, "আপনার মতো ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বোঝালেও যদি মায়া কি, না বুঝতে পারি, তাহলে জানব এ জন্মে ও রহস্য আর বোঝা হবে না।"

অতঃপর স্বামীজী মায়ার তাৎপর্য বুঝাতে লাগলেন। বহুক্ষণ তিনি অনর্গল যা বলে গেলেন, তা লিখতে পারলে একটি বহুমূল্য প্রবন্ধ হতো। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমার অনুভূতি স্থূল ইন্দ্রিয়-রাজ্য ছাড়িয়ে এক অতি সূক্ষ্ম সত্তা অনুভব করল। আমার চোখের সামনে ঘরবাড়ি সবই প্রবলবেগে কম্পিত হতে লাগল। অবশেষে সমস্ত দৃশ্য-জগৎ এক মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। পুনরায় এই জগতে মন ফিরে এল বটে, কিন্তু একটা স্বপ্নের ঘোর যেন লেগে রইল।

এই অনুভূতির পরক্ষণেই আমার ব্যক্তিত্বেরও যেন পরিবর্তন অনুভব করলাম। স্বামীজীর প্রতি আমার যে ভয় ও সঙ্কোচ ছিল, তাও যেন কেটে গেল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল—এক অখণ্ড অবিভাজ্য সত্তা সর্বত্র বর্তমান। স্বামীজী, এই মঠ প্রভৃতি এবং আমি—সব যেন তার মধ্যে এক অংশ।

তখন আমি বললাম, "স্বামীজী! আপনিও তো মায়ার মধ্যেই রয়েছেন। আপনার মঠ, স্কুল, দরিদ্রসেবা—এসবও তো মায়া। আপনার এসব করবার কি দরকার?"

স্বামীজী হেসে বললেন, "হ্যাঁ। তুই ঠিক বলেছিস। আমি মায়ার মধ্যেই রয়েছি। তবে আমি মায়ার সঙ্গে খেলা করছি। যে মুহূর্তে ইচ্ছা হবে—এই খেলা ছেড়ে দেব। তোর মায়ার সঙ্গে খেলা ভাল না লাগে, তুই পাহাড়ে চলে যা। সেখানে কোন গুহায় বসে তপস্যা করগে।"

কর্ম করবার মূলসূত্রটি সেদিন বুঝতে পারলাম। "ভগবানকে জেনে কর্ম করলে সেটা হয় লীলা—সেটা হয় আনন্দের জীবন। যতক্ষণ সত্য বস্তু জানা নেই, ততক্ষণ মানুষের তপস্যা ও ত্যাগ সহায়ে বিচার ও ধ্যান প্রয়োজন।"

স্বামীজী উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পদপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করে দিলাম, তারই নিদর্শনস্বরূপ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলাম এবং তিনিও স্থির অবিচল শিবস্বরূপ হয়ে তা গ্রহণ করলেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় হয়ে গিয়েছিল। আসন ও পাতা করা হয়ে গিয়েছিল। স্বামীজীর আসার অপেক্ষায় সকলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এইবার সকলে পরিবেশনের ব্যবস্থা করলেন। ইতিমধ্যে স্বামীজী ভাণ্ডার-ঘরের দিকে গিয়ে একটি আপেল ও ছুরি চেয়ে নিলেন। আপেলটি নিজেই ছাড়াতে লাগলেন এবং বারান্দার পায়চারি করতে করতে এক টুকরো কেটে আমাকে দিলেন। পরে এক টুকরো নিজের মুখে দিলেন। এইরূপে আমি তাঁর হাতে প্রথম প্রসাদ পেলাম। প্রসাদ যে মনের প্রসন্নতার প্রকাশ তা সেদিন বুঝলাম। যে তত্ত্ববস্তু অতি গূঢ় রহস্যাবৃত, তা আধিকারিক পুরুষেরা ইচ্ছামাত্র এই ফলের মতোই বিলোতে সক্ষম, আবার তাঁদের প্রেম ও আশীর্বাদ এই স্থূল অন্ন হয়ে আমাদের চিত্তপ্রসাদ আনতে পারে, তাও পরম সত্য বলে বুঝলাম।

ফলপ্রসাদ পেলাম, ইচ্ছাময় যেন মনের ইচ্ছাটাই পূর্ণ করলেন। তখন লোভ আরও বেড়ে গেল ; মনে হলো যদি স্বামীজী অন্ন-প্রসাদ দিতেন, তাহলে জীবন সার্থক হতো। পঙ্‌ক্তি-ভোজনের সময় স্বামীজী যেখানে বসেছিলেন, তারই অন্য আর এক দিকে—কিছু দূরে আমি ছিলাম। ঠাকুরের অন্ন-প্রসাদ স্বামীজীর পাতে দেওয়া হলো এবং পরে অন্য সকলের পাতায় একজন ব্রহ্মচারী তা পরিবেশন করতে লাগলেন। অন্য আর একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে স্বামীজী তার হাতে তাঁর পাত থেকে কিছু অন্ন তুলে দিয়ে বললেন, "এটা মন্মথকে দিয়ে আয়।" ঠাকুরের লীলাসহচরগণ অন্তর্যামী, তার প্রমাণ হাতে হাতে পেলাম।

বিচারপ্রবণ মনের স্বভাব হলো সংশয়। ভাবপ্রবণ ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবৎ-আশীর্বাদ সহজেই পেয়ে থাকেন। আমার মন ভাবপ্রবণ ছিল না, এইজন্য সংশয় তোলাই ছিল তার স্বভাব। কিন্তু সেই প্রসাদের গুণে আমার সংশয়ধর্মী মন নিরস্ত হলো এবং আমি অকপটে মনে মনে আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলাম।

দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সকলের কিছুক্ষণ বিশ্রামের সময়। স্বামীজী নিজ কক্ষে প্রবেশ করলেন। কিন্তু বিশ্রাম করবার সময় তাঁর ছিল না ; মঠের নিয়মাবলী লেখাতে তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যেন বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর শরীর

বেশি দিন থাকবে না। তাঁর অবর্তমানে মঠের পরিচালনা যেভাবে হবে, তার একটা বিধিবন্ধ নিয়ম করে যাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। মঠ ও মিশন যে সুদীর্ঘকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব ছড়াবে, তা তিনি দিব্যচক্ষে দেখেছিলেন। সেই ভাব সমাজে পরিবেশনের জন্য যে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রয়োজন, সেইরূপ কতকগুলি জীবনও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু ভাবীকালে তা কিভাবে অনুরূপ গতিশীল থাকবে, তারও একটা আভাস তাঁর মনে উদিত হয়েছিল এবং তদনুযায়ী তিনি মঠের নিয়মাবলী রচনা করেন।

সেইদিন আমি মঠে থেকে গেলাম। পরদিন প্রভাতে উঠে সকলে যখন স্বামীজীকে প্রণাম করতে গেলেন, তার কিছুক্ষণ পরে আমিও উপস্থিত হলাম। স্বামীজী নিজ কক্ষের বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চোখ দুটি ঈষৎ ফোলা, যেন ভাবের নেশায় ভরে রয়েছেন। তাঁর মুখে হাসি লেগেই আছে। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম, মনে হলো ঠাকুরই যেন দাঁড়িয়ে আছেন। কথা বললেন (ঈষৎ জড়িয়ে, যেন মাতাল হয়েছেন), "যা তুই গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আয়। শীগ্‌গির আয়।"

কৃপা যে করবেন, এ তারই সূচনা। দৌড়ে চলে গেলাম। সত্য সত্যই একটি ডুব দিয়ে ফিরে এলাম। ঠাকুরের ভাব না হলে তিনি দীক্ষা দিতেন না। মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেনও মাত্র কয়েকজনকে। আমার সেই সৌভাগ্য উপস্থিত, এ যেন অকল্পনীয়।

তাঁর ঘরে প্রবেশ করে দেখি একটি সোফায় চিৎভাবে শুয়ে আছেন। একটি হাত এলিয়ে দিয়েছেন; বললেন, "আমায় ধর। আমার হাতটা ধরে থাক।" আমার ডান হাতে তাঁর ডান হাতের কব্জির কাছে চেপে ধরলাম। সেইখানেই মেজের উপর বসে পড়লাম। দেখলাম—তাঁর কব্জি বেশ চওড়া। মাথায় তিনি প্রায় আমারই মতন ছিলেন এবং আমার শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল—একটু পালোয়ানী ধরনের, খেতেও পারতাম প্রচুর—কিন্তু দেখলাম, আমার আঙুলে তাঁর হাতের বেড় পেলাম না। রোগা হয়েছিলেন, তথাপি হাতের কব্জি বেশ চওড়া ছিল। তাই তাঁকে ধরলাম বটে—কিন্তু তবু ফাঁক রয়েই গেল।

স্বামীজী চক্ষু মুদ্রিত করে স্থির হয়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, কতক্ষণ যে চলে গেল তা বুঝতে পারলাম না, কারণ ক্রমে আমার মনও আচ্ছন্ন হয়ে গেল, কালের ও স্থানের মাপ করতে ভুলে গেলাম। তার পর স্বামীজী সোফা থেকে উঠে গালিচার ওপর বসলেন। আমাকেও সামনের অন্য একটি গালিচায় বসতে বলে বললেন, "স্বপ্নে তুই মায়ের কুমারী-মূর্তি দেখেছিস, এর পর তুই মায়ের —এই ষোড়শী মূর্তি ধ্যান করিস।"

আমার এই স্বপ্নের কথা আমি কাকেও বলিনি। সাতটি কুমারী-মূর্তি দেখেছিলাম প্রত্যেকের মাথায় সুবর্ণ মুকুট, হিরণ্ময়ী জ্যোতির্ময়ী সব মূর্তি—সালঙ্কারা এবং পরমাসুন্দরী। এঁরা একের পর একজন করে সম্মুখে এলেন এবং পাশ দিয়ে দূরে চলে গেলেন।

স্বামীজী বলে চললেন, "এর কিছু পরে তুই স্বপ্নে মহাদেবকে দেখিস ত্রিশূল হাতে। তিনি তোকে এই—মন্ত্র দেন। সেই অবধি তুই ওটাই জপ করিস।"

প্রথম স্বপ্নের কয়েক বৎসর পর আমি স্বপ্নে ঐরূপ মন্ত্র পেয়েছিলাম, এবং জপও করতাম। কিন্তু একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউই সে কথা জানত না। স্বামীজীর কথা শুনে খুবই বিস্মিত হলাম। আমরা যেমন আরসিতে মুখ দেখতে পাই, স্বামীজী সেইরূপ মনগুলিকে দেখতে পেতেন। এইরূপ অন্তর্যামিত্ব যাঁর, তাঁকে ভগবান ছাড়া আর কি বলব?

এরপর তিনি আমাকে বললেন, "এখন তোর মন্ত্র এই—।" ঐ বীজমন্ত্র উচ্চকণ্ঠে তিন বার আমাকে শুনিয়ে বললেন, "এবার থেকে এই—তোর ইষ্ট মূর্তি।" মানস চক্ষে দেখতে পেলাম সেই মূর্তি। দীক্ষা ও সাধনার ক্রম সম্পর্কে তখন কিছু উপদেশ দিলেন, তা একান্ত ব্যক্তিগত। গুরুপূজার মন্ত্র ও ন্যাস-স্থান দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "মানস প্রণামের পর গুরুর স্পষ্ট মূর্তি ধ্যান করতে হয়। সহস্রার-ই প্রকৃষ্ট স্থান। পরে ইষ্টের মন্ত্র জপ করতে করতে হৃদয়ে ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে হয়। প্রথমে পা থেকে মানসপূজা আরম্ভ করতে হয়। ক্রমশঃ ওপর দিকে উঠে মুখ পর্যন্ত ধ্যান করতে হয়। তবে ধ্যানের গভীরতায় হাত বা পা কিছুই থাকে না। মূর্তির চিন্তা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ নির্বিকল্প সমাধি হয় না। কিন্তু একটির পর একটি ধরে চলতে হয়। নইলে সুদীর্ঘ সময় লাগতে পারে।"

দীক্ষান্তে আমায় বললেন, "আমার কাছে বসে জপ ও ধ্যান কর। যত কাজেই ব্যস্ত থাকিস না কেন, প্রত্যহ সামান্য ক্ষণের জন্যও ওটা করিস।"

স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই সময় মাঝে মাঝে মঠে আসতেন। স্বামীজী যেমন গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে আমোদ করতেন, মহিমবাবুকেও কতকটা সেইরূপ করতে দেখেছি। তিনি সাদা কাপড়ে থাকতেন, সাধারণতঃ ধুতি ও পাঞ্জাবী পরতেন। তাঁর গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ। স্বামীজীর রঙ আর কোন ভ্রাতা পাননি। তবে শরীরের গঠন সব ভ্রাতারই এক ধরনের ছিল। স্বামীজীর সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেশ মিল ছিল; তাঁরও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। চোখদুটি তাঁর ছোট ছিল, তাঁর নেত্র বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে প্রদীপ্ত ছিল। স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন, আবার স্বামীজীর শিষ্যদের সঙ্গেও আলাপ করতে ছাড়তেন না।

একদিন স্বামীজী আমাকে বললেন, "দ্যাখ। দু নৌকায় পা দিসনি। যা হয় একটা কর।" হয় বিবাহ করে সংসার করা, নইলে সন্ন্যাস নেওয়া—এই দুটির একটি বেছে নিতে বললেন। আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে বললেন, "তাড়া নেই। তবে মন স্থির করে নে।"

এর এক বৎসর পর আমার বিবাহ হয়।

"এই শরীর আর কর্ম করবার উপযুক্ত হবে না। এটা ছেড়ে আবার নতুন শরীর নিয়ে আসতে হবে। এখনো অনেক কাজ বাকি রয়ে গেল।"

আর একদিন ভাবের মুখে তিনি বললেন, "আমি মুক্তি চাইনে। যতদিন না সব জীবের মুক্তি হবে, ততদিন আমাকে বার বার আসতে হবে।"

এই সময় চীনদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। পাশ্চাত্য শক্তিমান দেশগুলি চীনকে ভাগাভাগি করে শোষণনীতি অবলম্বন করেছিল। জাপানও তাদের দলে ভিড়ল। সেই সময় স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এত পুরাতন সভ্য একটা দেশ—এইবার কি শেষ হয়ে যাবে?" স্বামীজী অল্পকাল চুপ করে রইলেন; পরে বললেন, "আমি দেখেছি—একটা প্রকাণ্ড হাতির পেটে একটা বাচ্চা হয়েছে। সেই বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ হলো—কিন্তু সেটা একটা সিংহশাবক। এই বাচ্চাটা বড় হবে। তখন নতুন চীন তোয়ের হবে।"

ভারত সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে। কিন্তু যেভাবে সাধারণতঃ দেশ স্বাধীন হয়, সেভাবে নয়।[১] কুড়ি বৎসরের মধ্যেই একটা মহাযুদ্ধ হবে। পাশ্চাত্য দেশগুলি যদি materialism (জড়বাদ) না ছাড়ে, তাহলে আবার যুদ্ধ অনিবার্য। স্বাধীন ভারতবর্ষ ক্রমে পাশ্চাত্যের materialism (জড়বাদ) নেবে। প্রাচীন ঐহিক গৌরবকে নতুন ভারত ম্লান করে দেবে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশ উত্তরোত্তর অধ্যাত্মবাদী হবে। তারা জড়বাদের শিখরে পৌঁছে বুঝেছে—জড়ে শান্তি দিতে পারে না।"

স্বামীজীর বহু ছবি আছে, এবং তা থেকে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। কিন্তু মানুষকে দেখা এক, আর ছবিতে দেখা আর এক রকম। এক কথায় বলতে গেলে এ রকম মানুষ বড় দেখা যায় না। দেখলে মনে হতো, শুধু দেখতেই থাকি। তাঁর চলন-বলন সবই সুন্দর। জীবনে অনেক ভাল ভাল সাধু-সন্ন্যাসী দেখেছি। কারো কারো অলৌকিক ক্ষমতাও ছিল। কাশীর 'ত্রৈলঙ্গ স্বামী', এলাহাবাদের 'শাহ্‌জী' এবং কানপুরের 'নাগা বাবা'—এই তিনজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু স্বামীজীর মতো এমন আকর্ষণ কোথাও বোধ করিনি। আর এমন দুটি চোখও আর দেখলুম না।

স্বামীজীর রঙ তখন খুবই ফরসা ছিল। পায়ের দিক আবার বিশেষভাবে ফরসা। হাতের তেলো, পায়ের চেটো রক্তিমাভ ছিল। বাবুরাম মহারাজ খুব ফরসা ছিলেন, মহাপুরুষ মহারাজের রঙ স্বামীজীর চেয়েও ফরসা; কিন্তু স্বামীজীর বর্ণের

১ স্বামী লোকেশ্বরানন্দের কাছে শুনেছি, কুমুদবন্ধু সেন স্বামীজীর মুখে বেলুড় মঠে ১৮৯৮ / ১৮৯৯ সালে শুনেছিলেন: "আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ অভাবনীয় উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করবে।" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ কথাটি শুনেছিলেন কুমুদবন্ধু সেনের কাছেই।

—সম্পাদক

মধ্যে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য ছিল যে, তিনি যত না ফরসা ও সুন্দর ছিলেন, তার চেয়ে বেশি মনে হতো। সহোদর ভাইদের মধ্যেও স্বামীজীর রঙ সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল ছিল।

যারা স্বামীজীর মাতাঠাকুরানীকে দেখেছেন, তাঁরা জানেন—স্বামীজীর সব ভ্রাতাই কতকটা মায়ের মুখাকৃতি পেয়েছিলেন। স্বামীজী যে গঠনকে (নিজ মুখের) মঙ্গোলদেশীয় বলে নির্দেশ করতেন, তা সকল ভ্রাতার মধ্যেই পরিস্ফুট; তবে স্বামীজীর মুখের চোয়াল ও চিবুক কিছু অধিক পরিমাণে দৃঢ়তাব্যঞ্জক ছিল। চোখ-দুটি মায়েরই অনুরূপ; তবে স্বামীজীর চোখে যে কি ছিল, তা মুখে বলা যায় না। তাঁর চোখে নানা ভাব প্রকাশ পেত। কখনো স্থির, কখনো গম্ভীর, কখনো চঞ্চল—এইরূপ নানা ভাব চোখে ফুটে উঠত। শুধু চোখে নয়, তাঁর সারা মুখে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মনের এই ভাবগুলি প্রকাশ পেত।

যখনই যে-কথা এবং যে-ভাব প্রকাশ করতেন, মনে হতো সেই ভাব ছাড়া আর সব ভাব তাঁর মন থেকে মুছে গেছে। এইজন্য তাঁর কথা উদ্ধৃত করে আপাত-বিরোধী ভাব দেখানো যেতে পারে। যে-ক্ষেত্রে যাকে যে-কথা বলছেন, সেটুকু না বুঝলে শুধু তাঁর কথাগুলি তুলে দিলে ঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। 'নেড়া-নেড়ি' বলে কখনো কখনো তিনি বৈষ্ণবদের নিন্দা করেছেন বলা হয়, কিন্তু বৈষ্ণব ভাবকে তিনি নিজেই গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। কিছু লোকের ব্যাভিচারকেই নিন্দা করতেন। তন্ত্রের বামাচারকেও যথেষ্ট নিন্দা করেছেন। আবার কেউ তন্ত্রের নিন্দা করলে বামমার্গও যে উচ্চতম সিদ্ধির সোপান, তাও প্রমাণ করে ছাড়তেন। এইজন্য তাঁর কথার ভাব বুঝতে হলে তাঁর নিজের অন্তরের গভীর অনুভূতির রাজ্যকে বাদ দিলে কিছু বোঝা যাবে না।

যখন যে-কথা বলতেন, সে ভাবগুলি যেন তাঁর ভাঙা শরীরেও চনমন করে বেড়াত। আমরা শুনেছি—তাঁর ভাবের আধিক্যই অকালে শরীর চলে যাবার অন্যতম কারণ। তবে প্রধান কারণ ছিল তাঁর অপূর্ব বক্তৃতা। শোনা যায়, বক্তৃতা দেবার সময় শ্রোতৃমণ্ডলীর মনকে সমষ্টিভাবে আকর্ষণ করে নিজের বিরাট সত্তার মধ্যে গ্রহণ করতেন। যেমন যেমন তাঁর মন ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর ভাবরাজ্যে উঠতে থাকত, শ্রোতাদের মনও সেই ভাব অনুভব করতে থাকত। স্বামীজী বলতেন, তাতে তাঁর ভয়ানক রকম প্রাণ-শক্তির ব্যয় হতো। এই করেই তাঁর শরীর ভেঙেছিল।

তাঁর উচ্চতা ছিল প্রায় পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি। শরীরের গঠন বলিষ্ঠ ও ছাতি চওড়া ছিল, কিন্তু হাত-পা তাঁর খুব নরম ছিল। হাতের চেটোর উন্নত স্থানগুলি (mounts) বেশ পুষ্ট ছিল এবং রেখাগুলি ছিল গভীর ও রক্তিম। বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতির মতো শুক্র ও চন্দ্রের ক্ষেত্রও ছিল উচ্চ। শুক্র-বন্ধন (Girdle of Venus) সুস্পষ্ট ছিল। তাঁর হাড় চওড়া ছিল—হাতের কব্জি এতখানি—বুকও এতখানি। অস্থি সংযোগগুলি নিগূঢ় ছিল। এককালে কুস্তি করতেন—চেহারায় একটা বলিষ্ঠ

দৃঢ়ভাবের ছাপ ছিল। কিন্তু পালোয়ানি চেহারা বলতে যেমন বুঝায়, তেমন ছিল না। বরং বাজু, আঙুলগুলি শুণ্ডাকৃতি ('tapering) ও মসৃণ ছিল। পায়ের থেকে কোমরের ভাগ দীর্ঘ ছিল—হাতদুটি লম্বা—আজানুলম্বিত ছিল। তাঁর নখগুলি রক্তিমাভ এবং অগ্রভাগ চতুষ্কোণাকৃতি ছিল।

একবার ট্রেনে যাচ্ছেন। একটি স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। কানাই মহারাজ (পরে স্বামী নির্ভয়ানন্দ) এসে খোঁজ খবর নিচ্ছেন। একটি মুসলমান ফেরিওয়ালা চানাসিদ্ধ বিক্রয় করছে। স্বামীজী যে কম্পার্টমেণ্টে ছিলেন, তার সামনে কয়েকবার আনাগোনা করছে। অমনি স্বামীজী ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন, "ছোলাসেদ্ধ খেলে বেশ হয়। বেশ স্বাস্থ্যকর জিনিস।" স্বামীজীর মনোভাব বুঝে ব্রহ্মচারী তাকে ডেকে একটি ঠোঙা নিলেন। জিনিসটির দাম হয়তো এক পয়সা; কিন্তু স্বামীজী তাকে কিছু সাহায্য দিতে চান বুঝে ব্রহ্মচারী তাঁকে দিলেন একটি সিকি। স্বামীজী তাকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, "কিরে! কত দিলি ?" ব্রহ্মচারী বললেন, "চার আনা।" তিনি বলে উঠলেন, "ওরে, ওতে ওর কি হবে ? দে, একটা টাকা দিয়ে দে। ঘরে ওর বউ আছে, ছেলেপিলে আছে।" একটু পরে আবার বলছেন, "আহা! আজ বোধ হয় বেশি কিছু হয়নি। তাই দেখছিস না, ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসের সামনে ফেরি করছে।" ছোলা অবশ্য কেনাই হলো, ওই পর্যন্ত। দাঁতেও কাটলেন না।

ওইটুকু ছিল তাঁর বিশেষত্ব। যখন যা ভাবতেন, তার অনেক গভীর পর্যন্ত ভাবতেন। আমরা দেখি, জিনিসটার কত দাম হওয়া উচিত। এক পয়সা কি দুই পয়সা। আচ্ছা, এক আনা দিয়ে দাও। তার জায়গায় চার আনা দিলে যথেষ্ট হলো মনে করি। কিন্তু স্বামীজী ভাবছেন, আ—হা! তার কত অভাব, কত পোষ্য! অন্ততঃ একটি দিনের জন্য তারা সকলে খেতে পাক।

দীন-দুঃখীকে দয়া করার ভাব এক-রকম। এ তা নয়। সামনে যাকে দেখতেন, নাড়ী-নক্ষত্র সব কথাই যে তাঁর মনে উঠত। এটা ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা। এদিকে তাঁর মনটা ছিল কোমল—অতি স্নেহপরায়ণ। তাই লোকের দুঃখে দুঃখী, ব্যথায় ব্যথী হয়ে পড়তেন। তাঁর প্রাণের এই 'আহা!' তাঁকে যে কতদূরে ব্যথিত পীড়িত করে তুলত, তা তাঁর সেবকরাই শুধু জানতেন।

কেউ রোগে ওষুধ পাচ্ছে না, এতটুকু সেবা কি যত্নের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে—তার জন্য যাদের প্রাণ কাঁদত, তাদের তাই তিনি প্রাণঢালা আশীর্বাদ করেছেন। এই ভাবটি যে শুধু তাঁরই ছিল তা নয়, তাঁর মধ্যে প্রকাশটা খুব বেশি বোঝা যেত। স্বামী অখণ্ডানন্দের মধ্যে এই দরিদ্রনারায়ণের সেবার ভাবটি খুবই ছিল। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের মধ্যেও এই ভাব পরিস্ফুট ছিল, তবে তিনি ভাবগুলি খুব চেপে রাখতেন। তাঁকে দেখে হঠাৎ বোঝা যেত না—কি স্নেহ ও মাধুর্যপূর্ণ ছিল তাঁর অন্তঃকরণ। বাইরে থেকে অনেক সময় কঠোর বলে মনে হতো। শেষের দিকে এই স্নেহ-ভালবাসায়

ভাবটি তাঁর খুবই দেখা গেছে। অযাচিত করুণার ধারায় সকলকে অভিষিক্ত করে গেছেন।

একবার স্বামীজী স্টীমারে গোয়ালন্দ যাচ্ছেন; একটা নৌকোয় জেলেরা ইলিশ মাছ জালে তুলেছে। হঠাৎ বললেন, "বেশ ভাজা ইলিশ খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।" কানাই মহারাজ তাঁর কথার মানে বুঝতেন। খেতে ইচ্ছে তাঁর নিজের জন্য তো নয়, স্টীমারের সব খালাসীদের খাওয়াবার ইচ্ছে। সারেঙ দর করে জানালো, এক আনায় একটি ইলিশ মাছ—তিনটি চারটিই যথেষ্ট। স্বামীজী অমনি বললেন, "তবে। এক টাকার কেন্।" অঢেল মাছ হয়ে গেল। বড় বড় ইলিশ ষোলটি, তার ওপর দু-চারটি ফাউ। স্টীমার এক জায়গায় থামানো হলো। স্বামীজী অমনি বললেন, "পুঁইশাক হলে বেশ হতো, আর গরম ভাত!"

কাছেই গ্রাম। সেইদিকে কানাই মহারাজ গেলেন শাক সংগ্রহ করতে। একটি দোকানে চাল পাওয়া গেল। কিন্তু সেখানে কোন বাজার বসে না। এমন সময় একটি ভদ্রলোক বললেন, "চলুন, পুঁইশাক আমার বাড়ির বাগানে আছে অনেক। তবে একটি শর্ত। স্বামীজীকে একটিবার দর্শন করাতে হবে।" এক ঝুড়ি পুঁই নিয়ে চললেন নিজেই মাথায় করে। পরে (ফিরবার পথে) স্বামীজী তাঁকে কৃপা করে দীক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর অসীম ভক্তি ও অনুরাগ দেখে। ভক্তটি বলতেন, "আমাকে কৃপা করবেন বলেই স্বামীজীর মাছ ও পুঁইশাক খাবার কথা মনে উঠেছিল। তা না হলে এহেন সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যেতাম।"

আপাততঃ ছোট ছোট কথায় বা কাজে তাঁর সর্বজীবের প্রতি যে গভীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, তা সর্বদা টের পাওয়া যেত না, কিন্তু এক এক সময় এইরূপ ঘটনায় তা ব্যক্ত হয়ে পড়ত।

রাখাল মহারাজ ছিলেন মঠের অধ্যক্ষ। দীক্ষাপ্রার্থীদের তিনি মা-ঠাকরুনের কাছেই পাঠাতেন। স্বামীজীও নিজে প্রায় কাউকে দীক্ষা দিতেন না বললেই চলে। তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়েছেন, এমন লোক আঙুলে গোনা যায়। এলাহাবাদে আমার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র ভক্তরাজ (হরিনাথ ওদেদার, পরে স্বামী সদাশিবানন্দ) কাশীতে দীক্ষা পেয়েছিলেন আর হরেনবাবু মঠে গিয়ে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ভক্তরাজ দীর্ঘকাল বিজ্ঞান মহারাজের কাছে ছিলেন। পরে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে রাখাল মহারাজ কাশীতে তাঁকে চারুবাবু, কেদারবাবু প্রভৃতির সঙ্গে সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। হরেনবাবু সন্ন্যাস নেননি, শেষ অবধি সাদা কাপড়েই থাকতেন, তবে তিনি সাধুভাবেই ছিলেন—বলতেন, "স্বামীজী তো আমায় গেরুয়া দিয়ে যাননি, সাদা কাপড়েই থাকতে বলেছেন।" তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী ভাবেই কাটিয়ে দিলেন। ব্রহ্মচারী জ্ঞান বয়সে সব থেকে কনিষ্ঠ ছিলেন।

আমারই নামে আর এক 'মন্মথ' স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন; তিনিও গৃহস্থ। শ্রীমন্মথ মুখোপাধ্যায়—কলকাতার লোক। এ ছাড়া আর যাঁরা গৃহস্থ শিষ্য ছিলেন,

তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী—যাঁকে স্বামীজী রহস্য করে 'বাঙাল' বলতেন, তাঁর দীক্ষার সময় আমি মঠেই ছিলাম। তিনি খুব বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর বেশ একটা সহজ সখ্যভাব ছিল। আমরা সমীহ করে দূরে দূরে থাকতাম। শরৎবাবুর সঙ্গে স্বামীজীও রঙতামাসা করতে ভালবাসতেন। তাঁর প্রতি স্বামীজীরও খুব স্নেহের ভাব ছিল। শরৎবাবু মাঝে মাঝে তর্ক করতে ভালবাসতেন, শাস্ত্রাদির জ্ঞানও তাঁর বেশ গভীর ছিল—স্বামীজীও তাঁকে খেপিয়ে দিয়ে বেশ মজা করতেন। তাঁর সঙ্গে অন্য গুরুভাইরাও মাঝে মাঝে যোগ দিতেন। শরৎবাবু সর্বদিন যেমন সহজভাবে গল্পগাছা করতেন, দীক্ষার দিন—দীক্ষা হয়ে যাবার পর যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন এবং তাঁর ভক্তি-ভালবাসার জন্য মঠের সব মহারাজই তাঁকে স্নেহ ও প্রীতির চোখে দেখতেন।

স্বামীজী অতি সাধারণ কথা সাধারণ ভাবে আলোচনা করতে করতে অতি গভীর কথা বলে যেতেন অনর্গল। মন্ত্র-দীক্ষা না পেলেও এভাবে অন্তরের দীক্ষা যে কত লোক পেয়েছেন, তার ইয়ত্তা হয় না। একবার দুই বন্ধু এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কাশীতে। কথা পেড়েছেন, যেমন লোকে বলে থাকে, "শরীর কেমন ?"

"আ—র শরীর। বাঙালীর শরীর হেগে হেগেই গেল।" এই ভূমিকা থেকে বাঙালীর স্বাস্থ্য ও পশ্চিমে লোকের স্বাস্থ্যের একটা তুলনামূলক আলোচনা করলেন। ক্রমশঃ দুনিয়ার সব জাতের খাওয়া-দাওয়া আর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ তুললেন। প্রসঙ্গ শেষ করলেন 'অন্নই ব্রহ্ম'—এই কথায়। যে যেমন অন্ন খায়, তার দেহ মন সেই রকম গঠিত হয়—তদনুযায়ী ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্যতা হয়।

যে ভদ্রলোক কথা পেড়েছিলেন, তিনি প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে এই বক্তৃতা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ; পরে বলেছিলেন, "এমন অদ্ভুত কথা আমি জীবনে শুনিনি। এই সামান্য আহার—তার মধ্যে এত গুরুত্ব !"

বেলুড় মঠে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি কেরানী। কেরানীর কাজ কেমন করে করতে হয়, কেমন করে ফাইল (files) রাখতে হয়, হাতের লেখা কেমন গোটা গোটা ও স্পষ্ট হওয়া উচিত, ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে থাকলেন প্রায় পঁচিশ মিনিট ধরে। এই কাজ শুধু যে অন্নের জন্য তা নয়, দেশের দশের কাজ—ক্রমে 'কর্মই ব্রহ্ম' এইভাবে সকলের মনটা তুলে দিলেন, এ একটা অনুভূতি। যাঁরা শুনতেন, তাঁরা যে শুধু কথাগুলি শুনতেন, তা নয়—সেই বাণীর পিছনে একটা শক্তি কাজ করত, কিছুক্ষণে মন আচ্ছন্ন হয়ে যেত একটা সমগ্রতার চেতনায়। সেই ভাবটিই সারা জীবনের পাথেয় ও সাধনস্বরূপ হয়ে উঠত। এই যে ব্যাপারটি, তা যে শুধু স্বামীজীর মধ্যেই দেখা যেত, তা নয়। মহারাজদের (স্বামীজীর গুরু-ভাইদের) অনেকেরই এই গুণটি ছিল। তবে স্বামীজীর স্বভাব ছিল সব বিষয়ে

একটা জোর দিয়ে বলা এবং তাঁর কথার মধ্যে আশ্চর্য এক শক্তি থাকত, তা মনকে অনুভব করিয়ে দিত।

স্বামীজীর 'লেকচার' যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের কাছে আমি শুনেছি—তাঁর বক্তৃতার সঙ্গে সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনকে ধাপে ধাপে তুলে নিয়ে যেতেন এবং শেষে এক 'ব্রহ্মই আছেন সর্বসত্তাময়'—এই ভাবটি সকলের ভিতরে ঢুকে যেত।

অনেক সময় হাসি-তামাসার মধ্যেও স্বামীজী 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই ভাবটি ভিতরে ঢুকিয়ে ছাড়তেন। ভক্তরাজ মহারাজ একবার তাঁর অট্টহাস্য দেখেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ পর্যন্ত তটস্থ। অট্ট অট্ট হাসি। সেই শব্দের ধ্বনি-তরঙ্গ ধাপে ধাপে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে উঠছে—মনও সেই সঙ্গে উপরে উঠে যাচ্ছে। এক বিরাটের মহিমায় সব ছেয়ে গেল!

আমরা যেসব আধ্যাত্মিক অবস্থাগুলিকে জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করি, তাঁদের কাছে সেসব যেন ছেলেখেলা! হাসতে হাসতেই মনটাকে নিরোধ করে দিলেন। একটা হাসি বা ঠাট্টার মধ্যেই অন্তরে এমন ইঙ্গিত ও স্পর্শ দিয়ে দিতেন যে, ওইতেই সব কাজ হয়ে যেত। এসব কথা কাউকে বলবার নয়, কারণ কে বুঝতে যাচ্ছে ওকথা! কিন্তু যারা তাঁদের কাছে গিয়েছে, দেখেছে—তাদের কাছে এসব কথা নূতন নয়।

রাজনীতি বলতে আমরা তখন বুঝতাম—দেশের স্বাধীনতা। ইংরেজদের অধীন ছিল দেশ; অনেক যুবকের মনেই সেজন্য দুঃখ ছিল। স্বামীজী নিজেও ভারতবাসী হিসেবে এই পরাধীনতার গ্লানি অতি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। কোন কোন ব্যক্তির কাছে তিনি ইংরেজদের সম্বন্ধে অতি কঠিন মন্তব্যও করেছেন। কিন্তু ওইটাই তাঁর একমাত্র ভাব মনে করলে ভুল হবে। ইংরেজদের গুণের কথাও আবার বলেছেন। ইওরোপের লোকেদের কর্মশক্তির প্রশংসা বারবার করেছেন। কিন্তু অত্যাচার বা মনুষ্যত্বের অবমাননা যে কেউ করুক, তার বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়েছেন। একবার একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক তাঁকে ইংরেজদের অনাচার ও অত্যাচার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন। স্বামীজী কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর তাঁকেই প্রতিপ্রশ্ন করলেন, "তবে এত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করছ কেন?" তিনি বললেন, "কি করব?" স্বামীজী উচ্চস্বরে বললেন, "কেন? ওদের গলা টিপে সাগরে ভাসিয়ে দাও।" এ শুধু তাঁর কথার কথা ছিল না। অপমান সহ্য করা তাঁর কোষ্ঠীতে লেখেনি। ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে মিলিটারী ইংরেজদের দ্বারা অপমানিত হয়ে তাদের দুটিকে বগলদাবাই করে বলেছিলেন, "দরজা থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।" এটা হলো—তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি অসম্মান করলে তার প্রতিক্রিয়া। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম হোক—তাও তিনি চাইতেন। তবে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি গুরুভাইদের এবং মঠকে রাজনীতিক ব্যাপার থেকে আলাদা রেখেছিলেন। কোন ইংরেজ উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ মঠে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর

ইচ্ছা ছিল—স্বামীজী স্বয়ং বড়লাট বা তাঁর কোন সচিবের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু 'সন্ন্যাসীর রাজদর্শন নিষেধ'—এই কথা তিনি অক্ষরতঃ পালন করেছিলেন। মঠের প্রতি তদানীন্তন সরকারি দপ্তর বিশেষ করে 'সি. আই. ডি.'-র বড় সাহেব বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু ঐ ইংরেজ মহোদয় স্বামীজীকে যে কি চোখে দেখলেন, তা তিনিই জানেন। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে আপনিই এই কথাগুলি বেরিয়ে এল—"তুমি আমার ঈশ্বর—তুমিই যীশু।" তাঁর প্রভাবে পরে লাট-দপ্তরের মনোভাব অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছিল।

স্বামীজী ভবিষ্যতের উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তখনই দেখেছিলেন মঠের ভবিষ্যৎ। সকলকে নিয়ে—সর্ব জাতি ও সম্প্রদায়কে নিয়ে, সর্ব ভাবের মানুষকে নিয়ে সঙ্ঘকে চলতে হবে, তা তিনি জানতেন। রাজনীতিক আন্দোলনে ছিলেন, এমন অনেক লোক যদিও মঠে স্থান পেয়েছিলেন, তবু মঠকে সাক্ষাৎ রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হতে তিনি প্রবলভাবে নিষেধ করেছিলেন।

ভূপেনবাবুকে বলতে শুনেছি, "স্বামীজী আর কিছুদিন পরে এলে রাজনীতিক আন্দোলন চালাতেন।" তাঁকে তিনি যুগ-পরিবর্তনকারী শক্তি বলেই দেখেছেন। তবে তাঁর ভাবকে রাজনীতির মধ্যে সীমিতই দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু স্বামীজী সব গণ্ডির বাইরে ছিলেন। মহামানবতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি সর্বদেশের মঙ্গল কামনা করে গেছেন। আমাদের নিজেদের দেশের আত্মচেতনা জাগুক—এ ইচ্ছা তো হওয়া স্বাভাবিক। সেইজন্যে ত্যাগী একদল সন্ন্যাসী গঠন করে গেছেন, যাঁরা তাঁর সেই ভাবকে জীবনে জাগ্রত করে রাখবে আর বাইরের জগতে কর্মের মধ্যে তাকে রূপ দেবে।

সিস্টার নিবেদিতা সম্পর্কেও কিছু লোকের ধারণা আছে: তিনি রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বামীজীর সায় না থাকলে তা সম্ভব ছিল না। প্রকারান্তরে স্বামীজী রাজনীতিক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন—এই কথাই তাঁরা বলতে চান। কিন্তু স্বামীজী নিজে এবং সন্ন্যাসী-সঙ্ঘকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কাশীতে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাজনীতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনাও হয়েছিল। স্বামীজী তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলনের তুলনামূলক দোষগুণ বিচার করেছিলেন ও নিজের স্পষ্ট মতামতও জানিয়েছিলেন। সেই সময় ধর্মের স্থান রাজনীতির ঊর্ধ্বে, তাও অতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন।

সিস্টার ছিলেন আইরিশ দুহিতা। তখনও আয়ার্ল্যাণ্ড স্বাধীন হয়নি। তাঁর মনে ভারতের বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক ছিল। অন্যপক্ষে স্বামীজী কারো ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিস্টার নিবেদিতা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হারিয়ে রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েন, তাও তিনি চাইতেন না। তাই তাঁকে ভারতের ভাবধারা বুঝে সেবা করতে বলেছিলেন। গুপ্ত

মহারাজ তাঁকে বাঙলা শেখাতে যেতেন। অন্যান্য ব্রহ্মচারীরাও তাঁর খোঁজখবর নিতেন। কিন্তু তাঁকে মঠ থেকে আলাদা থেকেই নিজের ইচ্ছা ও ভাব অনুযায়ী কাজ বেছে নিতে বলেছিলেন। ভারতের পুরাণ ও উপনিষদ্ সিস্টার খুব ভালভাবে জেনেছিলেন। এবং তিনিও মনেপ্রাণে ভারতের একটি মেয়ে হয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অজস্র স্নেহ ছিল তাঁর উপর; এবং তিনি শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শেই নিজেকে সম্পূর্ণ রকমে ভারতের কল্যাণে বিলীন করেছিলেন।

একটি মেয়ে-স্কুল খুলে মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে তাদের জীবন গঠন করতে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এটা ছিল তাঁর আত্মবিলুপ্তি। তাঁর মতো প্রতিভা ও বাগ্মিতার শক্তি নিয়ে একজন রাজনীতিক নেত্রী হওয়া তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু তিনি একটি ছোট্ট ক্ষেত্রে নিজেকে সীমিত করে যে-কাজ করে গেছেন, বাইরে তার প্রকাশ বেশি বোঝা না গেলেও অন্তর্জগতে মেয়েদের মধ্যে অদ্ভুত শক্তি সঞ্চারিত করেছে।

'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'—এই মহাবাক্য সিস্টারের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছিল। স্কুলের সামনের গলিটি অপরিষ্কার থাকায় বহুবার নিজের হাতে সমস্ত পথটি সম্মার্জনী দিয়ে পরিষ্কার করেছেন। পাড়ার সব বাড়িতেই মহিলারা নিজেদের মেয়েদের সাবধান করে দিতেন "ওরে! রাস্তায় কিছু ফেলিসনি, ফেলিসনি। এখুনি 'মেম সায়েব' ঝাঁটা-হাতে নিজে পরিষ্কার করতে আসবে।"

মেমসাহেবকে সকলেই ভালবেসেছিলেন, তাই তো তাঁকে এত ভয় ছিল! ছেঁড়া কাগজ বা পাতা, খেলনা-ভাঙা—কিছুই ফেলবার জো ছিল না। সেদিন সিস্টারকে যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁদের অনেকে এখনো জীবিত আছেন। তাঁরাই এখনো বলতে পারেন—সিস্টার ও শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষা কি প্রকার ছিল। মানুষ-গঠন করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। সিস্টার স্বামীজীর শিষ্যা ছিলেন বটে, কিন্তু শ্রীশ্রীমায়েরও অজস্র স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন এবং মেয়েদের শিক্ষাও এই দেশেরই ভাবধারা অনুযায়ী দিতে চেয়েছিলেন। এইজন্যই সিস্টারও রাজনীতিকে প্রাধান্য দেননি। যদি রাজনীতিকে সিস্টার নিজ কর্মক্ষেত্ররূপে বরণ করতেন, তাহলে তাঁর মতো গুণবতী ও ওজস্বিনী মহিলা সেদিকেও বড় কিছু করে যেতেন। ইচ্ছা করেই তা তিনি নেননি। তবে সম্পূর্ণ এড়িয়েও যাননি। হয়তো এইজন্যই বাহ্য-সন্ন্যাসও তিনি নেননি। তবে তাঁকে হালকা রঙের গেরুয়া পরতে দেখেছি এবং গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরতেন। তা থেকেই তাঁর অন্তঃসন্ন্যাসের ভাবটি স্পষ্ট বোঝা যেত। এই রাজনীতির জন্যই সম্ভবতঃ তিনি মঠে থেকেও আলাদাভাবেই ছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর জীবনের লক্ষ্য এই কর্মজগতের-মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। বেদান্তের চরম অনুভূতিই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। স্বামীজীর ইচ্ছায় কর্মকে তিনি স্বীকার করেছিলেন এবং ছোট ছোট কাজে 'সেবার আদর্শ' নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই

মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেজন্য নানা প্রকার সাধনার কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। স্বামীজীও সংক্ষেপে রাজযোগের উপর অধিক ঝোঁক দিয়েছেন মনে হয়। তবে ভক্তি কর্ম ও জ্ঞান—এই তিনটির সামঞ্জস্য করতে বলেছেন বারে বারে। এই সাধনার ভিত্তি একজন সৎ মানুষের গুণাবলী। অধ্যাত্ম-রাজ্যের দর্শনাদি বা 'ভাব'সমূহকে তিনি প্রধান বলতেন না। সমগ্র জীবনটাই সাত্ত্বিক ও সুন্দর হতে হবে—এইটাই হলো মূল কথা। এরই নাম হলো কর্মযোগ।

স্বামীজী যে-কোন কর্মকেই কর্মযোগে পরিণত করতে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে গুরুর বা গুরুতুল্য ব্যক্তির প্রতি অটুট শ্রদ্ধা ও আজ্ঞানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। যে-কোন ব্যক্তির জীবনে ধর্মলাভের পিপাসা যতই প্রবল হোক, 'বেহেড' হওয়া পছন্দ করতেন না। বুদ্ধি ও যুক্তি সহায়ে ধীরে ধীরে উন্নতি হওয়া বেশি ভাল; কিন্তু ভাব-বিহ্বলতা, বিচার-বিমুখতা—এ-সকল গুণকে অধিক প্রশ্রয় দিতেন না। 'মেনিমুখো হোসনি', 'বীর হ তোরা', 'কাজে লেগে যা'—এইসব ছিল তাঁর কথা। এইগুলি আমরাও বলি, কিন্তু তাতে শক্তি নেই। স্বামীজীর এইসব অতি সাধারণ কথাও শুধু কথা নয়—'মন্ত্র' বলা যেতে পারে। শুধু কথা দিয়ে যে এসব ভাব তিনি বুঝিয়ে দিতেন, তা নয়। ঐ কথার পিছনে একটা প্রচণ্ড শক্তি ছিল—একবার শুনলে মনে গেঁথে যেত। ওইগুলি পালন করতে গিয়ে সারা জীবনটাই পালটে যেত। স্বামীজী বা তাঁর গুরুভাইদের কাছে যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা সকলেই সুচারুরূপে কর্ম করার শিক্ষা পেয়েছেন। কর্ম করতে করতে 'যোগ' হবে বা ভগবান লাভ হবে—এই রকম একটা ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ভগবদ্‌ভাবটি কি, তা তাঁদের কাছে গেলে মনে কেমন ভাবে যেন তা মুদ্রিত হয়ে যেত। আমি আমার জীবনে পরবর্তী কালে নানা সাধুসন্ন্যাসী দেখেছি, কিন্তু এই আধ্যাত্মিক সম্পদ নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বাতাসে ও অন্তরীক্ষে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়তে কোন দিন উপলব্ধি করিনি। ভগবান সর্বত্র বিরাজিত, সব কাজই 'তাঁর কাজ', কাজের ছোট বা বড় নেই। চিন্তা-ভাবনা, লেখা-পড়া, ধ্যান-ধারণা—সবই কাজ। যখন যে কাজটি করতে হবে, সমগ্র মনঃপ্রাণ দিয়ে, যেন একমাত্র ঐ কাজটি ঠিকমতো করার ওপরই জীবন-মরণ সমস্ত সমস্যা নির্ভর করছে।—এই রকম ঐকান্তিক অনুরাগ ও চেষ্টার নাম 'শ্রদ্ধা'। কর্ম এই শ্রদ্ধা-সহযোগে 'যোগে' পরিণত হয়। মন ও বুদ্ধি যেখানে নিরুদ্ধ, ভগবান শুধু সেখানেই আছেন তা নয়। সমস্ত বিশ্বে সমস্ত কিছুই তিনি। এমন কোন কাজ নেই, যা 'পূজা' নয়। ঘরটি মোছা, বাজারটি করা, হিসেব রাখা—সব কাজেই সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি ও উপলব্ধি থাকা চাই। তবে তো কাজ করে আনন্দ পাওয়া যাবে। আর তবেই যেখানে সেখানে বসেও তাঁর ধ্যান হওয়া সম্ভব হয়। এত কর্মের কথা যিনি বলতেন, সেই স্বামীজী কিন্তু কর্মজগতের মানুষ ছিলেন না। তাঁর সমস্ত বৃত্তি ছিল অন্তর্মুখী, এমন এক ভাবরাজ্যের—যা আমাদের চোখে ধরা দিত, কিন্তু যেন সদা সর্বদা নাগালের বাইরে থেকে যেত। তাঁর

কথা, তাঁর মুখ মনে পড়লেও সেই অপূর্ব ভাবজগতের কথাই মনে ওঠে, কর্ম জ্ঞান ভক্তি—এসব কিছুই মনে থাকে না। 'আচার্যকোটি'রা আসেন এই এই ভাবে মানুষকে ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দিতে—তার জন্য কোন যোগ বা সাধনার প্রয়োজন হয় না। তবে সেই ভাবটুকু রক্ষা করার জন্য সমগ্র জীবনটাই লেগে যায়, আর তারই নাম 'কর্মযোগ'।

রাখাল মহারাজকে প্রায়ই দেখেছি কোন এক অতল ভাবরাজ্যে ডুবে যেতেন। আমরা শুনতাম, তিনি ছিলেন ঠাকুরের মানস-পুত্র। একথাও শুনেছি, তাঁর দেহের গঠনও ছিল কতকাংশে ঠাকুরেরই মতন। তাছাড়া তাঁর মন মুহুর্মুহুঃ সমাধিমগ্ন হতো, তা তো তাঁর সেবক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা দেখেছেন। এমন মানুষকে মঠের অধ্যক্ষ নির্বাচন করলেন স্বয়ং স্বামীজী। প্রেসিডেণ্ট হওয়ার কত দায়িত্ব, কত বহুমুখী কাজ! এই কর্মের বোঝা তো রাখাল মহারাজ নিতেই চাননি। কিন্তু গুরু-ভাইদের ভিতর এমনই প্রেম ছিল যে, রাখাল মহারাজের মতো অন্তর্মুখী বৃত্তির মানুষও এই কর্মের শৃঙ্খল স্বেচ্ছায় বরণ করলেন। স্বামীজীর অমোঘ ঔষধ ছিল—মিনতি। "তাহলে কি ভাই, আমি একাই খেটে খেটে মরব?"—এর পর হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দ) মতো ধ্যাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর পক্ষেও 'না'-বলা অসম্ভব হয়েছিল। তিনি যেমন স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকা যেতে স্বীকৃত হলেন, ঠিক সেই ভাবেই স্বামীজী রাখাল মহারাজকেও মঠের প্রথম অধ্যক্ষ হতে স্বীকৃত করেছিলেন।

ঈশ্বর-দর্শন করলে সর্বভূতে প্রেম হয়—এই কথা আমরা শাস্ত্রমুখে শুনি। কিন্তু সেই প্রেম নিয়ে কিভাবে কর্ম করা যায়—তার নির্দেশ পাওয়া সুকঠিন। বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি স্বামীজীর গুরুভ্রাতাদের জীবন ও তাঁদের শিক্ষা থেকে আমরা কতকটা বুঝতে পারি কর্ম করার সূত্রটি কি। রাখাল মহারাজকে বলা যায় এ-বিষয়ে আদর্শ। তাঁর কাছে যাঁরা (সেবকরূপে) থেকেছেন, তাঁরা খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে আজও আমাদের আদর্শ স্বরূপ। খাবার পাতাটি কি করে পাততে হয়, এমনকি লবণ পরিবেশন কিভাবে করতে হয়, তাও তিনি শিখিয়েছেন। এমন ছোটখাট ব্যাপারে তাঁর মতন আত্মভোলা অন্তর্জগতের পুরুষ কি করে লক্ষ্য রাখতেন—এইটাই আশ্চর্য লাগে।

স্বামীজী ও এইসব মহান পুরুষদের দেখে একটি কথা নিশ্চিতরূপে বোঝা যায়—আমরা যাকে বলি ধর্ম, ভগবান, মনুষ্যত্ব—এগুলি আলাদা আলাদা কিছু নয়, একই নিত্য চিরন্তন ভাবেরই—এইগুলি শাশ্বত প্রকাশ। স্বামীজীর শিক্ষা বলতে বোঝায়—সেই মূল ভাবটিকে ধরা। সেই ভাবে ভাবিত হয়ে মানুষ নিজ নিজ পথ ও কর্তব্য নিজেই স্থির করে চলবে। তিনি একদিকে সঙ্ঘের প্রতি বিনা-প্রতিবাদে আজ্ঞানুবর্তিতা শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু অন্য দিকে ব্যক্তিকে দিয়েছেন পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু স্বামীজী কর্মের কোন একটি নির্দিষ্ট মার্গকে কখনো একমাত্র প্রাধান্য দেননি। শাস্ত্রে

যাকে বলে 'বিরাট'—সেই প্রাণ-পুরুষকে তিনি নিজের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই চেতনা থেকেই তিনি 'জনতা-জনার্দনে'র ভিতর যে প্রাণ-পুরুষের সত্তা ছড়িয়ে আছে, তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কর্মের সূত্রটি বুঝতে হলে এই চৈতন্যময় পুরুষকে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই বুঝতে পারা যাবে—আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম শিখরের সঙ্গে কর্মজগতের স্থূলতম কর্মক্ষেত্রের নিগূঢ় সম্পর্ক কি। তখন আমরা আংশিকভাবে বুঝি—স্বামীজীর বেদান্তবোধ সত্ত্বেও কর্মের জন্য কেন এই আহ্বান। রাখাল মহারাজের মতো সমাধিমান ব্যক্তিও তুচ্ছাতিতুচ্ছ কার্যকে কেন এত মহত্ত্ব দিয়েছেন। এবং এই সূত্রটি না বুঝলে 'নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা' কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা অতি দুরূহ।

ইংরেজীতেও এই রকম একটি প্রবাদ আছে—'Work is worship.' কিন্তু স্বামীজীর কর্মযোগ কি—বুঝতে হলে তাঁরই কথিত একটি সূত্র ধরে বুঝলে ভাল হয়। তিনি বলতেন, "কর্ম উপাসনা, উপাসনা কর্ম।" আমরা জীবনে ঠিক উলটোটাই বেশির ভাগ লোকে করি। কর্মকে উপাসনার চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করি। উপাসনার সময় যে একাগ্রতা ও শ্রদ্ধা থাকা উচিত, সেই শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা হলে তবে কর্ম সুষ্ঠুভাবে করা যায়। শুধু তাই নয়, উপাসনারূপে কর্মটিকেই ভগবৎকার্য বলে মনে করি—কর্মমাত্রই যে ঈশ্বর-উপলব্ধির সোপান, তা মনে করি না। সেই ভাবটি রাখাই হলো উপাসনা-বোধে কর্ম করা। কিন্তু এইটিও মনের ক্ষেত্রের আংশিক পরিণতি। এর পরিপূরক ভাবটি হলো উপাসনারূপে কর্মে নৈষ্কর্ম্যবৃত্তি নিয়ে আসা। এইবার এই দুইটি ভাবের সামঞ্জস্য করলে কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান বা ভক্তি—সবই কর্মও বটে, উপাসনাও বটে। জাগ্রত মনকেই বলে কর্ম—সেই মনের উপরে যে ভাবজগৎ তাকেই বলা হয় উপাসনার ক্ষেত্র। এই উভয় ক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে মন যেতে চায় না। নানা রকম সাধনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—এই কর্ম ও উপাসনার ঊর্ধ্বে যে বোধ সেইখানে স্থিতি যাতে হতে পারে। স্বামীজী সর্ব-সাধারণের জন্যে এই একটা সহজ সাধনার পথ বলে গিয়েছেন। সব কাজই ভগবানের কাজ ভাবলে মনের উপাসনার ভাব-জগৎ খুলে যায়। সেই ভাব-রাজ্যেও নিস্পৃহ হতে হবে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ স্বাভাবিক ভাবে যখন ভগবদ্‌বোধ প্রত্যেক কার্যে থাকে, তখনই উপাসনাও কার্যে পরিণত হতে পারে, তার পূর্বে নয়। এক কথায় বেদান্ত-ভাবের চরম অবস্থায় 'কর্ম উপাসনা ও উপাসনা কর্ম' রূপে—অনুভূতি হতে পারে। স্বামীজীর ছোট ছোট এক একটি কথার তাৎপর্য এই রকম অতি নিগূঢ়।

একবার স্বামীজীকে প্রশ্ন করলাম, "মুক্তি কি গুরু দেন, না জীব সাধনা বলে মুক্তিলাভ করে?"

স্বামীজী। জীব নিজের ইচ্ছায় বদ্ধ হয়েছে। বদ্ধ হয়েছে বলেই তো সে জীব। অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা থেকে সে নিজের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ব্যষ্টিত্ব লাভ করেছে এবং সেই থেকে নিজেকে আলাদা বলে ভাবছে। কেন এমন হলো? এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই।

যদি বল কোন শক্তির দ্বারা হয়েছে, জীবের নিজের ইচ্ছায় হয়নি, তাহলে সেই শক্তির নাম হলো মায়া। মায়ার প্রভাবে জীব নিজের আলাদা অস্তিত্ব বোধ করে। মায়ার যে শক্তি, তার অনন্ত ধারা। জীবের ক্ষুদ্র শক্তি তার কাছে থাকবে জলবিন্দুর মতো। জীব একা একা কি করবে? তাই মায়াশক্তির সঙ্গে সে খেলে, খেলতে খেলতে ভুলে যায় কোথা থেকে সে এসেছে। প্রকৃতির ফাঁদে পড়ে ব্রহ্ম (জীব) তখন কাঁদে।

ছোট ছেলেদের দেখেছিস? একটা থাম ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে। জীবও ওই রকম নিজের বাসনা-বলে হাবুডুবু খাচ্ছে আর বলছে, "বাঁচাও।" ছোট ছেলে যদি বলে, "আমার হাত খুলে দাও!" বড়রা কি করে? হাসে, আর এই তামাসা দেখে। মায়ার শক্তি আশ্রয় করেই জীব ভোগ করে আর তাকেই বলে, "দূর হ!" ঈশ্বর তখন সেই জীবকে উদ্ধার করতে ছুটে আসবেন? না, মজা দেখবেন? ছোট ছেলে হাত খুলে নেয়, যখন ঘুরপাক খাওয়ার ইচ্ছা তার শেষ হয়। জীবের মুক্তিও নির্ভর করে বাসনা-ত্যাগে। বাসনা ত্যাগ করার ইচ্ছা হলে তখন মুক্তির কথা। ত্যাগ হয়ে গেলেই মুক্তি।

আমি। তাহলে গুরু কি করেন? কৃপা আমরা চাই-ই বা কেন?

স্বামীজী। জীব নিজে পথ দেখতে পায় না, হাতড়াচ্ছে কিসে উদ্ধার হবে। তখন এমন একজনকে আশ্রয় করে, যাঁর ও পথঘাট জানা আছে। তিনি একটা রাস্তা ধরিয়ে দেন। সেইভাবে সাধনা করলে সে মুক্তির পথ খুঁজে পায়। এটা গুরুকৃপা ছাড়া কি?

আমি। আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে, সাধনার ওপর আপনি জোর দিচ্ছেন। ভক্তিতে তো কৃপাই একমাত্র অবলম্বন।

স্বামীজী। ওটা কি জানিস? এক একটা ভাব। এক এক ভাবে এক এক রকম মনে হয়। যদি পূর্ণ ভক্তি বিশ্বাস থাকে, তাহলে সাধকের মনে হয়, সে কিছুই করছে না—গুরুই সব করছেন। কিন্তু এ-রকম হওয়া বড় কঠিন। 'আমি, আমি' ভাব যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ সাধনা অর্থাৎ কর্মও আছে। কর্মের ফলও আছে। সাধনা পরিপক্ব হলে ইষ্ট-সাক্ষাৎকার হয়—ঈশ্বর কি বুঝলে তখন গুরুর প্রকৃত সত্তা অনুভূত হয়।

আমি। ব্রহ্মচর্য ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞান হয় না—একথা শুনি। কিন্তু আজকাল সে-রকম আধার তো খুবই কম। তাহলে আমাদের মতো সাধারণ জীবের কি হবে?

স্বামীজী। ব্রহ্মচর্য একটা সাধনা। ওর মধ্যে সব রকম সাধনাই হয়। দেহ মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হওয়া চাই, তবে বুঝতে পারে, ভগবান কি। সন্ন্যাসীর ষোল আনা করতে হয়। তারা সংসারে আদর্শ হবে। সংসারী লোকেরও যথাশক্তি সংযত জীবন হওয়া দরকার। তবেই সেই বোধশক্তি জন্মাবে। শুধু বিচার করে আর বই পড়ে কি জানা যায়, ব্রহ্ম কি বস্তু?

আমি। ব্রহ্মচর্য-পালনই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কি বিবাহ না করাই উচিত?

যাকে বলে 'বিরাট'—সেই প্রাণ-পুরুষকে তিনি নিজের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই চেতনা থেকেই তিনি 'জনতা-জনার্দনে'র ভিতর যে প্রাণ-পুরুষের সত্তা ছড়িয়ে আছে, তাঁকে আহ্বান করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কর্মের সূত্রটি বুঝতে হলে এই চৈতন্যময় পুরুষকে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে হবে। তবেই বুঝতে পারা যাবে —আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম শিখরের সঙ্গে কর্মজগতের স্থূলতম কর্মক্ষেত্রের নিগূঢ় সম্পর্ক কি। তখন আমরা আংশিকভাবে বুঝি—স্বামীজীর বেদান্তবোধ সত্ত্বেও কর্মের জন্য কেন এই আহ্বান। রাখাল মহারাজের মতো সমাধিমান ব্যক্তিও তুচ্ছাতিতুচ্ছ কার্যকে কেন এত মহত্ত্ব দিয়েছেন। এবং এই সূত্রটি না বুঝলে 'নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা' কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা অতি দুরূহ।

ইংরেজীতেও এই রকম একটি প্রবাদ আছে—'Work is worship.' কিন্তু স্বামীজীর কর্মযোগ কি—বুঝতে হলে তাঁরই কথিত একটি সূত্র ধরে বুঝলে ভাল হয়। তিনি বলতেন, "কর্ম উপাসনা, উপাসনা কর্ম।" আমরা জীবনে ঠিক উলটোটাই বেশির ভাগ লোকে করি। কর্মকে উপাসনার চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করি। উপাসনার সময় যে একাগ্রতা ও শ্রদ্ধা থাকা উচিত, সেই শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা হলে তবে কর্ম সুষ্ঠুভাবে করা যায়। শুধু তাই নয়, উপাসনারূপ কর্মটিকেই ভগবৎকার্য বলে মনে করি— কর্মমাত্রই যে ঈশ্বর-উপলব্ধির সোপান, তা মনে করি না। সেই ভাবটি রাখাই হলো উপাসনা-বোধে কর্ম করা। কিন্তু এইটিও মনের ক্ষেত্রের আংশিক পরিণতি। এর পরিপূরক ভাবটি হলো উপাসনারূপ কর্মে নৈষ্কর্ম্যবৃত্তি নিয়ে আসা। এইবার এই দুইটি ভাবের সামঞ্জস্য করলে কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান বা ভক্তি—সবই কর্মও বটে. উপাসনাও বটে। জাগ্রত মনকেই বলে কর্ম—সেই মনের উপরে যে ভাবজগৎ তাকেই বলা হয় উপাসনার ক্ষেত্র। এই উভয় ক্ষেত্রের উর্ধ্বে মন যেতে চায় না। নানা রকম সাধনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—এই কর্ম ও উপাসনার উর্ধ্বে যে বোধ সেইখানে স্থিতি যাতে হতে পারে। স্বামীজী সর্ব-সাধারণের জন্যে এই একটা সহজ সাধনার পথ বলে গিয়েছেন। সব কাজই ভগবানের কাজ ভাবলে মনের উপাসনার ভাব-জগৎ খুলে যায়। সেই ভাব-রাজ্যেও নিস্পৃহ হতে হবে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ স্বাভাবিক ভাবে যখন ভগবদ্‌বোধ প্রত্যেক কার্যে থাকে, তখনই উপাসনাও কার্যে পরিণত হতে পারে, তার পূর্বে নয়। এক কথায় বেদান্ত-ভাবের চরম অবস্থায় 'কর্ম উপাসনা ও উপাসনা কর্ম" রূপে—অনুভূতি হতে পারে। স্বামীজীর ছোট ছোট এক একটি কথার তাৎপর্য এই রকম অতি নিগূঢ়।

একবার স্বামীজীকে প্রশ্ন করলাম, "মুক্তি কি গুরু দেন, না জীব সাধনা বলে মুক্তিলাভ করে?"

স্বামীজী। জীব নিজের ইচ্ছায় বদ্ধ হয়েছে। বদ্ধ হয়েছে বলেই তো সে জীব। অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা থেকে সে নিজের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ব্যষ্টিত্ব লাভ করেছে এবং সেই থেকে নিজেকে আলাদা বলে ভাবছে। কেন এমন হলো? এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই।

যদি বল কোন শক্তির দ্বারা হয়েছে, জীবের নিজের ইচ্ছায় হয়নি, তাহলে সেই শক্তির নাম হলো মায়া। মায়ার প্রভাবে জীব নিজের আলাদা অস্তিত্ব বোধ করে। মায়ার যে শক্তি, তার অনন্ত ধারা। জীবের ক্ষুদ্র শক্তি তার কাছে থাকবে জলবিন্দুর মতো। জীব একা একা কি করবে? তাই মায়াশক্তির সঙ্গে সে খেলে, খেলতে খেলতে ভুলে যায় কোথা থেকে সে এসেছে। প্রকৃতির ফাঁদে পড়ে ব্রহ্ম (জীব) তখন কাঁদে।

ছোট ছেলেদের দেখেছিস? একটা থাম ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে। জীবও ওই রকম নিজের বাসনা-বলে হাবুডুবু খাচ্ছে আর বলছে, "বাঁচাও।" ছোট ছেলে যদি বলে, "আমার হাত খুলে দাও!" বড়রা কি করে? হাসে, আর এই তামাসা দেখে। মায়ার শক্তি আশ্রয় করেই জীব ভোগ করে আর তাকেই বলে, "দূর হ!" ঈশ্বর তখন সেই জীবকে উদ্ধার করতে ছুটে আসবেন? না, মজা দেখবেন? ছোট ছেলে হাত খুলে নেয়, যখন ঘুরপাক খাওয়ার ইচ্ছা তার শেষ হয়। জীবের মুক্তিও নির্ভর করে বাসনা-ত্যাগে। বাসনা ত্যাগ করার ইচ্ছা হলে তখন মুক্তির কথা। ত্যাগ হয়ে গেলেই মুক্তি।

আমি। তাহলে গুরু কি করেন? কৃপা আমরা চাই-ই বা কেন?

স্বামীজী। জীব নিজে পথ দেখতে পায় না, হাতড়াচ্ছে কিসে উদ্ধার হবে। তখন এমন একজনকে আশ্রয় করে, যাঁর ও পথঘাট জানা আছে। তিনি একটা রাস্তা ধরিয়ে দেন। সেইভাবে সাধনা করলে সে মুক্তির পথ খুঁজে পায়। এটা গুরুকৃপা ছাড়া কি?

আমি। আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে, সাধনার ওপর আপনি জোর দিচ্ছেন। ভক্তিতে তো কৃপাই একমাত্র অবলম্বন।

স্বামীজী। ওটা কি জানিস? এক একটা ভাব। এক এক ভাবে এক এক রকম মনে হয়। যদি পূর্ণ ভক্তি বিশ্বাস থাকে, তাহলে সাধকের মনে হয়, সে কিছুই করছে না—গুরুই সব করছেন। কিন্তু এ-রকম হওয়া বড় কঠিন। 'আমি, আমি' ভাব যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ সাধনা অর্থাৎ কর্মও আছে। কর্মের ফলও আছে। সাধনা পরিপক্ব হলে ইষ্ট-সাক্ষাৎকার হয়—ঈশ্বর কি বুঝলে তখন গুরুর প্রকৃত সত্তা অনুভূত হয়।

আমি। ব্রহ্মচর্য ছাড়া ব্রহ্মজ্ঞান হয় না—একথা শুনি। কিন্তু আজকাল সে-রকম আধার তো খুবই কম। তাহলে আমাদের মতো সাধারণ জীবের কি হবে?

স্বামীজী। ব্রহ্মচর্য একটা সাধনা। ওর মধ্যে সব রকম সাধনাই হয়। দেহ মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হওয়া চাই, তবে বুঝতে পারে, ভগবান কি। সন্ন্যাসীর ষোল আনা করতে হয়। তারা সংসারে আদর্শ হবে। সংসারী লোকেরও যথাশক্তি সংযত জীবন হওয়া দরকার। তবেই সেই বোধশক্তি জন্মাবে। শুধু বিচার করে আর বই পড়ে কি জানা যায়, ব্রহ্ম কি বস্তু?

আমি। ব্রহ্মচর্য-পালনই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কি বিবাহ না করাই উচিত?

স্বামীজী। জীবের সংস্কার এমন বলবান যে, সে বিবাহ করতে বাধ্য হয়। যে ওই সংস্কার থেকে কিছুটা মুক্ত, সে-ই সন্ন্যাসের অধিকারী হতে পারে। যেটুকু সংস্কার থাকে, তা গুরুবলে এবং সাধনপথে থাকলে চলে যায়। তবে বেশির ভাগ লোকের পক্ষে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করা সম্ভবপর নয়, কাজেই বিবাহ-সংস্কারও দরকার। তবে বিয়ে করলেই যে ব্রহ্মচর্য পালন হবে না, তা নয়। ঠাকুরই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আরও অনেকে আছেন, তবে তাঁদের কথা সর্বসাধারণে তো জানতে পারে না।

শান্তিরাম ঘোষ

স্বামী প্রেমানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর

একটু বেশি বয়সে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে পড়ি। তখন খুব সম্ভব দ্বিতীয় শ্রেণীতে। আন্দাজ সতের বছর বয়স। ঠাকুরের প্রথম দর্শন পাই বলরামবাবুর বাড়িতে, বিকালে। সেদিন শনিবার, এইটুকু কেবল মনে আছে। কম্বুলিটোলায় স্বর্গীয় বিপিন ডাক্তারের বাড়িতে তখন আমাদের থাকা। এরপর বসুবাটীতে দ্বিতীয়বার ঠাকুরকে দেখার সময় স্বামীজীকে সর্বপ্রথম দেখা। ওঁরা দুজনেই ওখানে রয়েছেন। মেজদা (বাবুরাম মহারাজ) আমাকে বলেন, "তোকে নরেন দেখতে চেয়েছে।" ঠাকুর দেখতে চেয়েছেন বললেন না। সন্ধ্যার পর স্বামীজী দোতলার হলঘরের দক্ষিণের বারান্দায় বসে, তখন তিনি গেরস্তের ছেলে। সাদা কাপড় পরা।

তারপর মেজদা আমাদের দেশ আঁটপুর গ্রামে যান। তাঁর ভারি ইচ্ছা, ঠাকুরের পদধূলি আমাদের ভদ্রাসনে পড়ে। এইজন্য সেখানকার বাড়ির দালান-আদি সারাবার যোগাড় করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। ঠাকুরের দেহান্তের পর স্বামীজী প্রমুখ সাধুবৃন্দ যান।

একবার মনে আছে, বলরামবাবুর বাড়ি ঠাকুর এসেছেন। হলের পশ্চিম কোণে ফরাসের উপর শুয়ে আছেন। কালী মহারাজ কাছে। আমাকে সেইবার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বলেন। দিতে দিতে এমনি বলেছি, "আমায় কিছু করে দিন।" বলা মোটেই আন্তরিক ছিল না। উনিও সঙ্গে সঙ্গে সাফ বললেন, "তুই তো ভারি চালাক।"

স্বামীজীকে প্রথম দিনই দেখে যেমন স্বভাবতই ভাল লেগেছিল, পরমহংসদেবকে সেরূপ লাগল না। স্বামীজীর ভেতর দিয়েই তিনি আমার কাছে পরে হাজির হবেন বলে কি প্রথম থেকেই তাঁকে ওরূপ ভাল না লাগা, কে বলবে? তখন প্রাণে ধর্মলাভের কোন আকাঙ্ক্ষাই জাগেনি, এইটাই আসল কথা।

প্রথম যখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখি, তাঁর কাছে জনৈক ভক্ত ছিলেন। এই ভক্তের

সেদিন সেইসময় 'ভাব' হতে লাগল। আমি ভাব-টাব কিছু বুঝতাম না। ভক্তটি হাত-পা বাঁকাতে লাগলেন, তেউড়ে গেলেন। ঠাকুরের মৌলিক ভাষায় 'খ্যাঁচা-ম্যাচা', মোটেই ভাল লাগল না। পরমহংসদেবের কথাবার্তা কিন্তু আমাকে আকর্ষণ করেছিল প্রথম দিনই। তাতে একটি অনন্যদৃষ্ট বিশেষত্ব ও অভাবনীয় আকর্ষণ ছিল। সোজা সোজা ঘরোয়া দৃষ্টান্তগুলি, গ্রাম্য জীবনে সকলের সুপরিচিত উপমা বা রূপকাবলী অবলম্বনে তত্ত্বালোচনা, গভীর দার্শনিকতাকে সুলভ, সুগম করার প্রয়াস অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বোধ হয়েছিল, আমার ভেতরটা ভিজিয়ে দিয়েছিল। আজও সেই প্রথম শোনা রূপকগুলো স্মৃতির পট থেকে মুছল না। দুটি বচন বেশ সুস্পষ্ট মনে আছে। বললেন, "ডোবাতে হাতি নামলে জল গুলিয়ে ওঠে, নদী-সাগরে নামলে কিছু হয় না।" ফের বললেন, "মানুষ বাইরে দেখতে এক; কিন্তু ভেতরে এক এক রকম, যেন পিঠেপুলি—ভেতরের পুর সব ভেন্ন ভেন্ন। ঠিক সেরূপ—হরেক প্রকৃতির মানুষ।"

আমার ভাগ্নে-ভাগ্নী, রাম, কেষ্টময়ী প্রভৃতি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সব বসেছিল। তাদের উপর নজর পড়তেই বললেন, "এসব তো হলো। এখন এরা।" ওদের জন্য আনন্দ করে ছড়া বলতে লাগলেন, "দে দৈ, দে দৈ পাতে, ওরে বেটা হাঁড়ি-হাতে। ওদের পাতে মাছের মুড়ো—ওরা কি তোর বাবা-খুড়ো?" ইত্যাদি। ওরা হেসেই খুন। মুখে মজার আওয়াজ করে ঐসব কথা বললেন।

দ্বিতীয়বার বসুবাটীতে যখন পরমহংসদেবের দর্শন হয়, তখন বিজলী আলোর রেওয়াজ হয়নি। রেড়ির তেলের সেজ জ্বলছিল।

তৃতীয়বার কলকাতা শ্যামপুকুর ভাড়াবাড়িতে দেখি, তখন তিনি অসুস্থ। এছাড়া আর একবার মাত্র দক্ষিণেশ্বরে বলরামবাবুর সঙ্গে তাকে দেখি। তাঁর দেহান্তের বৎসর আমি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীভুক্ত। এর ঠিক চার বৎসর পর ১৮৯৫, ১৩ এপ্রিল, পয়লা বৈশাখ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দাগা ভক্ত—যাঁর অন্ন তিনি বলতেন অতি শুদ্ধ—একান্ত বিশ্বস্ত, অশেষ বিশ্বাসময় বলরামের তনুত্যাগ।

স্বামীজী গাজীপুর থেকে ঐ নিদারুণ ঘটনার পরে এলেন। তিনি ও তাঁর গুরুভাইদের এবার প্রথম রূপান্তর দেখলাম। এখন সব গৈরিক পরিহিত। বলরাম ভবনের হলঘরে সবাই বসেছেন। আমি বি-এ পরীক্ষা দিয়ে রুরকি গিয়েছিলাম, মৃত্যুসংবাদ পেয়ে মেজদাকে নিয়ে কাশী থেকে ফিরে এলাম।

মেজদার সঙ্গেই সেই সর্বপ্রথম আমার বরাহনগরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দর্শন। সেদিন ওখানে অন্নপ্রসাদের মধ্যে যে চমৎকার থোড় সড়সড়ি খেয়েছিলাম, তা এখনো জিভে যেন লেগে আছে। জীবনে দুটো-একটা খুঁটিনাটি আশ্চর্যরকম মনে থাকে। এর হেতু খুঁজে পাওয়া ভার।

বলরাম মন্দির হলঘরে স্বামীজী প্রভৃতি সব সন্ন্যাসীরা একত্রে থাকতেন। সবাইয়ের এক একটি ছোট মশারি। গড়াগড় শুয়ে থাকতেন। এক রাত্রে যোগেন মহারাজের

বালিশে একটু জায়গা আছে দেখে আস্তে আস্তে আমি সেই একই বালিশে মাথা দিয়ে শুয়েছিলাম। সকালে উঠে উনি বলেছেন, "তুমি তো বেশ শোও। নড়োচড়ো না।"

স্বামীজীকে এই সময় বেশ মনে আছে। দেখতাম—বাইরের খাওয়া-পরা-থাকা কিছুর প্রতি তিলমাত্র লক্ষ্য নেই।

সন্ন্যাসীদের রাত্রে থাকার জন্য সিঙ্গেল মশারি আলনায় বলরামবাবু নিজহস্তে সাজিয়ে রাখতেন, পশ্চিমের দুইতলা ঘরে। বাড়ি-ঘর-দোর-উঠান সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন। দেখেছি একটা কালচিটে ময়লা বালিশে মাথা দিয়ে স্বামীজী অম্লানবদনে হলঘরে শুয়ে থাকতেন। বাইরের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। নিচে একতলা ঘরের কোণে দালানে বলরামবাবুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হচ্ছিল। একজন অল্পবয়সী সাধু দোতলার বারান্দা থেকে তা দেখছিলেন। স্বামীজী তাঁকে দেখতে নিষেধ করলেন, কারণ সন্ন্যাসীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দেখতে নেই।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে বলরামবাবুর সঙ্গে স্বামীজী একদিন বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটারে বিল্বমঙ্গল নাটকের অভিনয় দেখতে যান। আমিও সঙ্গে যাই। স্বামীজী প্রভৃতি অনেকেই বলরামবাবুকে খুব সমীহ করতেন। সামনে তামাক খেতেন না। ছোট ভাই সাধুবাবুর সঙ্গে তাঁদের খুব দহরম-মহরম হতো। দোতলায় পশ্চিমের ছোট ঘরে তাঁকে নিয়ে তামাক খাওয়া হতো।

বলরামবাবু থাকতে স্বামীজী একদিন খাবেন, গলদা চিংড়ি হবে। তিনি খেতে ভালবাসেন। মাছটা একটু রসা ছিল। স্বামীজী দিব্যি খেয়ে গেলেন। কোন খুঁত ধরলেন না। কিন্তু আমার দাদা দোষ ধরাতে বলরামবাবু বললেন, "নরেন সোনার চাঁদ ছেলে, কিছু নিন্দে করলে না। (পত্নীকে)—আর তোমার ভাই বললে মাছ খারাপ।"

বিশেষ লক্ষ্য করেছি, সে-সময় স্বামীজী বাহ্য ব্যাপার আমলে আনতেন না। যা দিত, তাই খেতেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের একদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। বলরাম মন্দিরে হলঘরে স্বামীজী বেড়াচ্ছেন। আমি সঙ্গে আছি।

বললেন, "কি ভাবছ?"

আমি চুপ।

"দেখ, একটা ছবি আছে চাকার পিছনে। ছ্যাঁদার ভিতর দিয়ে ছবিটি বেশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু চাকাটা যখন ঘোরে, ছবি দেখা যায় না। তেমনি মনেতে এইরকম চিন্তাদি রাতদিনই ঘুরছে। যদি মনটা স্থির হয়, তাহলে আমরা পেছনের ছবি দেখতে পাই—চাকাটা স্থির হলে।

"স্থির করতে হবে মনকে। শান্ত হয়ে এক জায়গায় চুপ করে বসবে। বসে শুধু দেখবে—মনে মনে কি কি চিন্তা উঠছে। কিন্তু কোন চিন্তাকে ধরবে না। যেমন রেলের স্টেশন দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে। এইরকম যদি রোজ রোজ কর, তাহলে ক্রমে ক্রমে

দেখবে—যদি আজকে দুশো চিন্তা হয়, কাল একশো আটানব্বইটা হয়ে গেছে। এইরূপ নিয়মিত অভ্যাস করতে করতে চিন্তা কমে আসবেই। আর মন আয়ত্তে এসে যাবে—স্থির হবে।"

আটপুরে তিনি মৌন ছিলেন। যে কাজ নেহাৎ দরকার, দেখলাম লিখে লিখে দিলেন। পাশ্চাত্যে যাবার আগে ৫৭নং বাড়িতে দোতলার বার-বাড়ির সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মেজদার নাম করে বলেছিলেন, "ওকে দেখো।"

প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এলেন। ডায়মণ্ডহারবারে জাহাজ নোঙর করল। ডেকে পায়চারি করছেন। আমাদের দেখেই চিৎকার করে বলছেন, "ভাল আছ তো?"

আর দেখেছি ওঁর প্রতি রাখাল মহারাজের মিশ্রিত ভয়-ভালবাসা। হয়তো খেলা-ধুলো হচ্ছে, স্বামীজীর আসার শব্দ হওয়ামাত্রই সব গুটিয়ে ফেলা হলো। যেমন 'গুড্ বয়,' তেমনি 'গুড্ বয়।'

আমার মায়ের ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসীদের উপর বিশেষ ভক্তি ছিল। তিনি একদিন যোগেন মহারাজকে বলেন, "তুমি শান্তিরামের স্ত্রীকে মন্ত্র দাও।" তিনি বললেন, "বেশ তো। আমি কেন? —স্বামীজীই দেবেন।" মা রাজি। যোগেন মহারাজ ঐকথা স্বামীজীকে বলেছেন। দীক্ষার আগের দিন যোগেন মহারাজ আমায় বললেন, "তোমার স্ত্রীর হচ্ছে, তুমিও নাও না।" আমি দ্বিরুক্তি করলাম না। আগে আমার হলো, পরে আমার পত্নী সরোজিনীর হলো। তা হলো বলরাম গৃহে দোতলায়, বাড়ির ভেতর দিকের পশ্চিম ঘরখানিতে। স্বামীজী দেখলাম পুজো-টুজো কিছুই করলেন না। ধূপ-দীপ-চন্দন-বিল্বপত্র—কিছুই নিলেন না। দুখানি আসন ঘরে পাতা।

জিজ্ঞেস করলেন, "কোন ঠাকুর ভাল লাগে? কি ভাল লাগে?"

আমি বললাম, "কি করে জানব? মনকে তো জানি না, কি করে বলব কি ভাল লাগে?" তারপর তিনি মুখে একটি কথা বললেন, কানে নয়। যেটি উনি বললেন, আশ্চর্যের বিষয়—তক্ষুণি তা আমার খুবই ভাল লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো—বাঃ, এতো বেশ জিনিস! আমি তো এর কিছুই জানতাম না। কখনো ধরতে পারিনি যে এটা আমার ভাল লাগে।

শেষে বললেন, "একটা ফল-টল কিছু নিয়ে আয়।" এই 'তুই' বলা শুরু করলেন। একটা গোলাপজাম এনে দিলাম। সেটি খেয়ে ফেললেন। আর কোন কিছু উপদেশ দিলেন না। ১৩০৩, ১১ চৈত্র, কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথি, বেলা সাড়ে বারটায় দীক্ষা হলো—১৮৯৭, ২৩ মার্চ।

আগের রাত্রে পত্নীকে আমি স্বতই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তোমার কি ভাল লাগে?" আমরা বংশগতভাবে কিন্তু শাক্ত। পত্নী বললেন, "সীতারাম ভাল লাগে।"

আমার দীক্ষা শেষ হলো। পত্নীর হবে। আমি উঠে এলাম। কি জানি যদি পত্নী সঙ্কুচিত হন। স্বামীজী কিন্তু বলেছিলেন, "বোস না!"

পরে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলাম, “তোমার কি হলো ?” তিনি বললেন, “কাল যা বলেছিলাম তাই হলো।”

ধ্যান-ধারণা কি প্রণালীতে করতে হয়, পরে তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলেন, “ধ্যান-ট্যান তোর হবে না। জপ করিস।”

একবার বলরামবাবুর বাড়িতে ভোর সাড়ে চারটের সময় স্বামীজী বললেন, “খিদে পেয়েছে।” মা তখন ছিলেন না। সরোজিনী ঐ সংবাদ শুনে সঙ্গে সঙ্গে লুচি, হালুয়া, কি কি ভাজা তৈরি করে দিলেন। আমি সে খবর কিছুই জানি না।

স্বামীজী হাসতে হাসতে খেতে খেতে আমায় বলছেন, “দেখছিস আমার কেমন শিষ্যা !”

হাতজোড় করে পেন্নাম করতাম। পায়ের ধুলো নিতে জানতাম না। একদিন স্নান করছেন—বললেন, “আমার পিঠে সাবান দিয়ে দে তো।” দিলাম, জীবনে সেই প্রথম তাঁকে স্পর্শ করবার ভাগ্য হলো। এ না হলে বোধহয় জীবিতাবস্থায় তাঁকে আর ছোঁয়া হতো না।

১৩০৮—ইংরেজী ১৯০১। আমার টাইফয়েড। মা ও পত্নী পুরীধামে। রাখাল মহারাজ সর্বদাই কাছে আছেন। তাঁর অপার স্নেহযত্ন ভোলবার নয়। রাখাল মহারাজ নিজে সেবা করেছেন। এত দয়া তাঁর।

একচল্লিশ দিনের পর প্রথম জ্বর ছাড়ল। স্বামীজী নিজে ঠাকুরের পুজো করে বেলুড় মঠ থেকে চরণামৃত পাঠান। আট-দশদিন পর আবার জ্বর আক্রমণ করল। ফের আবার একুশ দিন ভুগতে হয়। বিপিন ডাক্তারকে ভাল না লাগাতে মহেন্দ্র মজুমদারকে দেখালাম।

১ কার্তিক বেলুড়ে স্বামীজী যেদিন প্রথম দুর্গোৎসব করেন, সেই শুভদিনে ভাতের মণ্ড পথ্য করি। পরিশেষে স্বামীজী যোগেন মহারাজকে আমার দুবার পর পর টাইফয়েড রোগাক্রমণ সম্বন্ধে বলেন, “দেখ। ওর যে এত বড়ো ব্যারাম হলো, কিন্তু অঙ্গহানি হলো না, এইটেই ঠাকুরের দয়া।”

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা পুলিসের প্রথম ভারতীয় ডেপুটি কমিশনার

আমার বাবা মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেকালের দার্জিলিং-এ সরকারি উকিল, বাইরে সাহেব, বাড়িতে আনুষ্ঠানিক হিন্দু। নিত্য ঠাকুরঘরে আরাত্রিকাদি সহযোগে নারায়ণ পূজা করতেন। স্বামীজীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মা-বাবার ধর্মপ্রসঙ্গে আলোচনা হতো—তাঁরা স্বামীজীকে খুবই ভক্তি করতেন। তাঁরা তাঁর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন কিনা জানি না। তাঁরা ছিলেন প্রবল সাধুভক্ত। অনেক সাধুই আসতেন, নিকটে মন্দিরে থাকতেন, আমাদের বাড়ি থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন। স্বামীজীর কয়েকখানি চিঠিতে আমাদের দার্জিলিং-এর বাড়ির ঠিকানা আছে। আমাদের বাড়িতে আবার ইংরেজী-চর্চা ও খানাপিনারও খুব ব্যবস্থা ছিল। সেজ ভাই শৈল, পরে কলকাতা হাইকোর্টের কৃতী ব্যারিস্টার শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলুড় মঠে স্বামীজীর কাছে থেকে বালি টমসন স্কুল ও কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ত। শৈলকে বাড়িতে ডাকা হতো 'সাইলা' বলে। এই স্টাইলে আমার ভূপেন নামের 'বপেন' নামান্তরও চালু। ১৬ বছর বয়সে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে আমি দার্জিলিং সেণ্ট জোসেফ স্কুলে লণ্ডন-ম্যাট্রিক ছাত্র। পড়াশোনায় মোটে মন বসে না, খালি খেলা আর আড্ডা।

একটা কথা সবচেয়ে মনে হয়, মানুষের প্রতি স্বামীজীর অপার করুণা, Infinite grace। কখনো নিয়মনিষ্ঠা করে জপ করিনি। সটান মুখের উপর বলেছিলাম, আপনি মন্তর ঘুরিয়ে নিন, আমার মনে থাকবে না, জপ করতে পারব না। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, "যা বেটা, যখন দরকার হবে, ঠিক সময় হবে, দেখবি, আপনা থেকে মনে উদয় হবে, এখন মনে না থাকে না থাক।"

আজ জীবনের শেষে দেখছি, শুয়ে শুয়ে বিনা চেষ্টায় তিনি যা বলে দিয়েছিলেন, সে ক-টি অক্ষর সব সময়েই মনে হচ্ছে। আপনা হতে জপ হয়ে চলেছে। এ-কৃপার কি যুক্তি কি জানি।

১৮৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রথম আমাদের কাছে আসেন। তখন সেণ্ট জোসেফ্-এ পড়ি, বয়েস তের-চৌদ্দ। ষোল বৎসর বয়সে স্বামীজীকে যেদিন প্রথম দেখলাম, সেটি একটি স্মরণীয় দিন। প্রত্যেকে প্রথমে চেহারা দেখেই মুগ্ধ। সঙ্গে গুডউইন, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার, কিডি, জি জি (নরসিংহচারি)। তখন এধারে আমি তো পড়া ছেড়েছি, দারুণ আড্ডাবাজ হয়েছি। চা-বাগানে কাজ করছিলাম। সপ্তাহে একদিন-দুদিন বাড়ি আসি।

স্বামীজী তো আলাপ হতেই একেবারে আপন করে নিলেন। বললেন, "চল, তোর চা-বাগান দেখে আসি।" আমার কর্মস্থল চার-পাঁচ মাইল দূরে। ঘোড়ায় চেপে গেলেন, দেখলেন। দেখে তো ভারি খুশি। সে কি ভালবাসা, ভাষায় বলা যায় না। তিনমাস আমাদের বাড়িতে সেবার ছিলেন। শুনলাম বড়দা (বলেন্দ্রনাথ) মন্ত্র নিয়েছেন। কয়েক মাস খুব হৈ-হৈ করা গেল। পনের-ষোল মাইল ঘোড়ায় চড়িয়ে সিকিম ফ্রনটিয়ার নিয়ে গেলাম। বিদেশ থেকে রোস্টার মেশিন এনেছিলেন। পাঁঠা কাটা হলো। উনিই অতি উৎকৃষ্ট পোলাও-মাংস রাঁধলেন। দু-একদিন পরে ফিরলাম। মজা দেখার জন্য দাক্ষিণী ব্রাহ্মণ জি জি-কে 'রামপাখি' প্রসাদ দিয়েছেন একটু। বিনা সঙ্কোচে তিনিও তাঁদের দেশের জাত্যাচারে নিষিদ্ধ আহার গ্রহণ করলেন, গুরু-প্রসাদের মর্যাদা রক্ষা করলেন। স্বামীজী আমাদের মধ্যে দ্বিতীয়বার যখন আসেন, তখন সঙ্গে ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও মিসেস সেভিয়ার। তাঁরা হোটেলের বাসা থেকে আসতেন। বড় সজ্জন। স্বামীজীর সেবক এবারে কেষ্টলাল। একদিন আমাকে দেখিয়ে মা বললেন, "একে দীক্ষা দিন।" মা স্বামীজীকে সিল্কের গেরুয়া দিলেন। ঠাকুরঘরে দীক্ষা হলো। ডান কানে মন্ত্র বলে দিলেন, যেন চুপি-চুপি। ১৮৯৮ বা ১৮৯৯।

আরও একবার আমাদের ভাড়া বাড়িতে ওঁর বোনকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের নিজেদের বাড়িতে সেই তাঁর শেষ ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভ। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে চা-বাগানের কাজ ছেড়ে বাড়িতেই হৈ-হৈ করি। তিনিও বললেন, "ওরে, তোকে ভাবতে হবে না, তোর হৈ-হৈ করেই কেটে যাবে।" আমাদের একটি চার্চ-অর্গ্যান ছিল। তাতে স্বরচিত 'খণ্ডন ভব বন্ধন' বন্দনাগীত শিখিয়ে দিলেন।

বেলুড় মঠে স্বামীজীকে দু-একবার দেখেছি। মাংস ভালবাসতেন, নিয়ে যেতাম। মঠের নিজস্ব পানসি ছিল। তাইতে চড়ে গঙ্গার উপর বেড়াতেন। আমিও বেড়িয়েছি তাঁর সঙ্গে, খুব আনন্দ হতো। ক্রীসমাসের সময় একবার প্রচুর খাওয়ালেন। তখনকার মঠের বেগুন ক্ষেত মনে পড়ে। বুড়ো গোপালদাকে বড্ড ক্ষেপাতেন, রঙ্গরস করতেন।

অসীমকুমার বসু

আমার বাবা (কথামৃতে উল্লিখিত চুনীলাল বসু) ঠাকুরের ভক্ত। ছেলেবেলায় বহুবার আমাদের পাড়ায়[১] পরমহংসদেব এসেছেন। তাঁকে দর্শন করেছি অনেকবার। বাবার নির্দেশমতো আলমবাজার মঠে পরে স্বামীজীর কাছে আমার দীক্ষা হয়। এনট্রানস দেবার সময় স্বামীজী আমাদের বাড়ি এসেছেন। আমি অঙ্কে কাঁচা। তাঁকে জানাতে তিনি বললেন, "আমিও তা-ই ছিলুম। F. A.-তে Wilson-এর Conics মুখস্থ করে পাশ করেছিলুম। তুইও তা-ই করবি।"

পরে আমি আইন পড়ছি। একদিন স্বামীজী এসেছেন। কথায় কথায় বললেন, "উকিলের তো উদ্দেশ্য দেখছি, পরের ভেতর ঝগড়া সৃষ্টি করা।" তাঁর কথায় আমার ওকালতির ওপর কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। আইন পড়া ছেড়ে দিলাম।

অভিনয় সম্বন্ধে একদিন তিনি প্রসঙ্গ করছিলেন। পাশ্চাত্যের তুলনায় আমাদের দেশের তখনকার দিনের অভিনয়-দারিদ্র্যের কথা বললেন। নিজে গিরিশবাবুর নাটক থেকে এবং শেকস্‌পীয়ারের রোমিও-জুলিয়েট থেকে খানিকটা অভিনয় করে দেখালেন। চমৎকার লাগল।

প্রতিভার খনি ছিলেন তিনি। বাবার আগ্রহে তাঁর কাছে দীক্ষা হয়। যখন দীক্ষা নিই তখন চাকরি করি। সেদিন কিছু ফলমূল এবং তাঁর প্রিয় খাবার মাংস সঙ্গে নিয়ে যাই। আগে থেকেই আমাকে স্নেহ করতেন। পুজো-টুজো না করেই দীক্ষা দেন। মন্ত্র নেওয়ার পর ক্রমশঃ তাঁকে গুরু বলে বুঝতে পারলুম। ধ্যান-জপ করতে শেখালেন। তাঁর কৃপায় ধীরে ধীরে সাধুদের আপনার জন বলে বিশ্বাস হতে লাগল। আমার শরীর বরাবর খারাপ। একটু কিছু না খেয়ে জপ-আহ্নিক করার অসুবিধা সারদা মহারাজ মারফত তাঁকে জানাতে তিনি বলে পাঠান, "একটু খেয়ে-দেয়ে করলেও কোন দোষ হবে না। আর যখন তোর সুবিধা হবে করবি।"

তিনি একবার বলেছিলেন, "ঠাকুরের কৃপায় শাস্ত্রের Text পড়লেই অতি সহজে ভেতরের ভাবটা এসে যায়। তোমরা ভাষ্য-টাষ্য বেশি পড়বে না। Text আগে পড়বে। বেশি করে পড়বে।"

দেহত্যাগের ঠিক এক সপ্তাহ আগে শেষ দেখা। বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। তখন তাঁর কবিরাজী চিকিৎসার বাঁধাবাঁধি চলছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন আছেন?"

বললেন, "আরে তুমিও যেমন! ডাক্তার-বদ্যিতে তো অনেক কথাই বলে। কিন্তু আমার মৃত্যুরোগ। তারা কি করবে?"

—"কি খাবেন? দুধ খাবেন? আমাদের বাড়িতে গাই আছে।"

—"হ্যাঁ, তা খাব। অন্য কিছু খাওয়া চলবে না।"

১ ৫৯বি রামকান্ত বসু স্ট্রীট, বাগবাজার, কলকাতা ৭০০ ০০৩ ঠিকানায় চুনীলাল বসুর বাসভবন, বলরাম মন্দিরের পাশে।

সূত্রনির্দেশ

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বামী সদানন্দ : স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন

স্বামী শুদ্ধানন্দ : উদ্বোধন, ১৫ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২০

ঐ ১৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩২১

ঐ ১৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩২১

ঐ ১৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২২

ঐ ৫৪ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৫৯

স্বামী অচলানন্দ : উদ্বোধন, ৬৬ বর্ষ, ২য়/৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন/চৈত্র, ১৩৭০

ব্রহ্মচারী জ্ঞান : স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন

হরিপদ মিত্র : উদ্বোধন ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৫ই চৈত্র, ১৩১০

ঐ, ঐ, ৯ম সংখ্যা, ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১

ঐ, ঐ, ১৪ সংখ্যা, ১৫ শ্রাবণ, ১৩১১

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী : উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা, পৌষ, ১৩৭০ (স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ লিখিত 'স্বামীজীর সম্বন্ধে বেটুকু শুনিয়াছি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : উদ্বোধন, ৬২ তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৬৭

ঐ ঐ ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ ঐ

ঐ ঐ ১০ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৬৭

ঐ ৬৪তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৬৯

ঐ ঐ ১২শ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৬৯

ঐ ৬৫তম বর্ষ ১২শ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৭০

ঐ বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা, পৌষ, ১৩৭০

শান্তিরাম ঘোষ : স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঐ

অসীমকুমার বসু : ঐ

তৃতীয় অধ্যায়

প্রিয়নাথ সিংহ

স্বামীজীর বাল্যবন্ধু। 'গুরুদাস বর্মন' ছদ্মনামে তিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত' (১ম ভাগ) গ্রন্থটি লিখেছিলেন। বাল্যবন্ধুকে কখনো মজা করে স্বামীজী বলতেন 'প্রিয় সিঙ্গি' বা শুধু 'সিঙ্গি', কখনো উল্টে হতো 'সিয় প্রিঙ্গি'।

স্বামীজীর বাড়ির কাছেই আমাদের বাড়ি ছিল। এক পাড়ার ছেলে আমরা, ছেলেবেলায় তাঁর সঙ্গে কত খেলাই না খেলেছি। তারপর তাঁর জীবন আর আমাদের জীবন কত তফাত হয়ে গেল। কতদিন কত বৎসর দেখাসাক্ষাৎই হয়নি। শুনতে পেতাম বটে, তিনি সন্ন্যাসী হয়েছেন, দেশ-বিদেশে ঘুরছেন। আমার কিন্তু ছেলেবেলা থেকে তাঁর ওপর বিশেষ একটা টান ছিল। তাই বড় হয়েও তাঁর কথা একদিনও ভুলতে পারিনি। তিনি যে একটা খুব বড়লোক হবেন, এটা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে এমনভাবে যে জগতের পূজ্য হবেন, একথা কে ভেবেছিল? তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াতে এই কথাই মনে হয়েছিল যে, হায়, এত বড় শক্তিমান পুরুষের জীবনটা মিছেই হয়ে গেল!

তারপর তিনি আমেরিকা গেলেন। শিকাগোর ধর্মসভা ও আমেরিকার অন্যান্য স্থানের বক্তৃতার সারাংশ একটু-আধটু কাগজে দেখতে লাগলুম। যা একটু-আধটু বিবরণ পেতাম, তাতেই অবাক হয়ে যেতাম। ভাবলাম, আগুন কখনো কাপড়ে ঢাকা থাকে না। এতদিনে স্বামীজীর ভেতরের সেই শক্তি জ্বলে উঠেছে। ছেলেবেলাকার সেই ফুল এতদিনে ফুটেছে। যতই তাঁর অদ্ভুত কথা কাগজে পড়তে লাগলাম, ততই সেই বাল্যবন্ধুকে আবার দেখবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল।

একদিন শুনলাম, তিনি দেশে ফিরছেন। মাদ্রাজে এসেছেন, জ্বলন্ত অগ্নিময় বক্তৃতা করেছেন। সে বক্তৃতা পড়লাম, প্রাণ মেতে উঠল। ভাবলাম, হিন্দুধর্মের ভেতর এই জিনিস আছে; আর এমন সহজ করে জলের মতো ধর্মটা বোঝানো যায়? এঁর কি অদ্ভুত শক্তি! ইনি কি মানুষ না দেবতা?

তার পর একদিন কলকাতায় ভারি হৈচৈ; স্বামীজী এলেন। বাগবাজারে পশুপতিবাবুর বাড়িতে তাঁর অভ্যর্থনা হলো এবং শীলবাবুদের কাশীপুরের গঙ্গার ধারের বাগানে তাঁকে সঙ্গে করে রেখে আসা গেল। কয়েক দিন পরে রাজা রাধাকান্তদেবের বাটীতে বিরাট সভায় স্বামীজীর স্নিগ্ধ-গম্ভীর বক্তৃতা হলো—যে যেখান থেকে শুনলে, চিত্রার্পিত হয়ে রইল।

কলকাতায় আসা অবধি তাঁর সঙ্গে নির্জনে একবার দেখা করবার এবং প্রাণ খুলে ছেলেবেলাকার মতো দুটো কথা বলবার জন্য মন বড় ব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু সদাই লোকের ভিড়। অনবরত বহুলোকের সঙ্গে আলাপ চলেছে। সুবিধামতো সময় আর

পাই না। ইতিমধ্যে একটু অবসর পেয়েই তাঁকে ধরে নিয়ে বাগানে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এলাম। তিনিও শৈশবের খেলুড়েকে পেয়ে আগেকার মতোই কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। দুচারটা কথা কইতে না কইতেই ডাকের ওপর ডাক এল যে, অনেক নূতন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এবার একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "বাবা একটু রেহাই দাও ; এই ছেলেবেলাকার খেলুড়ের সঙ্গে দুটো কথা কই, একটু ফাঁকা হাওয়ায় থাকি। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের যত্ন করে বসাওগে, তামাক-টামাক খাওয়াওগে।"

যে ডাকতে এসেছিল সে চলে গেলে জিজ্ঞাসা করলাম, "স্বামীজী তুমি সাধু। তোমার অভ্যর্থনার জন্য যে টাকা আমরা চাঁদা করে তুললাম, আমি ভেবেছিলাম যে, তুমি দেশের দুর্ভিক্ষের কথা শুনে, কলকাতায় পৌঁছুবার আগেই আমাদের 'তার' করবে যে, 'আমার অভ্যর্থনায় এক পয়সা খরচ না করে দুর্ভিক্ষনিবারণী ফাণ্ডে ঐ সমস্ত টাকা চাঁদা দাও,' কিন্তু দেখলুম, তুমি তা করলে না ; এর কারণ কি ?"

স্বামীজী বললেন, "হাঁ, আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, আমায় নিয়ে একটা খুব হৈচৈ হয়। কি জানিস, একটা হৈচৈ না হলে তাঁর (ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের) নামে লোক চেতবে কি করে? এত ovation (সম্বর্ধনা) কি আমার জন্য করা হলো, না, তাঁর নামেরই জয়জয়কার হলো ? তাঁর বিষয় জানবার জন্য লোকের মনে কতটা ইচ্ছা হলো। এইবার ক্রমে তাঁকে জানবে তবে না দেশের মঙ্গল হবে। যিনি দেশের মঙ্গলের জন্য এসেছেন, তাঁকে না জানলে লোকের মঙ্গল কি করে হবে ? তাঁকে ঠিক ঠিক জানলে তবে মানুষ তৈরি হবে, আর মানুষ তৈরি হলে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাড়ানো কতক্ষণের কথা! আমাকে নিয়ে এই রকম বিরাট সভা করে হৈচৈ করে তাঁকে প্রথমে মানুক—আমার এই ইচ্ছাই হয়েছিল ; নতুবা আমার নিজের জন্য এত হাঙ্গামার কি দরকার ছিল ? তোদের বাড়ি গিয়ে যে একসঙ্গে খেলতুম, তার চেয়ে আর আমি কি বড়লোক হয়েছি ? আমি তখনও যা ছিলাম, এখনও তা-ই আছি। তুই-ই বল না, আমার কি কোন পরিবর্তন দেখছিস ?"

আমি মুখে বললাম, "না, সে-রকম তো কিছুই দেখছি না। তবে মনে হলো—সাক্ষাৎ দেবতা হয়েছ !"

স্বামীজী বলতে লাগলেন, "দুর্ভিক্ষ তো আছেই, এখন যেন ওটা দেশের ভূষণ হয়ে পড়েছে। অন্য কোন দেশে দুর্ভিক্ষের এত উৎপাত আছে কি ? নেই। কারণ, সেসব দেশে মানুষ আছে। আমাদের দেশের মানুষগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে। তাঁকে দেখে, তাঁকে জেনে লোকে স্বার্থত্যাগ করতে শিখুক, তখন দুর্ভিক্ষ নিবারণের ঠিক ঠিক চেষ্টা আসবে। ক্রমে সে চেষ্টাও করব, দেখ না।"

আমি। আচ্ছা, তুমি এখানে খুব লেকচার-টেকচার দেবে তো ? তা না হলে তাঁর নাম কেমন করে প্রচার হবে ?

স্বামীজী। তুই খেপেছিস, তাঁর নাম প্রচারের কি কিছু বাকি আছে ? লেকচার

করে এদেশে কিছু হবে না। বাবুভায়ারা শুনবে, 'বেশ বেশ' করবে, হাততালি দেবে ; তারপর বাড়ি গিয়ে ভাতের সঙ্গে সব হজম করে ফেলবে। পচা পুরনো লোহার ওপর হাতুড়ির ঘা মারলে কি হবে? ভেঙে গুড়ো হয়ে যাবে। তাকে পুড়িয়ে লাল করতে হবে ; তবে হাতুড়ির ঘা মেরে একটা গড়ন করতে পারা যাবে। এদেশে জ্বলন্ত জীবন্ত উদাহরণ না দেখলে কিছুই হবে না। কতকগুলো ছেলে চাই, যারা সব ছেড়েছুড়ে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। তাদের life আগে তয়ের করে দিতে হবে, তবে কাজ হবে।

আমি। আচ্ছা স্বামীজী, তোমার নিজের দেশের লোক নিজেদের ধর্ম বুঝতে না পেরে কেউ কৃশ্চান, কেউ মুসলমান, কেউ বা অন্য কিছু হচ্ছে, তাদের জন্য তুমি কিছু না করে, গেলে কিনা আমেরিকা ইংলণ্ডে ধর্ম বিলুতে?

স্বামীজী। কি জানিস, তোদের দেশের লোকের যথার্থ ধর্ম গ্রহণ করবার ও অনুষ্ঠান করবার শক্তি কি আছে? আছে কেবল একটা অহঙ্কার যে, আমরা ভারি সত্ত্বগুণী। তোরা এককালে সাত্ত্বিক ছিলি বটে, কিন্তু এখন তোদের ভারি পতন হয়েছে। সত্ত্ব থেকে পতন হলে একেবারে তমোয় আসে। তোরা তাই এসেছিস। মনে করেছিস বুঝি যে নড়ে না চড়ে না, ঘরের ভেতর বসে হরিনাম করে, সামনে অপরের ওপর হাজার অত্যাচার দেখেও চুপ করে থাকে, সেই-ই সত্ত্বগুণী—তা নয়, তাকে মহা তমোয় ঘিরেছে। যে-দেশের লোক পেটটা ভরে খেতে পায় না, তার ধর্ম হবে কি করে? যে-দেশের লোকের মনে ভোগের কোন আশাই মেটেনি, তাদের নিবৃত্তি কেমন করে হবে? তাই আগে যাতে মানুষ পেটটা ভরে খেতে পায় ও কিছু ভোগবিলাস করতে পারে, তারই উপায় কর। তবে ক্রমে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এসে ধর্মলাভ হতে পারে। বিলেত আমেরিকার লোকেরা কেমন জানিস? পূর্ণ রজোগুণী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রকম ভোগ করে এলে গেছে। তাতে আবার কৃশ্চানী ধর্ম—মেয়েলি ভক্তির ধর্ম, পুরাণের ধর্ম। শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে তাতে আর তাদের শান্তি হচ্ছে না। তারা যে অবস্থায় আছে, তাতে তাদের একটা ধাক্কা দিয়ে দিলেই সত্ত্বগুণে পেঁছয়। তারপর আজ একটা লালমুখ এসে যেকথা বলবে, তা তোরা যত মানবি, একটা ছেঁড়ান্যাকড়া-পরা সন্ন্যাসীর কথা তত মানবি কি?

আমি। এন. ঘোষও ঠিক ঐ ভাবের কথা বলেছিলেন।

স্বামীজী। হাঁ, আমার সেখানকার চেলারা সব যখন তৈরি হয়ে এখানে এসে তোদের বলবে, "তোমরা কি করছ, তোমাদের ধর্ম-কর্ম রীতি-নীতি কিসে ছোট? দেখ, তোমাদের ধর্মটাই আমরা বড় মনে করি"—তখন দেখিস হুদো হুদো লোক সেকথা শুনবে। তাদের দ্বারা এদেশের বিশেষ উপকার হবে। মনে করিসনি, তারা ধর্মের গুরুগিরি করতে এদেশে আসবে। বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যবহারিক শাস্ত্রে তারা তোদের গুরু হবে, আর ধর্মবিষয়ে এদেশের লোক তাদের গুরু হবে। ভারতের সঙ্গে সমস্ত জগতের ধর্মবিষয়ে এই সম্বন্ধ চিরকাল থাকবে।

আমি। তা কেমন করে হবে? ওরা আমাদের যেরকম ঘৃণা করে, তাতে ওরা যে কখনো নিঃস্বার্থভাবে আমাদের উপকার করবে, তা বোধ হয় না।

স্বামীজী। তোদের ঘৃণা করবার অনেকগুলি কারণ পায়, তাই ঘৃণা করে। একে তো তোরা বিজিত, তার ওপর তোদের মতো 'হাঘরের দল' আর জগতে কোথাও নেই। নীচু জাতগুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে, উঠতে-বসতে জুতো-লাথি খেয়ে, একেবারে মনুষ্যত্ব হারিয়ে এখন পেশাদার (professional) ভিখিরি হয়েছে; তাদের উপরশ্রেণীর লোকেরা দু-এক পাতা ইংরেজী পড়ে আর্জি হাতে করে সকল অফিসের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বিশ টাকার চাকরি খালি হলে পাঁচশ বি. এ. / এম. এ. দরখাস্ত করে। পোড়া দরখাস্তও বা কেমন!—"ঘরে ভাত নেই, মাগ-ছেলে খেতে পাচ্ছে না, সাহেব, দুটি খেতে দাও, নইলে গেলাম!" চাকরিতে ঢুকেও দাসত্বের চূড়ান্ত করতে হয়। তোদের উচ্চশিক্ষিত বড় বড় (?) লোকেরা দল বেঁধে 'হায়, ভারত গেল! হে ইংরেজ, তোমরা আমাদের লোকেদের চাকরি দাও, দুর্ভিক্ষ মোচন কর' ইত্যাদি দিনরাত কেবল 'দাও দাও' করে মহা হল্লা করছে। সকল কথার ধুয়ো হচ্ছে, 'ইংরেজ আমাদের দাও!' বাপু! আর কত দেবে? রেল দিয়েছে, তারের খবর দিয়েছে, রাজ্যে শৃঙ্খলা দিয়েছে, ডাকাতের দল প্রায় তাড়িয়েছে, বিজ্ঞান-শিক্ষা দিয়েছে। আবার কি দেবে? নিঃস্বার্থভাবে কে কি দেয়? বলি বাপু, ওরা তো এত দিয়েছে, তোরা কি দিয়েছিস?

আমি। আমাদের দেবার কি আছে? রাজ্যের কর দিই।

স্বামীজী। আ মরি, সে কি তোরা দিস, জুতো মেরে আদায় করে—রাজ্যরক্ষা করে বলে। তোদের যে এত দিয়েছে, তার জন্য কি দিস—তাই বল। তোদেরও দেবার এমন জিনিস আছে, যা ওদেরও নেই। তোরা বিলেতে যাবি, তাও ভিখিরি হয়ে—কিনা বিদ্যে দাও। কেউ গিয়ে বড় জোর তাদের ধর্মের দুটো তারিফ করে এলি, বড় বাহাদুরি হলো! কেন, তোদের দেবার কি কিছু নেই? অমূল্য রত্ন রয়েছে, দিতে পারিস—ধর্ম দে, মনোবিজ্ঞান দে। সমস্ত জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ, যত উচ্চভাব পূর্বে ভারতেই উঠেছে। চিরকাল ভারত জনসমাজে ভাবের খনি হয়ে এসেছে; ভাব প্রসব করে সমস্ত জগৎকে ভাব বিতরণ করেছে। আজ ইংরেজ ভারতে এসেছে সেই উচ্চ উচ্চ ভাব, সেই বেদান্তজ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের গভীর রহস্য নিতে। তোরা ওদের কাছে যা পাস, তার বিনিময়ে তোদের ঐসব অমূল্য রত্ন দান কর। তোদের এই ভিখিরি-নাম ঘুচোবার জন্য ঠাকুর আমাকে ওদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেবল ভিক্ষে করবার জন্য বিলেত যাওয়া ঠিক নয়। কেন তোদের চিরকাল ভিক্ষে দেবে? কেউ কখনো দিয়ে থাকে? কেবল কাঙালের মতো হাত পেতে নেওয়া জগতের নিয়ম নয়। জগতের নিয়মই হচ্ছে আদান-প্রদান। এই নিয়ম যে-লোক বা যে-জাত বা যে-দেশ না রাখবে, তার কল্যাণ হবে না। সেই নিয়ম আমাদেরও প্রতিপালন করা চাই। তাই আমেরিকায় গিয়েছিলুম। তাদের ভেতর

এখন এতদূর ধর্মপিপাসা যে, আমার মতো হাজার হাজার লোক গেলেও তাদের স্থান হয়। তারা অনেক দিন থেকে তাদের ধন-রত্ন দিয়েছে, তোরা এখন অমূল্য রত্ন দে। দেখবি, ঘৃণাস্থলে শ্রদ্ধাভক্তি পাবি আর তোদের দেশের জন্য তারা অযাচিত উপকার করবে। তারা বীরের জাত, উপকার ভোলে না।

আমি। ওদেশে লেকচারে আমাদের কত গুণপনা ব্যাখ্যা করে এসেছ, আমাদের ধর্মপ্রাণতার কত উদাহরণ দিয়েছ। আবার এখন বলছ, আমরা মহা তমোগুণী হয়ে গেছি। অথচ ঋষিদের সনাতন ধর্ম বিলোবার অধিকারী আমাদেরই করছ—এ কেমন কথা?

স্বামীজী। তুই কি বলিস, তোদের দোষগুলো দেশে দেশে গাবিয়ে বেড়াব, না, তোদের যা গুণ আছে, সে গুণগুলোর কথাই বলে বেড়াব? যার দোষ তাকেই বুঝিয়ে বলা ভাল, আর তার গুণ নিয়ে ঢাক বাজানোই উচিত। ঠাকুর বলতেন যে, মন্দ লোককে 'ভাল ভাল' করলে সে ভাল হয়ে যায়; আর ভাল লোককে 'মন্দ মন্দ' করলে সে মন্দ হয়ে যায়। তাদের দোষের কথা তাদের কাছে খুব বলে এসেছি। এদেশ থেকে যত লোক এ-পর্যন্ত ওদেশে গেছে, সকলে তাদের গুণের কথাই গেয়ে এসেছে; আর আমাদের দোষের কথাই গাবিয়ে বেড়িয়েছে। কাজেই তারা আমাদের ঘৃণা করতে শিখেছে। তাই আমি তোদের গুণ ও তাদের দোষ তাদের দেখিয়েছি। তোরা যত তমোগুণী হোস না কেন, পুরাতন ঋষিদের ভাবটা তোদের ভেতর একটু না একটু আছে—অন্ততঃ তার কাঠামোটা আছে। তবে হুট্ করে বিলেত গিয়েই যে ধর্ম-উপদেষ্টা হতে পারা যায়, তা নয়। আরো নিরালায় বসে ধর্মজীবনটা বেশ করে গড়ে নিতে হবে; পূর্ণভাবে ত্যাগী হতে হবে; আর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য করতে হবে। তোদের ভেতর তমোগুণ এসেছে—তা কি হয়েছে? তমোনাশ কি হতে পারে না? এক কথায় হতে পারে। ঐ তমোনাশ করবার জন্যই তো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন।

আমি। কিন্তু স্বামীজী, তোমার মতো কে হবে?

স্বামীজী। তোরা ভাবিস, আমি মলে বুঝি আর 'বিবেকানন্দ' হবে না। ঐ যে নেশাখোরগুলো এসে কনসার্ট বাজিয়ে গেল, যাদের তোরা এত ঘৃণা করিস, মহা অপদার্থ মনে করিস, ঠাকুরের ইচ্ছা হলে ওরা প্রত্যেকে এক এক 'বিবেকানন্দ' হতে পারে। দরকার হলে 'বিবেকানন্দে'র অভাব হবে না। কোথা থেকে কত কোটি কোটি এসে হাজির হবে তা কে জানে? এ বিবেকানন্দের কাজ নয় রে; তাঁর কাজ—খোদ রাজার কাজ। একটা গভর্নর জেনারেল গেলে তার জায়গায় আর একটা আসবেই। তোরা যতই তমোগুণী হোস না কেন, মন মুখ এক করে তাঁর শরণ নিলে সব তমঃ কেটে যাবে। এখন যে ও-রোগের রোজা এসেছে। তাঁর নাম করে কাজে লেগে গেলে তিনি আপনিই সব করে নেবেন। ঐ তমোগুণটাই মহা সত্ত্বগুণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমি। যাই বল, ও-কথা বিশ্বাস হয় না। তোমার মতো Philosophyতে Oratory (দর্শনে বক্তৃতা) করবার ক্ষমতা কার হবে ?

স্বামীজী। তুই জানিস না। ও-ক্ষমতা সকলেরই হতে পারে। যে ভগবানের জন্য বার বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করবে, তারই ও-ক্ষমতা হবে। আমি ঐরূপ করেছি, তাই আমার মাথার ভেতর একটা পর্দা খুলে গেছে। তাই আর আমার দর্শনের মতো জটিল বিষয়ের বক্তৃতা ভেবে বার করতে হয় না। মনে কর কাল বক্তৃতা দিতে হবে, যা বক্তৃতা দেব তার সমস্ত ছবি আজ রাত্রে পর পর চোখের সামনে দিয়ে যেতে থাকে। পরদিন বক্তৃতার সময় সেইসব বলি। অতএব বুঝলি তো, এটা আমার নিজস্ব শক্তি নয়। যে অভ্যাস করবে, তারই হবে। তুই কর, তোরও হবে। অমুকের হবে, আর অমুকের হবে না, আমাদের শাস্ত্রে একথা বলে না।

আমি। তোমার মনে আছে, তখন তুমি সন্ন্যাস নাওনি, একদিন আমরা অমুকের বাড়িতে বসেছিলাম; তুমি সমাধি ব্যাপারটা আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলে। কলিকালে ওসব হয় না বলে আমি তোমার কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করায় তুমি জোর করে বলেছিলে, 'তুই সমাধি দেখতে চাস, না সমাধিস্থ হতে চাস ? আমার সমাধি হয়। আমি তোর সমাধি করে দিতে পারি।' তোমার এই কথা বলবার পরেই একজন নূতন লোক এসে পড়ল আর আমাদের ঐ-বিষয়ের কোন কথাই চলল না।

স্বামীজী। হাঁ, মনে পড়ে।

আমি তখন আমায় সমাধিস্থ করে দেবার জন্য তাঁকে বিশেষরূপে ধরায় স্বামীজী বললেন, "দেখ, গত কয় বৎসর ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে আর কাজ করে আমার ভেতর রজোগুণ বড় বেড়ে উঠেছে ; তাই সে শক্তি এখন চাপা পড়েছে। কিছুদিন সব কাজ ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে বসলে তবে আবার সে শক্তির উদয় হবে।"

এর দু-এক দিন পরে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করব বলে আমি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি, এমন সময় দুটি বন্ধু এসে উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, তাঁরাও স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করে প্রাণায়ামের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান। তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাশীপুরের বাগানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, স্বামীজী হাত মুখ ধুয়ে বাইরে আসছেন। শুধু হাতে দেবতা বা সাধু দর্শন করতে যেতে নেই শুনেছিলুম, তাই আমরা কিছু ফল ও মিষ্টান্ন সঙ্গে এনেছিলুম। তিনি আসবামাত্র তাঁকে সেইগুলি দিলুম ; স্বামীজী সেগুলি নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকালেন এবং আমরা প্রণাম করবার আগেই আমাদের প্রণাম করলেন। আমার সঙ্গের দুটি বন্ধুর মধ্যে একটি তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তাঁকে চিনতে পেরে বিশেষ আনন্দের সঙ্গে তাঁর সমস্ত কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। পরে তাঁর কাছে আমাদের বসালেন। আমরা যেখানে বসলুম, সেখানে আরো অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজীর মধুর কথা শুনতে এসেছেন। অন্যান্য লোকের দু-একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী নিজেই প্রাণায়ামের কথা কইতে লাগলেন। মনোবিজ্ঞান হতেই জড়বিজ্ঞানের

উৎপত্তি—বিজ্ঞান সহায়ে প্রথমে তা বুঝিয়ে পরে প্রাণায়াম বস্তুটা কি, বোঝাতে লাগলেন। এর আগে আমরা কয়জনেই তাঁর 'রাজযোগ' পুস্তকখানি ভাল করে পড়েছিলুম। কিন্তু আজ তাঁর কাছে প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে-সকল কথা শুনলুম, তাতে মনে হলো যে তাঁর ভেতরে যা আছে, তার অতি অল্পমাত্রই সেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এও বুঝলুম যে, তাঁর ঐ সকল কথা কেবল পুঁথিপড়া কথা নয়। মন্ত্রদ্রষ্টা ছাড়া ধর্মশাস্ত্রের কূট প্রশ্নসকলের বিজ্ঞান সহায়ে ঐরূপ বিশদ মীমাংসা করা কারো সাধ্য নয়। জগতে পণ্ডিতের অভাব নেই ; কিন্তু সত্যের দ্রষ্টা বা উপলব্ধা বড়ই বিরল।

সেদিন আমরা স্বামীজীর কাছে সাড়ে তিনটের সময় উপস্থিত হই। তাঁর প্রাণায়াম-বিষয়ের কথা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত চলেছিল। বাইরে এসে সঙ্গিদ্বয় আমায় জিজ্ঞাসা করলেন তাঁদের প্রাণের ভেতরের প্রশ্ন স্বামীজী কেমন করে জানতে পারলেন ? আমি কি পূর্বেই তাঁকে এ প্রশ্নগুলি জানিয়েছিলুম ?

ঐ ঘটনার কিছু দিন পরে একদিন বাগবাজারে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিরিশবাবু, অতুলবাবু, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ এবং আরো দু-একটি বন্ধুর সম্মুখে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, "স্বামীজী সেদিন আমার সঙ্গে যে-দুজন লোক তোমায় দেখতে গিয়েছিল, তুমি এ-দেশে আসবার আগেই তারা তোমার 'রাজযোগ' পড়েছিল আর বলে রেখেছিল যে, যদি তোমার সঙ্গে কখনো দেখা হয় তো তোমাকে প্রাণায়াম-বিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু সেদিন তারা কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে না করতেই তুমি তাদের ভেতরের সন্দেহগুলি আপনি তুলে ঐরূপে মীমাংসা করায় তারা আমায় জিজ্ঞাসা করছিল, আমি তোমাকে তাদের প্রশ্নগুলি আগে জানিয়েছিলুম কিনা।" স্বামীজী বললেন, "ওদেশেও অনেক সময়ে ঐরূপ ঘটনা ঘটায় অনেকে আমায় জিজ্ঞাসা করত, 'আপনি আমার অন্তরের প্রশ্ন কেমন করে জানতে পারলেন ?' ওটা আমার তত হয় না। ঠাকুরের অহরহ হতো।"

এই প্রসঙ্গে অতুলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি রাজযোগে বলেছ যে, পূর্ব-জন্মের কথা সমস্ত জানতে পারা যায়। তুমি নিজে জানতে পার ?"

স্বামীজী। হাঁ পারি।

অতুল বাবু। কি জানতে পার, বলবার বাধা আছে ?

স্বামীজী। জানতে পারি—জানিও, কিন্তু details (খুঁটিনাটি) বলব না।

আষাঢ় মাস, সন্ধ্যার কিছু আগে চতুর্দিক অন্ধকার ও ভয়ানক তর্জন-গর্জন করে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। আমরা সেদিন মঠে। শ্রীযুক্ত ধর্মপাল এসেছেন, নূতন মঠ হচ্ছে দেখবেন এবং সেখানে মিসেস বুল আছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। মঠের বাড়িটি সবে আরম্ভ হয়েছে। পুরনো যে দু-তিনটি কুটির আছে, তাইতে মিসেস বুল আছেন। সাধুরা ঠাকুর নিয়ে শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ভাড়া

দিয়ে বাস করছেন। ধর্মপাল বৃষ্টির আগেই সেইখানে স্বামীজীর কাছে এসে উঠেছেন। প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হলো, বৃষ্টি আর থামে না। কাজেই ভিজে ভিজে নূতন মঠে যেতে হবে। স্বামীজী সকলকে জুতো খুলে ছাতা নিয়ে যেতে বললেন, সকলে জুতো খুললেন। ছেলেবেলাকার মতো শুধু পায় ভিজে ভিজে কাদায় যেতে হবে, স্বামীজীর কতই আনন্দ। একটা খুব হাসি পড়ে গেল। ধর্মপাল কিন্তু জুতো খুললেন না দেখে স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, "বড় কাদা, জুতোর দফা রফা হবে।" ধর্মপাল বললেন, "Never mind, I will wade with my shoes on." এক এক ছাতা নিয়ে সকলের যাত্রা করা হলো। মধ্যে মধ্যে কারো পা পিছলয়, তার ওপর খুব জোর ঝাপটায় সমস্ত ভিজে যায়, তার মধ্যে স্বামীজীর হাসির রোল, মনে হলো যেন আবার সেই ছেলেবেলাকার খেলাই বুঝি করছি। যা হোক অনেক খানা-খন্দ পার হয়ে নূতন মঠের সীমানায় আসা গেল। জমিটিতে অনেক বড় বড় খাদ (গর্ত) ছিল ; দূর থেকে মাটি আনিয়ে সবে ভরাট করা হয়েছে। যখন সেখানে আসা গেল, তখন সকলের কাদায় পা বসে যেতে লাগল। ধর্মপাল একে খঞ্জ, তার ওপর নূতন মাটি, বেজায় কাদা ; একবার বেচারার সেই খোঁড়া পাটি এমন বসে গেল যে, তিনি আর তাকে উদ্ধার করতে পারলেন না। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে তাঁকে কাঁধ পেতে দিলেন ও ডান হাতে তাঁর কোমর ধরলেন ; ধর্মপাল তাঁর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে মহা কর্দম হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। তারপর হাসতে হাসতে দুজনে সেইভাবেই মঠ পর্যন্ত চললেন।

স্বামীজী জল আনতে বললেন সকলের পা ধোবার জন্য। জল আনা হলে ধর্মপাল স্বয়ং পা ধোবার জন্য একটি ঘটি নেবামাত্র স্বামীজী তা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললেন, "আপনি অতিথি—আমি আপনার সৎকার করব" বলে বাঁ হাতে ঘটিটি নিয়ে ডান হাতে পা ধুয়ে দিতে উদ্যত হলেন। আমি তাই দেখে তাঁর হাত থেকে ঘটিটা কেড়ে নিতে গেলুম, তিনি বিরক্ত হয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় আমি বললুম, "মহারাজ! আমরা তোমার চেলা ; সেবক থাকতে তুমি পা ধুইয়ে দেবে আর আমরা দাঁড়িয়ে দেখব, তা ভাল দেখাবে না।" এই বলে তাঁর হাত থেকে ঘটিটি বলপূর্বক কেড়ে নিলে তিনি নিরস্ত হলেন।

সকলের পা হাত ধোয়া হলে মিসেস বুলের কাছে সকলে গিয়ে বসলেন, এবং অনেকক্ষণ অনেক বিষয়ে কথাবার্তার পর ধর্মপালের নৌকা এলে সকলে উঠে পড়লুম। নৌকা আমাদের মঠে (নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে) নামিয়ে দিয়ে ধর্মপালকে নিয়ে কলকাতা যাত্রা করল। তখনো বেশ টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ছে।

মঠে এসে স্বামীজী তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যদের সঙ্গে ঠাকুরবাড়িতে ধ্যান করতে গেলেন এবং ঠাকুরঘরে ও তার পূর্বদিকের দালানে বসে সকলে ধ্যানে মগ্ন হলেন। আমার আর সেদিন ধ্যান হলো না, পূর্বের কথাগুলিই কেবল মনে পড়তে লাগল। ছেলেবেলায় মুগ্ধ হয়ে দেখতুম, এই অদ্ভুত বালক নরেন আমাদের সঙ্গে কখন হাসছে, খেলছে,

গল্প করছে, আবার কখনো বা সকলের মনোমুগ্ধকর কিন্নর স্বরে গান করছে। ছেলে-বেলাকার ছবিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে আমার সম্মুখে পুনরায় রঙ্গ করতে লাগল। মনে হলো, লোকটার ভেতরে এখন যা দেখছি, সমস্তই তখনো জাজ্বল্যমান ছিল, তখনো দশের মধ্যে একজন; নইলে তখনো কেন নরেন কথা আরম্ভ করলে অপর ছেলেগুলো হাঁ করে থাকত? সে একটা মত প্রকাশ করলে তার সঙ্গে তর্ক করে ভুল ধরে দেয়, এমন তো একটাও ছেলে ছিল না। সে যে কাজটা করত, মনে হতো যেন তার চেয়ে ভাল আর কেউই করতে পারে না। ক্লাসে তো বরাবর first (প্রথম) হতো। খেলায়ও তাই, ব্যায়ামেও তাই, বালকগণের নেতৃত্বেও তাই, গানেতে তো কথাই নেই—গন্ধর্বরাজ।

স্বামীজীরা ধ্যান থেকে উঠলেন। বড় ঠান্ডা, একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে স্বামীজী তানপুরা ছেড়ে গান ধরলেন। তারপর সংগীতের ওপর অনেক কথা চলল। স্বামী শিবানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, "বিলাতী সংগীত কেমন?"

স্বামীজী। খুব ভাল, harmony-র চূড়ান্ত, যা আমাদের মোটেই নেই। তবে আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভাল লাগে না। আমারও ধারণা ছিল যে, ওরা কেবল শেয়ালের ডাক ডাকে। যখন বেশ মন দিয়ে শুনতে আর বুঝতে লাগলুম, তখন অবাক হলুম। শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে যেতুম। সকল art-এই তাই। একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একটা খুব উৎকৃষ্ট ছবির কিছু বুঝতে পারা যায় না। তার ওপর একটু শিক্ষিত চোখ নইলে তো তার অন্ধি-সন্ধি কিছুই বুঝবে না। আমাদের দেশের যথার্থ সংগীত কেবল কীর্তনে আর ধ্রুপদে আছে। আর সব ইসলামী ছাঁচে ঢালা হয়ে বিগড়ে গেছে। তোমরা ভাব, ঐ যে বিদ্যুতের মতো গিটকিরি দিয়ে নাকি সুরে টপ্পা গায়, তাই বুঝি দুনিয়ার সেরা জিনিস। তা নয়। প্রত্যেক পর্দায় সুরের পূর্ণবিকাশ না করলে music-এ (গানে) science (বিজ্ঞান) থাকে না। Painting-এ (চিত্রশিল্পে) nature-কে (প্রকৃতিকে) বজায় রেখে যত artistic (সুন্দর) কর না কেন ভালই হবে, দোষ হবে না। তেমনি music-এর science বজায় রেখে যত কারদানি কর, ভাল লাগবে। মুসলমানেরা রাগ-রাগিণীগুলোকে নিলে এদেশে এসে। কিন্তু টপ্পাবাজিতে তাদের এমন একটা নিজেদের ছাপ ফেললে যে, তাতে science আর রইল না।

প্রশ্ন। কেন science মারা গেল? টপ্পা জিনিসটা কার না ভাল লাগে?

স্বামীজী। ঝিঁঝি পোকার রবও খুব ভাল লাগে। সাঁওতালরাও তাদের music অত্যুৎকৃষ্ট বলে জানে। তোরা এটা বুঝতে পারিস না যে, একটা সুরের ওপর আর একটা সুর এত শীঘ্র এসে পড়ে যে, তাতে আর সংগীতমাধুর্য (music) কিছুই থাকে না, উলটে discordance (বে-সুর) জন্মায়। সাতটা পর্দার permutation, combination (পরিবর্তন ও সংযোগ) নিয়ে এক একটা রাগরাগিণী হয় তো? এখন টপ্পার এক তুড়িতে সমস্ত রাগটার আভাস দিয়ে একটা তান সৃষ্টি করলে, আবার তার ওপর গলায় জোয়ারী বলালে কি করে আর তার রাগত্ব থাকবে? আর টোকরা তানের এত ছড়াছড়ি করলে সংগীতের কবিত্ব-ভাবটা তো একেবারে যায়। টপ্পার যখন সৃষ্টি

হয়, তখন গানের ভাব বজায় রেখে গান গাওয়াটা দেশ থেকে একেবারে উঠে গিয়েছিল। আজকাল থিয়েটারের উন্নতির সঙ্গে সেটা যেমন একটু ফিরে আসছে, তেমনি কিন্তু রাগরাগিণীর শ্রাদ্ধটা আরো বিশেষ করে হচ্ছে। এইজন্য যে ধ্রুপদী, সে টপ্পা শুনতে গেলে তার কষ্ট হয়। তবে আমাদের সঙ্গীতে Cadence (মীড় মূর্ছনা) বড় উৎকৃষ্ট জিনিস। ফরাসীরা প্রথমে ওটা ধরে, আর নিজেদের music-এ ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর এখন ওটা ইওরোপে সকলেই খুব আয়ত্ত করে নিয়েছে।

প্রশ্ন। ওদের music-টা কেবল martial (রণবাদ্য) বলে বোধ হয়, আর আমাদের সঙ্গীতের ভেতর ঐ ভাবটা আদতেই নেই যেন।

স্বামীজী। আছে আছে। তাতে harmony-র (ঐকতানের) বড় দরকার। আমাদের harmony-র বড় অভাব, এইজন্যই ওটা অত দেখা যায় না, আমাদের music-এর খুবই উন্নতি হচ্ছিল, এমন সময়ে মুসলমানেরা এসে সেটাকে এমন করে হাতালে যে, সঙ্গীতের গাছটি আর বাড়তে পেলে না। ওদের (পাশ্চাত্যের) music খুব উন্নত ; করুণরস বীররস দুই-ই আছে, যেমন থাকা দরকার। আমাদের সেই কদুকলের আর উন্নতি হলো না।

প্রশ্ন। কোন্ রাগরাগিণীগুলো martial ?

স্বামীজী। সকল রাগই martial হয়, যদি harmony-তে বসিয়ে নিয়ে যন্ত্রে বাজানো যায়। রাগিণীর মধ্যেও কতকগুলো হয়।

ইতিমধ্যে ঠাকুরের ভোগ হলে পর সকলে ভোজন করতে গেলেন। আহারের পর কলকাতার যে-সকল লোক সেই রাত্রে মঠে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের শয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে স্বামীজী তারপর নিজে শয়ন করতে গেলেন।

* * * *

প্রায় দুই বৎসর নূতন মঠ হয়েছে, স্বামীজীরা সেখানেই আছেন। একদিন প্রাতে আমি গুরুদর্শনে[১] গেছি। স্বামীজী আমায় দেখে হাসতে হাসতে তন্নতন্ন করে সমস্ত কুশল এবং কলকাতার সমস্ত খবর জিজ্ঞাসা করে বললেন, "আজ থাকবি তো ?"

আমি 'নিশ্চয়' বলে অন্যান্য অনেক কথার পর স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, "ছোট ছেলেদের শিক্ষা দেবার বিষয়ে তোমার মত কি ;"

স্বামীজী। গুরুগৃহে বাস।

প্রশ্ন। কি রকম ?

স্বামীজী। সেই পুরাকালের বন্দোবস্ত। তবে তার সঙ্গে আজকালের পাশ্চাত্য দেশের জড়বিজ্ঞানও চাই। দুটোই চাই।

প্রশ্ন। কেন, আজকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে কি দোষ ?

---

১ প্রিয়নাথ সিংহের এই কথা থেকে জানা যাচ্ছে যে, বাল্যবন্ধুর (স্বামীজীর) কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিকথাতেও এর সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

স্বামীজী। প্রায় সবই দোষ, কেবল চূড়ান্ত কেরানি-গড়া কল বই তো নয়। কেবল তাই হলেও বাঁচতুম। মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-বর্জিত হচ্ছে। গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে ; বেদকে চাষার গান বলবে। ভারতের বাইরে যা' কিছু আছে, তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে, নিজের কিন্তু সাত পুরুষ চুলোয় যাক—তিন পুরুষের নামও জানে না।

প্রশ্ন। তাতে কি এসে গেল ? নাই বা বাপ-দাদার নাম জানলে ?

স্বামীজী। না'রে ; যাদের দেশের ইতিহাস নেই, তাদের কিছুই নেই। তুই মনে কর না, যার 'আমি এত বড় বংশের ছেলে' বলে একটা বিশ্বাস ও গরব থাকে, সে কি কখনো মন্দ হতে পারে ? কেমন করে হবে বল না ? তার সেই বিশ্বাসটা তাকে এমন রাশ টেনে রাখবে যে, সে মরে গেলেও একটা মন্দ কাজ করতে পারবে না। তেমনি একটা জাতির ইতিহাস সেই জাতটাকে টেনে রাখে, নিচু হতে দেয় না। আমি বুঝেছি, তুই বলবি আমাদের history (ইতিহাস) তো নেই। তোদের মতে নেই। তোদের university-র (বিশ্ববিদ্যালয়ের) পণ্ডিতদের মতে নেই, আর এক দৌড়ে বিলেতে বেড়িয়ে এসে সাহেব সেজে যারা বলে, 'আমাদের কিছুই নেই, আমরা বর্বর', তাদের মতে নেই। আমি বলি, অন্যান্য দেশের মতো নেই। আমরা ভাত খাই, বিলেতের লোকে ভাত খায় না ; তাই বলে কি তারা উপোস করে মরে ভূত হয়ে আছে ? তাদের দেশে যা আছে, তারা তাই খায়। তেমনি তোদের দেশের ইতিহাস যেমন থাকা দরকার হয়েছিল, তেমনিই আছে। তোরা চোখ বুজে 'নেই, নেই' বলে চেঁচালে কি ইতিহাস লুপ্ত হয়ে যাবে ? যাদের চোখ আছে, তারা সেই জ্বলন্ত ইতিহাসের বলে এখনও সজীব আছে। তবে সেই ইতিহাসকে নূতন ছাঁচে ঢালাই করে নিতে হবে। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষার চোটে লোকের যে বুদ্ধিটি দাঁড়িয়েছে, ঠিক সেই বুদ্ধির মতো উপযুক্ত করে ইতিহাসটাকে নিতে হবে।

প্রশ্ন। সে কেমন করে হবে ?

স্বামীজী। সে অনেক কথা। আর সেইজন্যই 'গুরুগৃহবাস' ইত্যাদি চাই। চাই Western science-এর (পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের) সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা আর আত্মপ্রত্যয়। আর কি জানিস, ছোট ছেলেদের গাধা পিটে ঘোড়া করা গোছ শিক্ষা দেওয়াটা তুলে দিতে হবে একেবারে।

প্রশ্ন। তার মানে ?

স্বামীজী। ওরে, কেউ কাউকে শেখাতে পারে না। শেখাচ্ছি মনে করলেই শিক্ষক সব মাটি করে। কি জানিস, বেদান্ত বলে—এই মানুষের ভেতরেই সব আছে। একটা ছেলের ভেতরেও সব আছে। কেবল সেইগুলো জাগিয়ে দিতে হবে, এইমাত্র শিক্ষকের কাজ। ছেলেগুলো যাতে নিজ নিজ হাত-পা-নাক-কান-মুখ-চোখ ব্যবহার করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু করে দিতে হবে। তাহলেই আখেরে সবই সহজ হয়ে পড়বে। কিন্তু গোড়ার কথা ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলো

তরকারি। কেবল শুধু তরকারি খেলে হয় বদহজম ; শুধু ভাতেও তাই। মেলা কতকগুলো কেতাবপত্র মুখস্থ করিয়ে মনিষ্যিগুলোর মুণ্ডু বিগড়ে দিচ্ছিল। এক দিক দিয়ে দেখলে তোদের বড়লাটের ওপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। High education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিচ্ছে বলে দেশটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। বাপ! কি পাশের ধুম, আর দুদিন পরেই সব ঠাণ্ডা! শিখলেন কি?—না, নিজেদের সব মন্দ, সাহেবদের সব ভাল। শেষে অন্ন জোটে না। এমন High education (উচ্চশিক্ষা) থাকলেই কি, আর গেলেই বা কি? তার চেয়ে একটু Technical education (কারিগরী শিক্ষা) পেলে লোকগুলো কিছু করে খেতে পারবে, চাকরি চাকরি করে আর চেঁচাবে না।

প্রশ্ন। মারোয়াড়ীরা বেশ—চাকরি করে না, আর প্রায় সকলেই ব্যবসা করে।

স্বামীজী। দূর, ওরা দেশটা উচ্ছন্ন দিতে বসেছে। ওদের বড় হীন বুদ্ধি। তোরা ওদের চেয়ে অনেক ভাল—manufacture-এর (শিল্পজাত দ্রব্যনির্মাণের) দিকে নজর বেশি। ওরা যে টাকাটা খাটিয়ে সামান্য লাভ করে আর গৌরাঙ্গের পেট ভরায়, সেই টাকায় যদি গোটাকতক factory (শিল্পশালা), workshop (কারখানা) করে, তাহলে দেশেরও কল্যাণ হয় আর ওদের এর চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয়। চাকরি বোঝে না কাবলীরা—স্বাধীনতার ভাব হাড়ে হাড়ে। ওদের একজনকে চাকরির কথা বলে দেখিস না।

প্রশ্ন। High education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে সব মানুষগুলো যেমন গরু ছিল, তেমনি আবার গরু হয়ে দাঁড়াবে যে?

স্বামীজী। রাম কহ! তাও কি হয় রে? সিংগি কি কখনো (শেয়াল) হয়? তুই বলিস কি? যে-দেশ জগৎকে চিরকাল বিদ্যা দিয়ে এসেছে, কার্জন High education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে বলে কি দেশশুদ্ধ লোক গরু হয়ে দাঁড়াবে?

প্রশ্ন। যখন ইংরেজ এদেশে আসেনি, তখন দেশের লোক কি ছিল? আজও কি আছে?

স্বামীজী। কলকব্জা তয়ের করতে শিখলেই High education হলো না। Life-এর problem solve (জীবনের সমস্যার সমাধান) করা চাই—যেকথা নিয়ে আজকাল সভ্য জগৎ গভীর গবেষণায় মগ্ন, আর যেটার সিদ্ধান্ত আমাদের দেশে হাজার বৎসর আগে হয়ে গেছে।

প্রশ্ন। তবে তোমার সেই বেদান্তও তো যেতে বসেছিল?

স্বামীজী। হ্যাঁ। সময়ে সময়ে সেই বেদান্তের আলো একটু নিভু নিভু হয়, আর সেইজন্যই ভগবানের আসবার দরকার হয়। আর তিনি এসে সেটাতে এমন একটা শক্তির সঞ্চার করে দিয়ে যান যে, আবার কিছুকালের জন্য তার আর মার থাকে না। এখন সেই শক্তি এসে গেছে। তোদের বড়লাট High education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে ভালই হবে।

প্রশ্ন। ভারত যে সমগ্র জগৎকে বিদ্যা দিয়ে এসেছে, তার প্রমাণ কি?

স্বামীজী। ইতিহাসই তার প্রমাণ। এই ব্রহ্মাণ্ডে যত Soul-elevating ideas (মানবমনের উন্নয়নকারী ভাবসমূহ) বেরিয়েছে আর যত কিছু বিদ্যা আছে, অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায়, তার মূল সব ভারতে রয়েছে।

এই কথা বলতে বলতে তিনি যেন মেতে উঠলেন। একে তো শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, তার ওপর দারুণ গ্রীষ্ম, মুহুর্মুহুঃ পিপাসা পেতে লাগল। অনেকবার জল পান করলেন। এবার বললেন, "সিংহ, একটু বরফ-জল খাওয়া। তোকে সব বুঝিয়ে বলছি।"

জল পান করে আবার বললেন, "আমাদের চাই কি জানিস? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর science (বিজ্ঞান) পড়ানো চাই, technical education (কারিগরী শিক্ষা) চাই, যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।"

প্রশ্ন। সেদিন টোলের কথা কি বলছিলে?

স্বামীজী। উপনিষদের গল্পটল্প পড়েছিস? সত্যকাম গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য করতে গেলেন। গুরু তাঁকে কতকগুলি গরু দিয়ে বনে চরাতে পাঠালেন। অনেক দিন পরে যখন গরুর সংখ্যা দ্বিগুণ হলো, তখন তিনি গুরুগৃহে ফেরবার উপক্রম করলেন। এই সময়ে একটি গরু, অগ্নি এবং কতকগুলো জন্তু তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। যখন শিষ্য গুরুর বাড়ি ফিরে এলেন, তখন গুরু তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন, শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। এই গল্পের মানে এই—প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করলে তা থেকেই যথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায়।

সেই-রকম করে বিদ্যা অর্জন করতে হবে; শিরোমণি মহাশয়ের টোলে পড়লে রূপী বাঁদরটি থাকবে। একটা জ্বলন্ত character-এর (চরিত্রের) কাছে ছেলেবেলা থেকেই থাকা চাই, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা চাই। কেবল 'মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ' পড়লে কচুও হবে না। Absolute (অখণ্ড) ব্রহ্মচর্য করাতে হবে প্রত্যেক ছেলেটাকে, তবে না শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসবে। নইলে যার শ্রদ্ধা বিশ্বাস নেই, সে মিছে কথা কেন কইবে না? আমাদের দেশে চিরকাল ত্যাগী লোকের দ্বারাই বিদ্যার প্রচার। পণ্ডিত মশাইরা হাত বাড়িয়ে বিদ্যাটা টেনে নিয়ে টোল খুলেই দেশের সর্বনাশটা করে বসেছেন। যতদিন ত্যাগীরা বিদ্যাদান করেছেন, ততদিন ভারতের কল্যাণ ছিল।

প্রশ্ন। এর মানে কি? আর সব দেশে তো ত্যাগী সন্ন্যাসী নেই, তাদের বিদ্যার বলে যে ভারত জুতোর তলে রয়েছেন।

স্বামীজী। ওরে বাপ চেল্লাসনি, যা বলি শোন্। ভারত চিরকাল মাথায় জুতো বইবে যদি ত্যাগী সন্ন্যাসীদের হাতে আবার ভারতকে বিদ্যা শেখাবার ভার না পড়ে। জানিস একটা নিরক্ষর ত্যাগী ছেলে তেরকেলে বুড়ো পণ্ডিতদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পা পূজারী ভেঙে ফেলে। পণ্ডিতরা এসে সভা করে পাঁজিপুঁথি খুলে বললে, "এ ঠাকুরের সেবা চলবে না, নূতন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা

করতে হবে।" মহা হুলস্থূল ব্যাপার। শেষে পরমহংস মহাশয়কে ডাকা হলো। তিনি বললেন, "স্বামীর যদি পা খোঁড়া হয়ে যায়, তাহলে কি স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে?" পণ্ডিত বাবাজীদের আর টীকে-টিপ্পনি চলল না। ওরে আহাম্মক, তা যদি হবে তো পরমহংস মহাশয় আসবেন কেন? আর বিদ্যাটাকে এত উপেক্ষা করবেন কেন? বিদ্যাশিক্ষায় তাঁর সেই নূতন শক্তিসঞ্চার চাই; তবে ঠিক ঠিক কাজ হবে।

প্রশ্ন। সে তো সহজ কথা নয়, কেমন করে হবে?

স্বামীজী। সহজ হলে তাঁর আসবার দরকার হতো না। এখন তোদের করতে হবে কি জানিস? প্রতি গ্রামে প্রতি শহরে মঠ খুলতে হবে। পারিস কিছু করতে? কিছু কর। কলকাতায় একটা বড় করে মঠ কর। একটা করে সুশিক্ষিত সাধু সেখানে থাকবে, তার তাঁবে practical science (ব্যবহারিক বিজ্ঞান) ও সব রকম art (কলাকৌশল) শেখাবার জন্য প্রত্যেক branch-এ (বিভাগে) specialist (বিশেষজ্ঞ) সন্ন্যাসী থাকবে।

প্রশ্ন। সে-রকম সাধু কোথায় পাবে?

স্বামীজী। তয়ের করে নিতে হবে। তাই তো বলি কতকগুলো স্বদেশানুরাগী ত্যাগী ছেলে চাই। ত্যাগীরা যত শীঘ্র এক-একটা বিষয় চূড়ান্ত রকমে শিখে নিতে পারবে, তেমন তো আর কেউ পারবে না।

তারপর স্বামীজী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে তামাক খেতে লাগলেন। পরে বলে উঠলেন, "দেখ সিঙ্গি, একটা কিছু কর। দেশের জন্য করবার এত কাজ আছে যে, তোর আমার মতো হাজার হাজার লোকের দরকার। শুধু গপ্পিতে কি হবে? দেশের মহা দুর্গতি হয়েছে, কিছু কর রে। ছোট ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই।"

প্রশ্ন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তো অনেকগুলি বই আছে।

এই কথা বলবামাত্র স্বামীজী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললেন, "'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ', 'গোপাল অতি সুবোধ বালক'—ওতে কোন কাজ হবে না। ওতে মন্দ বই ভাল হবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষায় কতকগুলো বাঙলাতে আর কতকগুলো ইংরেজীতে কেতাব করা চাই। সেইগুলি ছোট ছেলেদের পড়াতে হবে।"

বেলা প্রায় এগারটা; ইতিপূর্বে পশ্চিম দিকে একখানা মেঘ দেখা দিয়েছিল। এখন সেই মেঘ, শনশন শব্দে চলে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ শীতল বাতাস উঠল। স্বামীজীর আর আনন্দের শেষ নেই, বৃষ্টি হবে। তিনি উঠে "সিঙ্গি আয় গঙ্গার ধারে যাই" বলে আমাকে নিয়ে ভাগীরথীতীরে বেড়াতে লাগলেন। কালিদাসের মেঘদূত থেকে কত শ্লোক আওড়ালেন, কিন্তু মনে মনে সেই একই চিন্তা করছিলেন—ভারতের মঙ্গল। বললেন, "সিঙ্গি, একটা কাজ করতে পারিস? ছেলেগুলোর অল্প বয়েসে যে বন্ধ করতে পারিস?"

আমি উত্তর করলাম, "বে বন্ধ করা চুলোয় যাক, বাবুরা যাতে বে সস্তা হয়, তার ফিকির করছেন।"

স্বামীজী। ক্ষেপেছিস, কার সাধ্যি সময়ের ঢেউ ফেরায়! ঐ হইচই-ই সার। বে যত মাগ্‌গি হয় ততই মঙ্গল। যেমন পাশের ধুম, তেমনি কি বিয়ের ধুম! মনে হয় বুঝি আইবুড়ো আর রইল না। পরের বছর আবার তেমনি।

স্বামীজী আবার খানিক চুপ করে থেকে পুনরায় বললেন, "কতকগুলো অবিবাহিত graduate (গ্রাজুয়েট) পাই তো জাপানে গিয়ে যাতে কারিগরী শিক্ষা (technical education) পেয়ে আসে, যদি তার চেষ্টা করা হয়, তাহলে বেশ হয়।"

প্রশ্ন। কেন বিলেত যাওয়ার চেয়ে কি জাপান ভাল ?

স্বামীজী। সহস্রগুণে! আমি বলি, এদেশের সমস্ত বড়লোক আর শিক্ষিত লোক যদি একবার করে জাপান বেড়িয়ে আসে তো লোকগুলোর চোখ ফোটে।

প্রশ্ন। কেন ?

স্বামীজী। সেখানে এখানকার মতো বিদ্যার বদহজম নেই। তারা সাহেবদের সব নিয়েছে, কিন্তু তারা জাপানীই আছে, সাহেব হয়নি। তোদের দেশে সাহেব হওয়া যে একটা বিষম রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি। আমি কতকগুলো জাপানী ছবি দেখেছি। তাদের শিল্প দেখে অবাক হতে হয়। আর তার ভাবটি যেন তাদের নিজস্ব বস্তু, কারো নকল করবার জো নেই।

স্বামীজী। ঠিক। ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে Asiatic (এশিয়া-বাসী)! আমাদের দেখছিস না, সব গেছে তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। যে-মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিজে একজন কত বড় artist (শিল্পী) ছিলেন!

প্রশ্ন। সাহেবদেরও তো art (শিল্প) বেশ।

স্বামীজী। দূর মূর্খ! আর তোকেই বা গাল দিই কেন? দেশের দশাই এমনি হয়েছে। দেশসুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ, আর পরের রাঙটা সোনা দেখছে। এইটা হচ্ছে আজকালকার শিক্ষার ভেলকি। ওরে, ওরা যতদিন এশিয়ায় এসেছে, ততদিন ওরা চেষ্টা করছে জীবনে art (শিল্প) ঢোকাতে।

আমি। এরকম কথা লোকে শুনলে বলবে, তোমার সব pessimistic view (নৈরাশ্যবাদী মত)।

স্বামীজী। কাজেই তাই বই-কি! আমার ইচ্ছে করে, আমার চোখ দিয়ে তোদের সব দেখাই। ওদের বাড়িগুলো দেখ সব সাদামাটা। তার কোন মানে পাস? দেখ না এই যে এত বড় বড় সব বাড়ি government-এর (সরকারের) রয়েছে, বাইরে থেকে দেখলে তার কোন মানে বুঝিস বলতে পারিস? তারপর তাদের খাড়া প্যান্ট, চোস্ত কোট, আমাদের হিসেবে এক প্রকার ন্যাংটো না? আর তার কি যে বাহার! আমাদের

জন্মভূমিটা ঘুরে দেখ। কোন Buildingটার (অট্টালিকার) মানে না বুঝতে পারিস, আর তাতে কিবা শিল্প। ওদের জল খাবার গেলাস, আমাদের ঘটি, কোন্‌টায় আর্ট আছে? ওরে, এক টুকরা Indian silk (ভারতীয় রেশম) চায়নায় (China) নকল করতে হার মেনে গেল। এখন সেটা জাপান কিনে নিলে ২০,000 টাকায়, যদি তারা পারে চেষ্টা করে। পাড়াগাঁয়ে চাষাদের বাড়ি দেখেছিস?

আমি। হ্যাঁ।

স্বামীজী। কি দেখেছিস?

আমি। বেশ নিকান, চিকন পরিষ্কার।

স্বামীজী। তাদের ধানের মরাই দেখেছিস? তাতে কত আর্ট। মেটে ঘর-গুলোয় কত চিত্তির-বিচিত্তির। আর সাহেবদের দেশে ছোটলোকেরা কেমন থাকে তাও দেখে আয়। কি জানিস, সাহেবদের utility (কার্যকারিতা) আর আমাদের আর্ট (শিল্প)—ওদের সমস্ত দ্রব্যেই utility, আমাদের সর্বত্র আর্ট। ঐ সাহেবী শিক্ষায় আমাদের অমন সুন্দর চুমকি ঘটি ফেলে এনামেলের গেলাস এসেছেন ঘরে। ওই রকমে utility এমনভাবে আমাদের ভেতর ঢুকেছে যে, সে বদহজম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন চাই art এবং utility-র combination (সংযোগ)। জাপান সেটা বড় চট করে নিয়ে ফেলেছে, তাই এত শীঘ্র বড় হয়ে পড়েছে। এখন আবার ওরা তোমার সাহেবদের শেখাবে।

প্রশ্ন। কোন্ দেশের কাপড় পরা ভাল?

স্বামীজী। আর্যদের ভাল। সাহেবরাও এ-কথা স্বীকার করে। কেমন পাটে পাটে সাজানো পোশাক। যত দেশের রাজপরিচ্ছদ এক-রকম আর্য-জাতিদের নকল, পাটে পাটে রাখবার চেষ্টা; আর তা জাতীয় পোশাকের ধারেও যায় না। দেখ সিঙ্গি, ঐ হতভাগা সার্টগুলো পরা ছাড়।

প্রশ্ন। কেন?

স্বামীজী। আরে, ওগুলো সাহেবদের underwear (অধোবাস)। সাহেবরা ঐগুলো পরা বড় ঘৃণা করে। কি হতভাগা দশা বাঙালীর। যা হোক একটা পরলেই হলো? কাপড় পরার যেন মা-বাপ নেই। কারুর ছোঁয়া খেলে জাত যায়, বেচালের কাপড়-চোপড় পরলেও যদি জাত যেত তো বেশ হতো। কেন, আমাদের নিজের মতো কিছু করে নিতে পারিস না? কোর্ট, শার্ট গায় দিতেই হবে, এর মানে কি?

বৃষ্টি এল; আমাদেরও প্রসাদ পাবার ঘণ্টা পড়ল। স্বামীজী "চল ঘণ্টা দিয়েছে" বলে আমায় সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ পেতে গেলেন। আহার করতে করতে স্বামীজী বললেন, "দেখ সিঙ্গি, concentrated food (সারভূত খাদ্য) খাওয়া চাই। কতকগুলো ভাত ঠেসে খাওয়া কেবল কুড়েমির গোড়া।" আবার কিছু পরেই বললেন, "দেখ জাপানীরা দিনে দুবার তিনবার ভাত আর দালের ঝোল খায়। কিন্তু খুব জোয়ান লোকেরাও অতি অল্প খায়, বারে বেশি। আর যারা সঙ্গতিপন্ন, তারা মাংস প্রত্যহই খায়। আমাদের

যে দুবার আহার কঁচকি-কণ্ঠা ঠেসে। এক গাদা ভাত হজম করতে সব energy (শক্তি) চলে যায়।”

প্রশ্ন। আমাদের মাংস খাওয়াটা সকলের পক্ষে সুবিধা কি ?

স্বামীজী। কেন, কম খাবে। প্রত্যহ এক পোয়া খেলেই খুব হয়। ব্যাপারটা কি জানিস ? দরিদ্রতার প্রধান কারণ আলস্য। একজনের সাহেব রাগ করে মাইনে কমিয়ে দিলে ; সে ছেলেদের দুধ কমিয়ে দিলে, এক বেলা হয়তো মুড়ি খেয়ে কাটালে।

প্রশ্ন। তা নয়তো কি করবে ?

স্বামীজী। কেন, আরও অধিক পরিশ্রম করে যাতে খাওয়া-দাওয়াটা বজায় থাকে, এটুকু করতে পারে না ? পাড়ায় যে দু-ঘণ্টা আড্ডা দেওয়া চাই-ই চাই। সময়ের যে কত অপব্যয় করে লোকে, তা আর কি বলব।

আহারান্তে স্বামীজী একটু বিশ্রাম করতে গেলেন।

* * * *

একদিন স্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে আছেন, আমি তাঁকে দর্শন করতে গেছি। তাঁর সঙ্গে আমেরিকার ও জাপানের অনেক কথা হবার পর, আমি জিজ্ঞাসা করলুম—

প্রশ্ন। স্বামীজী, আমেরিকায় কতগুলো শিষ্য করেছ ?

স্বামীজী। অনেক।

প্রশ্ন। ২।৪ হাজার ?

স্বামীজী। ঢের বেশি।

প্রশ্ন। কি, সব মন্ত্রশিষ্য ?

স্বামীজী। হ্যাঁ।

প্রশ্ন। কি মন্ত্র দিলে স্বামীজী, সব প্রণবযুক্ত মন্ত্র দিয়েছ ?

স্বামীজী। সকলকে প্রণবযুক্ত দিয়েছি।

প্রশ্ন। লোকে বলে, শূদ্রের প্রণবে অধিকার নেই, তায় তারা ম্লেচ্ছ ; তাদের প্রণব কেমন করে দিলে ? প্রণব তো ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কারো উচ্চারণে অধিকার নেই ?

স্বামীজী। যাদের মন্ত্র দিয়েছি, তারা যে ব্রাহ্মণ নয়, তা তুই কেমন করে জানলি ?

প্রশ্ন। ভারত ছাড়া সব তো যবন ও ম্লেচ্ছর দেশ, তাদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ কোথায় ?

স্বামীজী। আমি যাকে যাকে মন্ত্র দিয়েছি, তারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ও-কথা ঠিক, ব্রাহ্মণ নইলে প্রণবের অধিকারী হয় না। ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তার মানে নেই, হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে। বাগবাজারে অঘোর চক্রবর্তীর ভাইপো যে মেথর হয়েছে। মাথায় করে গুয়ের হাঁড়ি নে যায়। সেও তো বামুনের ছেলে।

প্রশ্ন। ভাই, তুমি আমেরিকা-ইংলণ্ডে ব্রাহ্মণ কোথায় পেলে ?

স্বামীজী। ব্রাহ্মণজাতি আর ব্রাহ্মণের গুণ দুটো আলাদা জিনিস। এখানে সব—

জাতিতে ব্রাহ্মণ, সেখানে গুণে। যেমন সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিনটে গুণ আছে জানিস, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বলে গণ্য হবার গুণও আছে। এই তোদের দেশে ক্ষত্রিয়-গুণটা যেমন প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, তেমনি ব্রাহ্মণ-গুণটাও প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। ওদেশে এখন সব ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্ব পাচ্ছে।

প্রশ্ন। তার মানে সেখানকার সাত্ত্বিকভাবের লোকদের তুমি ব্রাহ্মণ বলছ?

স্বামীজী। তাই বটে, সত্ত্ব রজঃ তমঃ যেমন সকলের মধ্যেই আছে—কোনটা কারো মধ্যে কম, কোনটা করো মধ্যে বেশি; তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হবার কয়টা গুণও সকলের মধ্যে আছে। তবে এই কয়টা গুণ সময়ে সময়ে কম বেশি হয়। আর সময়ে সময়ে এক একটা প্রকাশ হয়। একটা লোক যখন চাকরি করে, তখন সে শূদ্রত্ব পায়। যখন দু-পয়সা রোজগারের ফিকিরে থাকে, তখন বৈশ্য; আর যখন মারামারি ইত্যাদি করে, তখন তার ভেতর ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পায়। আর যখন সে ভগবানের চিন্তা বা ভগবৎ-প্রসঙ্গে থাকে, তখন সে ব্রাহ্মণ। এক জাতি থেকে আর এক জাতি হয়ে যাওয়াও স্বাভাবিক। বিশ্বামিত্র আর পরশুরাম—একজন ব্রাহ্মণ ও অপরজন ক্ষত্রিয় কেমন করে হলো?

প্রশ্ন। এ-কথা তো খুব ঠিক বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে অধ্যাপক আর কুলগুরু মহাশয়েরা সে-রকমভাবে দীক্ষাশিক্ষা কেন দেন না?

স্বামীজী। ঐটি তোদের দেশের একটি বিষম রোগ। যাক। সেদেশে যারা ধর্ম করতে শুরু করে, তারা কেমন নিষ্ঠা করে জপ-তপ, সাধন-ভজন করে।

প্রশ্ন। তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিসকলও অতি শীঘ্র প্রকাশ পায়, শুনতে পাই। শরৎ মহারাজের একজন পাশ্চাত্য শিষ্য মোট চার মাস সাধন-ভজন করে তার যে-সকল ক্ষমতা হয়েছে, তার বিষয় লিখে পাঠিয়েছে। সেদিন শরৎ মহারাজ দেখালেন।

স্বামীজী। হ্যাঁ। তবে বোঝ তারা ব্রাহ্মণ কিনা—তোদের দেশে যে মহা অত্যাচারে সমস্ত যাবার উপক্রম হয়েছে। গুরুঠাকুর মন্ত্র দেন, সেটা তার একটা ব্যবসা। আর গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধটাও কেমন! ঠাকুর মহাশয়ের ঘরে চাল নেই। গিন্নি বললেন, "ওগো, একবার শিষ্য বাড়ি-টাড়ি যাও, পাশা খেললে কি আর পেট চলে?" ব্রাহ্মণ বললেন, "হ্যাঁগো, কাল মনে করে দিও, অমুকের বেশ সময় হয়েছে শুনছি, আর তার কাছে অনেকদিন যাওয়াও হয়নি।" এই তো তোদের বাংলার গুরু! পাশ্চাত্যে আজো এ-রকমটা হয়নি। সেখানে অনেকটা ভাল আছে।

প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের দিন এক অপরূপ দৃশ্য দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে এটি যে একটি সুবৃহৎ মেলা, তা আর সন্দেহ নেই। তবে অন্যান্য মেলায় নিম্নশ্রেণীর লোকেরই অধিক সমাগম হয়ে থাকে। এখানে কিন্তু শতকরা পঁচানব্বই জন শিক্ষিত ভদ্রলোক এসে থাকেন। এ মেলাতে কোন প্রকার কেনাবেচার বিশেষ সংস্রব থাকে না, তাই বোধ হয় নিম্নশ্রেণীর লোকের তত প্রাদুর্ভাব হয় না। মেলামাত্রেই কিছু না কিছু ধর্ম সম্বন্ধ আছে। তবে সেই ধর্মসংক্রান্ত উৎসবের আনুষঙ্গিক নানাবিধ

হাটবাজার প্রভৃতি বসে বলেই অন্যান্য মেলায় নিম্নশ্রেণীর লোকের অত্যধিক প্রাদুর্ভাব এবং ভয়ানক ভিড় ও ঠেলাঠেলি দেখা যায়। এখানে দশ বিশ হাজার লোক একত্র হলেও সে প্রকার ঠেলাঠেলি হয় না, কারণ, অধিকাংশই শিক্ষিত ভদ্রসন্তান।

কিন্তু এখানেও এক সময়ে এই ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লক্ষ্য করা যায়। স্টীমার এসে মঠের কিনারায় লাগলে আর রক্ষা নেই—সকলকেই আগে নামতে হবে। মঠ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে স্টীমারে উঠবার সময়ও ঠিক তদ্রূপ—কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নেই। প্রতিবারই প্রায় দুই একজন জলে পড়েন। আমাদের ভিতরে সভ্যতার অসম্পূর্ণতাই এর কারণ।

আমরা পাঁচ সাতজন একত্র হলেই আমাদের এই অসংযত ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সকলেই এক সঙ্গে কথা বলবেন, কেউ কারও কথা শুনবেন না। যদি গান আরম্ভ হলো তো সকলকেই তাতে যোগ দিতে হবে ; শিক্ষিত অশিক্ষিত বিচার নেই, সুরে সুর মিলল না মিলল ভ্রূক্ষেপ নেই, লজ্জা নেই—যেন ভেড়ার খোঁয়াড়ে আগুন লেগেছে।

স্বামীজীর সঙ্গে একদিন মঠে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তা হয়। তিনি দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন, "দেখ, আমাদের একটা সেকেলে কথা আছে :

যদি না পড়ে পো
সভায় নিয়ে থো।

"কথাটি খুব পুরাতন। আর সভা মানে সামাজিক এক আধটা সভা, যা কালেভদ্রে কারও বাড়িতে হয়, তা নয় ; সভা হচ্ছে রাজদরবার। আগে আমাদের যে-সকল স্বাধীন বাঙালী রাজা ছিল, তাদের প্রত্যহই সকালে বিকালে সভা বসত। সকালে সমস্ত রাজকার্য। আর খবরের কাগজ তো ছিল না, সমস্ত মাতব্বর ভদ্রলোকের কাছে রাজ্যের প্রায় সব খবর নেওয়া হতো, আর তাতে সেই রাজধানীর সব ভদ্রলোক আসত। যদি কেউ না আসত, তার খবর হতো। এই সকল দরবার—সভাই আমাদের দেশের, কি সমস্ত সভ্য দেশের সভ্যতার Centre (কেন্দ্র) ছিল। পশ্চিমে রাজপুতানায় আমাদের এখানকার চেয়ে ঢের ভাল। সেখানে আজও সেই রকমটা কতক হয়।"

প্রশ্ন। এখন দেশী রাজা আমাদের দেশে নেই বলে কি দেশের লোকগুলো এতই অসভ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে ?

স্বামীজী। এগুলো একটা অবনতি—যার মূলে স্বার্থপরতা, এ তারই লক্ষণ। জাহাজে ওঠবার সময় 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা', আর গানের সময় 'হামবড়া'—এই হচ্ছে সব ভিতরের ভাব ; একটু Self-sacrifice (আত্মত্যাগ) শিক্ষা করলেই ঐটুকু যায়। এটা বাপ-মার দোষ—ঠিক ঠিক সৌজন্যও শেখায় না। সুসভ্যতা Self-sacrifice-এর গোড়া।

নিতান্ত বালককালেও স্বামীজী যখন দশ পনেরজনকে নিয়ে গান গল্প করতেন, তখনও দেখা গেছে, একটা হৈচৈ কলরব কখনই ঘটত না। তাঁর কেমন একটা personality-র জোর ছিল এবং তাঁর নিজের একটা সংযত ভাব আগাগোড়া, প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক ভঙ্গিতে ছিল। তিনি কথা আরম্ভ করলে যদি কেউ অন্য কোন প্রসঙ্গ

তুলে কথা বলত, তিনি তৎক্ষণাৎ তার সম্পূর্ণ মীমাংসা দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করে তার পর নিজের কথা বলতেন। সেই শৈশবাবস্থাতেও নরেন গান ধরলে অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে ঠিক সুর লয় মিলিয়ে গাইতে পারতেন তো ভাল, নতুবা তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করে বলতেন, "তোর হচ্ছে না ভাই। আগে গানটা যেরকম গাই, মনে মনে গেয়ে শিখে নে; তারপর সঙ্গে সুর মিলিয়ে দুই একবার গেয়ে নিতে হয়, নইলে ভাল লাগবে কেন?" বালকের অমনি চৈতন্য হতো।

স্বামীজী বলতে লাগলেন, "বাপ-মার অন্যায় দাবের জন্য ছেলেগুলো যে একটা স্ফূর্তি পায় না। গান গাওয়াটা বড় দোষ—ছেলের কিন্তু একটা ভাল গান শুনলে প্রাণ ছটফট করে, সে নিজের গলায় কেমন করে সেটি বার করবে। কাজেই সে একটা আড্ডা খোঁজে। তামাক খাওয়াটা মহাপাপ—এখন কাজেই সে চাকর-বাকরের সঙ্গে আড্ডা দেবে না তো কি করবে? সকলেরই ভেতর সেই infinite (অনন্ত) ভাব আছে—সেসব ভাবের কোন রকম স্ফূর্তি চাই। তোদের দেশে তা হবার জো নেই। তা হতে গেলে বাপ-মায়েদেরও নূতন করে শিক্ষা দিতে হবে। এই তো অবস্থা! সুসভ্যই নয়, তার উপর আবার তোদের শিক্ষিত বড় বড় বাবুরা চান কিনা—এখনি রাজ্যিটা ইংরেজ তাঁদের হাতে ফেলে দেয় আর তাঁরা রাজ্যিটা চালান। দুঃখুও হয়, হাসিও পায়। আরে সে martial (সামরিক) ভাব কই? তার গোড়ায় যে দাসভাব সাধনা করা চাই, নির্ভর চাই—হামবড়াটা martial-ভাব নয়। হুকুমে এগিয়ে মাথা দিতে হবে—তবে না মাথা নিতে পারবে। সে যে আপনাকে আগে বলি দিতে হবে।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোন ভক্ত-লেখক যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলে বিশ্বাস করেন না তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন বলে স্বামীজী তাঁকে ডাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন:

"তোর এমন করে সকলকে গাল দিয়ে লেখবার কি দরকার ছিল? তোর ঠাকুরকে বিশ্বাস করে না, তার কি হয়েছে? আমরা কি একটা দল করছি না কি? আমরা কি রামকৃষ্ণ-ভজা যে, তাঁকে যে না ভজবে, সে আমাদের শত্রু? তুই তো তাঁকে নীচু করে ফেললি, তাঁকে ছোট করে ফেললি। তোর ঠাকুর যদি ভগবান হন তো যে যেমন করে ডাকুক, তাঁকেই তো ডাকছে। তবে সবাইকে তুই গাল দেবার কে? না, গাল দিলেই তোর কথা শুনবে? আহাম্মক! মাথা দিতে পারিস তবে মাথা নিতে পারবি; নইলে তোর কথা লোকে নেবে কেন?"

একটু স্থির হয়ে পুনরায় বলতে লাগলেন:

"বীর না হলে কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে, না নির্ভর করতে পারে? বীর না হলে হিংসা দ্বেষ যায় না, তা সভ্য হবে কি? সেই manly (পুরুষোচিত) শক্তি, সেই বীরভাব তোদের দেশে কই? নেই, নেই। সে ভাব ঢের খুঁজে দেখেছি, একটা বই দুটো দেখতে পাইনি।"

প্রশ্ন। কার দেখেছ, স্বামীজী?

স্বামীজী। এক G. C.-র (গিরিশচন্দ্রের) দেখেছি যথার্থ নির্ভর, ঠিক দাস-ভাব ; মাথা দিতে প্রস্তুত, তাই না ঠাকুর তার আমমোক্তারনামা নিয়েছিলেন। কি নির্ভর! এমন আর দেখলুম না, নির্ভর তার কাছে শিখেছি।

এই বলে স্বামীজী হাত তুলে গিরিশবাবুর উদ্দেশে নমস্কার করলেন।

* * * *

দ্বিতীয়বার স্বামীজীর মার্কিনে যাবার সমস্ত উদ্যোগ হচ্ছে, তিনি অনেকটা ভাল আছেন। একদিন প্রাতে তিনি কলকাতায় কোন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বাগবাজারে বলরামবাবুর বাটীতে এসে উপস্থিত হলেন। একজন নৌকা ডাকতে গিয়েছেন—স্বামীজী এখনি আবার মঠে যাবেন। ইতিমধ্যে স্বামীজী তাঁর অন্য একজন বন্ধুকে ডেকে বললেন ঃ

"চল মঠে যাবি, চল আমার সঙ্গে—অনেক কথা আছে।"

বন্ধুটি উপবেশন করলে আবার বললেন ঃ

"আজ বড় মজা হয়েছে। একজনের বাড়ি গেছলুম—সে একটা ছবি আঁকিয়েছে—কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ। কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রথের উপর, ঘোড়ার লাগাম হাতে আর অর্জুনকে গীতা বলছেন। ছবিটা দেখিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলে, কেমন হয়েছে। আমি বললুম, মন্দ কি। সে জিদ করে বললে, সব দোষ গুণ বিচার করে বল কেমন হয়েছে। কাজেই বলতে হলো—কিছুই হয়নি। প্রথমতঃ রথটা আজকালের প্যাগোডা রথ নয়, তার পর কৃষ্ণের ভাব কিছুই হয়নি।"

প্রশ্ন। কেন প্যাগোডা রথ নয় ?

স্বামীজী। ওরে, দেশে যে বুদ্ধদেবের পর থেকে সব খিচুড়ি হয়ে গেছে। প্যাগোডা রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ করত না। রাজপুতানায় আজও রথ আছে, অনেকটা সেই সেকেলে রথের মতো। Grecian mythology-র (গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর) ছবিতে যেসব রথ আঁকা আছে, দেখেছিস ? দুচাকার, পিছন দিয়ে ওঠা-নাবা যায়—সেই রথ আমাদের ছিল। একটা ছবি আঁকলেই কি হলো ? সেই সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে সেই সময়ের জিনিসগুলি দিলে তবে ছবি দাঁড়ায়। Truth represent (প্রতীকে সত্যকে প্রকাশ) করা চাই, নইলে কিছুই হয় না। যত মারে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে—যাদের স্কুলে লেখাপড়া হলো না, আমাদের দেশে তারাই যায় painting (চিত্রবিদ্যা) শিখতে। তাদের দ্বারা কি আর কোন ছবি হয় ? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করানো আর একখানা perfect drama (সর্বাঙ্গসুন্দর নাটক) লেখা, একই কথা।

প্রশ্ন। কৃষ্ণকে কিভাবে আঁকা উচিত ওখানে ?

স্বামীজী। শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস ?—সমস্ত গীতাটা personified (মূর্তিমান)। যখন অর্জুনের মোহ আর কাপুরুষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলছেন, তখন তাঁর central idea (মুখ্যভাব)-টি শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।

এই বলে স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে আঁকা কর্তব্য, সেই মতো নিজে অবস্থিত হয়ে দেখালেন আর বললেন :

"এমনি করে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা-দুটো প্রায় হাঁটুগাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে—ঘোড়াগুলো হাঁ করে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় action (ক্রিয়া) খেলছে। তাঁর সখা, ত্রিভুবনবিখ্যাত বীর ; দুপক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতো রথের উপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেইরকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই অমানুষী প্রেমকরুণামাখা বালকের মতো মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন। এখন গীতার preacher (প্রচারক)-এর এ ছবি দেখে কি বুঝলি ?

উত্তর। ক্রিয়াও চাই আর গাম্ভীর্য স্থৈর্যও চাই।

স্বামীজী। অ্যাই!—সমস্ত শরীরে intense action (তীব্র ক্রিয়াশীলতা) আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত। এই হলো গীতার central idea (মুখ্যভাব), দেহ জীবন আর প্রাণ-মন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥[২]

যিনি কর্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশান্ত রাখতে পারেন আর বাহ্য কোন কর্ম না করলেও অন্তরে যাঁর ব্রহ্মচিন্তারূপ কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তাঁরই সব কর্ম করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে যিনি নৌকা ডাকতে গিয়েছিলেন, তিনি এসে সংবাদ দিলেন, নৌকা এসেছে। স্বামীজী যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁকে বললেন :

"চল, মঠে যাই। বাড়িতে বলে এসেছিস তো ?"

বন্ধু। আজ্ঞা হ্যাঁ।

সকলে কথা বলতে বলতে মঠে যাবার জন্য নৌকায় গিয়ে উঠলেন।

স্বামীজী। এই ভাব সমস্ত লোকের ভিতর ছড়ানো চাই—কর্ম—কর্ম—অনন্ত কর্ম ; তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে আর প্রাণ-মন সেই রাঙা পায়।

বন্ধু। এ তো কর্মযোগ !

স্বামীজী। হ্যাঁ, এ-ই কর্মযোগ। কিন্তু সাধন-ভজন না করলে কর্মযোগও হবে না। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য চাই। নইলে প্রাণ-মন কেমন করে তাঁতে দিয়ে রাখবি ?

বন্ধু। গীতার কর্ম মানে তো লোকে বলে—বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান, সাধন-ভজন, আর তাছাড়া সব কর্ম অকর্ম।

---

২ গীতা, ৪।১৮

স্বামীজী। খুব ভাল কথা, ঠিক কথা ; কিন্তু সেটাকে আরও বাড়িয়ে নে না। তোর প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, প্রতি চিন্তার জন্য, তোর প্রতি কাজের জন্য দায়ী কে ? তুই তো ?

বন্ধু। তা বটে, না-ও বটে। ঠিক বুঝতে পারছি না। আসল কথা তো দেখছি গীতার ভাব—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন' ইত্যাদি। তা আমি তাঁর শক্তিতে চালিত, তবে আর আমার কাজের জন্য আমি তো একেবারেই দায়ী নই।

স্বামীজী। ওটা বড় উচ্চ অবস্থার কথা। কর্ম করে চিত্ত শুদ্ধ হলে পর যখন দেখতে পাবি, তিনিই সব করাচ্ছেন, তখন ওটা বলা ঠিক ; নইলে সব মুখস্থ, মিছে।

বন্ধু। মিছে কেন, যদি একজন ঠিক বিচার করে বোঝে যে, তিনিই সব করাচ্ছেন !

স্বামীজী। বিচার করে দেখলে পরে তখন। তা সে যখনকার তখনি। তার পর তো নয়। কি জানিস, বেশ বুঝে দেখ—অহরহঃ তুই যা-ই করিস, তুই করছিস মনে করে করিস কিনা ? তিনিই করাচ্ছেন, কতক্ষণ মনে থাকে ? তবে ঐরকম বিচার করতে করতে এমন একটা অবস্থা আসবে যে, 'আমি'-টা চলে যাবে আর তার জায়গায় 'হৃষীকেশ' এসে বসবেন। তখন 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন' বলা ঠিক হবে। আর বাবা, 'আমি'-টা বুক জুড়ে বসে থাকলে তাঁর আসবার জায়গা কোথায় যে তিনি আসবেন ? তখন হৃষীকেশের অস্তিত্বই নেই।

বন্ধু। কুকর্মের প্রবৃত্তিটা তিনিই দিচ্ছেন তো ?

স্বামীজী। না রে না ; ও রকম ভাবলে ভগবানকে অপরাধী করা হয়। তিনি কুকর্মের প্রবৃত্তি দিচ্ছেন না। ওটা তোর আত্মতৃপ্তির বাসনা থেকেই ওঠে। জোর করে তিনি সব করাচ্ছেন বলে অসৎ কাজ করলে সর্বনাশ হয়। ঐ থেকেই ভাবের ঘরে চুরি আরম্ভ হয়। ভাল কাজ করলে কেমন একটা elation (উল্লাস) হয়, বুক ফুলে ওঠে। বেশ করেছি বলে আপনাকে বাহবা দিবি। এটা তো আর এড়াবার যো নেই, দিতেই হবে। ভাল কাজটার বেলা আমি, আর মন্দ কাজটার সময় তিনি—ওটা গীতা-বেদান্তের বদহজম, বড় সর্বনেশে কথা ; অমন কথা বলিসনি। বরং তিনি ভালটা করাচ্ছেন আর আমিই মন্দটা করছি—বল। তাতে ভক্তি আসবে, বিশ্বাস আসবে। তাঁর কৃপা হাতে হাতে দেখতে পাবি। আসল কথা, কেউ তোকে সৃষ্টি করেনি, তুই আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেছিস কিনা। বিচার এই, বেদান্ত এই। তবে সেটা উপলব্ধি নইলে বোঝা যায় না। সেইজন্য প্রথমটা সাধককে দ্বৈতভাবটা ধরে নিয়ে চলতে হয় ; তিনি ভালটা করান, আমি মন্দটা করি—এটিই হলো চিত্তশুদ্ধির সহজ উপায়। তাই বৈষ্ণবদের ভিতর দ্বৈতভাব এত প্রবল। অদ্বৈতভাব গোড়ায় আনা বড় শক্ত। কিন্তু ঐ দ্বৈতভাব থেকে পরে অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি হয়।

স্বামীজী আবার বলতে লাগলেন ঃ

"দেখ, বিটলেমোটা বড় খারাপ। ভাবের ঘরে যদি চুরি না থাকে, অর্থাৎ যদি প্রবৃত্তিটা বড়ই নীচ হয় অথচ যদি সত্যই তার মনে বিশ্বাস হয় যে,এও ভগবান করাচ্ছেন,

তাহলে কি আর বেশিদিন তাকে সেই নীচকাজ করতে হয়? সব ময়লা চট সাফ হয়ে যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা খুব বুঝত। আর আমার মনে হয়, বৌদ্ধধর্মের যখন পতন আরম্ভ হলো, আর বৌদ্ধদের পীড়নে লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত—বাবা, দু-মাস ধরে আর যাগ করবার জো-টি নেই, এক রাত্রেই কাঁচা মাটির মূর্তি গড়ে পূজা শেষ করে তাকে বিসর্জন দিতে হবে—যেন এতটুকু চিহ্ন না থাকে—সেই সময়টা থেকে তন্ত্রের উৎপত্তি হলো। মানুষ একটা concrete (স্থূল) চায়, নইলে প্রাণটা বুঝবে কেন? ঘরে ঘরে ঐ এক রাত্রে যজ্ঞ হতে আরম্ভ হলো। কিন্তু প্রবৃত্তি সব Sensual (ইন্দ্রিয়গত) হয়ে পড়েছে। ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, 'কেউ কেউ নর্দমা দিয়ে পথ করে'; তেমনি সদ্গুরুরা দেখলেন যে, যাদের প্রবৃত্তি নীচ বলে কোন সৎ কাজের অনুষ্ঠান করতে পারছে না, তাদেরও ধর্মপথে ক্রমশঃ নিয়ে যাওয়া দরকার। তাদের জন্যই ঐসব বিটকেল তান্ত্রিক সাধনার সৃষ্টি হয়ে পড়ল।"

প্রশ্ন। মন্দ কাজের অনুষ্ঠান তো সে ভাল বলে করতে লাগল, এতে তার প্রবৃত্তির নীচতা কেমন করে যাবে?

স্বামীজী। ঐ যে প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দিলে—ভগবান পাবে বলে কাজ করছে।

প্রশ্ন। সত্য সত্যই কি তা হয়?

স্বামীজী। সেই একই কথা; উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেই হবে; না হবে কেন?

প্রশ্ন। পঞ্চ-'মকার' সাধনে কিন্তু অনেকের মন যে মদমাংসে পড়ে যায়।

স্বামীজী। তাই পরমহংস মশাই এসেছিলেন। ও-ভাবে তন্ত্রসাধনার দিন গেছে। তিনিও তন্ত্রসাধন করেছিলেন, কিন্তু ওরকম ভাবে নয়। মদ খাবার বিধি যেখানে, সেখানে তিনি একটা কারণের ফোঁটা কাটতেন। তন্ত্রটা বড় Slippery ground (পিছল পথ)। এইজন্য বলি, এদেশে তন্ত্রের চর্চা চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আরও উপরে যাওয়া চাই। বেদের [বেদান্তের] চর্চা চাই। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য করে সাধন করা চাই, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য চাই।

প্রশ্ন। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জস্য কি রকম?

স্বামীজী। জ্ঞান—বিচার, বৈরাগ্য, ভক্তি, কর্ম আর সঙ্গে সঙ্গে সাধনা এবং স্ত্রীলোকের প্রতি পূজাভাব চাই।

প্রশ্ন। স্ত্রীলোকের প্রতি পূজাভাব কি করে আসে?

স্বামীজী। ওরাই হলো আদ্যাশক্তি। যেদিন আদ্যাশক্তির পুজো আরম্ভ হবে, সেদিন মায়ের কাছে প্রত্যেক লোক আপনাকে আপনি 'নরবলি' দেবে, সেই দিনই ভারতের যথার্থ মঙ্গল শুরু হবে।

এই কথা বলে স্বামীজী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

একদিন তাঁর কতকগুলি বাল্যবন্ধু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে বললেন, "স্বামীজী, তুমি যে ছেলেবেলায় বে করতে বললে বলতে, 'বে করব না, আমি কি হব দেখবি', তা যা বলেছিলে, তাই করলে।"

স্বামীজী। হ্যাঁ ভাই, করেছি বটে। তোরা তো দেখেছিস—খেতে পাইনি, তার উপর খাটুনি। বাপ, কতই না খেটেছি। আজ আমেরিকানরা ভালবেসে এই দেখ কেমন খাট বিছানা গদি দিয়েছে, দুটো খেতেও পাচ্ছি। কিন্তু ভাই, ভোগ আমার অদৃষ্টে নেই। গদিতে শুলেই রোগ বাড়ে, হাঁপিয়ে মরি। আবার মেজেয় এসে পড়ি, তবে বাঁচি।

রক্ত-মাংসের শরীর, কতই সহ্য হবে? এই দারুণ পরিশ্রমের ফলে, ...অকালে স্বামীজীর দেহত্যাগ হয়।

নরেন্দ্রনাথ হেদোর ধারে জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে পড়েন। এফ. এ. সেইখান থেকেই পাশ করেছেন। তাঁর অসংখ্য গুণে সহপাঠীরা অনেকে বড়ই বশীভূত। তাঁরা তাঁর গান শুনতে, মিষ্টি কথাবার্তা, সুযুক্তিপূর্ণ তর্ক শুনতে এতই ভালবাসতেন যে, অবকাশ পেলেই নরেনের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হতেন। সেখানে বসে একবার তাঁর তর্কযুক্তি বা গান-বাজনা আরম্ভ হলে সময় যে কোথা দিয়ে চলে যেত তা বুঝতে পারতেন না।

নরেন্দ্র এখন তাঁর পিত্রালয়ে দুবেলা কেবল আহার করতে যান, আর সমস্ত দিবারাত্র নিকটে রামতনু বসুর গলিতে মাতামহীর বাড়িতে থেকে পাঠাভ্যাস করেন। পাঠাভ্যাসের খাতিরেই যে এখানে থাকেন তা নয়। নরেন্দ্র নিভৃতে থাকতে ভালবাসেন। বাড়িতে অনেক লোক, বড় গোলমাল, নিশীথে ধ্যান-জপের বড়ই ব্যাঘাত। মাতামহীর বাড়িতে লোক বেশি নয়, দু-একজন যাঁরা আছেন তাঁদের দ্বারা নরেনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কাঁচকাঁচা ছেলে যাদের দ্বারাই অধিক গোলমাল হয়, এখানে একটিও নেই। যে ঘরটিতে নরেন থাকেন তা বারবাড়ির দোতলায়। ঘরের সম্মুখেই ঘরে উঠবার সিঁড়ি। অন্দরমহলের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব নেই। সুতরাং তাঁর বন্ধুবান্ধবের যার যখন ইচ্ছা এসে উপস্থিত হন। নরেন নিজের এই অপূর্ব ছোট ঘরটির নাম রেখেছিলেন 'টঙ'। কাউকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যেতে হলে বলতেন, "চল টঙে যাই।" ঘরটি বড়ই ছোট, প্রস্থে চার হাত, দৈর্ঘ্যে প্রায় তার দ্বিগুণ। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটি ক্যাম্বিসের খাট, তার উপর ময়লা একটি ক্ষুদ্র বালিশ। মেঝের উপর একটি ছেঁড়া সপ পাতা। এক কোণে একটি তম্বুরা। তারই কাছে একটি সেতার ও একটি বাঁয়া। বাঁয়া কখনো ঐ মাদুরের উপর পড়ে থাকে, কখনো বা ঐ খাটিয়ার নিচে পড়ে থাকে, কখনো বা তার উপর চড়ে বসে থাকে। ঘরের এক পার্শ্বে একটি থেলো হুঁকো, তার কাছে একটি তামাকের গুল আর ছাই ঢালবার একখানি সরা। তারই কাছে তামাক টিকে ও দেশলাই রাখবার একটি মৃত্তিকা পাত্র। আর কুলুঙ্গিতে খাটের উপর, মাদুরের উপর হেথা সেথা ছড়ানো পড়বার পুস্তক। একটি দেওয়ালে একটি দড়ি খাটানো তাতে কাপড়, পিরান ও একখানি চাদর ঝুলছে। ঘরে দুটো-একটা ভাঙা শিশিও রয়েছে, সম্প্রতি তাঁর পীড়া হয়েছিল তারই নজির। নরেন মনে করলেই বাড়ি থেকে পরিষ্কার বালিশ, উত্তম বিছানা, ও একটু ভাল ভাল দ্রব্যাদি এনে দু-একখানি ছবি প্রভৃতি দিয়ে

আপনার ঘরটি বেশ সাজাতে পারতেন। করতেন না যে, তার একমাত্র কারণ তাঁর ও সমস্ত দিকে কোন প্রকার খেয়ালই ছিল না। সেজন্য ঘরের সর্বত্র একটা যেন বাসাড়ে-বাসাড়ে ভাব। প্রকৃত কথা, আত্মতৃপ্তির বাসনা তাঁর বাল্যাবস্থা থেকেই কোন বিষয়ে দেখা যেত না।

নরেন্দ্র আজ মনোনিবেশ করে পাঠ করছেন; এমন সময় কোন বন্ধুর আগমন হলো, বেলা এগারটা। আহারাদি করে নরেন্দ্র পাঠ করছেন। বন্ধু এসে নরেনকে বললেন, "ভাই রাত্তিরে পড়িস, এখন দুটো গান গা।" অমনি নরেন পড়বার বই মুড়ে এক ধারে ঠেলে রাখলেন। তানপুরার জুড়ির তার ছিঁড়ে গেছে, সেতারের সুর বেধে নরেন গান ধরবার আগে বন্ধুকে বললেন, "তবে বাঁয়াটা নে।" বন্ধু বললেন, "ভাই, আমি তো বাজাতে জানি না। ইস্কুলে টেবিল চাপড়ে বাজাই বলে কি তোমার সঙ্গে বাঁয়া বাজাতে পারব?" অমনি নরেন আপনি একটু বাজিয়ে দেখালেন ও বললেন, "বেশ করে দেখে নে দিকি। পারবি বই কি, কেন পারবিনি? কিছু শক্ত কাজ নয়। এমনি করে কেবল ঠেকা দিয়ে যা, তাহলেই হবে।" সঙ্গে সঙ্গে বাজনার বোলটাও বলে দিলেন। বন্ধু দু-একবার চেষ্টা করে কোনরকমে ঠেকা দিতে লাগলেন, গান চলল। তান লয়ে উন্মত্ত হয়ে ও উন্মত্ত করে নরেনের হৃদয়স্পর্শী গান চলল। টপ্পা, টপ্‌খেয়াল, খেয়াল, ধ্রুপদ, বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত। নূতন ঠেকার সময় নরেন এমনি সহজভাবে বোল সহ ঠেকাটি দেখিয়ে দেন যে, এক দিনেই কাওয়ালি, একতারা, আড়াঠেকা, মধ্যমান এমন কি সুরফাঁক তাল পর্যন্ত তার দ্বারা বাজিয়ে নিলেন। বন্ধু মাঝে মাঝে তামাক সেজে নরেনকে খাওয়াচ্ছেন ও নিজে খাচ্ছেন; সেটা কেবল বাজানো থেকে একটু অবসর না নিলে হাত যে যায়। নরেন্দ্রের কিন্তু গানের কামাই নেই, হিন্দি গান হলে নরেন তার মানে বলছেন ও তার অন্তর্নিহিত ভাবতরঙ্গের সঙ্গে সুর লয়ে অপূর্ব ঐক্য দেখিয়ে বন্ধুকে বিমোহিত করছেন। দিন কোথা দিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যা এল, বাড়ির চাকর এসে একটি মিট্‌মিটে প্রদীপ দিয়ে গেল। ক্রমে রাত্রি দশটার সময় দুজনের হুঁশ হলে সেদিনকার মতো পরস্পর বিদায় নিয়ে নরেন্দ্র পিত্রালয়ে ভোজনের জন্য গেলেন, বন্ধু স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

এই ভাবে নরেনের পাঠে কতই যে ব্যাঘাত ঘটত তা বলা যায় না। নরেনের সঙ্গে এই সময়ে যাঁরই ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, তিনিই এই ব্যাপার চাক্ষুষ দেখেছেন। কিন্তু ব্যাঘাত যতই হোক না কেন নরেন্দ্র নির্বিকার।

একদিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, নরেন অনেক দিন তাঁর কাছে না যাওয়ায়, তাঁকে দেখবার জন্য রামলালের সঙ্গে কলকাতায় নরেনের 'টঙে' আগমন করেন। সেদিন সকালে নরেনের ঘরে দুই সহপাঠী বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও দাশরথি সান্যাল বসে কখনো পাঠ করছেন, আবার কখনো বা কথাবার্তা বলছেন। এমন সময় বহির্দ্বারে 'নরেন, নরেন' শব্দ শোনা গেল। স্বর শুনেই নরেন অতীব ব্যস্ত হয়ে দ্রুত নিচে চলে গেলেন। তাঁর বন্ধুরাও বুঝলেন পরমহংসদেব এসেছেন, তাই নরেন এত ব্যস্ত

হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনতে গেলেন। বন্ধুরা দেখলেন সিঁড়ির মাঝখানেই পরস্পরের সাক্ষাৎ হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে দেখে অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্‌গদ স্বরে বলতে লাগলেন, "তুই এত দিন যাসনি কেন? তুই এত দিন যাসনি কেন?" বারংবার এই বলতে বলতে ঘরে এসে বসলেন, পরে গামছায় বাঁধা সন্দেশ খুলে নরেনকে 'খা, খা' বলে খাওয়াতে লাগলেন। নরেনকে দেখতে যখনি আসেন, তখনি কিছু না কিছু অতি উত্তম খাদ্যদ্রব্য তাঁর জন্য বেঁধে আনেন; মাঝে মাঝে লোক দ্বারা পাঠিয়েও দেন। নরেন একলা খাবার পাত্র নয়, তা থেকে কতকগুলি সন্দেশ নিয়ে আগেই তাঁর বন্ধুদের দিয়ে তবে খেলেন। রামকৃষ্ণ তারপরে বললেন, "ওরে, তোর গান অনেক দিন শুনিনি, গান গা।" অমনি তানপুরা নিয়ে তার কান মলে সুর বেঁধে নরেন্দ্র গান আরম্ভ করলেন।

ভৈরবী—একতালা।
জাগ মা কুল কুণ্ডলিনি,
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী।
(তুমি) নিত্যানন্দ স্বরূপিণী
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধার-পদ্ম-বাসিনী॥
ত্রিকোণে জ্বলে কৃশানু, তাপিত হইল তনু।
মূলাধার ত্যজ শিবে, স্বয়ম্ভু-শিব-বেষ্টিনি॥
গচ্ছ সুষুম্নার পথ, স্বাধিষ্ঠানে হও অতীত।
মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাজ্ঞা-সঞ্চারিণী॥
শিরসি সহস্রদলে, পরম শিবেতে মিলে।
ক্রীড়া কর কুতূহলে, সচ্চিদানন্দদায়িনি॥

গানও আরম্ভ হলো, শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবস্থ হতে লাগলেন। গানের স্তরে স্তরে মন ঊর্ধ্বে উঠল, চক্ষে পলক নেই, অঙ্গে স্পন্দন নেই, মুখাবয়ব অমানুষী ভাব ধারণ করল, ক্রমে মর্মর মূর্তির মতো নিস্পন্দ হয়ে নির্বিকল্প সমাধিস্থ হলেন। নরেনের বন্ধুরা পূর্বে কোন মানুষে এরূপ ভাব দেখেননি। তাঁরা এই ব্যাপার দেখে মনে করলেন বুঝি বা তিনি শরীরে সহসা কোন পীড়া হওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। তাঁরা মহা ভীত হলেন। দাশরথি তাড়াতাড়ি জল এনে তাঁর মুখে সিঞ্চন করবার উদ্যোগ করছেন দেখে নরেন্দ্র তাঁকে বারণ করে বললেন, "জল দেবার দরকার নেই। উনি অজ্ঞান হননি, ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুনতে শুনতেই জ্ঞান হবে।" নরেন্দ্র এইবার শ্যামাবিষয়ক গান ধরলেন, "একবার তেমনি তেমনি করে নাচ মা শ্যামা।" শ্যামাবিষয়ক অনেক গান হলো। কৃষ্ণবিষয়ক গানও অনেক হলো। গান শুনতে শুনতে রামকৃষ্ণ কখনো ভাবাবিষ্ট হচ্ছেন,আবার কখনো বা সহজাবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছেন। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরে গান গাইলেন। অবশেষে গান শেষ হলে রামকৃষ্ণ বললেন, "দক্ষিণেশ্বর যাবি? কদিন তো যাসনি। চল না, আবার এখনি ফিরে আসিস।" নরেন্দ্র তখনি সম্মত হলেন। পুস্তকাদি

যেমন অবস্থায় পড়ে ছিল তেমনি পড়ে রইল, কেবলমাত্র তানপুরাটি যত্নপূর্বক তুলে রেখে গুরুদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গেলেন, বন্ধুরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করলেন।

নরেন্দ্রনাথের পড়াশুনায় এবম্বিধ বহু অন্তরায় তাঁর অনেক বন্ধুই দেখেছেন, কিন্তু সাহস করে তাঁকে কেউ কখনো কিছু বলতে পারেননি। একদিন উক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বৃথা সময় নষ্ট হয় ভেবে তার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "ভাই, ধর্মের জন্যে তোমার যেরকম আবেগ, তাতে তুমি নিশ্চয়ই শীঘ্র উৎকৃষ্ট গুরু পাবে।" নরেন্দ্র বেশ বুঝলেন যে বন্ধুটি রামকৃষ্ণকে একজন সামান্য ব্যক্তি মনে করেই এমন বলছেন। নরেন্দ্র বন্ধুর কথায় মর্মাহত হলেন। কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন কথায় কথায় বলে ফেললেন, "ভাই, হরিদাস আমার গুরুদেবকে সামান্য লোক মনে করে। তা সে যা হোক 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায় তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়'।" এর বহুকাল পরে লেখকের কাছে হরিদাস এই সম্বন্ধে বলেছিলেন, "ভাই, তখন কি আমরা পরমহংসদেবকে চিনতে পেরেছিলুম? ভাগ্যগুণে নরেন তাঁকে চিনেছিলেন, আর আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুই তখন বুঝতে পারিনি।" হরিদাস এইরূপ কত দুঃখ প্রকাশ করতেন ও তাঁর নয়ন আর্দ্র হয়ে আসত।

বি. এ. পরীক্ষার জন্য টাকা জমা দেবার সময় এলে সকলেই আপন আপন বেতন ও পরীক্ষার ফী জমা দিল। হরিদাসের অবস্থা ভাল নয়, তার উপর এক বৎসর বিদ্যালয়ের বেতন দেওয়া হয়নি। তখন এক প্রকার ধারে পড়াশুনা জেনারেল এসেম্‌ব্লিতে চলত। পরীক্ষার সময় সমস্ত টাকা আদায় করা হতো। যারা নেহাত সমস্ত বেতন দিতে অপারগ, তাদের কিছু কিছু, আবার তেমন তেমন স্থলে সমস্তই ছেড়ে দেওয়া হতো। এই সমস্ত ছাড়ছুড়ের ভার রাজকুমার নামক একজন বৃদ্ধ কেরানীর উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত। রাজকুমার সাদাসিদে লোক, একটু আধটু নেশাটা-আশটা করেন, কিন্তু গরিব ছাত্রদের প্রতি তাঁর বিশেষ দয়া। তাঁর দয়ার গুণেই অক্ষম ছাত্রেরা বিনা বেতনেই পড়তে পায়। বেতন সম্বন্ধে রাজকুমারের উপর কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস প্রগাঢ়। রাজকুমার—স্বয়ং তদন্ত করে কাউকেও অর্ধ বেতন, কাউকে বা বিনা বেতনে ভর্তি করেন। রাজকুমার যা করেন কর্তৃপক্ষ তাই মঞ্জুর করেন। কাজেই ছাত্রমহলে রাজকুমারের বেজায় প্রতিপত্তি। সকলেই বুড়ো কেরানীকে বড়ই ভালবাসে, রাজকুমারও ছেলের জহুরী, কে কেমন ছেলে বেশ পাকা রকম জানেন। নরেনের অক্ষম বন্ধু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কোনও উপায়ে ফী-র টাকা যোগাড় করেছেন, সম্বৎসরের বেতনের টাকার কিন্তু যোগাড় করতে না পেরে একদিন নরেন্দ্রকে সেকথা জানালেন। নরেন্দ্র বললেন, "তুই ভাবিসনি, এগজামিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে প্রস্তুত হ। আমি রাজকুমারকে বলে সব ঠিক করে দেব। তোর মাইনেটা মাপ করিয়ে দেব। কেবল ফী-র যোগাড়টা করিস।"

বন্ধু উত্তর দিলেন, "ভাই, ফী-র যোগাড় আছে। মাইনেটা মাপ হলে সব গোল মিটে যায়।"

নরেন বললেন, "তবে ভাবনা কি, সব ঠিক হবে এখন।" দু-একদিন পরে তাঁরা দুই বন্ধু একত্রে কেরানি রাজকুমারের ঘরের সম্মুখে পাদচারণা করতে করতে গল্প করছেন, এমন সময় সেখানে আরও অনেক ছাত্র এসে উপস্থিত হলো। ক্রমে রাজকুমার এলেন। অনেক ছেলে একত্রে দেখে রাজকুমার একবার সকলের বকেয়া বেতনের তাগাদা করলেন, একটু জোর তাগাদা, "অমুক দিনের মধ্যে যে মাইনের টাকা না দেবে এবার তাকে পাঠানো হবে না।" ছেলেরা রাজকুমারকে ঘিরে আপন আপন দুঃখ-কাহিনী বলে বকেয়া বেতনের ক্ষমার জন্য আব্দার করতে লাগল। কতকগুলি ভাল ছেলে রাজকুমারের প্রিয় পাত্র। অন্য ছেলেদের বিষয়ে তদন্ত করতে হলে রাজকুমার অনেক সময় তাদের দ্বারাই করেন। নরেন্দ্র তাদের মধ্যে একজন এবং নরেন্দ্র বেশ জানতেন যে তাঁর উপরোধ রাজকুমার এড়াতে পারবেন না। রাজকুমারের মাথায় পাকায় কাঁচায় চুল, গোঁফও তদ্রূপ ; কেবল তার উপর তামাকের ছোপের দাগ দু-পার্শ্বে ; কখনো তাঁর চাপকানের বা জামার বোতাম দেবার অবকাশ হতো না, কাঁধে চাদরখানি জাহাজি কাছির মতো পাকানো। রাজকুমার গিয়ে চেয়ারের হাতলে চাদরখানি বেঁধে তদুপরি উপবিষ্ট হলেন। অমনি ঝন্‌ঝন্ শব্দে ছেলেরা টাকা জমা দিতে আরম্ভ করল। রাজকুমারের চারিধারে বেজায় ভিড়। নরেন্দ্র ভিড় ঠেলে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "মশাই, অমুক দেখছি মাইনেটা দিতে পারবে না। তা আপনি একটু অনুগ্রহ করে তাকে মাপ করে দিন। তাকে পাঠালে সে ভাল রকম পাশ হবে। আর না পাঠালে তার সব মাটি হয়।"

রাজকুমার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "তোকে জ্যাঠামি করে সুপারিশ করতে হবে না, তুই যা, নিজের চরকায় তেল দিগে যা। আমি মাইনে না দিলে ওকে পাঠাব না।" নরেন্দ্র তাড়া খেয়ে অপ্রতিভ হয়ে চলে এলেন ; তাঁর বন্ধুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো, অতীব বিমর্ষ হয়ে নরেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে ক্লাসে চললেন।, নরেন্দ্র অপদস্থ হবার পাত্র নন, বন্ধুর ভাব দেখে তাঁকে অন্তরালে নিয়ে বললেন, "তুই হতাশ হচ্ছিস কেন? ও বুড়ো অমন তাড়াতুড়ি দেয়। আমি বলছি তোর একটা উপায় করে দেব, তুই নিশ্চিন্ত হ। আমি যেমন করে পারি তোর একটা উপায় করব। তোর এগজামিন দিতে পেলেই তো হলো? ভাবিসনি ভাই, নিশ্চয় বলছি তোর উপায় করব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।" বন্ধুর মুখের অন্ধকার ঘুচে আবার তাতে আশার আলোক দেখা দিল। বন্ধু ভাবলেন নরেন বড়লোকের ছেলে, বাপ উকিল, তাঁর গান শিখবার জন্য বেতন দিয়ে ওস্তাদ রাখেন। নরেন হয়তো বাপকে বলেই অক্ষম বন্ধুর কোন উপায় করে দেবেন। তাই তাঁর এত আত্মপ্রত্যয়।. রাজকুমার যখন বকেয়া বেতন না দিলে পরীক্ষা দিতে পাঠাবেন না, তখন নরেন নিশ্চয় টাকার যোগাড়ই করবেন। বন্ধু এই-রূপ ভেবে-চিন্তে নিশ্চিন্ত হলেন। নরেন্দ্র কলেজ থেকে বাড়ি এসে হেদোর ধারে

একটু আধটু বেড়িয়ে বাড়ি [বাড়ির দিকে] ফিরে এলেন। অন্যদিন সন্ধার পরে [বাড়ি] আসেন, আজ একটু ব্যস্ত হয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই এলেন। কিন্তু বাড়ি না গিয়ে সিমুলিয়ার বাজারের সম্মুখে পাদচারণা করতে লাগলেন, আর মাঝে মাঝে হেদোর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখতে লাগলেন। বাজারের একটু পশ্চিম-দক্ষিণে একটি গলি, গলির মোড়ের উপরেই একটি বৃহৎ গুলির আড্ডা। ইতিমধ্যে আড্ডায় গিয়ে নরেন আড্ডাধারীর সঙ্গে চুপি চুপি দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করলেন, আড্ডাধারী বিনা বাক্যব্যয়ে ঘাড় নেড়ে 'না' বলল। নরেন আবার হেদোর দিকে দু-চার পা অগ্রসর হয়েই পাশের আর একটি গলির ভিতর গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে, বেশ গা ঢাকা মতো হয়েছে এমন সময় গলির সম্মুখে রাজকুমার এসে উপস্থিত, অমনি নরেন্দ্রনাথ তাঁর পথরোধ করে সম্মুখে দাঁড়ালেন। নরেন্দ্রনাথের দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখেই রাজকুমারের মুখ শুকিয়ে গেল, নিজভাব চেপে বললেন, "কিরে দত্ত, এখানে কেন ?"

নরেন্দ্র গম্ভীর স্বরে বললেন, "কেন আর কি, আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। দেখুন মশাই, আমি বেশ জানি হরিদাসের অবস্থা বড়ই খারাপ, সে টাকা দিতে পারবে না, তাকে কিন্তু পাঠাতেই হবে, নইলে ছাড়ব না। যদি আমার কথা না রাখেন তো আমিও ইস্কুলে আপনার কথা রটাব ; ইস্কুলে টেঁকা দায় করে তুলব। এত ছেলের টাকা মাপ করলেন আর ও বেচারার কেন করবেন না ?" স্থির-প্রতিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথের মুখের ভঙ্গি দেখে রাজকুমারের মুখ শুকিয়ে গেল, তাড়াতাড়ি আদর করে নরেন্দ্রের গলদেশ হাত দিয়ে জড়িয়ে বললেন, "বাবা। রাগ করছিস কেন ? তুই যা বলছিস তাই হবে, তাই হবে। তুই যখন বলছিস আমি কি তা করব না ?"

নরেন্দ্র একটু বিরক্তির ভান করে বললেন, "তবে কেন সকালবেলা আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিলেন ?"

রাজকুমার। কি জানিস তোর দেখাদেখি সব ছোঁড়াগুলো ঐ বায়না ধরবে। তখন কাকে রেখে কাকে দেব বাবা ? আমি তখন এক বিষম বিপদে পড়ব। আমায় আড়ালে বলতে হয়। তুই ছেলেমানুষ, ওসব তো বুঝিসনি, কারুর সামনে কি ওকথা বলে ? তুই নিশ্চিন্ত হ। মাইনের টাকাটা মাপ হবে, তবে ফী-র টাকা তো আর মাপ হয় না, সেটা দেবে তো ?

নরেন্দ্র। সেটার উপায় হতে পারে, তবে মাইনেটা আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে, সে এক পয়সা দিতে পারবে না।

"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে" বলে রাজকুমার আড্ডার আশেপাশে বেড়িয়ে, নরেন চলে গেলে আড্ডায় ঢুকলেন।

নরেন্দ্র বুড়োর ভাবগতিক দেখে যেতে যেতে মুখে কাপড় চেপে খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। সহপাঠী বন্ধুটির বাসা নরেন্দ্রনাথের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়— চোরবাগানে ভুবনমোহন সরকারের গলিতে। পরদিন প্রত্যুষে বন্ধুর বাসায় সূর্যোদয়ের পূর্বেই উপস্থিত হয়ে বন্ধুর ঘরের দ্বারে করাঘাত করতে করতে গান ধরলেন ঃ

গান

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

অনুপম মহিম পূর্ণ ব্রহ্ম কর ধ্যান
নিরমল পবিত্র উষাকালে।
ভানু নব তাঁর প্রেমমুখছায়া
দেখ ঐ উদয় গিরি শুভ্রভালে॥
মধু সমীরণ বহিছে আজি শুভদিনে
তাঁর নাম গান করি অমৃত ঢালে,
চল সবে ভক্তিভাবে ভগবত নিকেতনে
প্রেম-উপহার লয়ে হৃদয়থালে॥

নরেনের মধুর কণ্ঠস্বর শুনে সহপাঠীরা শয্যাত্যাগ করে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। নরেন্দ্র বললেন, "ওরে খুব ফুর্তি কর, তোর কাজ ফতে হয়েছে, তোর মাইনের টাকাটা আর দিতে হবে না।" এই বলে পূর্বদিনের সমস্ত ঘটনা—রাজকুমারকে ভয় দেখানো, ভয়ে তাঁর কি রকম মুখের বিকৃতি হয়েছিল তার নকল, তারপর কেমন করে প্রতিদিন এদিক ওদিক উঁকি মেরে ফস্ করে গুলির আড্ডায় প্রবেশ করেন ইত্যাদি নকলের সঙ্গে গল্প করায় সকলের মধ্যে মহা হাসির রোল উঠল।

পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই, বোধ হয় মাসখানেকও নেই। বিপুল কলেবর ইংলণ্ডের ইতিহাস (Green's History of England) নরেন্দ্রনাথের একবারও পড়া হয়নি। পরীক্ষায় পাশ হতে হবে বলে নরেন্দ্রনাথের বিশেষ কোন চেষ্টাই তাঁর সহপাঠী বন্ধুরা দেখেন না। মাঝে মাঝে নরেন্দ্র পূর্বোক্ত বন্ধুদের বাসায় চোরবাগানে একটু-আধটু পড়াশোনা করতে যেতেন বটে, কিন্তু সেখানে গেলে বেশিরভাগ সময় কথাবার্তা বা গান গাওয়াই হতো। তাঁর মাতুলালয়ে যে ছোট ঘরটিতে থাকতেন তার উত্তরে দ্বিতলে তদপেক্ষা একটি বড় ঘর। এই ঘরের পশ্চিমে একটি চোরকুঠরি বা দোছত্রির ঘর ছিল। ঐ বড় ঘরের ভিতর দিয়েই তার মধ্যে প্রবেশের একটিমাত্র ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। হামাগুড়ি দিয়ে তার মধ্যে ঢুকতে হয়, এত ছোট। তার দক্ষিণ দিকে একটি ক্ষুদ্র জানালা। এই সময় একদিন প্রাতে তাঁর জনৈক বন্ধু তাঁর কাছে গিয়ে 'নরেন' বলে ডাকলে নরেন উত্তর দিলেন বটে, কিন্তু বন্ধুটি তাঁকে ঘরের মধ্যে চারিদিক খুঁজে না পেয়ে একটু আশ্চর্য হলেন। এমন সময় নরেন বললেন, "এই চোরকুঠরির ভেতর আছি।" সেইখান থেকেই বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলা হলো। পরে বন্ধু শুনলেন বিগত দু-দিন ঐ কুঠরির মধ্যে বসে নরেন ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করছেন, সংকল্প করে বসেছেন যে একাসনে বসে পাঠ শেষ করে তবে কুঠরি থেকে বার হবেন। নরেন্দ্র কার্যতও তাই করলেন। তিনদিনে ঐ বিপুলকায় পুস্তকখানি পূর্ণ আয়ত্ত করে বাইরে এলেন। পরীক্ষার দিন এল, নরেনের কোন উদ্বেগ বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য কোন উৎকণ্ঠা দেখা গেল না।

আজ পরীক্ষার প্রথম দিন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই নরেন শয্যাত্যাগ করে ইতস্ততঃ পাদচারণা করতে করতে চোরবাগানে হরিদাস ও দাশরথির বাসায় উপস্থিত। বন্ধুরা এখনও শয্যায় শায়িত। তাঁদের ঘরের দ্বারে এসে উচ্চৈঃস্বরে গান ধরলেন ঃ

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান বিশ্বের গীত।
মর্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যথা রবিশশী, সেই সভামাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে, এই ভকতের চিত।

নরেনের গলার আওয়াজ পেয়ে বন্ধুরা শশব্যস্তে উঠে দরজা খুললেন, দেখলেন নরেন আনন্দ-প্রদীপ্ত মুখে একখানি পুস্তক হাতে দাঁড়িয়ে গান গাইছেন। হয়তো একটু পাঠ করবেন ভেবে বন্ধুর বাসায় এসে উপস্থিত, কিন্তু ঘরের দ্বারে দাঁড়িয়ে গান ধরে যে ভাবোচ্ছ্বাসের বন্যা ছোটালেন, তার অবরোধ করে পড়াশোনা করা আর সেদিন হলো না। বেলা নটা পর্যন্ত, 'আমরা যে শিশু অতি', 'অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি' প্রভৃতি গান ও গল্প চলল। পাশের ঘরে নরেনের অপর একটি সহপাঠী বাস করতেন। নরেনের গান প্রথম আরম্ভ হতেই তিনি সেখানে এসে জুটলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ শুনবার পর পরীক্ষার কথা তাঁর মনে হলো। তিনি গানের সভা পরিত্যাগ-কালে বন্ধুভাবে নরেনকে পরীক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, নরেন্দ্র একটু হাসলেন মাত্র, কিন্তু গানের স্রোত থামল না দেখে বন্ধু সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। একজন বন্ধু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "নরেন, এগজামিনের দিন কোথায় একটু-আধটু খুঁতখাত যা আছে সেটুকু সেরে নেবে, না তোমার দেখছি সবই বিপরীত, বেড়ে ফূর্তি করছ।"

নরেন উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তাইতো করছি, মাথাটা সাফ রাখছি, মগজটাকে একটু জিরেন দেওয়া চাই, নইলে এই দু-ঘণ্টা যা মাথায় ঢোকাবে সেটা ঢুকে আগেকারগুলোকে গুলিয়ে দেবে বইতো নয়। এত দিন পড়ে পড়ে যা হলো না তা কি আর দু-এক ঘণ্টায় হয় ? হয় না। এগজামিনের দিন সকাল বেলাটা কেবল ফূর্তি, কেবল ফূর্তি করে শরীর-মনকে একটু শান্তি দিতে হয়, ঘোড়াটা খেটে এলে তাকে ডলাইমলাই করে তাজা করে নিতে হয়। মগজটাকেও তাই করতে হয়।"

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

ডন সোসাইটি-র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ। স্বামীজীর সহপাঠী।

ইংরেজী ১৮৭৯, ষোল বছরের ছেলে নরেন্দ্রনাথকে প্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজে বুথ সাহেবের অঙ্কের ক্লাসে দেখলাম। পরিচয়ের ঘটক শশীভূষণ বসু—আমার বন্ধু—ঐ কলেজেরই ছাত্র, অঙ্কে খুব ভাল, অধ্যাপকের পরম প্রিয়। তাছাড়া শশীর গানের চর্চা ছিল বলেই নরেনের সঙ্গে তার বিশেষ হৃদ্যতা। বুথ তখনকার দিনের খ্যাতনামা গণিত-বিশারদ, কেমব্রিজের র‍্যাংলার। অন্য কলেজের ছাত্রদেরও নিজের ক্লাসে অঙ্ক শেখাতেন। সেজন্যই আমি মেট্রোপলিটান কলেজের এফ. এ.-র ছাত্র হলেও ওখানে আমার রোজ বেলা দুটোর পর গতিবিধি। নরেন প্রথম বার্ষিক-এ প্রেসিডেন্সীতে পড়তেন, দ্বিতীয় বার্ষিক-এ জেনারেল এসেমব্লিজে (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) গেলেও বুথের ক্লাসে যোগ দিতেন। তাছাড়া নরেন ও শশী (শশীভূষণ বসু) হেয়ার স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছিলেন।[১]

শশীর ভবানীপুরের বাড়িতে নরেন ও আমি যেতাম। শশীর পিতা আমাদের ভালবাসতেন। কলেজ পাড়ায় তিনজনে মিলে গোলদীঘিতে রাত্রি নটা-দশটা পর্যন্ত গল্প-গান চলত। গাইতে না জানলেও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলাম। ক্রমে নরেন্দ্র ব্রাহ্মভাবাপন্ন হলেন। আর আমার তখন স্বদেশসেবার দিকে ঝোঁকের জন্য তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি ঘটল।[২]

পরমহংসদেবের তিরোধানের দু-তিন বৎসর পরে আমি বরাহনগর রামকৃষ্ণ মঠে যাতায়াত আরম্ভ করি। তখন স্বামীজী পরিব্রাজক, ওখানে নেই। ওখানে সাধুদের সঙ্গে যথাসাধ্য জল তোলা, ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া ও অন্যান্য কাজ করে তৃপ্তি পেতাম। পরে মহেন্দ্র মাস্টারমশায় ও দক্ষ মহারাজ আমাকে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর

---

১ নরেন্দ্রনাথের হেয়ার স্কুলে পড়ার কথা জীবনীতে নেই। তথাপি তার সম্ভাবনা রয়েছে। একবার মেট্রোপলিটান স্কুলে বদরাগী মাস্টারের চপেটাঘাত ও কানমলা খেয়ে, যাতে প্রচুর রক্তপাত হয়, তিনি অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাফ বলেছিলেন, "মশাই, আপনার এ স্কুলে আর পড়ব না।" হয়তো রাগ করে কিছুদিনের জন্য পাড়ার স্কুল ছেড়ে বেপাড়ায় হেয়ারে গিয়ে থাকবেন।—স্বামী নির্লেপানন্দের সংযোজন।

২ সতীশচন্দ্রের 'লাইট অব দি ইস্ট' ইংরেজী পত্রিকায় ১৮৯৪ জানুয়ারি সংখ্যায় শিকাগো ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ লেখা বের হয়। লেখাটি 'জীরো' ছদ্মনামে রচিত। বিখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক শংকরীপ্রসাদ বসু অনুমান করেন ছদ্মনামটি পত্রিকা-সম্পাদক সতীশচন্দ্রেরই। পূর্ব-পরিচয় সূত্রে সতীশচন্দ্র সেখানে (মূল লেখাটি আমরা দেখিনি) যা লিখেছেন তার অংশ-বিশেষের অনুবাদ শংকরীপ্রসাদ করেছেন এইভাবে (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম খণ্ড, ১৯৭৫, পৃঃ ৭১):

কাছে নিয়ে যান। গোঁসাইজী আমার ভিন্ন মার্গগামী মনকে ধর্মমার্গে আনয়ন করেন। তারপর একেবারে কাশীপুরে এক বাগানবাড়িতে (গোপাললাল শীলের বাগান-বাড়িতে) স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁর তখন অন্যমূর্তি। বাইরের দুনিয়া-ফেরত জগদ্বরেণ্য আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। একটা বৃহৎ হলঘর। একশো আন্দাজ লোক সেখানে উপস্থিত। প্রতীচ্যের ভক্তেরাও ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে সকলের ধর্মালোচনা চলছিল। আমি ঢুকছি দেখেই স্বামীজী তাঁর চেয়ার ছেড়ে একেবারে দরজার গোড়ায় এসে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। হাত ধরে টেনে নিয়ে একটা কৌচে নিজের অতি কাছে বসালেন এবং সেই পূর্বকালের নরেন্দ্রনাথের মতো (মাঝে যেন কোন কিছুই ঘটেনি) ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাবে বালকের মতো আলাপ করতে লাগলেন।

অত লোকের মধ্যে তাঁর প্রতি আমিও সম্ভ্রম প্রকাশ করলাম দেখে স্বামীজী অতি সহজভাবে বললেন, "কে কি মনে করবে? ও কিছু নয়!" পরে আমার পরিচিত একটি মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় (সে ছাত্র এখন একজন প্রসিদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত জজ) স্বামীজী অম্লানবদনে হেসে বললেন, "Is he a fanatic?" আমি বললাম, "No". তখন উত্তর করলেন, "Then I have no need of him—তাকে আমার দরকার নেই।" 'ফ্যানাটিক' অর্থে তেজীয়ান যুবক—ধর্মের বা দেশের জন্য সর্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত কিনা—এইভাবে রহস্যপূর্বক শব্দটি ব্যবহার করলেন। স্বামীজী আমাকে দেশের কাজে অধিক যোগ্য হবার জন্য আমেরিকা জাপান পাঠাবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু আমার অনিচ্ছায় তা সম্ভবপর হয়নি।

"বিবেকানন্দ-স্বামীকে আমি নিজস্বভাবে জানি। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র, পবিত্রতা এবং প্রতিভা সম্বন্ধে আমার সমুচ্চ শ্রদ্ধা। বহুদিক দিয়ে তিনি সুমহান রামকৃষ্ণ পরমহংসের যোগ্য শিষ্য।...

"আমি তাঁকে ভালবাসি, কারণ তিনি সকল মানুষের ভালবাসা পাবার যোগ্য। চমৎকার দীর্ঘ প্রশস্ত পুরুষ; অপূর্ব সুন্দর মুখ যা মনস্বিতায় পূর্ণ; বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু—প্রসন্ন-স্থির প্রেমে ও স্নেহে তোমার প্রতি আনত; বুদ্ধির প্রভায় ঝলমলে অবয়ব—সত্যই ভালবাসার যোগ্য মানুষ—এই বিবেকানন্দ! আধুনিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার তিনি নির্ধারিত পুরুষ। তাঁর বৃহৎ উদার কোমল হৃদয়, তাঁর দৃঢ়তা, তাঁর আত্মত্যাগ, সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা, সর্বোপরি, তাঁর পবিত্রতা এবং অতি উচ্চমার্গের বুদ্ধিশক্তি—এই সকলের দ্বারা যে-কোন বহু সহস্রের সমাবেশেও তিনি অনন্য পুরুষ। তোমার প্রতি নিবদ্ধ তাঁর প্রদীপ্ত নয়নের দিকে যদি তুমি তাকাও, দেখবে, তাঁর মধ্যে আছে সংকল্পশক্তির আগ্নেয়গিরি, যা ঠিক পথ গ্রহণ করলে মাতৃভূমিতে অলৌকিক কান্ড ঘটাবে।...এবং যে-আমি আজ তাঁর বিচার করতে বসেছি, সেই আমি হয়তো একদিন তাঁর সঙ্গে একটা কথা বলতে পেলেও ধন্য বোধ করব।"

চুনীলাল বসু

স্বামীজীর বাল্যবন্ধু। ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে তিনি 'রায়বাহাদুর' খেতাব পেয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞান ও কর্মের জীবন্ত প্রতিমূর্তিস্বরূপ ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আজ ভারতবাসী একাধারে তাঁহার এই মঙ্গলমূর্তি আদর্শরূপে বরণ করিতে সমর্থ হইয়া ধন্য হইয়াছে। আজ ভারতের সর্বত্রই তাঁহার পবিত্র স্মৃতিপূজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা অতি শুভ লক্ষণ। ইহার অর্থ এই যে, ভারতবাসী তাহার ধর্ম ও কর্মজীবনে পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে। ভগবান আমাদিগের এই মঙ্গলচেষ্টার উপর তাঁহার শুভাশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি আমা অপেক্ষা এক বৎসরের ছোট ছিলেন। আমি যখন মেডিক্যাল কলেজে থার্ড ইয়ার ক্লাসে পড়ি তখন তিনি বি. এ. পড়িতেন। আমার একজন নিকট আত্মীয় তাঁহার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুর বাটীতে তিনি সর্বদা আসিতেন এবং তথায় তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। সেই পরিচয় উত্তরকালে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়া তাঁহার তিরোভাবের দিন পর্যন্ত আমাকে তাঁহার পবিত্র সঙ্গসুখলাভের আনন্দ প্রদান করিয়াছিল।

ছাত্রজীবনেই আমরা তাঁহার চরিত্রগত বিবিধ সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়াছিলাম। এইজন্য তাঁহার সহপাঠিগণের হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত এবং তাঁহারা অনেক বিষয়ে তাঁহার মত ও নেতৃত্ব বিনা বিচারে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইতেন। মানুষকে পরিচালন করিবার উপযুক্ত শক্তি দিয়াই যেন প্রকৃতি তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি আজন্ম ব্রহ্মচর্যব্রতধারী পূত-চরিত্র ছিলেন। ছাত্রজীবনে তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে কাহারো কাহারো স্বভাব নিষ্কলঙ্ক ছিল না, কিন্তু তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সর্বদা একত্রে থাকিলেও তাঁহার চরিত্র কখনো কোনরূপ মলিনতাস্পৃষ্ট হয় নাই। তিনি আজীবন অধ্যয়নশীল ও জ্ঞানানুশীলনে রত ছিলেন। ছাত্রজীবনেও আমরা তাঁহার এই বৃত্তি অনুশীলনের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ইতিহাস ও দর্শন চর্চায় তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ লক্ষিত হইত। বি. এ. ক্লাসের পাঠ্য ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানের গ্রন্থ ব্যতীত তিনি এই দুই বিষয়ে অনেকানেক পাশ্চাত্য খ্যাতনামা গ্রন্থকারের গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁদের বিভিন্ন মতামত সম্বন্ধে তিনি সর্বদা চিন্তা ও বিচার করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার তর্কশক্তি ও বিচারবুদ্ধি সাধারণ ছাত্র অপেক্ষা অত্যধিক পরিমাণে

উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। তাঁহার প্রখর স্মৃতিশক্তি, তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের প্রাচুর্য বিচারে অনেক স্থলেই তাঁহাকে অজেয় করিয়া তুলিত। বয়সে তিনি নবীন হইলেও অনেক প্রবীণ খ্রীস্টধর্ম-প্রচারক পণ্ডিতগণ খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন-বিষয়ক বিচারে তাঁহার নিকট অনেক সময়ে অপদস্থ হইয়া যাইতেন। কিন্তু এই তীক্ষ্ণ তর্কশক্তি ও বিচারপ্রিয়তা ছাত্রজীবনে তাঁহার বিপদের কারণও হইয়াছিল। ইহার ফলে এক সময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর ঘোর সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি বিবিধ ধর্মাবলম্বীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইলেও এবং তাঁহাদের ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান করিলেও তাঁহার এই বিষম সংশয় নিরাকৃত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুদিনের জন্য এক প্রকার নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও, ঈশ্বর আছেন কিনা, এই কঠিন সমস্যার সন্তোষকর সমাধানের জন্য একটা প্রবল আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা সর্বদা তাঁহার অন্তরে জাগরূক থাকিত।

এমন সময়ে দক্ষিণেশ্বরের সাধু পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জীবনের আশ্চর্য ত্যাগ ও ভক্তির কাহিনী এবং তাঁহার ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অপূর্ব ধারণা লোকমুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন ও পরীক্ষা করিবার অভিলাষ তাঁহার মনে উদয় হইল এবং কালবিলম্ব না করিয়া সংশয়-বিক্ষিপ্ত অথচ সত্যান্বেষী এই যুবক জিজ্ঞাসু হইয়া পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। মাহেন্দ্রক্ষণে গুরুশিষ্যের এই প্রথম মিলন সংঘটিত হইল; ধর্মজগতে ঐক্য-প্রতিপাদক অসাম্প্রদায়িক উদার মত প্রচারের ভিত্তি এই শুভক্ষণে স্থাপিত হইল।...

গুরুশিষ্যের এই শুভমিলনে আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তের প্রভাব স্পষ্টভাবে দর্শন করিতেছি। বিবেকানন্দের মতো প্রতিভামণ্ডিত শক্তিশালী পুরুষ জগতে নাস্তিকতাবাদ প্রচার করিলে সমাজের ঘোর অমঙ্গল ও অকল্যাণ সংসাধিত হইত। তাই ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে এরূপ অপূর্ব সংযোগ উপস্থিত হইল যে, পূর্ণ জ্ঞানের সামীপ্যে অবিলম্বে অজ্ঞান তিরোহিত হইল। আলোকের সংস্পর্শে অন্ধকার চিরদিনের মতো অন্তর্হিত হইল। বিশ্বাসের নিকট অবিশ্বাস পরাজিত হইল। সত্যের নিকট অসত্য মস্তক অবনত করিল। গুরু, স্বীয় জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া 'সর্বধর্মসমন্বয়'রূপ যে অমৃত উত্তোলন করিয়াছিলেন, এই মিলনের ফলে শিষ্য-কর্তৃক তাহা জগতের মানুষকে বিতরণ করিবার শুভসংযোগ উপস্থিত হইল।...

[ভারতবর্ষ, ১৬শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৬]

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (পূর্বনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে স্বামীজীর সহপাঠী ছিলেন। তাঁর এক সময়ের প্রচণ্ড বিবেকানন্দ-বিরোধিতা শেষে চরম বিবেকানন্দ-অনুরাগে রূপান্তরিত হয়েছিল। সে-সম্পর্কে শংকরী-প্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদ আলোচনা করেছেন।

...স্বামীজী কামিনীকাঞ্চন-বিরক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ব্যথার ব্যথী ছিলেন। অহংকার-বিমূঢ় ফিরিঙ্গিজাতি ভারতের জ্ঞান-বিদ্যা ধর্ম-কর্ম সভ্যতা-সমাজকে পদদলিত করিতেছে—জগতের নিকটে উহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া প্রদর্শন করিতেছে—উহার মূল উৎপাটন করিয়া পাশ্চাত্য স্থূলে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে। আর ভারত-সন্তানেরা কোথায় ইহার প্রতিকার করিবে—না আত্মবিস্মৃত হইয়া কাচমূল্যে কাঞ্চন বিক্রয় করিতেছে। এইসব দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যথাই তাঁহাকে সাগরপারে সুদূর ফিরিঙ্গিস্থানে লইয়া গিয়াছিল। ঐ মায়াবীদের দেশে গিয়া তিনি একাকী আর্য-জ্ঞানের বিজয়ভেরী বাজাইয়াছিলেন। কে এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী—ইঁহার স্পর্ধা তো কম নয়—স্থূলে বিজ্ঞানদৃপ্ত ফিরিঙ্গির কোটের ভিতর গিয়া সিংহনিনাদে ঘোষণা করিলেন—হিন্দুজাতি জগতের গুরু—একমাত্র হিন্দুর নিবৃত্তিময়ী সভ্যতাই জগৎকে শান্তি ও একতার পথে লইয়া যাইতে পারে।—ঐ বিজয়ভেরীর রব—ঐ সিংহনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ফিরিঙ্গিস্থানের নরনারীরা চকিত স্তম্ভিত হইয়াছিল। তাহারা স্বীকার করিয়াছিল যে, আর্যজ্ঞানের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান নাই—সকল বিজ্ঞান—সকল কর্মকৌশল—বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব দ্বারায় উৎকর্ষ ও চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বামীজী—আমি তোমার যৌবনের বন্ধু—তোমার সহিত কত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি—বনভোজন করিয়াছি—গল্পগাছা করিয়াছি। তখন জানিতাম না যে, তোমার প্রাণে সিংহবল আছে—তোমার হৃদয়ে ভারতের জন্য আগ্নেয় পর্বতভরা ব্যথা আছে। আজ আমিও আমার ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া তোমারই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে উদ্যত হইয়াছি।... এই ঘোর সংগ্রামে যখন ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত হইয়া পড়ি—অবসাদ আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে—তখন তোমার প্রদর্শিত আদর্শের দিকে দেখি—তোমার সিংহবলের কথা ভাবি—তোমার গভীর বেদনার অনুধ্যান করি—অমনি অবসাদ চলিয়া যায়—কোথা হইতে দিব্যালোক দিব্যশক্তি আসিয়া প্রাণমনকে ভরপুর করিয়া ফেলে। স্বামী বিবেকানন্দ স্বরাজপ্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ঐ ভিত্তির উপরে যে স্বরাজ-মন্দির নির্মিত হইবে তাহার চূড়ায় আর্যজ্ঞানের স্বর্ণকলস দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিবে—উহাতে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার বসিবে—উহার প্রাঙ্গণে ফিরিঙ্গিপ্রমুখ জাতিরা সেবাদাস হইয়া মায়ের প্রসাদ লাভ করিবে,...

দিন কয়েকের জন্য আমি [রবীন্দ্রনাথের] বোলপুরের আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইস্টিশনে পা দিলাম কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন—শুনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন একখানা ছুরি বিঁধিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে। কেন—তাঁহার তো অনেক উপযুক্ত বিদ্বান গুরুভাই আছেন—তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে, তুমি ততটুকু কাজে লাগাও—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গিজয়-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে, বিলাত যাইব। আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবি নাই যে, বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবড়ার ইস্টিশনে স্থির করিলাম—বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম—বিবেকানন্দ কে। যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সুদূর সাগরপারে লইয়া যায়—সে বড় সোজা মানুষ নয়। তাহার কিছুদিন পরেই সাতাইশটি টাকা লইয়া বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিলাম। অবশেষে বিলাত গিয়া উক্ষপার (Oxford) ও কামব্রজে (Cambridge) বেদান্তের ব্যাখ্যা করিলাম। বড় বড় অধ্যাপকেরা আমার ব্যাখ্যান শুনিলেন ও হিন্দু অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া বেদান্ত-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। ঐ অধ্যাপকেরা যে-সকল চিঠি আমাকে লিখিয়াছেন, তাহা আমি ছাপাই নাই। ছাপাইলে বুঝিতে পারা যাইবে বিলাতে বেদান্তের প্রভাব কিরূপ গভীর হইয়াছিল। আমি সামান্য লোক। আমার দ্বারা যে এত বড় একটা কাজ হইয়া গেল, তাহা আমার কাছে ঠিক একটি স্বপ্নের মতো। এই সমস্তই বিবেকানন্দের প্রেরণাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—অঘটন ঘটিয়াছে—আমি মনে করি। তাই অনেক সময় ভাবি—বিবেকানন্দ কে। বিবেকানন্দ যে প্রকাণ্ড কাজ ফাঁদিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিবেকানন্দের মহত্ত্বের ইয়ত্তা করা যায় না।

আর একবার বিবেকানন্দের সঙ্গে কলকাতায় হেদোর ধারে আমার দেখা হয়। আমি বলিলাম—ভাই চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন? এস—একবার কলকাতা শহরে একটা বেদান্ত-বিজ্ঞানের রোল তোলা যাউক। আমি সব আয়োজন করিয়া দিব, তুমি একবার আসরে আসিয়া নামো।—বিবেকানন্দ কাতর স্বরে বলিল—ভবানী ভাই, আমি আর বাঁচিব না (তাহার তিরোভাবের ঠিক ছয় মাস পূর্বের কথা)—যাহাতে আমার মঠটি শেষ করিয়া কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারি—তাহার জন্য ব্যস্ত আছি—আমার অবসর নাই। সেই দিন তাহার সকরুণ একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লোকটার হৃদয় বেদনাময় ব্যথায় প্রপীড়িত। কাহার জন্য বেদনা, কাহার জন্য ব্যথা? দেশের জন্য বেদনা—দেশের জন্য ব্যথা। আর্যজ্ঞান আর্যসভ্যতা বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হইয়া যাইতেছে—তাহার স্থলে যাহা ইতর, যাহা অনার্য, তাহাই সূক্ষ্মকে, উদার বস্তুকে, আর্যতত্ত্বকে পরাভূত করিতেছে—আর

তোমার সাড়া নাই, ব্যথা নাই। বিবেকানন্দের হৃদয়ে ইহার যন্ত্রণাময় সাড়া পড়িয়াছিল। সেই সাড়া এত গভীর যে, উহাতে মার্কিন ও য়ুরোপের চৈতন্য হইয়াছিল। ঐ ব্যথার কথা ভাবি—বেদনার কথা চিন্তা করি—আর জিজ্ঞাসা করি—বিবেকানন্দ কে। দেশের জন্য ব্যথা কি কখনো শরীরিণী হয়? যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।

[স্বরাজ, ২২ বৈশাখ, ১৩১৪]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক স্বামীজীর বাল্যবন্ধু। সমকালীন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা-সম্পাদক। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি রক্ষণশীল সংবাদপত্র 'বঙ্গবাসী'-তে সাংবাদিক হিসাবে যোগদান করেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। রক্ষণশীল 'বঙ্গবাসী' আমেরিকা-প্রত্যাবৃত্ত স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে নিয়মিত আক্রমণ করত। পত্রিকার বেতনভুক সম্পাদকও ঐকালে বিবেকানন্দ-বিরোধী ভূমিকা পালন করেছেন। স্বামীজীর দেহাবসানের পূর্বেই (১৮৯৯) তিনি বঙ্গবাসীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে প্রথমে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' এবং পরে (১৯০১) 'রঙ্গালয়' পত্রিকার সম্পাদক পদে বৃত হয়েছিলেন। 'বঙ্গবাসী' অধ্যায়ের পর এইকালে এবং তারপরে তিনি তাঁর মহান বাল্যবন্ধু সম্পর্কে যা লিখেছেন তা যেমন হৃদয়ের উষ্ণতায় পূর্ণ, তেমনি বিশ্লেষণের গভীরতায় মণ্ডিত। অবশ্য 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদনাকালেও ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে স্বামীজীর কলকাতা-প্রত্যাবর্তনের পর বিদ্রূপের সঙ্গেও পাঁচকড়ি বাল্যবন্ধু বিবেকানন্দের মহত্ত্ব ও অনন্যতাকেও স্বীকার করেছিলেন। 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত পাঁচকড়ির বাঙলায় মূল মন্তব্য এখন দুষ্প্রাপ্য। তবে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'Light of the East' পত্রিকার ১৮৯৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'বঙ্গবাসী' থেকে ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে তা বেরিয়েছিল। শংকরীপ্রসাদ বসু তার পুনশ্চ অনুবাদ করে দিয়েছেন তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ১৯৭৫, পৃঃ ৭১ এবং ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৭৮, ১৩৭-৩৮)। আগ্রহী পাঠক সেখানে তার চেহারা দেখে নিতে পারেন।

স্বামীজীর দেহরক্ষার (৪ জুলাই, ১৯০২ : ২০ আষাঢ়, ১৩০৯) 'রঙ্গালয়'-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন (রঙ্গালয়, ২৮ আষাঢ়, ১৩০৯) :

"বিবেকানন্দের তিরোভাবে বাঙালী যে-নিধি হারাইল তেমন 'সাত রাজার ধন একটি মানিক' আর বাঙালী সহসা পাইবে না। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, রূপে-গুণে, বাক্‌শক্তিতে, তেজস্বিতায়, স্বাবলম্বনে, সাহসিকতায় বিবেকানন্দের মতো আর কে ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালী আছে? আর তেমন হইতে কি পারিবে? মনে পড়ে সে সুঠাম, সুপুষ্ট,

সুকান্ত দেহযষ্টি। মনে পড়ে সে কোকিল ঝঙ্কারতুল্য কোমল মধুর সুকণ্ঠের সুসংগীত। মনে পড়ে সে স্পর্ধা, সে মর্যাদাবুদ্ধি, সে জ্ঞানগৌরবের তেজ—আর মনে পড়ে সেই লোকমোহন সামর্থ্য, অপূর্ব সরলতা ও সাধনাপ্রিয়তা। একে-একে ধীরে-ধীরে দিনে-দিনে কত কথা মনে পড়িতেছে, কত কথা আরও মনে পড়িবে। বসন্ত রোগের বিস্ফোটকের ন্যায়, একে-একে সকল ঘটনা স্মৃতিপথে ফুটিয়া মনকে জর্জরী-ভূত করিবে। সাধারণ জীবের ভাগ্যে যাহা আছে, আমাদের তাহাই সহিতে হইবে। যে মহাপুরুষ—সে তো নিমেষের মধ্যে চলিয়া গেল!"

'রঙ্গালয়' পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেই 'বঙ্গবাসীর প্রলাপ' শিরোনামায় স্বামীজীর মৃত্যুতে প্রকাশিত 'বঙ্গবাসী'র শোক-প্রতিবেদনের সমালোচনা করলেন পাঁচকড়ি ঃ

"অতিবড় শত্রু হইলেও মৃত্যুতে মানুষের মনে একটু দুঃখের ভাব ফুটিয়া ওঠা স্বাভাবিক। অন্ততঃ লৌকিকতার খাতিরেও পিশাচবুদ্ধি জীবেও দুঃখপ্রকাশ করিয়া থাকে। সহযোগী বঙ্গবাসী কি লিখিতেছে দেখুন ঃ

'মঠে-মৃত্যু।—২৪ পরগনা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির ৺রামকৃষ্ণ অনেকের পরিচিত। তাঁহার সেই বুদ্ধিমান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত—হাবড়া বেলুড়ের মঠে—ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই নরেন্দ্রনাথ অধুনা বিবেকানন্দ-স্বামী বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে বটে। কিন্তু ইঁহাকে বাহাদুর পুরুষ বলিতে কুণ্ঠিত নহি। ইনি অল্পবয়সে রামকৃষ্ণের শিষ্য হইয়া আপন মেধা ও বুদ্ধির প্রভাবে এবং বক্তৃতার মোহজালে অনেককেই আপনপথে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মার্কিন মুলুকে ইঁহার বাক্-কৃতিত্বের একটা বিজয় ঘোষণা হইয়াছিল। কোন কোন রমণী তাঁহারই ভাবে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহারই পথানুসরণ করিয়া, তাঁহাকে পথপ্রদর্শক গুরুরূপে ভাবিয়া, নূতন পথে আসিয়া, এক নূতন ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই বাহাদুরীর কথা। শুনিতে পাই, নরেন্দ্রনাথের বহুমূত্রের পীড়া ছিল। গত সপ্তাহের শুক্রবার সন্ধ্যার সময় তিনি বেড়াইয়া মঠে ফিরিয়া আসেন, কিয়ৎক্ষণ পর তিনি যেন কেমন একটু অসুস্থ হন। অতঃপর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।'

"মৃতশত্রুর বিষয়েও কি কোন ভদ্রলোক এমন ভাষায় কোন কথা লিখিতে পারে? জানি না আজকাল ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এমনইভাবে সকল মনুষ্যত্বের ওলট-পালট হইয়া থাকিবে। বঙ্গবাসী যখন বিবেকানন্দের প্রতিকূলাচরণ করেন, তখন আমরাই বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় চাকুরি করিতাম। সে-সকল মতামতের জন্য আমরা দায়ী। আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখিবার পক্ষে আমাদের সাধ তীব্রতর হইবার কথা। কিন্তু এখন যে বঙ্গবাসী সৎ-শূদ্র [তখন বঙ্গবাসীর অব্রাহ্মণ সম্পাদক ছিলেন], এখনো সেই পূর্বেকার অমর্ষ কেন ফুটিয়া বাহির হয়? মরার বাড়া গালি নাই; যে মরিয়াছে সে তো আপদ চুকাইয়া গিয়াছে—মরার উপর খাঁড়ার ঘা মানুষ দেয় কি? ইংরেজ

'ইংলিশম্যান' যে-বাঙালীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে পারে, বাঙালী বঙ্গবাসী তাহা শ্লেষের ভাষায় উড়াইয়া দেয়। ধিক্ বঙ্গবাসী!

"বঙ্গবাসীকে এখনো আমরা বড়ই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। বঙ্গবাসীর সুখ্যাতি শুনিলে এখনো আমাদের লোমহর্ষণ হয়। সেই বঙ্গবাসীর রুচিবিকার দেখিয়া আমরা এতই ব্যথিত হইয়াছি যে, এই দুঃখের সময়ও বাজে কথার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। পাঠকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।"

অতঃপর 'প্রবাহিণী'। শংকরীপ্রসাদ বসু লিখেছেন (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৩য় খণ্ড পৃঃ ১১০): "১৯০২ সালের (১৩০৮-০৯ বঙ্গাব্দের) পরে এক দশক পাঁচকড়ি প্রচণ্ড ঘটনাবর্তের মধ্যে ছিলেন। বহু সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন এইকালে। যখন প্রভুর মতের সঙ্গে নিজের মত মিলেছে তখন সানন্দে নিজেকে তুলে ধরেছেন, যখন মেলেনি, তখন নিজের প্লানিময় প্রতিভাকে প্রভুর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে অম্লরসাক্ত করে তুলেছেন। কিন্তু সব সময়েই ভেবেছেন—এমন একটি পত্রিকা চালাবেন, যার মধ্যে তার গভীর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। মনে করলেন, 'প্রবাহিণী' তাঁকে সেই সুযোগ দেবে। 'প্রবাহিণীকে বিশ্বজন সমাজের চিত্তবিনোদিনী করাই আমাদের অভিলাষ। ধর্মকথা, সমাজকথা, কাব্যশাস্ত্রের কথা ···কহিবার জন্যই আমরা কৃতসংকল্প হইয়াছি। রাজনীতির পাঁক ঘাটিয়া তো এতদিন কাটাইলাম। ···আশা আছে প্রবাহিণী এ পংকাশয় হইতে অধমকে উদ্ধার করিতে পারিবে।' [প্রবাহিণী, ১৭ মাঘ, ১৩২০] এই আদর্শ তিনি সম্পূর্ণ রক্ষা করতে না পারলেও অনেকটাই পেরেছিলেন এবং পাঁচকড়ি-রচনাবলীতে সংকলিত গভীর ভাবাত্মক রচনার বেশি অংশ 'প্রবাহিণী' থেকেই গৃহীত। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতে পাঁচকড়ি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিষয়ে যা লিখেছিলেন —তাকেই বলতে পারি, তাঁর পরিণত মনের সার সিদ্ধান্ত।"

'প্রবাহিণী'-তে প্রকাশিত (২২ ফাল্গুন, ১৩২০) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ভগবান রামকৃষ্ণ'-এর দুটি অংশ। প্রথম অংশটি শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কিত (উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৯৬ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত)। 'স্বামী বিবেকানন্দ' শিরোনামায় চিহ্নিত দ্বিতীয় অংশটি (উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৯৬ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত) এখানে সম্পূর্ণতঃ উপস্থাপিত হলো:

গুরুর পরীক্ষা শিষ্যে, শিষ্যের পরীক্ষা গুরুতে। শুষ্ক তরু মঞ্জরিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বাংলায় ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; আর ইংরেজী-শিক্ষিত নবযুবকদের মধ্য হইতে ব্রহ্মানন্দ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসি-গণের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। আমরা নরেন্দ্রনাথকে জানি, চিনি, সেই নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে পরিণতিও জানি ও বুঝি, তাই ভগবান রামকৃষ্ণের মহিমায় মুগ্ধ। একবার বিবেকানন্দের সম্মুখেই তাহার একট বক্তৃতার সুখ্যাতি করিতেছিলাম, সে আমাদের মুখে হাত চাপিয়া বন্ধ করিয়াছিল

এবং সেইসঙ্গে বলিয়াছিল, "তোরা যদি অমন কথা বলবি তো আমি দাঁড়াব কোথা ? কার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সখ্যের সাধ মিটাইব ।"—উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, "দেখ দাদা, খলুই চিনতে পারলে জাতসাপের পরিচয় অনেকটা জানতে পারা যায় । আমি তোমায় দেখে ঠাকুরের মহত্ব চেনবার চেষ্টা করছি । তাঁহাকে তো দুইবারের অধিক দেখি নাই । তোমার মতো সামগ্রী যাঁহার কৃপায় তৈয়ার হইতে পারে, তিনি যে কৃপার সাগর—সর্বনিধির আধার ।" বিবেকানন্দ আমার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন । শেষে গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে

"আমি সেই ভয়ে মুদি না আঁখি,
পাছে তারা-হারা হয়ে থাকি ।"

এই গানটি বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে অপূর্ব ভাব মিশাইয়া গাহিলেন । বিবেকানন্দ কৃপা-সিন্ধু । তাহার ইংরেজী বিদ্যার বহর জানিতাম । পরে আমেরিকা ও ইওরোপে যাইয়া সে যে-বিদ্যার ও যে-তেজের পরিচয় দিয়াছিল, তাহারও অপূর্ব লীলা দেখিয়াছিলাম । ভগবান রামকৃষ্ণ মাতৃভাবের পলিমাটি ছড়াইয়া বাংলার যে উর্বরতা সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মানবতার বীজ না দিলে ফসল ভাল হইবে কেন । তাই বিবেকানন্দের উপর এই রোয়া-রোয়ার ভার পড়িয়াছিল । এ কাজের জন্য যেটুকু তেজ, যেটুকু সাহস, পাকা কৃষির ভূয়োদর্শনজাত যেটুকু স্পর্ধার প্রয়োজন, সে সকলই বিবেকানন্দের পূর্ণমাত্রায় ছিল । বিবেকানন্দে ইওরোপের তেজস্বিতা, মানবতা, এবং ভারতের ভক্তি, বিশ্বাস, একনিষ্ঠা, সংযম ও সাধনা পুরামাত্রায় ছিল । সে জল-বৃষ্টিতে ভিজিয়া, শুখা-রুখায় পুড়িয়া যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছে, যখন দেবতার কৃপায় পুরা ফসল হইবে, ক্ষেতভরা ধান হইবে, তখন বাঙালী বুঝিবে—কত বড় পুরুষ-সিংহ তাহাদের জন্য কি কাজ করিয়া গিয়াছে । ধর্ম ও সাধনার উপর জাতীয়তার পালিশ চড়াইয়া, সেবাব্রতকে জাতীয় ধর্মে পরিণত করিয়া বিবেকানন্দ—সব্যসাচী অর্জুনের ন্যায়—ভোগবতীর জল টানিয়া শুষ্ক তৃষ্ণার্ত সমাজের উপরের স্তরগুলিকে স্নিগ্ধ করিয়া গিয়াছেন । গরিব-দুঃখী, মূর্খ-পণ্ডিত সবাই এখন একসূত্রে বাঁধা হইয়াছে ; সবাই একই আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন । যে মন্ত্রের প্রভাবে বিলাসীবাবু সন্ন্যাসী হইতে পারে, রোগীর রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া অহর্নিশ সেবা করিতে পারে, প্লেগে ভয় পায় না, বসন্ত রোগী দেখিলে সঙ্কুচিত হয় না, উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগর-সঙ্গমে ঝম্প প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করে না, সে মন্ত্রই বা কেমন, সে মন্ত্রীই বা কেমন—একবার ভাবিয়া দেখ দেখি । সংসারের সুখ অপেক্ষা, ঘর-বাড়ি স্ত্রী-পরিবারের আয়েস অপেক্ষা বৃহত্তর, প্রগাঢ়তর, প্রবলতর একটা সুখ, আনন্দ, উন্মাদনা না পাইলে মানুষ কি সহজে এ দুনিয়ার চাকচিক্য ভুলিতে পারে ? যে গুরু এমনভাবে শিষ্যকে ভুলাইতে পারেন সে গুরু সত্যই তো ঈশ্বর—ঈশ্বরের অবতার ।

বিবেকানন্দ গুরুগিরি করিতে আসেন নাই—কেবল ভাব বিলাইতে আসিয়াছিলেন । তেমন সরল হাস্যময় মিত্র, তেমন তেজস্বী সত্যসন্ধ সহচর আর কখ না দেখি নাই ।

তাহাকে ফাঁকি দিবার জো-টি ছিল না, মনের কথাটি টানিয়া বাহির করিত। তাহার কখনো অভিমান ছিল না। আমি একজন পণ্ডিত, আমি একজন বড় বক্তা, মিত্র-সংসর্গে এ-ভাবটা তাহার কখনই ফুটিয়া উঠিত না। বিবেকানন্দ একজন বড়দরের ভক্ত ছিলেন। গোপনে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে অনেক সময় তাঁহাতে মহাভাবের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু তিনি সেভাব চাপিয়া রাখিতেন। একবার ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "না ভাই, আমায় মজাইও না। আমি তাল সামলাইতে পারিব না। আমার যে কাজ সে কাজ এখন তো শেষ হয় নাই। ও দিকটা ফুটাইও না, আমি পাগল হইব।" গান গাহিতে গাহিতে বিবেকানন্দ এক এক সময় সত্যই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। একদিন আমার কন্যাকে লইয়া "তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ দেখি শ্যামা" এই গানটি গাহিতে গাহিতে চারি বৎসরের কন্যাটিকে নাচাইতে নাচাইতে বিবেকানন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর মেয়েটিও তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্থির নিষ্পন্দবৎ তাঁহার বুকের উপর শুইয়াছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ প্রায়ই এই ভাব চাপিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, "দ্যাখ, এই ভাবের বাড়াবাড়ি হওয়াতেই আমরা কলা খেয়ে বসেছি। পৃথিবীতে এমন মদ নেই যাহাকে ভক্তিরসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সকল মদের সেরা ভক্তি-মদ। সেই মদ খেয়ে বাঙালী চারশো বছর মাতাল হয়ে ছিল। আর ও মদ চালানো ঠিক নয়।" তাই বিবেকানন্দ কর্ম-জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়া বক্তৃতা করিতেন।

সে চলিয়া গিয়াছে, গুরুদত্ত বীজ ছড়াইয়া, গুরুর গৌরব-ডঙ্কা বাজাইয়া, সর্ব-সামঞ্জস্যের মহামন্ত্র বাঙালীর কানে বজ্রগম্ভীরনাদে উচ্চারণ করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। এখন তো তাহাকে বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় আসে নাই। তাই স্মৃতিমুখে সুখী হইয়া আর একজনের আশাপথ চাহিয়া আছি। এস তুমি, ডাকার মতো ডাকিলে নাকি তুমি আসিয়া থাক, তাই তোমায় ডাকিতেছি। তুমি অন্যরূপে আসিয়া অবতীর্ণ হও। তোমার কর্ম পূর্ণ কর।

[প্রবাহিণী, ২২ ফাল্গুন, ১৩২০]

সূত্রনির্দেশ

তৃতীয় অধ্যায়

প্রিয়নাথ সিংহ : উদ্বোধন, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৫ শ সংখ্যা, ১৫ ভাদ্র, ১৩১১
ঐ ৭ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২
ঐ ঐ ১৩শ সংখ্যা, ১৫ শ্রাবণ, ১৩১২
ঐ ১৩ ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩১৭

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় : স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন

চুনীলাল বসু : ভারতবর্ষ, ১৬ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৬

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় : স্বরাজ, ২২ বৈশাখ, ১৩১৪

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রবাহিনী, ২২ ফাল্গুন, ১৩২০

চতুর্থ অধ্যায়

স্বামী ধীরানন্দ

শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য। বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজার পূজারী।

মার্চ, ১৮৯৯। গিরিশবাবুর বাড়ির সামনের গোল বারান্দাওয়ালা ভাড়াবাড়িতে (এখন রাস্তায় নিশ্চিহ্ন) স্বামী যোগানন্দের দেহ গেল। বেলা তখন তিনটে। মা (সারদাদেবী) উপরে আছেন। স্বামীজী যোগেন মহারাজের দেহ আরতি করলেন। মিষ্টি ভোগ দিলেন। স্বামীজী শ্মশানে গেলেন না। গিরিশবাবুর বাড়ি বসে রইলেন। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) গেলেন। স্বামীজী বললেন, "এই কড়ি খসল, এরপর একে একে বরগা প্রভৃতি খসে পড়বে।" যতক্ষণ না প্রাণবায়ু গেল, স্বামীজী কাছে বসে রইলেন। কোন নাম-টাম চেঁচিয়ে করলেন না। Silently pass করতে দিলেন। যোগীন স্বামীর গর্ভধারিণী মা দেখতে এসেছিলেন। স্বামীজী তাঁকে শিগ্‌গির চলে যেতে বললেন।

একদিন মা-র বাড়ি স্বামীজী খাবেন। বোসপাড়ায়। কলাইয়ের ডাল হয়েছে শুনে ভারি খুশি। খুব ভালবাসতেন। কোন লোকের সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "এর চাউনি ভাল নয়, তুই সাবধানে থাকবি।" কোন ব্রহ্মচারী[1] সম্বন্ধে যখন যোগেন স্বামী তার ভার নিলেন, তখন স্বামীজী নিশ্চিন্ত হলেন। নেয়াপাতি ডাবের ভেতর চিনি দিয়ে সেই ডাবের খোলে বরফ দিয়ে খেতে ভালবাসতেন। বলরামবাবুর বাড়িতে একবার তাই দিলুম। খেয়ে ভারি খুশি। বললেন, "আঃ চমৎকার, নে তুই খা।" আমি খাচ্ছি, তখন বালকবৎ বলছেন, "আমায় একটু দে না।" এঁটোর জ্ঞান নেই। পশ্চিমে বেড়াবার সময় একপাতে নিয়ে খেতে বসেছেন।

আমরা মায়ের বাড়ির দ্বারী ছিলাম বলে আমাদের তামাশা করে কালীঘাটের পাণ্ডা বলতেন।

একদিন সেবক কানাইলালকে সেবার ত্রুটির জন্য স্বামীজী কান মলে দিলেন। কানাই লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। কর্তা দূরে থেকে দেখে হাসতে হাসতে বললেন, "দেখতে পেয়েছি কানাই। আর কেঁদো না বাবা।" তারপর গলা জড়িয়ে আবদারের সঙ্গে বললেন, "ওরে কিছু মনে করিসনি। তোদের ভালবাসি, তাই এমন করে ফেলি। তোরা আপনার লোক।"

স্বামীজীর সঙ্গে যোধপুরের ম্যানেজারের বাসায় আমরা আছি। হরিদ্বার থেকে একজন সাধুর কাপড় পরা লোক এলেন। এক ঠোঙা জিলিপি স্বামীজীকে দিলেন।

১ এই ব্রহ্মচারী লেখক স্বয়ং।—সম্পাদক

তিনি কিন্তু কাউকে খেতে দিলেন না। রাজার হাতিকে খাওয়ালেন। আগত ব্যক্তি আশ্রম করবেন বলে টাকার জন্য এসেছেন। ইচ্ছা, রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কিছু পাইয়ে দেন। স্বামীজী ওপর-চড়াও হয়ে রাজাকে কিছু বললেন না। সেভিয়ারকে বললেন দশ টাকা দিতে। এই পর্যন্ত। স্বামীজী গুজগুজ ভাব পছন্দ করতেন না। পরিষ্কার জবাব, স্পষ্ট কথা এবং দোষ স্বীকার পছন্দ করতেন। গিরিশবাবুর নাটকে আছে ফাঁড়িদারের চার চোখ। স্বামীজীরও এইরকম ছিল। তিনি নিজেও বলতেন—আমার পিছনে দুটো চোখ, সামনে দুটো। প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে কলম্বোতে Diabetes রোগ প্রথম দেখা দেয়। তার আগে শরীর বেশ চমৎকার ছিল। শেষে রোগা হয়ে গেলেন।

শচীন্দ্রনাথ বসু

মহিষাদলের রাজার ম্যানেজার শচীন্দ্রনাথ বসু কাশীতে স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য তাঁর বাল্যবন্ধু চারুবাবুকে (পরে স্বামী শুভানন্দ) যেসব পত্র লিখেছিলেন, তা থেকে এই স্মৃতিকথাটি সংকলিত।

বেলুড়, ভাড়াটে মঠবাড়ি, নভেম্বর, ১৮৯৮।

স্বামীজী উপর থেকে নামলেন। কিছুদিন আগে কাশ্মীর থেকে ফিরেছেন। চেহারা অনেক কালো হয়ে গেছে। প্রণাম করলাম।

সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি শচীন, ভাল আছ তো?" কর্ণে যেন বীণাধ্বনি হলো। ঠাকুরঘরে চলে গেলেন। তাঁকে তাঁর এক খুড়ী দেখতে এসেছেন ও একজন বুড়ী ঝি—যে তাঁকে মানুষ করেছিল। অনেকক্ষণ কথা বলে হলঘরে এলেন। কথায় কথায় কাশীর কথা উঠল। আমাকে স্বামীজী খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। পূর্ববঙ্গে যাবার খুব ইচ্ছা। কামাখ্যা যাবেন। ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্য দেখবার ইচ্ছা। দুই তীরে কিভাবে পর্বতশ্রেণী মেঘমালার মতো দেখায় —তা দেখতে সাধ হয়েছে। আমি কতক কতক বর্ণনা দিলাম। স্বামীজী আমার সঙ্গে বেশ সহৃদয় ব্যবহার করলেন। বললেন, "আর লেকচার-ফেকচার দেব না। আর গোলমালে কাজ নেই বাবা, চুপচাপ ধীরস্থিরভাবে কাজ চলুক।"

তারপর হরি মহারাজ আসাতে কাশ্মীরের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি (স্বামীজী) মাঝে মাঝে খুব আবেগপূর্ণ বর্ণনা দিতে লাগলেন। হিমবাহের (glacier) বর্ণনা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। পরে অমরনাথের কথা বলতে তাঁর বিশাল চক্ষু আরক্তিম হয়ে গেল। লর্ড ল্যান্সডাউন কাশ্মীর-সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা বলাতে বললেন, "খুবই ঠিক। সুইজারল্যান্ডে যা সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দৃশ্য তা দেখবার জন্য আলমোড়া ছাড়িয়ে যাবার দরকার হয় না। আলমোড়াতেই

তা মিলবে। কাশ্মীরের তুলনা নেই।" তারপর অমরনাথে তাঁর কিরূপে স্তবের ভাব আসতে লাগল তা বলতে লাগলেন। তুষাররাজি দেখে কিরূপ অভূতপূর্ব আনন্দ হয়েছিল তাও বললেন। বললেন, "ঈশ্বর আছেন কিনা বলতে পারি না; কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম আছেন, আর দেবদেবী আছেন, তা সম্পূর্ণ জেনেছি।"

একজন বৃদ্ধ চাকর এসে উপস্থিত হলো—স্বামীজীকে সে স্কুলে নিয়ে যেত। তাকে চার টাকা দেওয়া হলো।

অপরাহ্নে নূতন মঠের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া হলো। জমির পশ্চিম দিকে বরাবর লোহার বেড়া দেওয়া হয়েছে। দু-তিনটে চালা বাঁধা হয়েছে। কাঠের কাজ চলছে। বেগুন গাছ, ঢেঁড়স গাছ, কুমড়ো গাছ প্রভৃতি স্বামী অদ্বৈতানন্দজী লাগিয়ে গিয়েছেন। যে বাড়ি তৈরি হয়েছে, তা মোটামুটি বেশ হয়েছে। ঠাকুরঘর ও রান্নাঘরের জন্য একটা আলাদা দোতলা বাড়ি পশ্চিম দিকে প্রস্তুত হচ্ছে। হরিপ্রসন্ন মহারাজ দিনরাত পড়ে আছেন। স্বামীজীর সঙ্গে বাড়ির উপরে উঠলাম। স্বামীজী গঙ্গার পানে তাকিয়ে একটু বাদে "বাচামগোচরমনেকগুণস্বরূপং···বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথং" গান গাইলেন। এইরূপে সন্ধ্যা হলো। শরৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে নৌকায় ফিরলাম।

একদিন বাগবাজারে গেলাম। স্বামীজী বলরামবাবুর বাড়ির ছাদের উপর হাবুলের সঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন—যে হাবুল খুব ভাল বাঁশি বাজাতে পারে—ঠাকুরের ভক্ত, কাঁকুড়গাছির উৎসবে বাঁশি বাজায়। ও নাকি দূর সম্পর্কে স্বামীজীর দাদা হয়।··· স্বামীজী ছাদ থেকে নেমে তাকে হলঘরে নিয়ে গেলেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা অতীত হয়ে গেল। ডাক্তার তাঁকে দেখতে এসেছিলেন।

রাস্তায় যেতে যেতে হাবুলের সঙ্গে অনেক কথা হলো। বলল, স্বামীজী তার জীবনের অনেক পরিবর্তন করে দিলেন।···স্বামীজী বলেছেন, "দাদা, বাঙালীর বৈরাগ্য হবে কি? ভোগ করতেই পেলে না; দু লাখ, চার লাখ টাকার উপর বসতেই পেলে না।···বৈরাগ্য হবে কি করে? জার্মানীর ভোগ শেষ হয়েছে; এইবার জার্মানীর বৈরাগ্য হবে, তারপর আমেরিকা, ইংলন্ডের পালা।···"

হাবুল বলতে লাগল, স্বামীজী তাকে বললেন, "দাদা, পরমহংস মশায় যা তোকে বলে গেছেন, তাই করে যা; যোগ-টোগের জন্য ঘুরিস নি (হাবুল নাকি যোগের চেষ্টায় ছিল) প্রাণায়ামের ক্রিয়া আপনি হয়ে যাবে।" স্বামীজীকে হাবুল জিজ্ঞাসা করেছিল, "ভাই স্বামীজী, তুমি অমরনাথের রাস্তায় কেমন আনন্দ পেলে?" স্বামীজী বললেন, "দাদা, অতি grand! সেখান থেকে ফিরে আসা অবধি আমার প্রাণ বড় শান্তির প্রয়াসী হয়েছে। আর work ভাল লাগছে না—একেবারে চুপ করতে ইচ্ছে হচ্ছে—একটা গুহার ভিতর থাকতে পারলেই বাঁচি। অমরনাথের মহাদেব আমার মাথায় আট দিন আট রাত্রি চড়ে বসেছিলেন। মাথায় বসে খুব হাসতেন। আমি বললাম, 'বাবা, আমার শরীরে রোগ-ভোগ হচ্ছে, আর তুমি হাসবে বই কি?' গুরু

মহারাজের যে মূর্তি আমায় আমেরিকা যাবার আগে দেখা দিয়ে আমায় আমেরিকা যেতে আদেশ করেছিল, এবারেও সেই মূর্তি এসে আমাকে অমরনাথ যাবার আদেশ করেছিল। তাই গিয়েছিলাম।...”

সোমবার, ৬ নভেম্বর, ১৮৯৮। বাগবাজার গিয়ে দেখি রাখাল মহারাজ বসে তামাক খাচ্ছেন—বেলা তখন দেড়টা। বললেন, “স্বামীজী এই মাত্র পাঁচ-সাত মিনিট হলো. বিদেশিনী ভক্তদের সঙ্গে মঠে গেলেন।” ...ঠাকুরের কৃপায় তখনই একখানি নৌকা এসে পড়ল, চড়ে বসলাম। এক ঘণ্টার মধ্যেই মঠে পেঁছিলাম, স্বামীজীর নৌকা কুড়ি মিনিট আগে গেছে; তাঁরা পেঁছেই নূতন মঠের জমি দেখতে গেছেন। বেলা চারটার সময় স্বামীজী মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড প্রভৃতির সঙ্গে এলেন। মেয়েরা নূতন মঠ দেখে খুব খুশি হয়েছেন। বুল আর ম্যাকলাউড ২ ডিসেম্বর আমেরিকা যাত্রা করবেন। স্বামীজী চার-পাঁচ মাস পরে যাবেন লন্ডন হয়ে। স্বামীজীর সঙ্গে এক নৌকায় ঘোরা গেল। তিনিই আমাকে ডেকে নিলেন। নৌকায় কেবল আমরা পাঁচজন। স্বামীজীর সঙ্গে মেয়েরা নানাবিধ প্রসঙ্গ করতে করতে চললেন। সন্ধ্যার সময় ঘাটে পেঁছানো গেল। চিৎপুরের ট্রামে বুলরা উঠলেন—এস্‌প্লানেডে কোন বোর্ডিং হাউসে আছেন। স্বামীজী ও আমি বাগবাজারে এলাম। তাঁর শরীর ডাক্তার আর. এল. দত্তের গুণে অনেক ভাল; low diet-এ থেকে অনেক উপকার পেয়েছেন। হলঘরে (বলরামবাবুর বাড়ির) বসলেন, আমরাও বসলাম—কেবল আমি ও রাখাল মহারাজ। কিছু পরে শরৎ চক্রবর্তী এল। নানাবিধ কথা হচ্ছে, এমন সময় সারদা মহারাজ টলতে টলতে এসে হাজির—জ্বর হয়েছে।

স্বামীজী যখন আলমোড়াতে, তখন থেকে ত্রিগুণাতীত মহারাজ তাঁকে বারবার চিঠি লেখেন—ভাই, আমি work করব—তুমি আমাকে দুহাজার টাকা দাও, আমি প্রেস করব, কাজ চালাব। স্বামীজী তাঁকে একহাজার টাকা দিয়েছেন, বাকি হাজার টাকা ধার করেছেন। মাসে দশ টাকা সুদ লাগে। দশ-পনেরশো টাকায় দুটি বেশ ভাল প্রেস কিনেছেন, কিন্তু কিনলে কি হবে? কোন কাজ নেই। ঠায় বসে আছেন; বড়বাজারের এক গুদামে অষ্টআশি টাকা ভাড়া দিয়ে রাখা হয়েছে। স্বামীজীর রাজযোগ[১] বইখানি ছাপাবার সঙ্কল্প হয়েছে; কিন্তু পয়সা নেই, কাগজ আসবে কোথা থেকে? আমি একবার ত্রিগুণাতীত মহারাজকে বলেছিলাম, “মহারাজ, ও কাজ (প্রেসের কাজ) বড় nefarious (হীন), আপনার কর্ম নয়। অপর লোকের করা উচিত।” তখন ভারি spirit; বললেন, “না, any work is sacred. আমি কাজ পেলে খুশি, কাজ করতে আমি নারাজ নই।” আমি চুপ করে গেলাম। এখন রোজ ছটার সময় প্রেসে যান; সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া হয়; আর আসেন রাত সাতটার পর। রোজ সন্ধ্যার পর জ্বর হয়।

১ স্বামী শুদ্ধানন্দ (সুধীর মহারাজ)-কৃত স্বামীজীর রাজযোগের বঙ্গানুবাদ।

স্বামীজী ও রাখাল মহারাজ একসঙ্গে ত্রিগুণাতীতজীকে অভ্যর্থনা করলেন, "কি বাবাজী, এস, আজকের খবর কি ? প্রেসের কতদূর ? বল, বল ! বস, বস !"

ত্রিগুণাতীত (নাকিসুরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে) "আঁর ভাই, আঁর পাঁরি নি—ও সব কাঁজ কি আঁমাদের পোঁষায় ভাই ? সারাদিন 'তীর্থি'র কাকের মতন বসে থাকতে হয় ; না আছে একটা কাজ, না আছে কিছু। একটা job work পাওয়া গেছে, তাতে কি হবে ? আট আনা বড় জোর পাওয়া যাবে। আমি প্রেস বিক্রি করে ফেলার চেষ্টা করছি।"

স্বামীজী। বলিস কি রে ? এরই মধ্যে তোর সব সখ মিটে গেল ? আর দিন কতক দেখ। তবে ছাড়বি। এই দিকে প্রেসটা নিয়ে আয় না—কুমারটুলির কাছে ; আমরা সকলে দেখতে পেতুম।

ত্রিগুণাতীত। না ভাই, সেইখানেই থাক ; দিন দুয়েক দেখা যাক। পনের-কুড়ি টাকা লোকসান করে বেচে দেব।

স্বামীজী। ও রাখাল, বলে কি ? ওর যে খুব trial হলো দেখছি। তোর এরই মধ্যে সব গুঁড়িয়ে গেল ! patience (ধৈর্য) রইল না !

এই কথা বলতে বলতে স্বামীজীর চক্ষু ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলে উঠল। তিনি সুপ্তোত্থিত সিংহের মতো উঠে বসলেন ও গর্জে বললেন, "বলিস কি রে ? দে, প্রেস বিক্রি করে দে। আমার টাকার ঢের দরকার আছে। এইবেলা বিক্রি কর—একশো-দেড়শো টাকা লোকসান করেও বেচে ফেল।…কাজের নামটি হলেই এদের সব বৈরাগ্য উপস্থিত হয়—'আঁর ভাঁই পাঁরি নিঁ—ওঁ সঁব কাঁজ কি আঁমাদের ?' কেবল খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি উপুড় করে শুয়ে থাকতে পারে। যাদের কোন কাজে patience নেই, তারা কি মানুষ ?…তুই তিনদিন এখনো প্রেস করিসনি। যাঃ যাঃ তোকে ঢের experiment (পরীক্ষা) হয়েছে—তোর বড় আস্বা হয়েছিল। কে তোকে প্রেস করতে সেধেছিল ? তুইই তো আমাকে লিখে লিখে টাকা আনালি। নিয়ে আয় না তুই তোর প্রেস এখানে, সেখানে রাখবার তোর মানে কি ? আর এই তোর জ্বর জ্বর হচ্ছে, তুই শরীরটা দেখছিস না !"

ত্রিগুণাতীত। আট টাকা ভাড়া দিতে হবে—এক মাসের এগ্রিমেন্ট হয়েছে।

স্বামীজী। দূর দূর, ছিঃ ছিঃ। এ বলে কি। এসব লোক কি কোন কাজ করতে পারে ? আট টাকার জন্যে পড়ে আছিস ? তোদের এ ছোটলোকপনা কিছুতেই যাবে না ! তুই আর হরমোহনটা সমান। তোদের কখনো কোন business (ব্যবসা) হবে না—সেও এক পয়সার আলু কিনতে পঞ্চাশ দোকান ঘুরবে আর ঠকে মরবে।… দে প্রেস আমাদের মঠে পৌঁছে—আমাদেরও তো একটা প্রেস চাই। দেখ, কত lecture (বক্তৃতা) দিয়েছি, কত লিখেছি ; তার অর্ধেকও ছাপা হলো না। তুই আমাকে work দেখাস ? রাখাল, মনে কর, সে আজ কত দিনের কথা—আজ সে বার-তের বৎসরের কথা—সেই গঙ্গার ধারে বসে আমরা কয়জনে তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁদছি।

আমি বললাম, 'তাঁর অস্থি গঙ্গার ধারে রাখা উচিত, গঙ্গার ধারেই মন্দির হওয়া উচিত ; কারণ, তিনি গঙ্গার ধার ভালবাসতেন।'...আমার কথা শুনল না। তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁকুড়গাছির বাগানেতে রাখল। আমার প্রাণে বড় ব্যথা বেজেছিল। রাখাল, মনে কর আমি কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আজ বার বছর bull dog-এর মতন সেই idea নিয়ে তামাম দুনিয়া ঘুরেছি ; একদিনও ঘুমোইনি। আজ দেখ তা সফল করলাম। সেই idea (ভাব) আমাকে একদিনও ছাড়েনি। ...এ জাতের কি আর উন্নতি আছে ?

ত্রিগুণাতীত। ভাই, তোমার brainটি (মস্তিষ্কটি) কেমন। তোমার brainটি আমায় দিতে পার ?

এই কথায় খুব হাসি পড়ে গেল, কারণ, বলবার তারিফ ছিল। পরে ত্রিগুণাতীত বললেন, এ জ্বরের উপর সকালে একটু সাবু খেয়েছিলেন ; এ বেলা এক সের রাবড়ী, আধসের কচুরী ও তদুপযুক্ত তরকারি আহার করেছেন। এই কথা শুনে স্বামীজী হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "শালা! তোর stomach-টা দে দেখি—দুনিয়াটার চেহারা একেবারে বদলে দি। লাহোরে সুরজলাল বলেছিল, 'স্বামীজী, তোমায় নানকের brain, আর গুরুগোবিন্দের heart (হৃদয়) এসে গিয়েছে—কেবল জগমোহনের (খেতড়ীর রাজ-দেওয়ান) মতো পেটটি চাই'।"

৬ নভেম্বর, ১৮৯৮। সন্ধ্যার পর কলকাতা বাগবাজার বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়িতে স্বামীজী ও রাখাল মহারাজ কথাবার্তা বলছিলেন। স্বামীজী বললেন, "দেখ রাখাল, আমি আগে মনে করতুম বুঝি child-marriage (বাল্য-বিবাহ) ভাল, ছেলেবেলা থেকে একটা acquaintance (পরিচয়) হয়ে love (ভালবাসা)-টা deep (গাঢ়) হয়। এখন আমার সে mistake (ভুল)-টা একেবারে গেছে ; কারণ ও system (রীতি)-এর principle (আদর্শগত ভাব)-টাই খারাপ। গোলামীর উপর যে relation (সম্বন্ধ)-টা based (স্থাপিত) সেটা আবার কখনো ভাল হতে পারে ? যেখানে মেয়েদের liberty (স্বাধীনতা) নেই, সে জাত কখনো prosper (উন্নতিলাভ) করতে পারে ? এ দেশের যত law (আইনকানুন), যত love (ভালবাসা), যত স্মৃতি সমস্ত মেয়েদের দাবিয়ে রাখবার জন্য হয়েছে। ওঃ, বলতে আমার গা শিউরে উঠছে—এই দেশ আজ দুই হাজার বছর জগদম্বার অপমান করছে ; সেই পাপে এত ভুগছে ; তবু চৈতন্য নেই। যদি ভাল চাস, জগদম্বার অপমান আর করিসনি। না কথা শুনিস, খা জুতো, খা লাথি। রুশ আসুক, জার্মান আসুক, জাতের পর জাত আসুক, অনন্তকাল পায়ে থ্যাঁতলাক। লোকদের একটা false idea of chastity (সতীত্বের ভ্রান্ত ধারণা)-তে মাথাটা খেয়েছে—ঘোরতর selfishness (স্বার্থপরতা)-এর manifestation (প্রকাশ) বই আর কিছু নয়।"

আমি। কেন মহারাজ, ওদের দেশে তো স্বাধীনতা আছে, তবু ওদের দেশেও এত ব্যাভিচার কেন ?

স্বামীজী। তা কি আমি বলছি, ওদের দেশে সব ভাল? তবে ওদের দেশে এতটা brutality (পাশবিকতা) নেই, ওরই মধ্যে কেমন একটা poetry (কবিত্ব) আছে। তুই যেমন বালক! কোন দেশটা ভাল আছে বল তো!…এখন একটু চুপ কর দেখি, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা, সতী সতী করে ঢের চেঁচিয়েছ, বাঁশ দিয়ে হাজার হাজার বিধবা পুড়িয়েছ। একটু ক্ষান্ত হও দেখি, এখন জনকতক 'সতা' হও দেখি—আমি বুঝি।…যত খারাপ মেয়েমানুষ, যত দোষ করেছে, যত কাম, passion (আসক্তি) মেয়েমানুষের—না?…hypocrites and selfish to the backbone (ভণ্ড ও স্বার্থপরের দল)। ছাড় দেখি জগদম্বার অপমান—দেশটি হুড়হুড় করে এখনি উঠে পড়বে।…রাম! রাম! এখন marriage (বিবাহ) মানে একটা মেয়েমানুষকে চিরকালের জন্য গোলাম বা বাঁদী করা।…তাদেরও কোন education (শিক্ষা) নেই—হাজার হাজার বছর ঐ করে করে মনে করছে—We are deemed for that (আমরা ঐরূপ নিয়তি নিয়ে জন্মেছি)…ওদের দেশে এখনো রাখাল,…poetry (কবিত্ব) আছে।…আর দেখ না, এইসব মেয়েরা যারা এখানে এসেছে এদের কাকেও মা বলি, কাকেও বোনের মতো দেখি—এদের কারও কোন কুভাব একদিনের তরে হয়? Chastity! Chastity আর কিছু নয়—আমার ভোগ্যা স্ত্রী…আমি যথেচ্ছ ভোগ করব!

পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার গিয়ে দেখি স্বামীজী বসে আছেন।…স্বামীজী বলছেন, বাংলাদেশের যেমন তরকারি-ব্যবস্থা এমন কোথাও নেই; তবে North-West-এ (উত্তর-পশ্চিম) রাজপুতানায় বেশ আহারের ব্যবস্থা আছে।

আমি। মহারাজ, ওরা কি খেতে জানে? সব তরকারিতে টক দেয়।

স্বামীজী। তুমি বালকের মতো কথা কইছ যে! কতকগুলি লোকদের দিয়ে তুমি সমস্ত জাতটা judge (বিচার) করবে? Civilization (সভ্যতা) তো ওদের দেশেই ছিল—Bengal (বাংলায়)-এ কোন কালে ছিল? ওদের দেশে বড়লোকের বাড়ি খাও তোমার ভ্রম ঘুচে যাবে।…আর তোমার পোলাওটা কি? Long before (অনেক আগে) 'পাক-রাজেশ্বর' গ্রন্থে পলান্নের উল্লেখ আছে; মুসলমানরা আমাদের copy (নকল) করেছে। আকবরের আইন-ই-আকবরীতে কি রকম করে হিন্দুর পলান্ন প্রভৃতি রাঁধতে হয় তার রীতিমত বর্ণনা আছে। Bengal (বাংলা)-এ আবার civilization (সভ্যতা) কবে হলো? আমি তোদের রোজ রোজ বলছি—Cape Comorin (কন্যাকুমারী) থেকে একটা লাইন যদি আলমোড়া অবধি টানা যায়, তাহলে পূর্বদিকটা একেবারে অনার্য, অসভ্য; চেহারাও সব কেলে কেলে ভূত, আবার বেদ-বিগর্হিত অবরোধ-প্রথা, বিধবা পোড়ানো প্রভৃতি অনার্যপ্রথা, কুলগুরু—। আর পশ্চিমদিকটা—সভ্য, আর্য manly (তেজস্বী) কি আশ্চর্য!…পশ্চিমদিকের পুরুষ সব সুন্দর—স্ত্রীলোক সব beautiful (রূপসী)—গ্রামগুলি type of

cleanliness (পরিচ্ছন্নতার আদর্শ)—বেশ healthy flourishing (স্বাস্থ্যকর সমৃদ্ধ)। ধর্মও দেখ, বাংলায় কিছু নেই। ত্যাগী কটা জন্মেছে ?

মিস নোবল স্বামীজীর সঙ্গে ২০ জুন তারিখে গোলকুণ্ডা জাহাজে চড়ে বিলেত গেছেন। আমি অবশ্য প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত ছিলাম। তিনি মঠের সন্ন্যাসিগণের কাছে অনেকটা সুখ্যাতি লাভ করে গেছেন। তাঁর শেষ বক্তৃতা কালীঘাটে মায়ের নাটমন্দিরে হয়েছিল। স্বামীজী এই বক্তৃতায় (বিষয়—কালী) সভাপতিত্ব করবেন এইরূপ স্থির হয়েছিল—হালদারেরা এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তাঁদের তখন স্বামীজীর উপর বিশেষ ভক্তি হয়েছিল। তার কারণ, এর এক সপ্তাহ পূর্বে স্বামীজী সহসা একদিন কালীঘাটে মায়ের শ্রীমন্দিরে যাবার ইচ্ছা করে দু-তিন জন মহারাজ ও মিস নোবল সহ সেখানে গেলেন—হালদারেরা সসম্ভ্রমে তাঁদের গ্রহণ করলেন। মায়ের মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত ছিল। মায়ের প্রসন্ন শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করে বিবেকানন্দের হৃদয়ে ভাবসাগর উথলে উঠল। বেদান্তের কঠোর আবরণ ভেদ করে ভাবরাশি ছুটে বের হতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল—বিশাল লোচনদ্বয় আরক্তিম হলো, দরদর বেগে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল—আর কমনীয় কণ্ঠ থেকে বের হয়ে এল অনর্গল সুন্দর স্তবরাজি ; হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ—তিনি অঞ্জলিভরে চন্দনচর্চিত জবাকমল মায়ের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করলেন, সকলকে দিতে বললেন। কালীঘাটবাসী সকলে তাঁর ভাব দেখে বিস্মিত হলো। মিস নোবল তথায় পরে একদিন বক্তৃতা দেবেন এইরূপ স্থির হয়েছিল। নির্দিষ্ট দিনে লোক ভেঙে পড়তে লাগল—অবশ্য স্বামীজীকে দেখতে ও শুনতে। আমিও গিয়েছিলাম, মানিক-দাদাও গিয়েছিলেন ; কিন্তু যখন অসুস্থতার দরুন স্বামীজী আসতে পারবেন না এই খবর এল তখন সকলে খুব নিরাশ হলেন। যা হোক ঠিক ছটার সময় মিস নোবল খালি পায়ে নাটমন্দিরে উপস্থিত হলেন এবং প্রায় আধঘণ্টা বললেন, বক্তৃতার পর সকলে খুব সাধুবাদ দিলেন।

মিস নোবল-এর ভারি তিতিক্ষা ছিল—মাছ-মাংস খেতেন না। একখানি কি দুখানি পাউরুটি ও ফলমূলাদি খেয়েই জীবনধারণ করতেন। মাতাঠাকুরানীর প্রতি তাঁর ছিল খুব ভক্তি। তাঁর স্কুল টাকার অভাবে কিছুই চলছে না। এবার নাকি বিলেতে টাকা তুলবার উদ্দেশ্যেই যাচ্ছেন।

মঠের উজ্জ্বলতম জ্যোতি কিছুদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়েছে—বেলুড় মঠ একেবারে শ্রীহীন। যাবার আগের দিন মঠে স্বামীজীর বক্তৃতা হয়েছিল। শুনে সকলের ধমনীতে উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হলো। সকলেরই অন্তত ক্ষণেকের জন্য মনে হলো যে আমরা মানুষ। স্বামীজী খুব উৎসাহের ভরে বললেন, "বাবা সব, তোরা মানুষ হ—এই আমি চাই। এর কিছুমাত্র সফল হলেও আমার জন্ম সার্থক

হবে।" সকলকে বললেন, "তোমাদের অধিক আর কি বলব? তোমরা সকলে সেই মহাপুরুষের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) পদাঙ্ক অনুসরণ করবার জন্য যত্নবান হও—জীবনে কর্মের ও বৈরাগ্যের সমাবেশ কর।" তার পরদিন কলকাতায় এলেন। বেলা তিনটার সময় প্রিন্সেপ ঘাটে যাবেন স্থির হলো। তাঁর জন্য কোন গাড়ি গেলে ভাল হয় এইরূপ কথাবার্তা হচ্ছিল—কোন স্থিরতা হয়নি; সৌভাগ্যক্রমে গর্গের (মহিষাদলের রাজা) Bruham ও Arab pairs শ্যামবাজার stable থেকে আনিয়েছিলাম। স্বামীজী দয়া করে তাতে গেলেন। স্বামীজী এবারে সমুদ্রযাত্রার পোশাক বদলেছিলেন—আসাম সিল্ক-এর কোট এবং দশ-বার টাকা দামের Cabin shoe আর Night cap; হরি মহারাজেরও এই ব্যবস্থা।...ঘাটে plague-এর examination হয়েছিল—খুব কড়া পরীক্ষা। প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক সমবেত ছিলেন। বেলা পাঁচটার সময় লঞ্চ এল। আমাদের নয়নাভিরাম স্বামীজী তাতে উঠলেন—সকলের কাছে বিদায়-গ্রহণ করলেন। হরি মহারাজের মুখের ভাব খুব গম্ভীর হয়েছিল। মঠের সকলেই সেখানে উপস্থিত। গঙ্গাধর মহারাজ মহুলা থেকে এসেছিলেন। লঞ্চ ছাড়বার সময় সকলেরই চোখ ছলছল করতে লাগল—কারও কারও বা চোখ জলে ভরে গেল। তারপর সেই পঞ্চাশ জন লোক একসংগে স্বামীজীর উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল। গঙ্গাতীরে সেই দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখিয়েছিল। অপরাপর সাহেবেরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখল। তাঁদের তিন জনেরই প্রথম শ্রেণীর টিকিট। ক্রমে লঞ্চ ছেড়ে দিল। যতক্ষণ দেখা গেল সকলে রুমাল প্রভৃতি ঘোরাতে লাগলেন। ক্রমে লঞ্চ যখন অদৃশ্য হয়ে গেল, সকলে গাড়িতে উঠলেন। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ—"বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে।..."

গোবিন্দচন্দ্র বসু

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ। সম্ভবতঃ শীতকালেতে বেলা নটা-দশটার সময় আমি কার্যগতিকে মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে খ্যাতনামা ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি যেতে তৈরি হয়েছি। ঈশানবাবুর পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। গিয়ে দেখলাম, সতীশ পাখোয়াজ বাজাচ্ছে। দু-তিনটি নয়-দশ বৎসরের বালক হাতে চৌতালের মান রাখছে এবং একটি তেজঃপুঞ্জ যুবক ধ্রুপদ গাইছে। আমি সংগীত ও তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখে বিশেষ আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হলাম। কিন্তু কোন আলাপ না থাকায় আমি কোন প্রশ্ন করতে পারলাম না। প্রস্থান করার পর আমি আমার বন্ধু সতীশকে পরদিন জিজ্ঞাসা করলাম, যুবকটি কে এবং তার বিষয়ে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলাম। পরে জানলাম যুবকের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাড়ি সিমুলিয়ার কলকাতা এবং পরমহংসদেবের অতি প্রিয়পাত্র। এই হলো আমার প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ।

ইংরেজী ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে যোগানন্দ স্বামী (যোগেন) প্রয়াগে সন্ন্যাসী অবস্থাতে পরিভ্রমণ করতে আসেন এবং সৌভাগ্যক্রমে আমার ভবনে আতিথ্য স্বীকার করেন। কিছুদিন পরে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলাম যোগেন পরমহংসদেবের সন্ন্যাসি-শিষ্য এবং তাঁর সঙ্গে নানাপ্রকার শাস্ত্রালাপ ধর্মপ্রসঙ্গ ও পরমহংসদেবের নানা কথাবার্তায় অতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আমি অতিশয় চিন্তিত হলাম এবং যোগেনের অনুজ্ঞাক্রমে বরাহনগরে পরামাণিকের ঘাটে নবস্থাপিত মঠে সংবাদ পাঠালাম। তার পেয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, অভেদানন্দ ও নিরঞ্জনানন্দ এবং যোগেন-মা, গোলাপ-মা শীঘ্রই কলকাতা থেকে আমার ভবনে (গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড চক) এসে উপস্থিত হলেন।

স্বামী অভেদানন্দ একদিন প্রসঙ্গক্রমে বললেন, "ডাক্তার, ঠাকুর বলেছিলেন নরেনকে ভোজন করালে হাজার ব্রাহ্মণ-ভোজন করানোর ফল হয়।"

নরেন। কিরে শালা দোকানদারি বাড়াচ্ছিস, পসার জমাচ্ছিস, তা শালা করবি বই কি ? কিছু রেস্ত চাই তো ?...

একদিন অপরাহ্নে সকলে অর্থাৎ স্বামিমহোদয়গণ ও আমি একত্রিত হয়ে ভজন ও সঙ্গীত করছিলাম। ভাব জমে গেল। সঙ্গীত ও ভজনাদি কিছুক্ষণ চলতে লাগল। আমার মনে বিশেষ ভক্তি ও আনন্দ উদ্দীপিত হলো এবং মধুর সঙ্গীতে মনের আবেগ অধিকতর বৃদ্ধি হওয়ায় ভাব সম্বরণ করতে না পেরে দুই নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হতে লাগল। স্বামীজী প্রভৃতি গানে বিশেষ আবিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু আমার চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত দেখে তিনি আত্মভাব সম্বরণ করে আমাকে উপহাস ও ব্যঙ্গচ্ছলে বললেন, "তোর বড় পানসে চোখ।"

এই সময় একদিন বিকালে আমরা অনেকে বসে নানারকম চর্চা করছিলাম। গিরিশ (গিরিশচন্দ্র বসু, যিনি পরে জজ হয়েছিলেন, তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতি করতেন) এসে Theosophy বিষয়ে নানাপ্রকার ব্যাখ্যা ও চর্চা করছিল। স্বামীজী গিরিশের কথোপকথনে বিশেষ শ্রদ্ধা ও মনোযোগ দিলেন না, পরন্তু জ্ঞানমার্গের নানাপ্রসঙ্গ ও উচ্চ অবস্থার কথাবার্তা বললেন। গিরিশ হঠাৎ চিৎকার করে উঠে বলল "স্বামীজী করলে কি ? আমার দশ বৎসরের পরিশ্রম পণ্ড করলে ?" স্বামীজী বললেন "তোমার পণ্ড হলো বা না হলো তাতে আমার কি ?"

একদিন গিরিশ বলল, "স্বামীজী, চলুন সিন্দুক সা নামক জনৈক সাধুকে দেখতে যাই।" আমরা সকলে সন্ধ্যার সময় গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। সিন্দুক সা ত্রিবেণীর নিকটস্থ বাঁধের উপর থাকতেন। তাঁর যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী একটি কাষ্ঠ নির্মিত প্রকাণ্ড সিন্দুকে ভরে রাখতেন এবং তদুপরি আসন পেতে বসে থাকতেন। স্বামীজী বললেন, "এই সাধুটি রামাৎ বৈষ্ণব বৈরাগী। এর দোকানদারির মালপত্র এই সিন্দুকের ভিতর থাকে।"

অপর একদিন এক বাঙালী সাধু বৈরাগী, নাম মাধবদাস বাবা, যিনি চিটগঞ্জে এক বাড়ির মধ্যে এক গণ্ডির মধ্যে চল্লিশ বৎসর ছিলেন, তিনি স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্য তাঁর গুরুভাইগণকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আর স্বামী বিবেকানন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখীন হতে পারলেন না। মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য সর্পের ন্যায় মস্তক অবনত করে রইলেন, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করতে পারলেন না। বৈরাগী মহাশয় অতি হর্ষিত হয়ে আমায় বললেন, "গোবিন্দ তুমি কি সৎসঙ্গই না করছ।"

একদিন স্বামীজী ও তদীয় গুরু ভ্রাতাগণ ও আমি কুসুম দর্শন করতে দয়ারামের আশ্রমে উপস্থিত হই। সারাদিন অতীব আনন্দে অতিবাহিত হয়েছিল, তা আর বর্ণনা করবার নয়। কি জমাট ভাব, কি কথা-প্রসঙ্গ, কি হৃদয়স্পর্শী ভালবাসা এবং মাঝে মাঝে হাস্যোদ্দীপক কৌতুক রহস্য, তা অদ্যাপি আমার হৃদয়ে জাগ্রত রয়েছে এবং অল্প দিনের কথা বলে যেন মনে হয়। দৃশ্যটি যেন আমার চোখের সামনে রয়েছে। সায়ংকালে প্রত্যাবর্তন করলাম। স্বামীজীর পরিধানে একটি মাত্র কৌপীন ও গৈরিক বহির্বাস অতি মোটা ভেড়ার কম্বল গাত্রাচ্ছাদিত এবং নগ্নপদ। নগ্নপদে গতাগতি অনভ্যস্ত থাকায় এবং বন্ধুর ও বালুকাপূর্ণ স্থানে চলতে হওয়ায় স্বামীজীর চরণচর্ম যেন ফেটে গিয়ে শোণিত বার হবার মতন হলো দেখে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগল ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হলো। কারণ আমার পায়ে ভাল জুতো এবং তাঁরা সকলে নগ্নপদ। আমি ত্রস্ত হয়ে জুতো খুলে হাতে নিয়ে চললাম। স্বামীজী তা দেখে আমাকে স্নেহপূর্ণভাবে বললেন "জুতো খুললে কেন?" আমি কিঞ্চিৎ লজ্জিত ও বিমনা হয়ে বললাম, "স্বামীজী, আপনারা সকলে নগ্নপদে এরূপ কষ্ট করে চলছেন আর আমি জুতো পরে চলব, এটা ঠিক নয়। আপনাদের শ্রান্ত ও নগ্নপদে চলতে দেখে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগছে, আমি জুতো পায়ে দিতে পারলাম না।"

একদিন স্বামীজী ও তাঁর গুরুভ্রাতারা আমার বাড়িতে রাত্রে আহার করছিলেন। তখন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ঠণ্ঠীমলের কুঠি, পাড়ারানী মণ্ডিতে ছিলেন; এমন সময় জনৈক সাধু—অমূল্য (পরে যাকে 'গুরুজী অমূল্য' বলে এলাহাবাদের লোকেরা জানত) সকলের সঙ্গে আহার করতে বসে স্বামীজীকে দেখিয়ে একটি শুকনো লঙ্কা খেল; স্বামীজী দুটি খেলেন, অমূল্য তিনটে খেল, স্বামীজী চারটে খেলেন; এরূপ উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। শেষে অমূল্য পরাস্ত হলো। সকলে হাসতে লাগল। এই সামান্য ব্যাপারেতেও স্বামীজীর এরূপ মাধুর্য ও হৃদয়স্পর্শী ভাব লক্ষিত হয়েছিল। সামান্য লঙ্কা খাওয়াটাও যে বিশেষ কার্য ও গুরুতর ব্যাপার তা অদ্যাপিও স্মৃতিপথে রয়েছে। অতি সামান্য কার্যেতে তাঁর গাম্ভীর্য ও মাধুর্য এরূপ প্রকাশ হতো, যেন বেদান্তের উচ্চতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছিলেন। আহারান্তে স্বামীজী আমায় একান্তে বললেন, "অমূল্য যদি মঠে যায় তাহলে তুমি তাকে বরাহনগরের মঠে পাঠিয়ে দিও।" একদিন স্বামীজী আমায় বললেন, "আমরা আজ রওনা হব।" আমি অতি কাতর হয়ে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলাম, যেন তিনি অন্ততঃ আর একটা দিন থেকে যান।

কারণ তাঁদের সঙ্গবিচ্যুত হতে আমার প্রাণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। স্বামীজী গম্ভীরভাবে আমাকে বললেন, "এতে সত্যের অপলাপ হবে। আমি আজকেই যাব।" এবং তাঁরা সকলে সেইদিনেই আমার ভবন থেকে প্রস্থান করলেন।

একদিন প্রসঙ্গক্রমে আমি উত্থাপন করলাম মৎস্য ও মাংস আহার করা মনুষ্যের পক্ষে উচিত বা অনুচিত ; কারণ আমি নিরামিষভোজী ; মৎস্য মাংস কখনো ব্যবহার করিনি এবং অপরের পক্ষে তা অপ্রয়োজনীয় ও ধর্মপথের অন্তরায় আমার এরূপ ধারণা ছিল। স্বামীজী সহাস্যবদনে স্নেহপূর্ণ গম্ভীরভাবে বললেন, "দেখ গোবিন্দ, সিংহ ব্যাঘ্র মাংসাশী এবং চটক পক্ষী (চড়াই) প্রভৃতি তণ্ডুলকণা ও কাঁকর খেয়ে জীবন ধারণ করে, কিন্তু সিংহ-ব্যাঘ্রাদির বৎসরান্তে সন্তান উৎপাদনের প্রবৃত্তি (Self-procreation) একবার হয়ে থাকে এবং চটক প্রভৃতি নিরামিষ্যভোজীরা সততই সন্তান উৎপাদনে (Self-procreation) ব্যগ্র। মাংসাহার ধর্মপথের কোন অন্তরায় নয়।"

এখান থেকে তাঁরা সকলে গাজিপুর রওনা হলেন। কিছুদিন পরে গাজিপুর থেকে পত্র পেলাম। সে পত্রখানি আমার ভবনে প্লেগের আশঙ্কা হওয়ায় আমি গৃহ পরিত্যাগ করায় নষ্ট হয়ে গেছে। তার মর্ম আমার যা স্মরণ আছে তা বলছি। তিনি লিখেছিলেন, "গোবিন্দ, আমি গাজিপুরে পেঁৗছেছি, পওহারীবাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার বিশেষ চেষ্টা করছি, দর্শন হলে বোধহয় তাঁর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ অমূল্যরত্ন পাব" ইত্যাদি মর্মে পত্রখানি আমায় লিখেছিলেন। তারপর থেকে তাঁর দর্শন বা কোন পত্রাদি পাইনি। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপপরিচয় পনের দিন মাত্র হয়েছিল এবং এই অল্পদিনের মধ্যে আমার ভিতরে এরূপ গভীর মুদ্রাঙ্কন করেছিলেন যে এত বৎসর অতীত হলেও আমার হৃদয় মধ্যে প্রত্যেক জিনিস নবজাত বলে জাগরূক রয়েছে। নানা বিষয়ের স্মৃতি যদিও বিভ্রম হয়, কিন্তু তাঁর প্রসঙ্গ এত জ্বলন্ত ও জীবন্ত—অদ্যাপি তা পূর্বাহ্নের কথা বলে প্রতীয়মান হয় এবং যেন মধুর সঙ্গ, স্নেহপূর্ণ মুখ, জ্যোতির্ময় কলেবর ও বিশাল হৃদয়ের কথা যখনি মনে মনে চিন্তা করি, তখনি অতীব পুলকিত হয়ে উঠি।

ইংরেজী ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে শীতকালে একদিন প্রায় সমস্তরাত্রি স্বপ্নাবস্থায় আমি স্বামীজীর সঙ্গে নানা কথাবার্তা বলছিলাম, যদিও কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষরূপ কথাবার্তা হয়েছিল, তা আমার এখন স্মরণ নেই। কিন্তু পূর্ব পরিচিত এবং অতীব প্রিয় ব্যক্তির সহসা সমাগম হলে মন যেরূপ প্রফুল্ল ও হর্ষিত হয় আমার তদ্রূপ হয়েছিল এটি বেশ মনে আছে। প্রাতে গাত্রোত্থান করে চিন্তা করতে লাগলাম, বোধ হয় স্বামীজীর জন্মোৎসব অতি নিকটে, মনে করলাম স্বামীজী আমাকে পূর্বাহ্নে এবিষয় প্রেরণা ও প্রবোধিত করলেন। আমার যা কর্তব্য তা নিশ্চয় করব।

সকালে দেখলাম ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবের হরেন্দ্রনাথ দত্ত উপস্থিত। তাকে দেখতে পেয়ে আমি সহাস্যে বললাম, "তোমায় বিশেষ বেগ পেতে হবে না। স্বামীজীকে কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি। উৎসবের জন্য যা করতে হবে তা আমি সব ঠিক করে

রেখেছি।" হরেন শুনে কিঞ্চিৎ চমকিত হলো এবং বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করে প্রত্যাবর্তন করল।

আমি প্রয়াগে চল্লিশ বৎসর অবস্থান করায় নানাপ্রকার সাধুর সঙ্গে মিশেছি এবং কুম্ভমেলা প্রভৃতি এখানে হওয়ায় অনেক প্রকার সাধু-মহাত্মার দর্শন করেছি এবং চিকিৎসা-ব্যবসা থাকায় বহুপ্রকার লোকের সম্মিলনে এসেছি। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের মতন অত অল্পবয়সে ঐরকম ত্যাগ ও বৈরাগ্য অপর কারও ভিতর দেখিনি। তাঁর ওজস্বী বাণী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দূরদর্শিতা, গম্ভীর বাণী ও সাহসপূর্ণ উক্তি, মধুময় সান্ত্বনাবাক্য এবং কৌতুক ব্যঙ্গ ও হাস্যোদ্দীপক কথাবার্তার এরূপ এক সঙ্গে সমাবেশ কুত্রাপি দর্শন করিনি।

কুমুদবন্ধু সেন

আলমবাজার মঠের সময় থেকেই সঙ্ঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের সকল পার্ষদের সান্নিধ্যে এসেছেন। সুবক্তা ও সুলেখক।

স্বামী বিবেকানন্দকে আমি ঠিক ঠিক প্রথম দর্শন করি, যখন (১৮৯৭) তিনি পাশ্চাত্য দেশ থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। পূর্বে (১৮৯০) তাঁকে একবার দেখেছি মণি গুপ্ত মহাশয়ের মসজিদবাড়ির জোড়া মন্দিরের কাছে।

মণিবাবুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছি, হঠাৎ তাঁকে সম্বোধন করে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি যুবক বললেন, "কিরে খোকা, কেমন আছিস?"

মণি গুপ্ত তাড়াতাড়ি তাঁর পদধূলি নিয়ে বললেন, "তিনি যেমন রেখেছেন। তুমি বুঝি বেণী ওস্তাদের বাড়ি যাচ্ছ?"

যুবক "হ্যাঁ" বলে চলে গেলেন বেণী ওস্তাদের কাছে গান শিখতে। মণিবাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ইনি কে?" তিনি বললেন, "ঠাকুর যাঁকে সহস্রদল পদ্ম বলতেন এবং সপ্তর্ষির একজন ঋষি বলে সম্বোধন করতেন, ইনি সেই নরেন্দ্রনাথ।"

তারপর কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। তখন কারও সন্ন্যাস-নাম প্রচার হয়নি। পরে মণিবাবুর কাছে পূজ্যপাদ স্বামী যোগানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে।

কুমারটুলির সুবিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বাড়িতে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কিছুদিন অবস্থান করেন। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ যে বক্তৃতা করেন এবং আমেরিকাবাসীর উপর তাঁর যে অপূর্ব প্রভাব, স্বামীজীর বাগ্মিতা-শক্তি প্রভৃতির কথা আছে, এমন একখানি পুস্তিকা তখন সেখানে গোসাঁইজীর আদেশে দর্শনার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছিল। সেই পুস্তিকা পড়ে জানলাম—নরেন্দ্রনাথই

স্বামী বিবেকানন্দ। সেই পুস্তিকায় বরানগর ও আলমবাজার মঠের কথাও উল্লিখিত ছিল।

আমি ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে বরানগর মঠের স্বামীজীদের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলাম। আমরা তখন যুবক। স্বামীজী যখন ভারতে ফিরে আসেন, তখন সবে এনট্রান্স পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছি। বলরাম-মন্দিরে শ্রীশ্রীমহারাজ, যোগেন মহারাজ, গিরিশবাবু, অতুলবাবু, পূর্ণবাবু প্রভৃতি ঠাকুরের লীলাসহচরদের সঙ্গে স্বামীজী-প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা হতো। যখন রামনাদে ও মাদ্রাজে স্বামীজীর বিরাট অভ্যর্থনা হয় এবং 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় সেইগুলি প্রকাশিত হলো, তখন আমাদের যুবকদের মধ্যে একটা অপূর্ব ভাবের প্রেরণা আসে এবং স্বামীজীর সংবাদ নেবার জন্য আমি প্রায়ই বিকালে বা সন্ধ্যার পর, কখনো প্রাতঃকালে বলরাম-মন্দিরে যেতাম।

চারদিকে অভ্যর্থনা হচ্ছে, অথচ কলকাতায় কোন অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয়নি—এই বিষয় নিয়ে সেখানে যখন আলোচনা হচ্ছিল, তখন ঠাকুরের 'ছোট নরেন'—যিনি এটর্নি ছিলেন—বললেন, " 'ইন্ডিয়ান নেশনে' শ্রীযুক্ত এন. এন. ঘোষ স্বামীজীর খুব উচ্চ প্রশংসা করেছেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণের ওপর তাঁর খুব প্রভাব আছে। ঐখানে একবার প্রস্তাব করি ; দেখি, যদি ওদিক থেকে কোন সমিতি গঠিত হয়।"

তখন চারদিক থেকে চেষ্টা হতে লাগল একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করবার জন্য। কলকাতার প্রসিদ্ধ লোকেরা এবং শ্রীযুক্ত হীরেন দত্ত মহাশয় এবিষয়ে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ সিংকে সভাপতি করে স্বামীজীকে একটি মানপত্র দেবার কথা হয়।

আমিও তৎকালে শ্রীবিজয়কৃষ্ণের শিষ্য সতীশ সরকার মহাশয়ের সঙ্গে গোসাঁইজীকে দর্শন করতে যাই। তিনি আমার স্বর্গত পিতাকে চিনতেন এবং সস্নেহে বললেন, "তুমি প্রসন্নের ছেলে ?" গোসাঁইজীর ওখানে দেখেছি নিত্য সন্ধ্যাকালে সঙ্কীর্তন হতো এবং গোসাঁইজীর ভাববিহ্বল নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। একদিন দেখি, গোস্বামী মহাশয় একাগ্র মনোযোগ সহকারে স্বামীজীর মাদ্রাজ-ভাষণের পাঠ শুনছেন এবং মাঝে মাঝে বলছেন, সব ঠিক শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে।

অভ্যর্থনা-সমিতি যখন গঠিত হয়, তখন ভক্ত শচীন্দ্রনাথ বসুর অধ্যক্ষতায় আমি একজন ভলান্টিয়ার বা স্বেচ্ছাসেবক হয়েছিলাম। একদিন বেলা দশটার সময় বলরাম-মন্দিরে গিয়েছি, তখন তিনি আমাকে নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কাছে এক চিঠি দিলেন এবং বললেন, "স্বামীজী বজবজে আসছেন, এই চিঠিটা যেন তিনি (নরেন্দ্রনাথ মিত্র) সারদা মহারাজকে (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে) পাঠিয়ে দেন।" অভ্যর্থনা-সমিতির অর্থাভাবে বজবজ থেকে শিয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত স্বামীজীকে আনবার জন্য একটি স্পেশাল ফার্স্টক্লাস কামরা রিজার্ভ করা হয়। স্বামীজীর আসবার পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলায় দেখি গিরিশবাবু প্রভৃতি পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ-স্বামীদের সঙ্গে

আলোচনা করছেন : স্পেশাল ট্রেন আসবে ভোর ছটার সময়, এই শীতে কি লোক হবে। যাতে সর্বসাধারণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন, এটাই আমাদের ইচ্ছা।

পূজ্যপাদ মহারাজ বললেন, "আমাদের কারো অগ্রণী হওয়া উচিত নয়। স্বামীজীকে ওরা বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে নিয়ে যাবে। বাইরে থেকে আমাদের দেখাই ভাল, কি বলেন মাস্টারমশায় ?"

গিরিশবাবু একটু হতাশভাব দেখিয়ে বললেন, "মাদ্রাজে যে-রকম অভ্যর্থনা হয়েছে, আর আমাদের বাংলাদেশে—ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতায় যদি সে-রকম জনসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনা না দেখা যায়, তবে বড়ই লজ্জার কথা।"

এই সময় নব-প্রকাশিত 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ এসে গিরিশবাবুর কথা শুনে বললেন, "কাল দেখবেন স্বামীজীর অভ্যর্থনার জন্য হাজার হাজার লোক যাবে। কলকাতা শহরে এবং আশেপাশে সর্বত্র বড় বড় প্ল্যাকার্ড মারা হয়েছে এবং লক্ষাধিক হ্যান্ডবিল বিলি করা হয়েছে। এতেই নিশ্চয়ই লোক হবে।"

শচীনবাবু বললেন, "কমিটি থেকে দুটি বিরাট তোরণ করা হয়েছে, একটি শিয়ালদায়—হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে, আর একটি রিপন কলেজের সম্মুখে। এই সমস্ত রাস্তা আমরা স্টেশন থেকে রিপন কলেজ পর্যন্ত পতাকা, ফুল, লতাপাতা দিয়ে সাজিয়েছি।"

যাই হোক, প্রায় শেষ রাত্রিতে—ভোর পাঁচটার সময় আমি স্টেশনে গিয়ে পেঁছাই স্বেচ্ছাসেবকরূপে, তখন দেখি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করা দায়—এত বিরাট জনতা। হ্যারিসন রোডে কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির কাছ থেকে [স্টেশন পর্যন্ত] সমস্ত বাড়ির অধিবাসীরা ফুল পতাকা লতাপাতা দিয়ে সাজিয়েছিল। এদিকে সঙ্কীর্তনের দল, নানা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের দল এবং বিরাট জনতা। কোনরকমে স্বেচ্ছাসেবকদের চিহ্ন থাকাতে মাননীয় চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নির্দেশে আমরা প্ল্যাটফর্মে স্বামীজীর জন্য নির্দিষ্ট স্পেশাল কামরার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

যখন স্বামীজীর সেই স্পেশাল ট্রেন এল, তখন মাননীয় আনন্দ চার্লু ভিড়ের ঠেলা-ঠেলিতে পড়েই গেলেন, স্বেচ্ছাসেবকেরা কোন রকমে তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল। তখন চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয় আমাদের আদেশ দিলেন, "তোমরা স্বামীজীকে বেষ্টন করে আমরা যে রাস্তা দেখাচ্ছি, সেই রাস্তা দিয়ে আমাদের অনুসরণ করে নিয়ে যাবে।" আমরা তদনুসারে স্বামীজীকে ঘিরে ঘিরে চললাম। কামরা থেকে যখন স্বামীজী নামেন, তখন প্রণাম করতেই বললেন, "That's all right." (বেশ, বেশ।)

স্বামীজী পেঁছানোমাত্রই চারিদিকে স্বামীজীর জয়ধ্বনি উঠতে লাগল। চারুবাবু নির্দেশ দিলেন কোচম্যানকে ঘোড়া খুলে দিতে এবং আমাদের গাড়ি টেনে নিয়ে যেতে বললেন। স্বামীজী তাতে আপত্তি করলেন, কিন্তু চারুবাবু বললেন, "আমরা আপনাকে সম্বর্ধনা করছি, আপনার আপত্তি টিকবে না। এরা রিপন কলেজ পর্যন্ত অনায়াসে আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে।"

তখন স্বামীজী ফুলমালা-সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে সকলকে প্রণাম করতে লাগলেন। ক্যাপটেন সেভিয়ার, মিসেস সেভিয়ার, গুডউইন সাহেব ফিটনে উপবিষ্ট। ফিটনের পিছনে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঠাকুর ও স্বামীজীর জয়ধ্বনি করছেন। যখন আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ের কাছে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর বাসভবনের সম্মুখে লোকের ভিড়ে ফিটন দাঁড়িয়ে ছিল তখন আমরা দেখি ত্রিতলের বারান্দা থেকে গোঁসাইজী স্বামীজীকে জোড়হস্তে প্রণাম করছেন। স্বামীজীও তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রণাম করলেন।

অতিকষ্টে স্বামীজীকে কোন রকমে পুরাতন রিপন কলেজের সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হলো। সামান্য একটি ক্ষুদ্র বারান্দায় টেবিল চেয়ার দিয়ে স্বামীজীকে বসানো হলো। সেখানে বক্তৃতা করা অসম্ভব। স্বামীজী শুধু দাঁড়িয়ে ইংরেজীতে বললেন, "তোমাদের উৎসাহে এবং সম্বর্ধনায় আমি মুগ্ধ হয়েছি, আনন্দিত হয়েছি। এখানে বক্তৃতা করা অসম্ভব। তোমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভা ভঙ্গ হোক।"

তখন ফেরবার সময় দেখি, আমার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র লোকের দ্বারা প্রায় পিষ্ট হয়ে পড়েছেন। তাঁকে কোনরকমে তুলে বার করে দেওয়া হলো। আমাদের এবং যুবকদের এত উৎসাহ যে আমরা বললাম, পশুপতি বসুর বাড়ি পর্যন্ত এই ফিটন আমরা টেনে নিয়ে যাব। এইভাবে যখন আমরা তাঁকে টেনে নিয়ে যাই, তখন রাস্তার এক পাশে দেখি, স্বামী সুবোধানন্দ (খোকা মহারাজ) দাঁড়িয়ে আছেন, অন্যদিকে লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ)—জনতার মধ্যে দূরে থেকে তাঁরা স্বামীজীকে দর্শন করছেন।

কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে পূর্ণবাবুর বাড়ির সামনে স্বামীজী ফিটন থামাতে বললেন এবং স্যারদা মহারাজকে বললেন, "পূর্ণ-ভাইকে খবর দে।" পূর্ণবাবু তখন স্নান করছিলেন, সেই ভিজে কাপড়েই স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন, "আমি স্টেশনেই আপনাকে দূরে থেকে দর্শন করে চলে আসি আপিস যেতে বেলা হবে বলে।" স্বামীজী বললেন, "সন্ধ্যের পর যাস। দেখা করিস।"

আমরা জয়ধ্বনি করতে করতে পশুপতি বসুর বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি টেনে নিয়ে গেলাম। সেখানেও পুষ্প-সজ্জিত বিরাট তোরণ। ফটকের সামনে পশুপতি বসু প্রভৃতি স্বামীজীকে প্রণাম করে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী যোগানন্দ সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর গলায় পুষ্পমালা পরিয়ে দিলেন। স্বামীজী দুজনকেই প্রণাম করলেন, বললেন, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।" মহারাজও প্রণাম করে উত্তর দিলেন, "জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।" মাস্টারমহাশয় এসে প্রণাম করতেই স্বামীজী হেসে বললেন, "সখি রে!" তারপর নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু প্রণাম করতেই "এ যে বিন্দে-দূতী দেখছি" বলে তাঁদের সঙ্গে নানারকম রহস্যালাপ করতে লাগলেন। সেখানে নিচে এক পাশে এক বেঞ্চিতে হুটকো গোপাল বসেছিলেন।

স্বামীজী তাঁকে দেখে বললেন, "ওরে হুটকো, আমি সেই নরেনই আছি। ওখানে লুকিয়ে আছিস কেন, এদিকে আয়। বাঙলা বুলি ভুলিনি।"

এইভাবে দশ মিনিট কাল অতিবাহিত হলে পশুপতি বসু প্রভৃতি স্বামীজীকে ভেতরে নিয়ে যেতে এলেন।

উপরে উঠেই গিরিশচন্দ্র স্বামীজীর গলায় একটা মালা পরিয়ে দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় স্বামীজী গিরিশবাবুর হাত ধরে বললেন, "ও কি, জি. সি.[১]। এতে যে আমার অকল্যাণ হবে। তোমার রামকৃষ্ণকে 'জয় রাম' বলে সাগর পার করে দিয়েছি।"

গিরিশবাবু স্বামীজীর দিকে তাকিয়ে আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেছেন। এমনকি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিতরে সে আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছিল; এত অভিভূত হয়েছিলেন যে, তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না। তখন স্বামীজী মাস্টারমহাশয়ের সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। মাস্টারমহাশয়কে সম্বোধন করে বললেন, "মাস্টার-মশায়, এসব যা দেখছেন (পাশ্চাত্যবিজয়), আমি নিমিত্তমাত্র। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। আর ঠাকুর যে আমাকে ইঙ্গিত করেছিলেন আমাদের মা-ঠাকরুনকে তা জানিয়ে তাঁর অনুমতি ও আদেশ চেয়েছিলাম। যার আশীর্বাদে অনায়াসে সব বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে আমি হলাম সেখানকার (পাশ্চাত্য দেশের) বড় বড় জ্ঞানী পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক সহস্র সহস্র নরনারীর কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তি। সবই অনুভব করছি, সেই ঠাকুরের খেলা। অনেক কথা বলবার আছে, পরে এক সময় আপনাকে বলব। কিন্তু এখন আমার মত এই—এদেশে ধর্মপ্রচার অনেক হয়েছে, এখন চাই শিক্ষা। সাধারণ মানুষ যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতে পারে, পেট ভরে দুমুঠো খেতে পারে, লেখাপড়া শিখে জীবিকা অর্জন করতে পারে—এই হচ্ছে বর্তমান ভারতের বিশেষ প্রয়োজন। মাস্টারমশায়, যখন ওদেশে ঐশ্বর্য চোখে পড়ত, তখন দেশের দুরবস্থা ভেবে আমার কান্না পেত, আর মেঘদূতের শ্লোক[২] মনে হতো। চারদিকে বিদ্যুতের মতো সুন্দরীর দল, আকাশস্পর্শী প্রাসাদোপম বাড়ি দুধারে, সেই সব বাড়ি হাস্য-কৌতুক, নৃত্য-সঙ্গীত প্রভৃতিতে মুখরিত। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; আর আমাদের দেশে চারিদিকে আবর্জনা, দুর্গন্ধ, অর্ধ-উলঙ্গ মানুষ—শ্রীহীন, ক্ষীণদৃষ্টি, নিরক্ষর নরনারী। দেখে আমার মনে হলো, এদের সেবা করাই ভারতের বর্তমান ধর্ম। 'খালি পেটে ধর্ম হয় না', ঠাকুর বলতেন না? এই

১ গিরিশবাবুকে সাধারণতঃ স্বামীজী 'জি. সি.' বলে সম্বোধন করতেন।

২ বিদ্যুত্বন্তং ললিত-বনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সংগীতায় প্রহত-মুরজা স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ ॥

(সেবা) ধর্ম প্রচার করাই আমার লক্ষ্য। পাশ্চাত্য দেশের সব প্রলোভন থেকে ঠাকুর আমাকে রক্ষা করেছেন। আর আশ্চর্য কাণ্ড—কেউ কেউ ঠাকুরের ভাব আগে থেকেই জেনে বসে আছে, কেউ বা স্বপ্নে। আমি সে দেশে মেয়েদের দেখেছি মা-বোনের মতো। তাদের মধ্যে অনেকে আমাকে মা-বোনের মতোই সেবা করেছে। ভোগভূমি পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম প্রচারের প্রয়োজন। আর এদেশে সেখানকার বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, উন্নত চিন্তাগুলি, সামাজিক স্বাধীনতা—ধর্মের ভিত্তির ওপর প্রচার করতে হবে।"

এমন সময় শ্রীমহারাজ এসে বললেন, "তোমার চা-টা খাবার ব্যবস্থা হয়েছে।" স্বামীজী বললেন, "রাজা, বিজয়বাবুকে দেখলাম আসবার সময়। তাঁকে মঠে এনে রাখতে পারলি না?" রাজা মহারাজ বললেন, "এখন তাঁর বহু শিষ্য-শিষ্যা। আমাদের শোবার জায়গা হওয়াই মুশকিল। তিনি একলা থাকতেন, সে আলাদা কথা।" স্বামীজী বললেন, "আমি শিগ্‌গির তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

যেদিন স্বামীজী প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর হ্যারিসন রোডের বাড়িতে যান, সেদিন আমি জানতে পেরে পূর্বেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। দেখি—গোঁসাইজীর সম্মুখে একটি পৃথক আসন রাখা হয়েছে। স্বামীজী যে সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন, সেই সময়ের জন্য গোঁসাইজী প্রতীক্ষা করছিলেন। গোঁসাইজীর কাছে তখন দশ-পনের জন লোক উপস্থিত ছিল। কিন্তু যখন স্বামীজী ওপরে এলেন, তখন বেজায় ভিড়। উভয়ে উভয়কে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন—অনেকক্ষণ। গোঁসাইজী বললেন, "জয় রামকৃষ্ণ। আপনার ভেতর তিনিই সব করছেন। আমি ঢাকায় দেখেছি, উপাসনা করছি, আমার পার্শ্বে তিনি অঙ্গ স্পর্শ করে রয়েছেন। যখন দক্ষিণেশ্বরে যাই, পঞ্চবটীতে এবং তাঁর ঘরে তাঁকে দর্শন করতে পাই।"

গোঁসাইজীকে আমি পঞ্চবটীতে প্রদক্ষিণ করতে দেখেছি এবং ঠাকুরের ঘরেও সেরকম ঊর্ধ্ববাহু হয়ে "জয় রামকৃষ্ণ" বলে নৃত্য করছেন—দেখেছি।

স্বামীজী বললেন, "আমিও পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে এই রকম অনেক দেখেছি এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি, আমি নিমিত্তমাত্র, তিনি আমার ভেতর দিয়ে কাজ করছেন।"

গোঁসাইজী বললেন, "অদ্ভুত কাণ্ড। একদিন দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে গেছি, লোকজন বিশেষ কেউ ছিল না। একাকী বসে আছেন, ভাবস্থ। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেই বললেন, 'তোমার উপাসনা ধ্যানট্যান হচ্ছে তো? দেহের ছয় রিপু বিবেক-বৈরাগ্যের পথে বড় অন্তরায়।' উত্তরে বললাম, 'আমার কিন্তু কামদমন হয়নি।' তখন ঠাকুর বললেন, 'সে কি! এত ভগবানের নাম নিচ্ছ, কামদমন হয়নি'? তখন তিনি আমাকে স্পর্শ করে বললেন, 'যা সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবে যা'—বলেই সমাধিস্থ। আমিও আমার দেহের মধ্যে এক বৈদ্যুতিক শক্তি অনুভব করলাম।"

স্বামীজী বললেন, "স্পর্শমাত্রেই যে তিনি শক্তি সঞ্চার করতেন, তা তো আমি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছি। আমার ইচ্ছা ভারতবর্ষে কয়েকটি আশ্রম স্থাপন করি। সম্প্রতি মাদ্রাজ, কলকাতা ও কাশীতে স্থাপিত হচ্ছে। আমার ইংরেজ বন্ধু সেভিয়ার-দম্পতি হিমালয়ে নির্জনে একটি আশ্রম স্থাপন করতে চাইছেন। স্থান খোঁজা হচ্ছে, এখনো ঠিক হয়নি। তাঁদের ইচ্ছা পবিত্র হিমালয়ে আশ্রম স্থাপন করবেন এবং সেখানে তাঁরা ভগবৎ-উপাসনায় জীবন অতিবাহিত করবেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য দু-একজন সাধু-ব্রহ্মচারীও থাকবে। আপনি আশীর্বাদ করুন, আপনি জ্যেষ্ঠ—গুরুবৎ পূজনীয়, যাতে এই সংকল্পগুলি শীঘ্র কাজে পরিণত করতে পারি।"

গোঁসাইজী উত্তরে বললেন, "আপনি সিদ্ধসংকল্প-পুরুষ; যা সংকল্প করবেন, তাই সিদ্ধ হবে। আর এই সংকল্প আপনার নয়, তিনিই আপনার ভেতরে এই সংকল্প উদয় করে দিচ্ছেন।"

এই প্রসঙ্গের পর ঠাকুরের দিব্যভাবের কথা বলতে বলতে উভয়েই ভাবে অভিভূত হলেন। পরে দুজন দুজনকে আবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। তারপর স্বামীজী চলে এলেন।

এই পুণ্য ছবি আমার স্মৃতিপটে এখনো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী ডাক্তারদের পরামর্শমতো দার্জিলিং-এ স্বাস্থ্য-পরিবর্তনে গিয়েছিলেন। এপ্রিল মাসের ২০[৩] পূজ্যপাদ স্বামী যোগানন্দের কাছে শুনলাম স্বামীজী পরদিন প্রাতে দার্জিলিং মেলে কলকাতায় পৌঁছবেন। হঠাৎ তাঁর আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "মহারানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উৎসব উপলক্ষে অন্যান্য রাজার সঙ্গে খেতড়ির মহারাজা অজিত সিং বিলেতে যাবেন। তাঁর ইচ্ছা যে তাঁর গুরুদেবকে তাঁর সঙ্গে বিলেতে নিয়ে যান। সমুদ্রবায়ু সেবনে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে বলে স্বামীজীরও নাকি তাঁর সঙ্গে যাবার ইচ্ছা।"

২৫ এপ্রিল[৪] দার্জিলিং মেল আসবার সময় শেয়ালদায় গিয়ে দেখি অপূর্ব ব্যাপার। বড় বাজারের প্রায় সমুদয় মারোয়াড়ী-সম্প্রদায় সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে খেতড়ির মহারাজার প্রজা। স্বামীজী গাড়ি থেকে প্ল্যাটফর্মে নামামাত্রই মহারাজা অজিত সিং তাঁকে প্রণাম করে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করলেন। ইংরেজীতে একটি ক্ষুদ্র অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হলো। স্বামীজী অতি সংক্ষেপে দুই-এক কথায় তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে জবাব দিলেন। পরে খেতড়ির মহারাজার সঙ্গে তাঁর বড়বাজারের বাসভবনে চলে গেলেন। ঐখানে শুনতে পেলাম, সেদিন বিকালে স্বামীজী খেতড়ির মহারাজাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ও আলমবাজার মঠে যাবেন।

৩ কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতি এখানে একটু বিভ্রান্তিকর। কারণ তারিখটি হবে মার্চ মাসের ২০ তারিখ (১৮৯৭)।—সম্পাদক।

৪ তারিখটি হবে ২১ মার্চ, ১৮৯৭—সম্পাদক।

উক্ত দিবস অপরাহ্নে আমি বাগবাজারের শেয়ারের গাড়িতে আলমবাজারে যাচ্ছি, সেসময় পূজনীয় মাস্টারমহাশয় (শ্রীম)-এর সঙ্গে দেখা হলো। গাড়ি বরানগরে পৌঁছলে মাস্টারমহাশয় উক্ত গাড়োয়ানকে আমাদের দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে দিতে বললেন। আমরা গিয়ে যখন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হলাম, তখন স্বামীজী ও মহারাজা অজিত সিং তাঁর সেক্রেটারি-সহ কালীমন্দির ও রাধাকান্তের মন্দির দর্শন করে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের অভিমুখে যাচ্ছেন। আমি ও মাস্টারমহাশয় তাঁদের পশ্চাৎ অনুসরণ করলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত। যে ছোট খাটে ঠাকুর বসতেন তাও পুষ্পমালায় সুশোভিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল দাদা প্রভৃতিও সেখানে প্রবেশ করলেন। ঘরে প্রবেশ করেই স্বামীজী ঐ ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লুটিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে লাগলেন। খেতড়ির মহারাজা পর্যন্ত দ্বার-সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। কেউই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস করলেন না। স্বামীজী এইপ্রকার তিনবার গড়াগড়ি দিয়ে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে লাগলেন। পরে যুক্তকরে ঠাকুরের সম্মুখে একপাশে অনিমেষনেত্রে ভাবগম্ভীর নয়নে তাঁকে দেখতে লাগলেন। তখন খেতড়ির মহারাজা প্রভৃতি সকলেই স্বামীজীর আদর্শ অনুসরণ করে লুটিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। সকলের প্রণাম হয়ে গেলে স্বামীজী খেতড়ির মহারাজাকে পঞ্চবটীর দিকে নিয়ে চললেন।

পঞ্চবটীর তলায় এসে স্বামীজী অপূর্বভাবে বিভোর হলেন। পঞ্চবটী প্রদক্ষিণ করে একটু ধ্যানস্থ হয়ে বসলেন। পরে বালকের মতো আনন্দে পঞ্চবটীর একটি ডালে বসে ঝুলতে লাগলেন। মহারাজাকে সম্বোধন করে বললেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ছিলেন, তখন আমরা এই রকম গাছে দোল খেতাম, আনন্দ করতাম। আজ সেই কথা স্মৃতিপথে উদিত হচ্ছে। দেখ, এই গঙ্গাতীরে কী অপূর্ব দৃশ্য, কী সুন্দর পরিবেশ!" পরে সকলেই সেখানে স্বামীজীর সঙ্গে বসে ধ্যান করতে লাগলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্বামীজী উঠে পড়লেন। পুনরায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের উত্তর দিকে সম্মুখের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

সেই সময় শ্রীযুক্ত রামলাল-দাদা প্রভৃতি পুরোহিতগণ নারিকেলে পৈতা জড়িয়ে স্বস্তিবাচন পাঠ করে মহারাজা অজিত সিংকে পুষ্পমাল্য-সহ নারিকেল অর্পণ করলেন। তিনিও নতমস্তকে তা গ্রহণ করে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। এমন সময় একটি সুন্দর গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ যুবক এসে স্বামীজীকে প্রণাম করে পদধূলি গ্রহণ করল। স্বামীজী তাকে দেখে বললেন, "কি রে তোর বাবা কোথায়?" বালক উত্তর করল, "কুঠিঘরের বৈঠকখানায় বসে আছেন।" "তোর বাবা এল না কেন?" বালক নিরুত্তর রইল। স্বামীজী একথা বলে মহারাজাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে আলমবাজার মঠের দিকে চলে গেলেন। শুনলাম, বালকটি ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের পুত্র।

আমি এবং মাস্টারমহাশয় যখন আলমবাজারে পৌঁছলাম, তখন মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরঘরে

পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বামী শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি করছিলেন। মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা সমবেত কণ্ঠে স্তোত্র উচ্চারণ করছিলেন। মাঝে মাঝে স্বামীজীর "জয়গুরু, জয়গুরু" হুঙ্কারে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিকভাবের তরঙ্গে সকলের হৃদয় উদ্বেলিত হচ্ছিল। আরতি শেষ হলে স্বামীজী ও মহারাজা অজিত সিং এবং সকলেই ভূমিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরঘরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। পূজ্যপাদ স্বামীজী—মহারাজা অজিত সিং ও গুরুভ্রাতাদের নিয়ে বহিঃপ্রকোষ্ঠের লম্বা ঘরে উপবেশন করলেন। আমি ও মাস্টার-মহাশয় সেখানে উপবেশন করলাম। স্বামীজী মাস্টারমহাশয়ের সঙ্গে খেতড়ির মহারাজার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ঠাকুরের কথা এবং স্বামীজীর শারীরিক অবস্থার আলোচনা চলতে লাগল। স্বামীজী সেই সময়ে প্রকাশ করলেন, "আমার তো ইচ্ছা ছিল, মহারাজার সঙ্গে বিলেত চলে যাই। জাহাজে সমুদ্রের বায়ুতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে। সব বড় ডাক্তারদের দেখিয়ে পরামর্শ নেওয়া হলো, কিন্তু কেউ আমার যাওয়া অনুমোদন করছে না। বরং তারা বলে, শিগ্গির আলমোড়া যেতে, কারণ বর্ষাকালে দার্জিলিং-এর আবহাওয়া ভাল থাকে না।"

অজিত সিং সকলের সম্মুখেই প্রকাশ করলেন, "আমার বিশ্বাস স্বামীজীর বর্তমান স্বাস্থ্য সমুদ্র-ভ্রমণে অনেকটা ভাল হবে। কিন্তু ডাক্তারদের কি অভিমত বুঝতে পারি না। যাই হোক আগামীকাল সাহেব-ডাক্তার যা বলবেন, তাই করা হবে।"

তারপর দু-একটি ভজন গান গেয়ে স্বামীজী খেতড়ির মহারাজার সঙ্গে তাঁর বাসভবনে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে প্রসাদ দেওয়া হলো। আমি ও মাস্টারমহাশয় ধীরে ধীরে আলমবাজার মঠ থেকে বরানগর পর্যন্ত হেঁটে গেলাম।

পরদিন অপরাহ্নে (বোসপাড়ায়) শ্রীশ্রীমার বাড়িতে পূজ্যপাদ যোগেন মহারাজের কাছে বসে আছি, এমন সময় বৃদ্ধ সাধু—দীনু মহারাজ এসে যোগেন মহারাজকে বললেন, "স্বামীজী একলা আসছেন।" কথা শেষ হতে না হতেই স্বামীজী এসে উপস্থিত। স্বামী যোগানন্দ স্বামীজীকে দেখে আনন্দে বললেন, "তুমি আসতে পেরেছ?"

স্বামীজী বললেন, "আমার বিলেতে যাওয়া হলো না—ডাক্তারদের সকলেই অমত করলেন—এমনকি শশী ও বিপিন ডাক্তার পর্যন্ত। তাঁদের পরামর্শ যে আমি আলমোড়াতে চলে যাই। কাল দার্জিলিং চলে যাচ্ছি রাজা (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রভৃতি সবাইকে নিয়ে। দু-চার দিনের মধ্যে ফিরে আসব। একবার মাকে প্রণাম করে যাই [স্বামীজী দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে আলমোড়া গিয়েছিলেন]।"

যোগেন মহারাজ গোলাপ-মাকে ডেকে বললেন, "স্বামীজী এসেছেন, মা ঠাকরুনকে দর্শন করবেন।" এই কথার পর স্বামীজী মাকে দর্শন করতে চললেন। আমরা দু-একজন তাঁকে অনুসরণ করলাম। তেতলায় শ্রীশ্রীমার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় স্বামীজী দাঁড়িয়ে রইলেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললেন, "তোরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবি, মার পাদপদ্ম স্পর্শ করবি না। মা এত করুণাময়ী যে, স্পর্শমাত্রই পাপ-তাপ গ্রহণ করে নেন।"

এমন সময় গোলাপ-মা বললেন, "নরেন, মা এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন।" স্বামীজী অমনি দুই বাহু প্রসারিত করে লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন, দ্বারসম্মুখে মা দাঁড়িয়ে ছিলেন। ধীরে ধীরে উঠে মাকে বললেন, "মা, কাল আবার দার্জিলিং যাচ্ছি।"

শ্রীশ্রীমা ধীরে ধীরে অনুচ্চস্বরে বললেন, "দার্জিলিং-এ কেমন ছিলে বাবা?"

স্বামীজী বললেন, "মা, সেখানে খুব যত্নে ভাল ছিলাম। আমার তো মনে হয় শরীর খুব ভাল আছে। ওখানে মহেন্দ্রবাবু এবং তাঁর স্ত্রী আমায় খুব যত্ন করেছেন। আর এই গরমে দার্জিলিং বেশ ঠাণ্ডা এবং বেড়াতে বেশ আনন্দ বোধ হয়। আমি বেশ বেড়াই এখন। খেতড়ির মহারাজা আমাকে বিলেত নিয়ে যাবে বলে আমাকে চিঠি লিখে ব্যস্ত করে তুলেছিল। কিন্তু এখানকার ডাক্তাররা সকলেই বিলেতে যেতে নিষেধ করলে। তারা বলেছে আলমোড়া-নৈনিতালে যেতে। তাই শিগ্‌গির দার্জিলিং থেকে আবার ফিরে আসব। মা, আশীর্বাদ করুন যেন আমি ঠাকুরের যে কাজ আরম্ভ করেছি, সে কাজ শেষ করতে পারি।"

মা উত্তরে ধীরে ধীরে বললেন, "বাবা, ঠাকুর তোমায় দেখছেন। ঠাকুরের শক্তি তোমার ভিতর খেলা করছে। তাঁর কাজের জন্য তোমায় এনেছেন।"

স্বামীজী বললেন, "মা, ঠাকুর তো দেখছেন, তুমিও আমায় আশীর্বাদ কর, কৃপা কর। ঠাকুর ও তোমার কৃপাই আমার সম্বল।" "জয় মা, জয় মা"—বলে স্বামীজী আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

গোলাপ-মা স্বামীজীকে সম্বোধন করে বললেন, "মা প্রসাদ দিলেন।" স্বামী যোগানন্দ সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, "এই প্রসাদ স্বামীজীর গাড়িতে দাও।"

স্বামীজী নিচে চলে এসে বললেন, "ভাই যোগেন, চললাম। আবার তো আসছি। এইবার এসে কাজ শুরু করে তারপর অন্যত্র গমন। কাজ শুরু না করে আমি অন্যত্র যাব না। ডাক্তাররা যাই বলুক।"

আমরা সকলে স্বামীজীকে প্রণাম করলাম। স্বামীজী খেতড়ির মহারাজার গাড়ি করে চলে গেলেন।[৫]

৫। প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকার Vol. LVII (১৯৫২) সংখ্যায় প্রকাশিত কুমুদবন্ধু সেনের মাতৃস্মৃতি 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে (১৯৮৫) অনূদিত (অনুবাদ : সুদীপ বসু) আকারে বেরিয়েছে। সেখানে মা ঠাকরুন এবং স্বামীজীর এই সাক্ষাতের কিছু অতিরিক্ত তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় তা উদ্ধৃত করা হলো (পৃঃ ৭৪৯) :

গোলাপ-মা। মা বলছেন, ঠাকুর সর্বদাই তোমার সঙ্গে আছেন। তোমাকে সমাজের উন্নতির জন্য আরও অনেক কিছু করতে হবে।

স্বামীজী। মা, আমি পরিষ্কার দেখছি, মনেপ্রাণে অনুভব করছি যে, আমি ঠাকুরের হাতের যন্ত্র ছাড়া কিছু নই। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, কি করে এইসব ব্যাপার সম্ভব হচ্ছে, কি করে পাশ্চাত্যের স্ত্রীপুরুষে ঠাকুরের বাণী প্রচারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে

'উদ্বোধন' প্রকাশের দিন (১৪ জানুয়ারি, ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দ) এখনো স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কি অদম্য উৎসাহ, কি মহোচ্চ আদর্শ, কি বৈদ্যুতিক প্রেরণা এবং কি অনাবিল আনন্দ যে সেদিন কতিপয় শিক্ষিত বাঙালী যুবকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছিল! স্বামীজীর লিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করে তাঁদের নয়নসম্মুখে বাংলা তথা ভারতের এক ভাবী সমুজ্জ্বল ছবি উদিত হয়েছিল। ক্ষুদ্র পাক্ষিক পত্রিকা—সামান্য পুঁজি, পরগৃহে অফিস ও ছোট ছাপাখানা, তবুও এর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনায় প্রস্ফুটিত হতে লাগল। কারণ এর পশ্চাতে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল আধ্যাত্মিক মহাশক্তি, স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব প্রেরণা ও প্রদীপ্ত উৎসাহব্যঞ্জক বাণী এবং সর্বত্যাগী পরহিতব্রতী রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের সুদৃঢ় সংকল্প, নিষ্কাম কর্ম-প্রচেষ্টা এবং অসাধারণ অধ্যবসায়। মনে পড়ে 'উদ্বোধনে'র সর্বপ্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের কথা।···পত্রিকায় কোন প্রকার ভ্রম-প্রমাদ বা প্রুফ দেখতে ভুল-ত্রুটি থাকলে কিংবা অশুদ্ধ শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ করলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে বিশেষভাবে [স্বামীজীর] তিরস্কার সহ্য করতে হতো। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একদিন এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। অধ্যাপক মোক্ষমুলর ও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজীর লিখিত একটি প্রবন্ধ 'উদ্বোধনে' তখন

আসছে! মা, আপনার আশীর্বাদ নিয়ে আমি আমেরিকা গিয়েছিলাম। তারপর যখন বক্তৃতা করে সেখানকার লোকেদের মুগ্ধ করতে পারলাম, তাদের কাছ থেকে বিরাট সম্বর্ধনা পেলাম, তখন বুঝতে পারলাম মায়ের আশীর্বাদের ফলেই এই অলৌকিক কান্ড ঘটেছে। যখন একান্তে থেকেছি, তখন স্পষ্টই অনুভব করেছি, ঠাকুর যাঁকে বলতেন মা-কালী, তিনিই আমায় পথ দেখিয়েছেন।

মায়ের উত্তর গোলাপ-মা স্বামীজীকে জানালেন, "ঠাকুর মা-কালীর থেকে পৃথক নন। ঠাকুরই এই বিরাট জিনিসগুলি তোমাকে দিয়ে করিয়েছেন। তুমিই তাঁর নির্বাচিত শিষ্য এবং সন্তান। তোমার প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা, তিনি সকলকে বলেই গিয়েছিলেন, তুমি একদিন পৃথিবীর আচার্য হবে।"

গভীর আবেগের সঙ্গে স্বামীজী বললেন, "মা, আমি তাঁর বাণী প্রচার করতে চাই, আর সেজন্য যত শীঘ্র সম্ভব একটি সঙ্ঘ স্থাপন করতে চাই। কিন্তু যত দ্রুত তা করতে চাইছি, ততটা দ্রুত পারছি না বলে কষ্ট পাচ্ছি।"

মা এবার নিজেই কোমল স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন, "চিন্তা করো না। তুমি যা করেছ, আর যা করবে সবই চিরকালের জিনিস। এই কাজের জন্যই তুমি এসেছ হাজার হাজার মানুষ তোমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আচার্য বলে গ্রহণ করবে। স্থির জেনো, ঠাকুর শীঘ্রই তোমার ইচ্ছা পূরণ করবেন। দেখবে অল্পদিনের মধ্যে তোমার ভাব কার্যকরী হচ্ছে।"

প্রার্থনার সুরে স্বামীজী বললেন, "মা, আশীর্বাদ করুন, আমার কাজের পরিকল্পনা যেন শীঘ্র রূপায়িত হচ্ছে দেখতে পাই। কাল দার্জিলিং-এ ফিরে যাচ্ছি। কলকাতায় এসেছিলাম খেতড়ির মহারাজার অনুরোধে।" এই কথাকটি বলে স্বামীজী আবার মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

সদ্য প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে স্বামী ত্রিগুণাতীত বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হলে তাঁকে দেখেই 'উদ্বোধনে' তাঁর লিখিত প্রবন্ধের ভ্রম-প্রমাদের কথা উল্লেখ করে তাঁর লাঞ্ছনার সীমা রাখলেন না। স্বামী ত্রিগুণাতীত বললেন, "কি রকম মূর্খ নিয়ে কাজ করতে হয় তাতো বুঝতে চাও না!" স্বামীজী বললেন, "ওসব কথা রেখে দে—তোরা যখন কাজ হাতে নিয়েছিস তখন তাতে গলদ থাকবে কেন? তাদের মানুষ করবার কি চেষ্টা করেছিস? এদেশের লোকই কেবল দোষ ঢাকবার জন্য ওজরের ওপর ওজর তোলে। ওদেশে কম্পোজিটাররাও বিদ্বান নয়—যারা ম্যানেজার, যারা কাজের ভার গ্রহণ করে, তারা কাজটি নিখুঁত করবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ নির্ভুল না হয়, ততক্ষণ তারা নাছোড়বান্দা। এদেশে দেখি ছাপা হলেই হলো—তাতে ভুল-ত্রুটি থাকে থাকুক। একটি শব্দের এদিক ওদিক হলে লেখার ভাব বা অর্থ একেবারে উল্টে যায়। কত সাবধানে প্রুফ দেখতে হয়। তোরা কাগজে যদি ভুল-ভ্রান্তি ছাপবি—তবে উন্নতিটা কি হলো বল?" স্বামী ত্রিগুণাতীত নিরুত্তর রইলেন। প্রেস ও পত্রিকা দুটির জন্য স্বামী ত্রিগুণাতীতকে কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে—বিশেষ কম্পোজিটার প্রভৃতির সন্ধানে তাঁকে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরতে হচ্ছে শুনে গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দকে প্রেসটি বিক্রয় করবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও জিদ করলেন। অবশেষে প্রেস বিক্রয় করা হলো। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মনোনিবেশ করলেন।

আজ যে চলিত ভাষায় সাহিত্যের প্রসার হয়েছে—তার প্রেরণা যুগিয়েছে স্বামীজীর বাঙলা রচনা। 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার কথা' ও 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়ে, হাজার হাজার শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে প্রেরণা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কিছু দিন পরে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একদিন রাত্রি আটটার পর বর্তমান লেখকের কাছে এসে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থখানি চাইলেন। লেখক বললেন, "কেন—যখন আমি কতবার আপনাকে তা পড়বার জন্য সেধেছি, প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাঙলায় স্বামীজী বঙ্গসাহিত্যের কেমন নবরূপ দিয়েছেন—তা পড়ে দেখুন—বলে বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি পড়তে চাননি। আজ হঠাৎ কি প্রয়োজন হলো?" দীনেশচন্দ্র বললেন, "আমি এইমাত্র রবিবাবুর [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের] কাছ থেকে তোমার কাছে এসেছি। আজ রবিবাবু বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইখানির অত্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন। আমি তা পড়িনি শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, 'আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই বইখানি পড়বেন। চলিত বাঙলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।' এ ছাড়া তিনি আরও শতমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন।" বইখানি নিয়ে দীনেশবাবু চলে গেলেন।...

তারকনাথ রায়

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে জেলাশাসক হিসাবে কাজ করেছেন। 'পাশ্চাত্যদর্শনের ইতিহাস' (তিন খণ্ড) নামে তাঁর একটি গ্রন্থ আছে।

জীবন সায়াহ্নে উপনীত হয়ে যখনই অতীতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখনই একটি দিনের স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আবির্ভূত হয়। সেদিন স্বামী বিবেকানন্দের চরণতলে উপবিষ্ট হয়ে এক ঘণ্টার অধিককাল তাঁর অমৃতায়মান বচনরাজি শুনবার সৌভাগ্য আমি লাভ করেছিলাম।

১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের কথা। তিন বৎসর পূর্বে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে এন্‌ট্রান্স পাস করে কলেজে পড়তে কলকাতায় এসেছিলাম। শিকাগো ধর্মসভায় এক অখ্যাত অজ্ঞাত হিন্দু সন্ন্যাসীর বিজয়বার্তা সংবাদপত্রে পড়েছিলাম। তারপরে সমগ্র আমেরিকায় স্বামীজীর বিপুল অভ্যর্থনার সংবাদও ভারতের সকল সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল। একদিন সংবাদ এল স্বামীজী দেশে ফিরছেন। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য মাদ্রাজ ও কলকাতায় আয়োজন হতে লাগল। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব কলকাতায় অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক অথবা সভাপতি হয়েছিলেন। যেদিন স্বামীজী শিয়ালদহে এসে পৌঁছান, সেদিন দলে দলে লোক তাঁকে দেখবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়েছিল। আমিও গিয়েছিলাম। এক সুশোভিত গাড়িতে স্বামীজীকে উঠিয়ে কয়েকজন উৎসাহী যুবক গাড়ি টানছিলেন। স্বামীজী গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে যুক্তকরে উভয় পার্শ্বের অগণিত জনসঙ্ঘের অভ্যর্থনা স্বীকার করছিলেন। দেখলাম, হ্যারিসন রোডের উপরের এক দ্বিতল গৃহের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক জটাধারী সন্ন্যাসী উভয় বাহু উত্তোলন করে স্বামীজীকে আশীর্বাদ করলেন; এবং স্বামীজী তাঁর দিকে চেয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। অনুসন্ধানে জানলাম, জটাধারী শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। এরপর শোভাবাজার রাজবাড়িতে যে বিরাট জনসভায় স্বামীজীকে অভিনন্দন দেওয়া হয়, সে সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু দূর থেকে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনতে পাইনি। স্টার থিয়েটারে ও আরও দুই এক স্থলে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনেছিলাম; কিন্তু ভাল বুঝতে পারিনি। দক্ষিণেশ্বরে এক উৎসবে গিয়ে স্বামীজী স্বহস্তে সাধু সন্ন্যাসীদের খাওয়াচ্ছেন, দেখেছিলাম। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ কোথাও পাইনি।

সে সুযোগ পেয়েছিলাম দেওঘরে। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে দেওঘরে গিয়ে শুনলাম স্বামীজী তখন সেখানে অবস্থান করছেন। একদিন সকালে তাঁর বাসায় উপস্থিত হয়ে শুনতে পেলাম, দ্বিতলে বসে কে উদাত্ত স্বরে গীতা পাঠ করছেন। নিচে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী খড়ম পায়ে

নেমে এলেন। ক্ষণকাল অপলক নয়নে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মনে আছে, বঙ্গবাসী পত্রিকায় স্বামীজীকে অহিন্দু বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছিল। শাস্ত্রবচন উল্লঙ্ঘন করে যিনি শূদ্র হয়েও সন্ন্যাস অবলম্বন করেছিলেন, এবং সমুদ্রপারে ইওরোপ ও আমেরিকায় গমন করে অহিন্দু-স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করেছিলেন, 'বঙ্গবাসী' তাঁকে হিন্দু বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত ছিলেন। পড়ে স্বামীজীর হিন্দুত্ব-সম্বন্ধে আমার মনেও সন্দেহ জেগেছিল। কিন্তু সেই প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে চাইবামাত্র সমস্ত সংশয় অপনীত হলো। মনে হলো আর্যসংস্কৃতি তাঁর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করেছেন। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম এবং আদিষ্ট হয়ে উপবেশন করলাম।

কি বলব ভাবছি। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি জন্য এসেছ?" বললাম, "চরণ দর্শন করতে এসেছি।" স্মিত মুখে বললেন, "আর কিছু নয়?" কি বলব? বললাম, "আপনার মুখে কিছু শুনব ইচ্ছা আছে।" তখন নূতন দর্শনশাস্ত্র পড়ছি। স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত-দর্শন প্রচার করে এসেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে কাকে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন?" হেগেলের দর্শন তখন আমাদের দেশের দার্শনিকদের মধ্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। ভেবেছিলাম, স্বামীজী হেগেলের নাম করবেন। কিন্তু তিনি স্পিনোজাকে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বললেন। স্পিনোজাও অদ্বৈতবাদী কিন্তু মায়াবাদী নন। জগৎ তাঁর কাছে মায়া নয় সত্য। স্বামীজীও জগৎকে অনিত্য বলেছেন, মিথ্যা বলেননি।

অার একটি প্রশ্ন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। না করলেই ভাল করতাম। কেননা, প্রশ্নটি করামাত্র স্বামীজীর মুখে বিরক্তির আভাস দেখতে পেয়েছিলাম। অবতারবাদের কোন সুসংগত দার্শনিক ব্যাখ্যা আমি দেখতে পাইনি। যাঁর ইচ্ছা ও বাস্তবের মধ্যে কোনও ভেদ নেই, যাঁর ইচ্ছাই রূপগ্রহণ করে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, সমগ্র বিশ্বই যাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ, কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁর এক বিশিষ্ট নররূপ ধারণ কিরূপে হতে পারে, তা আমি কখনো বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করলাম, "পরহংসদেবকে আপনি কি অবতার বলে বিশ্বাস করেন?" বললেন, "বিশ্বাস করতে বাধা কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তো কত বিশ্রী কাহিনী বর্ণিত আছে। তা সত্ত্বেও তো তাঁকে আমরা অবতার বলে বিশ্বাস করি। আর এই নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, চিরব্রহ্মচারী, নিরক্ষর অথচ সর্বশাস্ত্রপারদর্শী করুণাময় ব্রাহ্মণকে অবতার বলে বিশ্বাস করতে বাধা কোথায়?" বাধা ছিল আমার ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণায়। কিন্তু আমি তা বললাম না।

এর পরে আমি আর কিছু বলিনি। স্বামীজী তাঁর ইওরোপের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগলেন, "কত বড় জাতি আমেরিকানরা, কত বড় ইংরেজ, ফরাসী ও জার্মানরা। আমরা তাদের তুলনায় কত ছোট। কত ভালবাসে তারা তাদের দেশকে ও জাতিকে। আর আমরা? সংকীর্ণমনা, আত্মসর্বস্ব আমরা দেশের জন্যে এপর্যন্ত

কতটুকু স্বার্থ বিসর্জন করেছি? জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা কত উন্নত। আমরা কত পশ্চাতে পড়ে আছি। কিন্তু চিরদিন আমরা এরূপ ছিলাম না। পূর্বে পরের কাছ থেকে আমরা যতটুকু গ্রহণ করেছি, তা অপেক্ষা অনেক অধিক আমরা জগৎকে দিয়েছি। একসময় আমরা জগতের গুরু ছিলাম। আবার জগতের গুরু আমরা হব। তা-ই ভারতের নিয়তি। চিরকাল ভারত বিদেশীর পদানত হয়ে থাকবে না, তা তার নিয়তি নয়। গত গৌরবের দিন আবার ফিরে আসবে। ইংরেজ তার সভ্যতা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়েছে। কিন্তু আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতি চিরকাল চাপা থাকবে না। ইংরেজী ভাষা চিরকাল ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা থাকবে না। সংস্কৃত আমাদের জাতীয় ভাষা, তা-ই রাষ্ট্রভাষা ও lingua franca হবে। কে বলে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন? আমার ইচ্ছা আছে কয়েকখানা সংস্কৃত প্রাইমার লিখব। কত সহজে সংস্কৃত শিখতে পারা যায়, তা আমি দেখিয়ে দেব।" 'যথা গোমুখীর মুখ হইতে নিঃস্বনে ঝরে পূত বারিধারা।'—আমি সেই পূত বচনধারায় ডুবে রইলাম। অকস্মাৎ তিনি থামলেন। আমিও বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলাম। প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলাম। এরপরে আর তাঁকে দেখিনি।

সন্ন্যাসী স্বামীজী আমাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে উপদেশ দেননি, বেদান্ত অথবা রাজযোগ সম্বন্ধে কিছু বলেননি। এক ঘণ্টা ধরে তিনি যা বলেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে তিনি কিভাবে পুনর্গঠিত করতে চান, আমার মনে তার একটি ধারণা উৎপন্ন করা। স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মসম্মানগর্বী ভারত তাঁর সাধনার বস্তু ছিল। তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সাধনার ফল তাঁর তিরোধানের পরে অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হয়েছিল। মহারাষ্ট্রে তিলক, পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায়, বাংলায় অরবিন্দ তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন অর্ধেক বাস্তবে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমাদের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু আর্য সংস্কৃতির সমগ্র উদ্ধার এখনো হয়নি। যতদিন তা না হবে, ততদিন স্বাধীনতার স্থায়িত্ব সংশয়ের অতীত হবে না।

সুরেন্দ্রনাথ সেন

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (বর্তমানে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরির) সহকারী লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর-ভারত ভ্রমণে যান। বিবেকানন্দ সোসাইটির গোড়ার দিকে সম্পাদক ছিলেন (১৯০৩-১৯০৯)।

২২ জানুয়ারি, ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ। ১০ মাঘ শনিবার। সকালে উঠেই হাত-মুখ ধুয়ে বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ বলরামবাবুর বাড়িতে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হয়েছি। একঘর লোক। স্বামীজী বলছেন, "চাই শ্রদ্ধা ; নিজেদের উপর বিশ্বাস চাই। Strength is life, weakness is death (সবলতাই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু)। আমরা আত্মা, অমর, মুক্ত—pure, pure by nature (পবিত্র, স্বভাবতঃ পবিত্র)। আমরা কি কখনো পাপ করতে পারি ? অসম্ভব। এই রকম বিশ্বাস চাই। এই বিশ্বাসই আমাদের মানুষ করে, দেবতা করে তোলে। এই শ্রদ্ধার ভাবটা হারিয়েই তো দেশটা উৎসন্নে গিয়েছে।"

প্রশ্ন। এই শ্রদ্ধাটা আমাদের কেমন করে নষ্ট হলো ?

স্বামীজী। ছেলেবেলা থেকে আমরা negative education (নেতিমূলক শিক্ষা) পেয়ে আসছি। 'আমরা কিছু নই'—এ শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। আমাদের দেশে যে বড়লোক কখনো জন্মেছে, তা আমরা জানতেই পাই না। Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখানো হয়নি। হাত-পায়ের ব্যবহার তো জানিইনি। ইংরেজদের সাতগুষ্টির খবর জানি, নিজের বাপ-দাদার খবর রাখি না। শিখেছি কেবল দুর্বলতা। জেনেছি যে, আমরা বিজিত, দুর্বল, আমাদের কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নেই। এতে শ্রদ্ধা নষ্ট হবে না কেন ? দেশে এই শ্রদ্ধার ভাবটা আবার আনতে হবে। নিজেদের উপর বিশ্বাসটা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তাহলেই দেশের যত কিছু problems (সমস্যাগুলি) ক্রমশঃ আপনা-আপনিই solved (মীমাংসিত) হয়ে যাবে।

প্রশ্ন। সব দোষ শুধরে যাবে, তাও কি কখনো হয় ? সমাজে কত অসংখ্য দোষ রয়েছে। দেশে কত অভাব রয়েছে, যা পূরণ করবার জন্যে কংগ্রেস প্রভৃতি অন্যান্য দেশহিতৈষী দল কত আন্দোলন করছে, ইংরেজ বাহাদুরের কাছে কত প্রার্থনা করছে। এসব অভাব কিসে পূরণ হবে ?

স্বামীজী। অভাবটা কার ? রাজা পূরণ করবে, না তোমরা পূরণ করবে ?

প্রশ্ন। রাজাই অভাব পূরণ করবেন। রাজা না দিলে আমরা কোথা থেকে কি পাব, কেমন করে পাব ?

স্বামীজী। ভিখিরির অভাব কখনো পূর্ণ হয় না। রাজা অভাব পূরণ করলে সব রাখতে পারবে, সে লোক কই ? আগে মানুষ তৈরি কর। মানুষ চাই। আর শ্রদ্ধা না আসলে মানুষ কি করে হবে ?

প্রশ্ন। মহাশয়, majority-র (অধিকাংশের) কিন্তু এ মত নয়।

স্বামীজী। Majority (অধিকাংশ) তো fools (নির্বোধ)—men of common intellect (সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন), মাথাওয়ালা লোক অল্প। এই মাথাওয়ালা লোকেরাই সব কাজের সব department-এরই (বিভাগেরই) নেতা। এদেরই ইঙ্গিতে majority (অধিকাংশ) চলে। এদেরই আদর্শ করে চললে কাজও সব ঠিক হয়। আহম্মকেরাই শুধু হামবড়া হয়ে চলে, আর মরে। সমাজ-সংস্কার আর কি করবে? তোমাদের সমাজ-সংস্কার মানে তো বিধবার বিয়ে আর স্ত্রী-স্বাধীনতা বা ঐরকম আর কিছু। তোমাদের দু-এক বর্ণের সংস্কারের কথা বলছ তো? দু-চারজনের সংস্কার হলো, তাতে সমস্ত জাতটার কি এসে যায়? এটা সংস্কার না স্বার্থপরতা? নিজেদের ঘরটা পরিষ্কার হলেই হলো, আর যারা মরে মরুক!

প্রশ্ন। তাহলে কি কোন সমাজ-সংস্কারের দরকার নেই বলেন?

স্বামীজী। দরকার আছে বই কি। আমি তা বলছি না। তোমাদের মুখে যা সংস্কারের কথা শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলোই অধিকাংশ গরিব সাধারণদের স্পর্শই করবে না। তোমরা যা চাও, তা তাদের আছে। এজন্য তারা ওগুলোকে সংস্কার বলেই মনে করবে না। আমার কথা এই যে, শ্রদ্ধার অভাবই আমাদের মধ্যে সমস্ত evils (অনর্থ) এনেছে ও আরও আনছে। আমার চিকিৎসা হচ্ছে রোগের কারণকে নির্মূল করা—রোগ চাপা দিয়ে রাখা নয়। সংস্কার কি আর দরকার নেই? দরকার। যেমন ভারতবর্ষে intermarriage (অসবর্ণ বিবাহ)-টা হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে।

* *

২৩ জানুয়ারি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ। ১১ মাঘ, রবিবার। বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়িতে সন্ধ্যার পর আজ সভা হয়েছে। স্বামীজী উপস্থিত আছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন। স্বামীজী পূর্বদিকের বারান্দায় বসে আছেন। বারান্দাটা লোকে পরিপূর্ণ হয়েছে। দক্ষিণ দিকের ও উত্তর দিকের বারান্দাও সেইরূপ লোকে পরিপূর্ণ। স্বামীজী কলকাতায় থাকলে নিত্যই এইরূপ হতো। স্বামীজী সুন্দর গান গাইতে পারেন, অনেকে শুনেছেন। অধিকাংশের গান শুনবার ইচ্ছা দেখে মাস্টারমহাশয় ফিসফিস করে দু-একজনকে স্বামীজীর গান শুনবার জন্য উত্তেজিত করেছেন। স্বামীজী কাছেই ছিলেন, মাস্টার-মহাশয়ের কাণ্ড দেখতে পেলেন।

স্বামীজী। কি বলছ মাস্টার বল না? ফিস ফিস করছ কেন?

মাস্টারমহাশয়ের অনুরোধক্রমে অতঃপর স্বামীজী 'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে' গানটি ধরলেন। যেন বীণার ঝঙ্কার উঠতে লাগল। যাঁরা তখনো আসছিলেন, সত্যই তাঁরা সিঁড়ি থেকে যেন মনে করলেন গানটি বেহালার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গীত হচ্ছে। গান শেষ হলে স্বামীজী মাস্টারমহাশয়কে লক্ষ্য

করে বললেন, "হয়েছে তো ? আর গাব না। নেশা ধরে যাবে। আর গলাটা লেবচার দিয়ে দিয়ে মোটা হয়ে গেছে। voice (গলার স্বর)-টা roll করে (কাঁপে)।"

অতঃপর স্বামীজী এক ব্রহ্মচারী শিষ্যকে মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলতে বললেন। ব্রহ্মচারীটি সভাস্থলে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ধরে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতান্তে শচীনবাবু ও আর দু-একজন বক্তৃতার সম্বন্ধে দু একটি কথা বললেন। স্বামীজী তাঁর আর একজন গৃহী ভক্তকে বললেন, "এর পক্ষে বা বিপক্ষে যদি কিছু বলবার থাকে তো বল।" স্বামীজী উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে দু-একজনকে 'মুক্তির স্বরূপ' সম্বন্ধেও কিছু বলতে বললেন। দ্বৈত ও অদ্বৈতের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্ক হলো। তর্ক ক্রমাগত বেড়ে চলছে দেখে স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দ স্বামী উভয়ে তর্কবিতর্ক থামিয়ে দিলেন।

স্বামীজী। রেগে উঠলি কেন ? তোরা বড় গোল করিস। তিনি (পরমহংসদেব) বলতেন, 'শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক।' ভক্তিমতে ভগবানকে প্রেমময় বলা হয়। তাঁকে ভালবাসি—একথাও বলা যায় না, তিনি যে ভালবাসাময়। যে ভালবাসাটা হৃদয়ে আছে, তাই যে তিনি। এইরূপ যার যে-টান, সে সমস্তই তিনি। চোর চুরি করে, বেশ্যা বেশ্যাগিরি করে, মা ছেলেকে ভালবাসে—সব জায়গায়ই তিনি। একটা জগৎ আর একটাকে টানছে, সেখানেও তিনি। সর্বত্রই তিনি। জ্ঞানপক্ষেও সর্বস্থানে তাঁকে অনুভব হয়। এইখানেই জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য। যখন ভাবে ডুবে যায়, অথবা সমাধি হয়, তখনই দ্বিভাব থাকতে পারে না, ভক্তের সঙ্গে ভগবানের পৃথকত্ব থাকে না। ভক্তিশাস্ত্রে ভগবানলাভের জন্য পাঁচ ভাবে সাধনের কথা আছে, আর এক ভাবের সাধন তাতে যোগ করা যেতে পারে—ভগবানকে অভেদভাবে সাধন করা। ভক্তেরা অদ্বৈতবাদীদের 'অভেদবাদী ভক্ত' বলতে পারেন। মায়ার ভেতর যতক্ষণ, ততক্ষণ দ্বৈত থাকবেই। দেশ-কাল-নিমিত্ত বা নাম-রূপই মায়া। যখনই এই মায়ার পারে যাওয়া যায়, তখনই একত্ববোধ হয় ; তখন মানুষ দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী থাকে না, তার কাছে তখন সব এক, এই বোধ হয়। জ্ঞানী ও ভক্তের তফাত কোথায় জানিস ? একজন ভগবানকে বাইরে দেখে, আর একজন ভগবানকে ভেতরে দেখে। তবে ঠাকুর বলতেন, ভক্তির আর এক অবস্থাভেদ আছে, যাকে পরাভক্তি বলা যায়। মুক্তিলাভ করে অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থিত হয়ে তাঁকে ভক্তি করা। যদি বলা যায়—মুক্তিই যদি হয়ে গেল, তবে আবার ভক্তি করবে কেন ? এর উত্তর এই—মুক্ত যে, তার পক্ষে কোন নিয়ম বা প্রশ্ন হতে পারে না। মুক্ত হয়েও কেউ কেউ ইচ্ছা করে ভক্তি রেখে দেয়।

প্রশ্ন। মশায়, এতো বড় মুশকিলের কথা। চোরে চুরি করবে, বেশ্যা বেশ্যাগিরি করবে, সেখানেও ভগবান ; তাহলে ভগবানই তো সব পাপের জন্য দায়ী হলেন।

স্বামীজী। ঐ রকম জ্ঞান একটা অবস্থার কথা। ভালবাসা-মাত্রকেই যখন ভগবান বলে বোধ হবে, তখনই কেবল ঐরকম মনে হতে পারে। সেইরকম হওয়া চাই। ভাবটার realization (উপলব্ধি) হওয়া দরকার।

প্রশ্ন। তা হলেও তো বলতে হবে, পাপেতেও তিনি।

স্বামীজী। পাপ আর পুণ্য বলে আলাদা জিনিস তো কিছু নেই। ওগুলো ব্যবহারিক কথামাত্র। আমরা কোন জিনিসের এক-রকম ব্যবহারের নাম পাপ ও আর এক-রকম ব্যবহারের নাম পুণ্য দিয়ে থাকি। যেমন, এই আলোটা জ্বলার দরুন আমরা দেখতে পাচ্ছি ও কত কাজ করছি, আলোর এই এক-রকম ব্যবহার। আবার এই আলোতে হাত দাও, হাত পুড়ে যাবে। এটা ঐ আলোর আর এক-রকম ব্যবহার। অতএব ব্যবহারেই জিনিসটা ভাল-মন্দ হয়ে থাকে। পাপ-পুণ্যটাও ঐরকম। আমাদের শরীর ও মনের কোন শক্তিটার সুব্যবহারের নামই পুণ্য ও কুব্যবহার বা অপচয়ের নাম পাপ।

প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হতে লাগল। একজন বললেন, "একটা জগৎ আর একটাকে টানে, সেখানেও ভগবান, এ কথা সত্য হোক আর না হোক, এর মধ্যে বেশ poetry (কবিত্ব) আছে।"

স্বামীজী। না হে বাপু, ওটা poetry (কবিত্ব) নয়। ওটা জ্ঞান হলে দেখতে পাওয়া যায়।[১]

আবার Mill (মিল), Hamilton (হ্যামিলটন), Herbert Spencer (হারবার্ট স্পেনসার) ইত্যাদির দর্শন নিয়ে প্রশ্ন হতে লাগল। স্বামীজী সকলেরই যথাযথ উত্তর দিতে লাগলেন। উত্তরে সকলেই মহাসন্তুষ্ট হতে লাগলেন। অনেকে তাঁর উত্তরদানে তৎপরতা ও পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শেষে আবার প্রশ্ন হলো।

প্রশ্ন। ব্যবহারিক প্রভেদই বা হয় কেন? কোন শক্তি মন্দরূপে ব্যবহার করতে লোকের প্রবৃত্তিই বা হয় কেন?

স্বামীজী। নিজের নিজের কর্ম অনুসারে প্রবৃত্তি হয়, সবই নিজের কর্মকৃত; সেইজন্য প্রবৃত্তি দমন বা তাকে সুচারুরূপে চালনা করাও সম্পূর্ণ নিজের হাতে।

প্রশ্ন। সবই কর্মের ফল হলেও, গোড়া তো একটা আছে। সেই গোড়াতেই বা আমাদের প্রবৃত্তির ভাল-মন্দ হয় কেন?

স্বামীজী। কে বললে গোড়া আছে? সৃষ্টি যে অনাদি। বেদের এই মত। ভগবান যতদিন আছেন, তাঁর সৃষ্টিও ততদিন আছে।

১ স্বামীজীর ঐ কথাতে আমি এই বুঝেছিলাম যে, জড় ও চেতন ব্যবহারিক কথায় পৃথক পৃথক বস্তু হলেও, এক বস্তুরই রূপান্তরমাত্র এবং তদ্রূপ জড় বা অন্তর্জগতে যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি, সে-সমস্তও, এক শক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশে প্রতীত হয়ে থাকে। সর্বকালে সর্বাবস্থায় জড়, এমন কোন বস্তু নেই। যেদিকে আমরা বস্তুর চেতন অবস্থা দেখে থাকি, যে অবস্থাসমূহে তদপেক্ষা স্বল্প শক্তি প্রকাশিত হয়, সেই অবস্থাসমূহই বস্তুর জড়াবস্থা বলে উপলব্ধ হয়। যে-শক্তি জড় অবস্থায় আকর্ষণ রূপে প্রকাশিত থাকে, তা-ই আবার চেতনাবস্থায় সূক্ষ্মতর হয়ে ভালবাসাদি রূপে অনুভূত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন। আচ্ছা মায়াটা কেন এল ? আর কোথা থেকে এল ?

স্বামীজী। ভগবান সম্বন্ধে 'কেন' বলাটা ভুল। 'কেন' বলা যায় কার সম্বন্ধে ? —যার অভাব আছে, তারই সম্বন্ধে। যার কোন অভাব নেই, যে পূর্ণ, তার পক্ষে আবার কেন কি ? 'মায়া কোথা থেকে এল'—এরূপ প্রশ্নই হতে পারে না। দেশ-কাল-নিমিত্তের নামই মায়া। তুমি আমি সকলেই এই মায়ার ভেতর। তুমি প্রশ্ন করছ ঐ মায়ার পারের জিনিস সম্বন্ধে। মায়ার ভেতর থেকে মায়ার পারের জিনিসের কি কোন প্রশ্ন হতে পারে ?

অতঃপর অন্য দু-চারটা কথার পর সভা ভঙ্গ হলো। আমরাও সকলে আপন আপন বাসায় ফিরলাম।

স্থান—কলকাতা, বাগবাজার, বলরাম বসুর বাড়ি।
২৪ জানুয়ারি, ১৮৯৮। ১২ মাঘ, সোমবার।

গত শনিবার যে-লোকটি প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি আবার এসেছেন। তিনি intermarriage (অন্তর্বিবাহ) সম্বন্ধে আবার কথা পাড়লেন। বললেন, "ভিন্ন জাতির সঙ্গে আমাদের কিরূপে আদান-প্রদান হতে পারে ?"

স্বামীজী। বিধর্মী জাতিদের ভেতর আদান-প্রদান হবার কথা আমি বলি না। অন্ততঃ আপাততঃ তা সমাজবন্ধনকে শিথিল করে নানা উপদ্রবের কারণ হবে, এ কথা নিশ্চিত। জান তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নং" ইত্যাদি[২], সমধর্মীদের মধ্যেই বিবাহ-প্রচলনের কথা আমি বলে থাকি।

প্রশ্ন। তা হলেও তো অনেক গোল। মনে করুন, আমার এক মেয়ে আছে, সে এদেশে জন্মেছে ও পালিত হয়েছে। তার বিয়ে দিলুম এক পশ্চিমের লোকের সঙ্গে বা মাদ্রাজীর সঙ্গে। বিয়ের পর মেয়ে জামাইয়ের কথা বোঝে না, জামাইও মেয়ের কথা বোঝে না। আবার পরস্পরের দৈনিক ব্যবহারাদিরও অনেক তফাত। বর কনে সম্বন্ধে তো এই গণ্ডগোল ; আবার সমাজেও মহা বিশৃঙ্খলা এসে পড়বে।

স্বামীজী। ও-রকম বিয়ে হতে আমাদের দেশে এখনো ঢের দেরি। একেবারে ও-রকম করাও ঠিক নয়। কাজের একটা secret (রহস্য) হচ্ছে—to go by the way of least possible resistance (যতদূর সম্ভব কম বাধার পথে চলা)। সেইজন্য প্রথমে একবর্ণের মধ্যে বিয়ে চলুক। এই বাংলা দেশের কায়স্থদের কথা ধর। এখানে কায়স্থদের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে—উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ইত্যাদি। এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নেই। প্রথমে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণ-রাঢ়ীতে বিবাহ হোক। যদি তা সম্ভব না হয়, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীতে হোক। এইরূপে—যেটা আছে, সেটাকেই গড়তে হবে—ভাঙার নাম সংস্কার নয়।

প্রশ্ন। আচ্ছা না হয় বিয়েই হলো, তাতে ফল কি ? উপকার কি ?

---

২ গীতা, ১।৩৯

স্বামীজী। দেখতে পাচ্ছ না, আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে একশ বছর ধরে বিয়ে হয়ে হয়ে এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হতে আরম্ভ হয়েছে। তাতেই শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে যত রোগও এসে জুটছে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভিতরই চলা-ফেরা করেই রক্তটা দূষিত হয়ে পড়ছে। তাদের শরীরগত রোগাদি নবজাত সকল শিশুই নিয়ে জন্মাচ্ছে। সেইজন্য তাদের শরীরের রক্ত জন্মাবধি খারাপ। কাজেই কোন রোগের বীজকে resist করবার (প্রতিরোধ করবার) ক্ষমতাও ঐ-সব শরীরে বড় কম হয়ে পড়েছে। শরীরের মধ্যে একবার নতুন অন্যরকম রক্ত বিবাহের দ্বারা এসে পড়লে এখনকার রোগাদির হাত থেকে ছেলেগুলো পরিত্রাণ পাবে ও এখনকার চাইতে ঢের active (কর্মঠ) হবে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, early marriage (বাল্যবিবাহ) সম্বন্ধে আপনার মত কি?

স্বামীজী। বাংলাদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে ছেলেদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার নিয়মটা উঠে গিয়েছে। মেয়েদের মধ্যেও পূর্বের চেয়ে দুই-এক বছর বড় করে বিয়ে দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সেটা হয়েছে টাকার দায়ে। তা যে জন্যেই হোক, মেয়েগুলোর আরও বড় করে বিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বাপ-বেচারীরা করবে কি? মেয়ে বড় হলেই বাড়ির গিন্নি থেকে আরম্ভ করে যত আত্মীয়ারা ও পাড়ার মেয়েরা বে দেবার জন্য নাকে কান্না ধরবে। আর তোমাদের ধর্মধ্বজীদের কথা বলে আর কি হবে! তাদের কথা তো আর কেউ মানে না, তবুও তারা নিজেরাই মোড়ল সাজে। রাজা বললে যে, বার বছরের মেয়ের সহবাস করতে পারবে না, অমনি দেশের সব ধর্মধ্বজীরা 'ধর্ম গেল, ধর্ম গেল' বলে চিৎকার আরম্ভ করলে। বার-তের বছরের বালিকার গর্ভ না হলে তাদের ধর্ম হবে না! রাজাও মনে করেন, বা রে এদের ধর্ম! এরাই আবার political agitation (রাজনীতিক আন্দোলন) করে, political right (রাষ্ট্রীয় অধিকার) চায়।

প্রশ্ন। তাহলে আপনার মত মেয়ে-পুরুষ সকলেরই বেশি বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত।

স্বামীজী। হ্যাঁ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই। তা না হলে অনাচার ব্যভিচার আরম্ভ হবে তবে যে-রকম শিক্ষা চলেছে, সে-রকম নয়। Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখা চাই। খালি বইপড়া শিক্ষা হলে হবে না। যাতে character form (চরিত্র তৈরি) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই।

প্রশ্ন। মেয়েদের মধ্যে অনেক সংস্কার দরকার।

স্বামীজী। ঐ রকম শিক্ষা পেলে মেয়েদের problems (সমস্যাগুলো) মেয়েরা নিজেরাই solve (মীমাংসা) করবে। আমাদের মেয়েরা বরাবর প্যানপ্যানে ভাবই শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হলে কেবল কাঁদতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা

দরকার। এসময়ে তাদের মধ্যে self-defence (আত্মরক্ষা) শেখা দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ দেখি ঝাঁসির রানী কেমন ছিল।

প্রশ্ন। আপনি যা বলছেন তা বড়ই নতুন ধরনের, আমাদের মেয়েদের মধ্যে সে-শিক্ষা দিতে এখনো সময় লাগবে।

স্বামীজী। চেষ্টা করতে হবে। তাদের শেখাতে হবে। নিজেদেরও শিখতে হবে। খালি বাপ হলেই তো হয় না, অনেক দায়িত্ব ঘাড়ে করতে হয়। আমাদের মেয়েদের একটা শিক্ষা তো সহজে দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুর মেয়ে—সতীত্ব কি জিনিস, তা তারা সহজেই বুঝতে পারবে; এটা তাদের heritage (উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জিনিস) কিনা। প্রথমে সেই ভাবটাই বেশ করে তাদের মধ্যে উস্কে দিয়ে তাদের character form (চরিত্র তৈরি) করতে হবে—যাতে তাদের বিবাহ হোক বা কুমারী থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। কোন একটা ভাবের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা কি কম বীরত্ব? এখন যে-রকম সময় পড়েছে, তাতে তাদের ঐ যে ভাবটা বহুকাল থেকে আছে, তার বলেই তাদের মধ্যে কতকগুলিকে চিরকুমারী করে রেখে ত্যাগধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাতে তাদের নিজের ও অপরের কল্যাণ হতে পারে, তাও শেখাতে হবে। তা-হলে তারা অতি সহজেই ঐ-সব শিখতে পারবে ও ঐ-রূপ শিখতে আনন্দও পাবে। আমাদের দেশে যথার্থ কল্যাণের জন্য এইরকম কতকগুলি পবিত্রজীবন ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী দরকার হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন। ঐরূপ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী হলেও দেশের কল্যাণ কেমন করে হবে?

স্বামীজী। তাদের দেখে ও তাদের চেষ্টায় দেশটার আদর্শ উলটে যাবে। এখন ধরে বিয়ে দিতে পারলেই হলো।—তা নয় বছরেই হোক, দশ বছরেই হোক! এখন এ-রকম হয়ে পড়েছে যে, তের বছরের মেয়ের সন্তান হলে গুষ্টিশুদ্ধের আহ্লাদ কত, তার ধুমধামই বা দেখে কে? এ ভাবটা উলটে গেলে ক্রমশঃ দেশে শ্রদ্ধাও আসতে পারবে। যারা ঐ-রকম ব্রহ্মচর্য করবে, তাদের তো কথাই নেই—কতটা শ্রদ্ধা, নিজেদের উপর কতটা বিশ্বাস তাদের হবে, তা বলা যায় না!

শ্রোতা মহাশয় এতক্ষণ পরে স্বামীজীকে প্রণাম করে উঠতে উদ্যত হলেন। স্বামীজী বললেন, "মাঝে মাঝে এস।" তিনি বললেন, "ঢের উপকার পেলুম; অনেক নতুন কথা শুনলুম, এমন আর কখনো কোথাও শুনিনি।" সকাল থেকে কথাবার্তা চলছিল, এখন বেলা হয়েছে দেখে আমিও স্বামীজীকে প্রণাম করে বাসায় ফিরলাম।

স্নান আহার ও একটু বিশ্রাম করে আবার বাগবাজারে চললাম। এসে দেখি, স্বামীজীর কাছে অনেক লোক। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা হচ্ছে। হাসি-তামাসাও চলছে। একজন বলে উঠলেন, "মহাপ্রভুর কথা নিয়ে এত রঙ্গরসের কারণ কি? আপনারা কি মনে করেন, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন না, তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করেননি?"

স্বামীজী। কে বাবা তুমি? কাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে হবে? তোমাকে নিয়ে নাকি? মহাপ্রভুকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করাটাই দেখছ বুঝি? তাঁর কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ নিয়ে এতদিন যে জীবনটা গড়বার ও লোকের ভিতর সেই ভাবটা ঢোকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটা দেখতে পাচ্ছ না। শ্রীচৈতন্যদেব মহা ত্যাগী-পুরুষ ছিলেন। স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও থাকতেন না। কিন্তু পরে চেলারা তাঁর নাম করে নেড়া-নেড়ীর দল করলে। আর তিনি যে প্রেমের ভাব নিজের জীবনে দেখালেন, তা স্বার্থশূন্য কামগন্ধহীন প্রেম। তা কখনো সাধারণের সম্পত্তি হতে পারে না। অথচ তাঁর পরবর্তী বৈষ্ণব গুরুরা আগে তাঁর ত্যাগটা শেখানোর দিকে ঝোঁক না দিয়ে তাঁর প্রেমটাকে সাধারণের ভিতর ঢোকাবার চেষ্টা করলেন। কাজেই সাধারণ লোকে সে উচ্চ প্রেমভাবটা নিতে পারলে না ও সেটাকে নায়ক-নায়িকার দূষিত প্রেম করে তুললে।

প্রশ্ন। তিনি তো আচণ্ডালে হরিনাম প্রচার করলেন, তা সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন?

স্বামীজী। প্রচারের কথা হচ্ছে না গো, তাঁর ভাবের কথা হচ্ছে—প্রেম, প্রেম—রাধাপ্রেম। যা নিয়ে তিনি দিন রাত মেতে থাকতেন—তার কথা হচ্ছে।

প্রশ্ন। সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন?

স্বামীজী। সাধারণের সম্পত্তি করে কি হয়, তা এই জাতটা দেখে বোঝ না? ঐ প্রেম প্রচার করেই তো সমস্ত জাতটা 'মেয়ে' হয়ে গিয়েছে। সমস্ত উড়িষ্যাটা কাপুরুষ ও ভীরুর আবাস হয়ে গিয়েছে। আর এই বাংলা দেশটায় চারশ বছর ধরে রাধাপ্রেম করে কি দাঁড়িয়েছে দেখ। এখানেও পুরুষত্বের ভাব প্রায় লোপ হয়েছে। লোকগুলো কেবল কাঁদতেই মজবুত হয়েছে। ভাষাতেই তো ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—তা চারশ বছর ধরে বাঙলা ভাষায় যা কিছু লেখা হয়েছে, সেসব এক কান্নার সুর। প্যান-প্যানানি ছাড়া আর কিছু নেই। একটা বীরত্বসূচক কবিতারও জন্ম দিতে পারেনি।

প্রশ্ন। ঐ প্রেমের অধিকারী তবে কারা হতে পারে?

স্বামীজী। কাম থাকতে প্রেম হয় না—এক বিন্দু থাকতেও হয় না। মহাত্যাগী, মহাবীর পুরুষ ভিন্ন ঐ প্রেমের অধিকারী কেউ নয়। ঐ প্রেম সাধারণের সম্পত্তি করতে গেলে নিজেদের এখনকার ভেতরকার ভাবটাই ঠেলে উঠবে। ভগবানের উপর প্রেমের কথা মনে না পড়ে ঘরের গিন্নিদের সঙ্গে যে প্রেম, তার কথাই মনে উঠবে। আর প্রেমের যে অবস্থা হবে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ।

প্রশ্ন। তবে কি ঐ প্রেমের পথ দিয়ে ভজন করে—ভগবানকে স্বামী ও আপনাকে স্ত্রী ভেবে ভজন করে—তাঁকে (ভগবানকে) লাভ করা গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব?

স্বামীজী। দু-একজনের পক্ষে সম্ভব হলেও সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে যে অসম্ভব, একথা নিশ্চিত। আর একথা জিজ্ঞাসারই বা এত আবশ্যক কি? মধুরভাব ছাড়া ভগবানকে ভজন করবার আর কি কোন পথ নেই? আর চারটে ভাব আছে তো, সে-

গুলো ধরে ভজন কর না? প্রাণভরে তাঁর নাম কর না? হৃদয় খুলে যাবে। তারপর যা হবার আপনি হবে। তবে একথা নিশ্চিত জেনো যে, কাম থাকতে প্রেম হয় না। কামশূন্য হবার চেষ্টাটাই আগে কর না। বলবে, তা কি করে হবে—আমি গৃহস্থ। গৃহস্থ হলেই কি কামের একটা জালা হতে হবে? স্ত্রীর সঙ্গে কামজ সম্বন্ধ রাখতেই হবে? আর মধুরভাবের উপরেই বা এত ঝোঁক কেন? পুরুষ হয়ে মেয়ের ভাব নেবার দরকার কি?

প্রশ্ন। হাঁ, নামকীর্তনটাও বেশ। সেটা লাগেও বেশ; শাস্ত্রেও কীর্তনের কথা আছে। চৈতন্যদেবও তাই প্রচার করলেন। যখন খোলটা বেজে ওঠে, তখন প্রাণটা যেন মেতে ওঠে আর নাচতে ইচ্ছে করে।

স্বামীজী। বেশ কথা, কিন্তু কীর্তন মানে কেবল নাচাই মনে করো না। কীর্তন মানে ভগবানের গুণগান, তা যেমন করেই হোক। বৈষ্ণবদের মাতামাতি ও নাচ ভাল বটে, কিন্তু তাতেও একটা দোষ আছে। সেটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে যেও। কি দোষ জান? প্রথমে একেবারে ভাবটা খুব জমে, চোখ দিয়ে জল বেরোয়, মাথাটাও রিরি করে, তারপর যেই সংকীর্তন থামে, তখন সে ভাবটা হু হু করে নামতে থাকে। ঢেউ যত উঁচু ওঠে, নামবার সময় সেটা তত নিচুতোনামে। বিচারবুদ্ধি সঙ্গে না থাকলেই সর্বনাশ—সে-সময়ে রক্ষা পাওয়া ভার। কামাদি নীচুভাবের অধীন হয়ে পড়তে হয়। আমেরিকাতেও ঐরূপ দেখেছি, কতকগুলো লোক গির্জায় গিয়ে বেশ প্রার্থনা করলে, ভাবের সঙ্গে গাইলে, লেকচার শুনে কেঁদে ফেললে—তার পর গির্জা থেকে বেরিয়েই বেশ্যালয়ে ঢুকল।

প্রশ্ন। তাহলে চৈতন্যদেবের দ্বারা প্রচারিত ভাবগুলির ভিতর কোন্‌গুলি নিলে আমাদের কোনরূপ ভ্রমে পড়তে হবে না এবং মঙ্গলও হবে?

স্বামীজী। জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তির সঙ্গে ভগবানকে ডাকবে। ভক্তির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি রাখবে। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের কাছ থেকে আরও নেবে তার heart (হৃদয়বত্তা), সর্বজীবে ভালবাসা, ভগবানের জন্য টান, আর তাঁর ত্যাগটা জীবনের আদর্শ করবে।

প্রশ্ন। ঠিক বলেছেন। আমি আপনার ভাব প্রথমে বুঝতে পারিনি। (করজোড়ে) মাপ করবেন। তাই আপনাকে বৈষ্ণবদের মধুরভাব নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতে দেখে কেমন বোধ হয়েছিল।

স্বামীজী। (হাসতে হাসতে)। দেখ, গালাগাল যদি দিতেই হয় তো ভগবানকে দেওয়াই ভাল। তুমি যদি আমাকে গাল দাও, আমি তেড়ে যাব। আমি তোমাকে গাল দিলে তুমিও তার শোধ তোলবার চেষ্টা করবে। ভগবান তো সেসব পারবেন না।

প্রশ্নকর্তা তাঁর পদধূলি নিয়ে চলে গেলেন। স্বামীজী কলকাতায় থাকতে নিত্যই এইরূপ লোকের ভিড় হতো। লোকের বিরাম নেই। সকাল থেকে রাত্রি আটটা-নয়টা পর্যন্ত ক্রমাগত লোকের যাওয়া-আসা চলত। ফলে স্বামীজীর খাওয়া-দাওয়াও বড় অসময়ে হতো। সেজন্য অনেকে জনতা বন্ধ করতে অভিলাষী হলেন। একটা নির্দিষ্ট

সময় ভিন্ন অন্য সময় কারও সঙ্গে দেখা করবেন না, এইরূপ করবার জন্য স্বামীজীকে অনেকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু চিরপরহিতাকাঙ্ক্ষী স্বামীজীর প্রেমিক হৃদয় জনসাধারণের এইরূপ ধর্মপিপাসা দেখে একেবারে গলে গিয়েছিল, তাঁর শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও জনতারোধ সম্বন্ধে কারও কথা তিনি রাখলেন না। বললেন: "তারা এত কষ্ট করে দূর দূর থেকে হেঁটে আসতে পারে, আর আমি এখানে বসে বসে, একটু নিজের শরীর খারাপ হবে বলে, তাদের সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারব না?"

তারপর আর কোন কথা হলো না। সভা ভেঙে গেল। দু-চার জন লোক ভিন্ন আর কেউ রইল না।

ঐদিন বেলা তিন-চারটে হবে। স্বামীজীর সঙ্গে উপস্থিত কয়েকজনের অন্য কথাবার্তা হতে লাগল। ইংলন্ড ও আমেরিকার কথাও হতে লাগল। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বললেন: ইংলন্ড থেকে আসবার সময় পথে বড় এক মজার স্বপ্ন দেখেছিলুম। ভূমধ্যসাগরে আসতে আসতে জাহাজে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে দেখি—বুড়ো থুড়থুড়ো ঋষিভাবাপন্ন একজন লোক আমাকে বলছেন, "তোমরা এস আমাদের পুনরুদ্ধার কর, আমরা হচ্ছি সেই পুরাতন থেরাপুত্ত সম্প্রদায়—ভারতের ঋষিদের ভাব নিয়েই যা গঠিত হয়েছে। খ্রীস্টানেরা আমাদের প্রচারিত ভাব ও সত্য-সমূহই যীশুর দ্বারা প্রচারিত বলে প্রকাশ করেছে। নতুবা যীশু নামে বাস্তবিক কোন ব্যক্তি ছিল না। ঐ-বিষয়ক নানা প্রমাণাদি এই স্থান খনন করলে পাওয়া যাবে।" আমি বললাম, "কোথায় খনন করলে ঐ-সকল প্রমাণ-চিহ্নাদি পাওয়া যেতে পারে?" বৃদ্ধ বললেন, "এই দেখ না এইখানে।" একথা বলে টার্কির নিকটবর্তী একটি স্থান দেখিয়ে দিলেন। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙামাত্র তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন জাহাজ কোন জায়গায় উপস্থিত হয়েছে?" ক্যাপ্টেন বলল, "ওই সামনে টার্কি এবং ক্রীটদ্বীপ দেখা যাচ্ছে।"

ভুবনমোহন হাওলাদার

স্বামী বিবেকানন্দ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই যে তিনি অলোকসামান্য উন্নতি করেছিলেন, তা তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভা দর্শনে বোঝা যায়। কি বীর্যে, কি তেজস্বিতায়, কি পাণ্ডিত্যে, কি সঙ্গীতাদিতে, কি বাগ্মিতায়, কি আমোদপ্রমোদে, কি ত্যাগবৈরাগ্যে, কি তত্ত্বজ্ঞানে তাঁর সমকক্ষ জগতে অতি বিরল দেখতে পাওয়া যায়।

স্বামীজী যে-সকল গুণের সমষ্টি ছিলেন সে-সকল গুণ তাঁর এক-একখানা ফটো দেখে চিন্তা করলেই বিশেষরূপে বোঝা যায়। যষ্টি-হস্তে মুণ্ডিতমস্তক পরিব্রাজকবেশের ফটোটি দেখলেই কামকাঞ্চন-ত্যাগী সংসারাসক্তি-বিরহিত যতি বলে বোধ হয়। বাবরী-চুলবিশিষ্ট, চোগা-চাপকান-পরিহিত, চেয়ারে উপবিষ্ট বিবেকানন্দকে দেখলে বোধ হয়, ব্রহ্মচর্যে লোককে যে সৌন্দর্যে ভূষিত করে, স্বামীজী সেই সৌন্দর্যের অধিকারী। তাঁর শিকাগোর সেই উষ্ণীষ-শোভিত, বাহু-বিজড়িত-বক্ষ বীরমূর্তি দেখলে বোধ হয়, যেন সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। আবার তাঁর ধ্যানমূর্তি দেখলে বোধ হয়, তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন থেকে, ইহ জগৎ থেকে ঊর্ধ্বে, অতি ঊর্ধ্বে কোন এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করছেন। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা গেল।

একদা স্বামীজী ট্রেনে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যাচ্ছিলেন। সেই গাড়িতে মহামতি তিলক ও একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্যারিস্টার ছিলেন। ব্যারিস্টার ও তিলকের মধ্যে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বহু তর্কবিতর্ক হচ্ছিল। ব্যারিস্টার—হিন্দুধর্ম, বেদবেদান্ত অলীক বলে প্রতিপন্ন করছিলেন। তিলকও যথাসাধ্য স্বীয় মত সমর্থন করছিলেন। স্বামীজী নাকে মুখে একখানা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে তাঁদের তর্ক-বিতর্ক শুনছিলেন। যখন দেখলেন, তিলক আর ব্যবহারজীবীর সঙ্গে পেরে উঠছেন না, তখন মুখের কম্বল ফেলে সিংহবিক্রমে উঠে বসে ব্যারিস্টারের সঙ্গে হিন্দুধর্ম বিষয়ে প্রসঙ্গ করতে লাগলেন। তাঁর মুখে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ করে এবং তাঁর গভীর তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে ব্যারিস্টার অবাক হয়ে রইলেন। পরে তিলক শিকাগোর মহাসম্মেলনে হিন্দু সন্ন্যাসীর বক্তৃতা পাঠ করে ঐ ব্যারিস্টারকে বলেছিলেন, "এই সন্ন্যাসী আর কেউ নন, গাড়িতে যে মহাপুরুষকে দেখেছিলাম, তিনিই এই ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন। এরূপ লোক ভারতে ইদানীং জন্মায়নি।"

স্বামীজী অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। ইওরোপ থেকে ফিরলে কোন একটি লোক তাঁকে ঐ দেশে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন যে, "ইওরোপ জড়বিজ্ঞানবলে পার্থিব উন্নতি এত করেছে যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহ

তার তুলনায় নগণ্য।" প্রশ্নকর্তা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ উন্নতির পরিণাম কি?" তিনি তদুত্তরে বললেন, "ঐ উন্নতির পরিণাম এই যে, হঠাৎ কোন সামান্য কারণে সমরানল প্রজ্বলিত হয়ে সমগ্র ইওরোপকে ধ্বংসপ্রায় করবে।" বর্তমান মহাসমরের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের) প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্বে স্বামীজী এই কথা বলেছেন।

বর্তমানে ভারতবাসী নিতান্ত হীনাবস্থায় পতিত। তমোগুণ ভারতকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কর্ম করতে হলে রজোগুণের প্রয়োজন এবং রজোগুণসম্পন্ন লোকেরাই শীঘ্র সত্ত্বগুণে পৌঁছুতে সমর্থ। তাই তিনি যুবকগণকে কর্মোপদেশ দিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার কথা বলছি: ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগ। ঠনঠনিয়ার কালীমন্দিরের সংলগ্ন যে দ্বিতল গৃহটি বর্তমান, ঐ গৃহে রামমোহন লাইব্রেরী ছিল। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের পূর্বদিবস ঐ লাইব্রেরীতে আমার একটি ব্রাহ্ম বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের কথা আমি উত্থাপন করে বন্ধুটিকে উৎসব দেখবার জন্য অনুরোধ করি। আমার কথা শুনে বন্ধুটি সেখানে যেতে সম্মত হলেন এবং বললেন, "আচ্ছা আমি যাব এবং বিবেকানন্দকে কয়েকটি কথা শুনিয়ে আসব।" আমি বললাম, "কিছু বলতে হবে না। দেখ, যেন তোমার ব্রাহ্মগিরি ছুটে না যায়।"

অতঃপর বন্ধুটি শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবান্তে কলকাতায় ফিরে এলেন। পরদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই স্থানে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। আমাকে দেখে বন্ধুটি বলতে লাগল, "ভাই, চার পাঁচ হাজার লোককে লুচি, পায়স, খিচুড়ি আকণ্ঠ খাওয়াল।" আমি বললাম, "যা দেখতে গিয়েছিলে তার কি হলো?" বন্ধুটি বলল, "বিবেকানন্দ স্বামীকে বললাম, 'মহাশয়! আমাদের কিছু ধর্মোপদেশ দিন।' তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি? আমি আমার নাম বললাম। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি পড়?' আমি বললাম, 'সিটি কলেজে চতুর্থ বার্ষিকশ্রেণীতে পড়ি।' স্বামীজী বললেন, 'ফিলজফি পড় কি?' আমি বললাম: 'আজ্ঞে হাঁ।' স্বামীজী বললেন: 'Define Philosophy'.

আমি Stephen-এর নোট পড়ে যে জ্ঞান লাভ করেছি, তা বললাম।

স্বামীজী ঈষৎ হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি মাছ-মাংস খাও?'

আমি। না, আমি নিরামিষ খাই।

স্বামীজী। তোমার এরূপ দুর্দশা কেন? তুমি মাছ খাও, মাংস খাও, নাগরা জুতো পর, মাথায় পাগড়ি পর, ছুটোছুটি কর, নড়চড়, কাজ কর। Look at the sky and think over that piece of cloud and you will know what Philosophy is. তুমি তরুণবয়স্ক যুবক, তোমার চক্ষু কোটরগত, তোমার মুখমণ্ডল মলিন। তোমায় দেখে সুখী হলাম না।

ভাই, এই কথাগুলি যখন স্বামীজী বলছিলেন তখন তাঁর চোখ দুটো দেখে বাস্তবিক আমার ভয় হয়েছিল। আমি আর তাঁর সঙ্গে কথা না বলে নমস্কার করে চলে এলাম।"

স্বামীজী অশেষ গুণসম্পন্ন হয়েও কত নিরভিমান ছিলেন, তা নিম্নের ঘটনাটি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে।

সম্ভবতঃ ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে অর্থাৎ পূজার ছুটিতে স্বামীজী কিছুদিনের জন্য দেওঘরে বাস করছিলেন। একদিন তিনি কোট প্যান্ট পরে রাস্তায় বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর সঙ্গে দেওঘর স্কুলের একটি ছাত্রের সাক্ষাৎ হলো। ছাত্রটির জুতোর ফিতে আলগা ছিল। তা দেখামাত্র তিনি স্বয়ং সেই বালকের জুতোর ফিতে এঁটে বেধে দিলেন এবং তার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে বললেন, "Be active my dear boy." সেই বালক এখন হাজারীবাগ Dublin Mission College-এ দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। ইনি স্বামীজীকে চিনতে না পারায় কখনো আলাপ করতে পারেননি বলে চিরদুঃখিত। রাস্তা দিয়ে কত লোক যাতায়াত করে, কে কার দিকে তাকায়? কিন্তু লোকশিক্ষকেরা কিছুই উপেক্ষা করেন না। তাঁরা ছোট বড় সকল বিষয়ে সমান দৃষ্টি রাখেন।

আমেরিকাতে কত প্রলোভন, তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু গুরুকৃপাপ্রাপ্ত, ব্রহ্মচর্যপরায়ণ, ইন্দ্রিয়বিজয়ী বিবেকানন্দ ভোগবিলাসের লীলানিকেতন আমেরিকা ও ইওরোপে মহাবীরের ন্যায় দিগ্বিজয় করে পূতভূমি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করলেন। যিনি হৃদয় মন্দিরে ভগবানকে স্থাপন করেছেন এবং কাম-ক্রোধাদি ছয়টি পশুকে বলিদান করেছেন, তাঁর সম্মুখে পার্থিব প্রলোভন দাঁড়াতে পারবে কেন?

লোকে বলে, ঈশ্বরকে দেখা যায় না—বিশেষতঃ কালযুগে। তাঁকে দেখবে কিরূপে? যে শক্তিসঞ্চয় হলে আত্মদর্শন হয়, সেই শক্তির অভাব হলে তা কিরূপে সম্ভব? স্বামীজী অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপরায়ণ ও সত্যবাক্ ছিলেন বলে সেই শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি বলে গেছেন, "চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়।" আমরাও যদি ভগবান লাভ করতে চাই, তবে আমাদের সরল পথে চলতে হবে—পাটোয়ারি বুদ্ধি পরিত্যাগ করে সত্যপথ অবলম্বন করতে হবে। মন পরিষ্কার হলে তবে তো সেই পথের পথিক হতে পারব। তা না হলে আসা-যাওয়া সকলই বৃথা।

স্বামীজী আমাদের কি শিক্ষা দিয়ে গেছেন? তিনি পাশ্চাত্যদেশ থেকে ফিরে কলম্বোয় অবতরণ করেন এবং সেখান থেকে আলমোড়া পর্যন্ত ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করে স্বদেশবাসীকে তাঁর প্রাণের কথা বলে বেড়ান। তিনি বলছেন:

"তোমরা যদি ধর্ম ছেড়ে পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যেতে না যেতেই বিনষ্ট হবে। এই কারণেই আমি বলছি, এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্মকে ধরে অপর হস্ত প্রসারিত করে অন্যান্য জাতির নিকট যা শিক্ষা করবার তা শিক্ষা কর—কিন্তু মনে রেখো যে, সেইগুলিকে হিন্দুজীবনের সেই মূল আদর্শের অনুগত রাখতে হবে—তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব মহিমামণ্ডিত হয়ে আবির্ভূত হবে।

"আমরা অলস, আমরা কার্য করতে পারি না, আমরা একসঙ্গে মিলতে পারি না, আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি না, আমরা ঘোর স্বার্থপর, আমরা তিনজন একসঙ্গে মিললেই পরস্পরকে ঘৃণা করে থাকি। পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা করে থাকি। আমরা ভাবি অনেক জিনিস, কিন্তু কার্যে পরিণত করি না। এইরূপ তোতাপাখির মতো কথা আমাদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়েছে—আচরণে আমরা পশ্চাৎপদ। এর কারণ কি? শারীরিক দুর্বলতাই এর কারণ। দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করতে পারে না। আমাদের যুবকগণকে প্রথমতঃ সবল হতে হবে। ধর্ম পরে আসবে। হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—এই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ।

"এই বীর্যলাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া ও বিশ্বাস করা যে 'আমি আত্মা'। আমরা সব করতে পারি। আমরা কি না করতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের ভিতর সেই মহিমময় আত্মা রয়েছেন। তাতে বিশ্বাসী হতে হবে।

"বেদান্তের এই সকল মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায়, আবদ্ধ থাকবে না—বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে সর্বত্র এই সকল তত্ত্ব আলোচিত ও কার্যে পরিণত হবে। মৎস্যজীবী যদি আপনাকে আত্মা বলে চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল মৎস্যজীবী হতে পারবে। বিদ্যার্থী যদি আপনাকে আত্মা বলে চিন্তা করে, তবে সে একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হবে। উকিল যদি আপনাকে আত্মা বলে চিন্তা করে, তবে সে একজন ভাল উকিল হবে।

"সকল ব্যক্তিকেই তার আভ্যন্তরীণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দাও। প্রত্যেকে নিজেই নিজের মুক্তিসাধন করবে। জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার কর; প্রত্যেক ব্যক্তি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হোক।

"প্রত্যেক নরনারীকে, সকলকেই ঈশ্বরদৃষ্টিতে দেখতে থাক। তুমি কাউকেও সাহায্য করতে পার না—তুমি কেবল সেবা করতে পার। কতকগুলি ব্যক্তি যে দুঃখে ভুগছে, সে তোমার আমার মুক্তির জন্য—যাতে আমরা রোগী, পাগল, কুষ্ঠ, পাপী প্রভৃতি রূপধারী প্রভুর পূজা করতে পারি। কারও উপর প্রভুত্ব করে কারও কল্যাণ করতে পার, এ ধারণা ছেড়ে দাও।"

আমরা যদি এই সকল অমূল্য উপদেশ অনুসরণ করে জীবন পথে অগ্রসর হই, তাহলে অচিরেই যে আমরা অমৃতের সন্ধান পাব তাতে আর সন্দেহ নেই।

দেবেন্দ্রকুমার রায়

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে ১৩৩২ সালের ২৬ পৌষ রবিবার (১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি) ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে পঠিত।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকা নগরীতে শুভাগমন করেছিলেন। তিনি ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মোহিনীবাবুর (মোহিনীমোহন দাসের) বাড়িতে থাকতেন। যতদূর-সম্ভব তাঁর সঙ্গ করাই সেইকালে আমার লক্ষ্য ছিল। শত শত লোক তাঁকে দর্শন, তাঁর সঙ্গে আলাপ ও তাঁর অমূল্য উপদেশাবলী শোনার জন্য প্রতিদিন তাঁর কাছে উপস্থিত হতো। আমি তাঁর সঙ্গে বিশেষ কোন বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিনি। নীরবে বিভিন্ন শ্রেণীর শত শত লোকের সঙ্গে তাঁর প্রশ্নোত্তর শুনেছি মাত্র। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে যেতাম! যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন প্রশ্ন করুক না কেন, তাঁর কাছে তারই সদুত্তর লাভ করত এবং সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরে যেত। প্রশ্নটি যতই কেন দুরূহ হোক না, উত্তর দিতে তাঁর ক্ষণমাত্র বিলম্ব ঘটত না। বোধ হতো যেন তাঁর জিহ্বাগ্রে স্বয়ং সরস্বতী দেবী বিরাজমানা। এক কথায় বলতে গেলে, সেইকালে আমার মনে হতো যেন স্বামী বিবেকানন্দ সাক্ষাৎ মূর্তিমান অগ্নি।

আমি মাত্র দুদিন তাঁকে দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমার নোটবুক থেকে তা যথাযথভাবে নিম্নে উদ্ধৃত করছি।

প্রথম প্রশ্নোত্তর

স্থান—ঢাকা, মোহিনীবাবুর বাড়ি। সময়—২০ মার্চ, ১৯০১, অপরাহ্ন ছটা।

প্রশ্ন। কর্ম কি? যজ্ঞাদি কর্মই কেবল কর্ম-সংজ্ঞক কিনা?

উত্তর। 'দানমেকং কলৌ যুগে'—কলিযুগে দানই কর্ম। যথা—বিদ্যাদান, অর্থদান, অন্নদান, প্রাণদান ইত্যাদি। 'পুণ্যং পরোপকারে চ পাপঞ্চ পরপীড়নে।'—স্বার্থত্যাগই প্রকৃত মহত্ত্বের নিকষ। প্রকৃত মহাপুরুষের দ্বেষবুদ্ধি নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর

স্থান—উক্ত মোহিনীবাবুর বাড়ি। ২১ মার্চ, ১৯০১।

প্রশ্ন। স্বধর্ম কি?

উত্তর। এ বড় শক্ত প্রশ্ন। স্বধর্ম—প্রকৃতি অনুসারী ধর্ম, অথবা বর্ণাশ্রম ধর্ম। জ্যোতিষে প্রকৃতিজ ধর্মের কথা নিয়ে ব্রাহ্মণবর্ণ, শূদ্রবর্ণ প্রভৃতি হয়েছে। আবার

গীতাতে অর্জুনের প্রতি ক্ষাত্রধর্ম অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্মের কথা উক্ত হয়েছে। আমার মতে প্রকৃতিজ ধর্ম হলেই যেন ভাল হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকাতে দুটি মাত্র বক্তৃতা করেন। প্রথমটি ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ৩০ মার্চ সন্ধ্যা সাতটার সময় তখনকার জগন্নাথ কলেজের হলে (টিনের ঘরে) প্রদত্ত হয়। তার বিষয় ছিল, 'What Have I Learnt ?'—আমি কি শিখেছি? সৌভাগ্যক্রমে উক্ত বক্তৃতাস্থলে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং উক্ত বক্তৃতাটি যতদূর সম্ভব বিবেকানন্দের নিজের ভাষায় আমার নোটবুকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম। উক্ত বক্তৃতাতে তাঁর মুখে এই মহাবাক্যটি প্রথম শ্রবণ করি :

'মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ'

তিনি বললেন, "First, a human birth is necessary. Next, you should have a thirst for God and spirituality. This is admitted by all universally. Next point is peculiar to your religion—you require a Mahapurusha—a Guru. He must be a ব্রহ্মবিৎ, he must know God, before he can make you know God, for the blind cannot lead the blind—অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।" এর ভাবার্থ এই : প্রথমতঃ, মানবজন্ম আবশ্যক, তারপরে ভগবানের ও ধর্মের জন্য পিপাসা চাই। একথা সকলেই স্বীকার করেন। পরবর্তী কথাটি আপনাদের ধর্মের বিশেষত্ব। আপনাদের একজন মহাপুরুষ অর্থাৎ গুরু চাই। গুরু আবার 'ব্রহ্মবিৎ' হওয়া আবশ্যক। আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়ার পূর্বে, তাঁর নিজের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা চাই, কারণ একজন অন্ধব্যক্তি অপর অন্ধকে চালাতে পারে না ; চালাতে গেলে উভয়েই গর্তে নিপতিত হয়।

উক্ত বক্তৃতাতে তিনি আরও বলেছিলেন, "For the last 25 years I have been a seeker of Truth, but, I have found only book-learning and pride of sect. At last it pleased God to join me with a Mahapurusha" অর্থাৎ বিগত ২৫ বৎসর যাবৎ আমি সত্যের অনুসন্ধানে ঘুরেছি, কিন্তু সত্যের পরিবর্তে পুস্তকের বিদ্যা ও সাম্প্রদায়িক অভিমান প্রাপ্ত হয়েছি। অবশেষে ভগবানের কৃপায় একজন মহাপুরুষের সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটেছে।

দ্বিতীয় বক্তৃতাটি ঢাকা পগোজ স্কুলের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ৩১ মার্চ তারিখে প্রদত্ত হয়। তার বিষয় ছিল, "The Religion We Are Born In—" আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সেদিন সেখানে উপস্থিত হতে পারিনি।

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে আমি আর একটি মহতী শিক্ষা লাভ করেছি, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তা এস্থলে ব্যক্ত করছি। বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ন্যায় আমিও 'Idolatry' বা পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলাম, এবং হিন্দুধর্মের আগাগোড়াই 'Idolatry' ও 'Superstition'—এ আমারও মত ছিল। কিন্তু ভগবৎ কৃপায় বিবেকানন্দজীর ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো সহরের ধর্মমহামেলাতে

প্রদত্ত বক্তৃতা পাঠে এ-বিষয়ে আমার চিরন্তন সত্য লাভ হয়। উক্ত বক্তৃতা পাঠে আমি স্পষ্টই দেখতে পেলাম যে হিন্দুধর্মের দেবোপাসনা 'Idolatry' হলে, 'Church,' 'Altar,' 'Sabbath day,' 'Cross' প্রভৃতি সমস্তই 'Idolatry'তে পরিগণিত হয়। উক্ত বক্তৃতাতে বিবেকানন্দ সত্যই বলেছেন, "Why does a Christian go to the Church ? Why is the Cross holy ? Why is the face turned towards the sky, in prayer ? Why are there so many images in the Catholic Church ? Why are there so many images in the minds of Protestants when they pray ? My brethren, we can no more think about anything without a mental image, than we can live without breathing." এই বাক্যগুলি এইরূপে অনূদিত হয়েছে।

"আচ্ছা, যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তবে খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণ 'ধর্মালয়' বলে এক স্বতন্ত্র স্থলে কেন তাঁর আরাধনা করতে যান? কেন তাঁরা ক্রুশকে এত পবিত্র বলেন? প্রার্থনার সময় কেন তাঁরা উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন? ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত-দিগের ধর্মমন্দিরে এত মূর্তি স্থান পেয়েছে কেন? প্রার্থনাকালে প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ীদের হৃদয়ে এত ভাবময়ী মূর্তির বিকাশ হয় কেন? হে ভ্রাতৃগণ, নিঃশ্বাস গ্রহণ না করে জীবনধারণ যেরূপ অসম্ভব, চিন্তাকালে মূর্তিবিশেষের সাহায্য না নেওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব।"

ঢাকাতে পূর্বোক্ত বক্তৃতাকালেও তিনি এবিষয়টির পুনরুল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "Englishmen condemn idolatry—that's a long word and therefore must be bad. It is surely bad, the reason being—Englishmen call it so."—সাহেবরা পৌত্তলিকতা ঘৃণা করে, সুতরাং এ তো খারাপ হবেই। পৌত্তলিকতা নিশ্চয়ই খারাপ কেননা ইংরেজরা একে খারাপ বলে। কিন্তু এস্থলেও তিনি ইংরেজদের প্রতি নিন্দার ভাবে একথা বলেননি। কারণ তিনি তারপরেই বলেছিলেন, "However godspeed to these Englishmen for they form a part of the economy of the Great Mother and they are fulfilling their mission." অর্থাৎ ভগবান এই ইংরেজদেরও সাফল্যমণ্ডিত করুন। কারণ তাঁরাও সেই জগন্মাতার কার্যই সম্পন্ন করছেন। এখানেই প্রকৃত বেদান্তবাদীর বিশেষত্ব। তিনি সকল ঘটনাতেই সেই বিশ্বজননীর হস্ত দেখতে পান, সুতরাং তিনি কাউকেও নিন্দা করতে পারেন না।

বাস্তবিক হিন্দুধর্ম 'Idolatry' (পৌত্তলিক) তো নয়ই, পরন্তু তা সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্রসম্মত, উদার এবং বিশ্বজনীন।

আমি একদিন স্বামীজীকে বললাম, "আমি আপনার উপদেশাদি অপেক্ষা আপনার আমেরিকা ও ইওরোপ ভ্রমণকালীন আশ্চর্য ঘটনাবলী শুনতে অধিকতর লালায়িত।" তিনি আমেরিকা অবস্থানকালীন একটি ঘটনা বিবৃত করলেন। তা আমার হৃদয়ে

চির-জাগরূক থাকবে। তাঁর সৌম্যমূর্তি দর্শনে ও মধুর সারগর্ভ বক্তৃতাদি শ্রবণে একজন কোটিপতির পরমাসুন্দরী যুবতী তনয়া ও উত্তরাধিকারিণী এত মুগ্ধা হলেন যে, তিনি তাঁকে স্বীয় আবাসে নিমন্ত্রণ করে তাঁর যথাসর্বস্ব—দেহ, মন, প্রাণ, ঐশ্বর্য—তাঁর চরণে সমর্পণ করার আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা জানালেন, এবং একথাও বললেন যে, তাঁর জীবনের কার্যে (in his mission of life) তিনি তাঁর সহযোগিনী হবেন। আপাততঃ মনে হতে পারে যে একজন চিরকুমার সন্ন্যাসী এই প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু মহাপুরুষদের ক্রিয়াকলাপ ও ব্যবহার, অনন্যসাধারণ ও অত্যাশ্চর্য। স্বামীজী ধীরভাবে উত্তর করলেন ঃ

"তোমার এই প্রস্তাবের জন্য আমি তোমার কাছে আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ; কিন্তু তোমার যেমন শরীর, মন, প্রাণ প্রভৃতি অর্পণ করবার স্বাধীনতা আছে, আমার সেরূপ অধিকার মোটেই নেই। আমার শরীর, মন, প্রাণ প্রভৃতি সমস্তই ইতিপূর্বে ভগবান রামকৃষ্ণের শ্রীচরণে চিরতরে সমর্পণ করেছি, সুতরাং আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হতে অক্ষম।"

এই কথাগুলি তাঁর মুখে শুনতে শুনতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছিল এবং সেগুলি চিরদিনের জন্য আমার মানসপটে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে তখন যে ভাবরাশি উদ্বেলিত হয়েছিল তা বাক্যে বর্ণনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। আমার মন বিস্ময়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিতে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর শরীর অতিরিক্ত পরিশ্রমে একেবারে ভেঙে পড়েছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বিবেকানন্দ স্বামী বললেন, "আমেরিকাতে শত শত মাইল রেলগাড়িতে গিয়ে একস্থানে বক্তৃতা দিতে হতো। আবার যথোচিত বিশ্রামাদি না করেই স্থানান্তরে গমন করতে হতো এবং বক্তৃতা দিতে হতো। এতে শরীর ভেঙে গেছে।" আমি বললাম, "আপনার জীবন আমাদের পক্ষে কত মূল্যবান! এবিষয়ে সংযত হয়ে চললেন না কেন?" তিনি উত্তর করলেন, "তখন নিজের দেহের কথা মনেই আসেনি।" এ-কথা অতীব সত্য। নিজের দেহের কথা মনে থাকলে কেন ব্যক্তিই জগতের কল্যাণ সাধন করতে পারে না।

মহাপুরুষদের দয়া ও স্মরণশক্তি অত্যাশ্চর্য। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলাম, "পরমহংসদেব আপনার মধুরকণ্ঠের যে-সকল সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হতেন, সেই সঙ্গীতগুলি আমাকে গেয়ে শোনাতে হবে।" একদিন রাত্রিতে দেখি আমার তৎকালীন গেণ্ডারিয়াস্থ বাসাতে হঠাৎ তাঁর প্রেরিত লোক উপস্থিত। সে বলল, "এখন গান হবে। স্বামী বিবেকানন্দ আপনাকে যেতে বলেছেন।" আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। শত শত অপরিচিত ব্যক্তির শত শত প্রশ্ন ও কথাবার্তার মধ্যে তিনি আমার মতো একজন সামান্য ব্যক্তির প্রার্থনা মনে করে রেখেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ মোহিনী-বাবুর বাড়ির দিকে ছুটলাম। সেখানে গিয়ে দেখি মহাত্মা শত শত ব্যক্তি পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। দূর থেকে আমাকে দেখামাত্র 'এহ্যেহি বিম্বন্' 'এহ্যেহি বিম্বন্' এইরূপ আহ্বান করতে লাগলেন। সমাগত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি এতে সহজেই আমার

দিকে আকৃষ্ট হলো। আমি লজ্জায় অধোবদন হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। পরে আমার প্রার্থনানুরূপ তাঁর সুকণ্ঠে পরমহংসদেবের প্রিয় কয়েকটি সংগীত শুনে চরিতার্থতা লাভ করলাম।

আর একদিন বললেন, "সার্ভিয়াতে (Servia) গিয়ে হিন্দু সওদাগর দেখে বিস্মিত হলাম। তারা সেখানে আতর, গোলাপের ব্যবসা করত। সেই সব মাড়োয়ারী বণিক স্থলপথে ভারতবর্ষ থেকে ইওরোপে গিয়েছিল। তারা সেখানে হিন্দু সন্ন্যাসী পেয়ে যে কত শ্রদ্ধাভক্তি ও আদর করল তা বলে শেষ করা যায় না।" এই ঘটনা দ্বারা ভারতীয় লোকদের সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

বিবেকানন্দ স্বামী যে কয়দিন ঢাকাতে ছিলেন, ততদিন সাধ্যানুরূপ তাঁর সঙ্গলাভে কৃতার্থ হয়েছি এবং সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য চিরজীবন প্রাণে অনুভব করছি। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য সত্যই বলেছেন :

'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥'

যতীন্দ্রমোহন দাস

লেখক ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বারবার ঢাকাবাসীর সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় যান। দিন পনের ছিলেন। মোহিনীমোহন দাসের ফরাসগঞ্জের বাড়িতে আনন্দের হাট বসে গেল। এই কদিন দুবেলা স্বামীজী প্রত্যহ ক্লাস করতেন। বহু লোকের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। জগন্নাথ কলেজের হলঘরে একটি বক্তৃতা, আর একটি বক্তৃতা পগোজ স্কুলের খেলার ময়দানে দেন। শেষোক্ত স্থলে বক্তৃতাকালে দেবদেহ থেকে যেন মহাশক্তির অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহ ক্ষণে ক্ষণে ঠিকরে বেরুচ্ছিল। আবালবৃদ্ধবনিতা মন্ত্রমুগ্ধ, উল্লাসে অধীর। একদিন হাসতে হাসতে বললেন, "আর গানটাই বা বাকি থাকে কেন? বাজিয়েদের ও ওস্তাদদের জমায়েত কর, গান হোক।" কিন্তু ঐ দিন সকালে একটু বমি করাতে সকলের মিনতিতে স্বামীজীর সেদিন আর গান গাওয়া হয়নি। আবার একদিন জলসা হলো। ঐ দিন—

তুঁহী পরম তীর্থ, তুঁহী পরম অর্থ। তুঁহী এক অব্যর্থ যোগিজন গাবে।
তুঁহী পরশমণি, তুঁহী অনন্তধনি। সুর নর ঋষি মুনি সদানন্দ পাবে ॥

ইত্যাদি পদযুক্ত গীতটি ও আরও অনেকগুলি ধ্রুপদাঙ্গ ভজন গেয়ে স্বামীজী সকলকে মোহিত করেন।

ঢাকায় নেমে তিনি শুনলেন আমার পুত্রের অসুখ। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী বললেন, "আমি যদি গৃহস্থ হতাম, আর আমার ছেলের যদি অসুখ থাকত এবং সন্ন্যাসীর আগমন হতো, সন্ন্যাসীকে বলতাম, আপনি এখন ফিরে যান, আপনি ফিরে গেলে আবার আপনাকে পাব, কিন্তু ছেলে গেলে ছেলে আর ফিরে পাব না। মন প্রাণ দিয়ে ছেলেকেই এখন আমি দেখব। অন্যদিকে নজর দেবার অবকাশ এখন আমার নেই।" আমার ছেলে তার মামার বাড়িতে ছিল। স্বামীজী অপরের অবস্থা প্রাণ দিয়ে বোধ করতে পারতেন। নিজেকে অন্যের অবস্থায় ফেলতে পারতেন।

ঢাকার সন্নিকটে ছেলের মামার বাড়ি গিয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করার জন্য অনুরুদ্ধ হলে স্বামীজী বিনয় সহকারে বলেছিলেন, "আমার কি শক্তি আছে? আমার আশীর্বাদে কি হবে?" কিন্তু একদিন গিয়ে রোগশয্যায় শায়িত বালকের বুকে মাথায় আশিস-হস্ত বুলিয়ে দিলেন। বালক ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

এই সময় গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) ও কানাই মহারাজকে (স্বামী নির্ভয়ানন্দকে) সঙ্গে নিয়ে ভুবনেশ্বরী দেবী (স্বামীজীর গর্ভধারিণী) কয়েকজন মহিলা সহ লাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুত্র-স্নানে যান। এঁদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য স্বামীজী একখানি বজরায় সেবকাদি সহ ঢাকা থেকে জলপথে বুড়িগঙ্গা দিয়ে ঐস্থানে হাজির হন। এই ভ্রমণ তাঁর খুব উপাদেয় বোধ হয়েছিল।

সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

ঢাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী।

আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরেই স্বামীজী ঢাকায় শুভপদার্পণ করেন। আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। স্বামীজীর ঢাকায় শুভাগমনের সুদূরপ্রসারী ফল বুঝতে হলে ঢাকার তৎকালীন ধর্মজীবনের সঙ্গে অন্ততঃ কিছুটা পরিচয় থাকা আবশ্যক। কোন কোন মহাপুরুষ পূর্ব থেকে অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন, আর কেউ কেউ বা নিজ সাধনলব্ধ জ্ঞানপ্রচার দ্বারা আবহাওয়ার আশ্চর্য পরিবর্তন সাধন করে মেঘমুক্ত সূর্যের মতো প্রতিভাত হন। এ এক ঐতিহাসিক সত্য।

ঢাকা নগরী একদা সমগ্র বাংলার রাজধানী ছিল, তখন কলকাতার সৃষ্টি হয়নি। বৈষ্ণবপ্রধান স্থান বলে ঢাকার খ্যাতি সুবিদিত। ঢাকার বিরাট জন্মাষ্টমী-মিছিল, ঝুলন প্রভৃতি প্রধান প্রধান উৎসবগুলির সঙ্গে যারা পরিচিত, তারা সহজেই এই সত্য উপলব্ধি করতে পারবে। ভারতের কোথাও শ্রীকৃষ্ণের পূজা-অর্চনা এইরূপ সর্বজনীনভাবে ও লোকশিক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ার কথা আমি অবগত নই।

আমাদের সময়ে অর্থাৎ গত শতাব্দীর শেষভাগে আরও দুইটি ধর্মান্দোলন ঢাকার নাগরিক জীবনকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছিল। একটি ব্রাহ্মধর্মের চর্চা, আর একটি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঢাকা শহরের গেন্ডারিয়া সাধনকুঞ্জ থেকে বিচ্ছুরিত ভক্তিভাব এবং অদূরেই নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্তী বারদীর বিখ্যাত ব্রহ্মচারী মহারাজের সাধনক্ষেত্র থেকে প্রচারিত জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিভাব। অদ্বিতীয় বক্তা ও সাধক স্বর্গত কেশবচন্দ্র সেনও ঢাকায় গিয়ে শিক্ষিত জনসমাজে ব্রাহ্মধর্মের প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। কাজেই ঢাকা শহরের আধ্যাত্মিক আবহাওয়া ও মনোবৃত্তি দিগ্বিজয়ী স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রস্তুতই ছিল। সমাজের আর একটা প্রভাবশালী অংশ ঢাকার ছাত্রসমাজ। তারা তখন থেকেই স্বদেশীভাবে অনুপ্রাণিত ছিল এবং যা কিছু বাংলার তথা ভারতের গৌরব, তাতেই একাত্মতা বোধ করত। যে স্বদেশী ভাব ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল বঙ্গবিভাগ-আন্দোলনের সময়, সেই আবহাওয়া ও পরিস্থিতির মধ্যে স্বামীজীর পূত পদধূলিকণাপাত ও জ্বালাময়ী ভাষণের আশু ও গৌণ প্রতিক্রিয়াই আমার বক্তব্য।

আমেরিকায় স্বামীজীর বক্তৃতা ও কৃতিত্বের সংবাদ পূর্বেই ঢাকা নাগরিক জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল; কাজেই সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল স্বামীজীর শুভপদার্পণের। আমাদের ঢাকা কলেজে তখন বিখ্যাত ইংরেজ এবং বাঙালী অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা করতেন।

স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করবার স্থান স্থিরীকৃত হলো শহরের কেন্দ্রস্থলে জগন্নাথ কলেজের বিরাট প্রাঙ্গণে। স্বামীজী ধর্মবক্তা বলে পরিচিত, কাজেই স্বামীজীর ভাষণ শুনতে বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের কোন বাধা ছিল না। কলেজ-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। দেখতে দেখতে আমরা ছাত্রবৃন্দও স্বামীজীর ইংরেজী ভাষায় ভাষণ শুনবার জন্যই প্রধানতঃ সমবেত হলাম। ভাষার পিছনে যে একটা অসাধারণ শক্তি থাকে, সেটা আমরা তখনই প্রথম অনুভব করলাম।

সৌম্য, শান্ত, দীর্ঘায়তন, গৈরিক-পরিহিত ও পাগড়ীবিভূষিতমস্তক স্বামীজী যখন মঞ্চে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর উজ্জ্বল প্রতিভার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। তাঁর চক্ষুর সরল অথচ অন্তঃস্তলস্পর্শী জ্যোতি এক মুহূর্তে মুগ্ধ করে ফেলল সেই বিরাট জনতাকে। গৈরিকধারী সন্ন্যাসী অনেক দেখেছি, কিন্তু গৈরিক-বসনকে গৌরবোজ্জ্বল ও মনোমুগ্ধকর করে তোলে এমন স্বর্গীয় প্রতিভাদীপ্তমূর্তি আর কেউ কখনো দেখেনি। স্বামীজী বক্তৃতা করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর আমেরিকার বক্তৃতার ধারা ছিল বেদান্তধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী, যা পাশ্চাত্যের কর্ণে এক নতুন সুরের ঝঙ্কার তুলেছিল। খ্রীস্টান পাদরীরাও খ্রীস্টের বাণীর প্রতিধ্বনি শুনলেন তাঁর বক্তৃতায়। স্বামীজীর ঢাকার বক্তৃতায় এক নতুন সুর শুনতে পেলাম : 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' তোমরা চিনে নাও নিজেদের—অমৃতের অধিকারী তোমরা। তোমাদের উন্নতির গতিরোধ করবার শক্তি পৃথিবীতে কারও

নেই। সাম্রাজ্যের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তোমরা হবে জগতের গুরু ও শিক্ষক। চাই তোমাদের আত্মবিশ্বাস (self-confidence)। ভারত ছিল একদিন আধ্যাত্মিক চিন্তাজগতের শীর্ষস্থানে। আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি, তোমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবময় ও মহান।

যুবকদলের প্রতি ছিল স্বামীজীর বিশেষ আহ্বান : জাগো, ওঠ। ছুঁড়ে ফেলে দাও আলস্য ও নির্জীবতা। এ তোমাদের শোভা পায় না। অগ্রসর হও। চরৈবেতি চরৈবেতি।

সে কী আহ্বান। কী তূর্য-নিনাদ। ঢাকাবাসী মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-উৎসব সম্পন্ন করে থাকে বটে, কিন্তু এর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি তারা স্বকর্ণে শোনেনি। আজ তারা শুনল সেই গুরুগম্ভীর ধ্বনি—জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনল সে ভাষণ। এমনই তন্ময়ভাবে শুনল যে, তার সারাংশ ব্যতীত আর কিছুই তাদের স্মৃতি ভারাক্রান্ত করল না। থাকল শুধু তাদের অবচেতন মনে একটা বিরাট সর্বাত্মিক চেতনা। চারিদিকে চলল নানাপ্রকার কল্পনা-জল্পনা। শিক্ষককুল এমন সুন্দর সহজ অথচ মর্মস্পর্শী ইংরেজী বক্তৃতা পূর্বে আর শোনেননি। বাইবেলের ইংরেজী থেকেও স্বামীজীর বক্তৃতার ভাষা সহজ সরল। আর রাজনীতিচর্চাকারীরা বললেন, স্বামীজী প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক নেতা, অচিরেই তাৎকালিক রাজনীতির ক্ষেত্র অধিকার করে বসবেন। যুবকগণের চিত্তে সে ভাষণ এক সুদূরপ্রসারী ভাবতরঙ্গ সৃষ্টি করল এবং জনসেবায় আত্মোৎসর্গের সংকল্প জাগিয়ে তুলল। সকলেই স্বীকার করবে যে, এর প্রতিধ্বনি এবং প্রেরণা পরবর্তী কালে ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের তীব্র স্বাদেশিকতায়। ঢাকার জনচিত্ত বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিল তাঁর সেই বীর্যপূর্ণ আহ্বানে। অহিংসবাদের অন্ধসেবক তিনি ছিলেন না। একদিন প্রশ্ন উঠল—"কোন্ খেলা ভাল ?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "ফুটবল খেলা, যাতে আছে পদাঘাতের পরিবর্তে পদাঘাত।" সেই সময়ে লাথি মেরে একজন কুলির প্লীহা ফাটিয়ে দিয়েছিল কোন দাম্ভিক ইংরেজ। এহেন মহাপুরুষ যাদের আদর্শ, তাদের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল স্বাধীনতার সৈন্যদল।

হেমচন্দ্র ঘোষ

প্রখ্যাত মুক্তিসংগ্রামী। প্রথমে 'মুক্তিসংঘ' এবং পরে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' (সংক্ষেপে 'বি. ভি.')-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বাধিনায়ক। রাইটার্সে'র অলিন্দযুদ্ধ-খ্যাত বিনয়-বাদল-দীনেশের বিপ্লবগুরু। হেমচন্দ্র ঘোষের দীর্ঘতর স্মৃতিকথার জন্য সম্পাদকের লেখা উদ্বোধন-প্রকাশিত—'স্বামী বিবেকানন্দ ঃ মহাবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের দৃষ্টিতে' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ১৯ মার্চ পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকা নগরীতে আসেন। স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রবীণ ব্যক্তিগণের সহিত আমিও অপরাহ্নে স্টেশনে গিয়াছিলাম। স্বামী বিবেকানন্দ যখন গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন তখন আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া উপস্থিত জনমণ্ডলী একসঙ্গে 'জয় রামকৃষ্ণ' 'জয় বিবেকানন্দ' ধ্বনি দিতে লাগিল। তেজোদৃপ্ত বীরসন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম।

ঢাকার জমিদার মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের বাটীতে স্বামীজীর থাকিবার স্থান সুনির্দিষ্ট হইয়াছিল। আমি প্রত্যহ সেখানে গিয়াছি এবং স্বামীজীর চরণস্পর্শ করিয়া নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিয়াছি। ইহা ব্যতীত স্বামীজী যে-সমস্ত স্থানে গিয়াছেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সে-সমস্ত স্থানে গিয়াছি। মোট চৌদ্দদিন তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি। স্বামীজীর সঙ্গে আমি দেওভোগে সাধু নাগ মহাশয়ের বাটীতেও গিয়াছিলাম।

৩০ ও ৩১ মার্চ স্বামীজী জগন্নাথ কলেজ এবং পগোজ স্কুলে দুইটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রথম বক্তৃতার বিষয় ছিল—'আমি কি শিখিয়াছি'; দ্বিতীয়টি ছিল 'আমাদের জন্মপ্রাপ্ত ধর্ম'। এই দুটি সভায় কয়েক সহস্র শ্রোতা ছিল। আমিও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম।

স্বামীজী ব্যক্তিগতভাবে যে-সমস্ত উপদেশ আমাকে দিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই ঃ

"সর্বপ্রথমে চরিত্রবান হও। ভারতমাতার সেবা করিতে যদি চাও তাহা হইলে বীর্যবান হও। দেশমাতৃকার দুর্গতি দূর করিবার জন্য প্রচণ্ড শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হও। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ পাঠ করিলে শক্তিলাভ করিবে।" স্বামীজীর এই উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছি এবং আমার সাধ্যমতো দেশমাতৃকার সেবা করিয়াছি।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুলাই স্বামীজীর পরলোক-প্রাপ্তি হয়। সেই হইতে আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যও আমি মনে করিতে পারি না যে, স্বামীজী আমাদের মধ্যে নাই। তাঁহার সেই অমোঘ বাণী আমাদের কানে প্রতিনিয়ত ধ্বনি দিতেছে ঃ

"সাহস অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব কর্ম করিয়া যাও, জয় তোমাদের অনিবার্য।"

আমার বয়স যতই বাড়িতে লাগিল, ততই বুঝিতে পারিলাম স্বামী বিবেকানন্দের বাণীই আমাদের একমাত্র অবলম্বন এবং একমাত্র সম্বল।

সেই কারণে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের হৃদয়ের মানুষ, সমগ্র চৈতন্যের সাথী। স্বামী বিবেকানন্দ যত বড় মহাপুরুষই হউন না কেন—বাংলার বিপ্লবীরা তাঁহাকে দেখিয়াছেন বন্ধুরূপে, পথদ্রষ্টা অগ্রজরূপে। তাঁহাকে বিপ্লবীরা পটে বসাইয়া, দেবতার আসনে স্থাপিত করিয়া পূজা করেন নাই। তাঁহারা স্বামীজীকে অন্তরে স্থাপন করিয়া, সকল কর্মের সঙ্গী করিয়া পথ চলিয়াছেন। তাই বিবেকানন্দ বিপ্লবীর রক্তের আত্মীয়, পথের বন্ধু, আদর্শ-সাধনার গুরু, সর্বসময়ে তাঁহাদের নিকটতম জন—দূরের মানুষ নহেন। তাঁহাকে আমার অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

[রাখাল বেণু, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৬]

সুরেন্দ্রনাথ দত্ত

নরেন্দ্রনাথের জ্যাঠামহাশয়ের (কালীপ্রসাদ দত্তের পুত্র কেদারনাথ দত্তের) পুত্র—ডাক নাম তমু দত্ত। বাটিকাময় জীবন তাঁর। সপরিবারে খ্রীস্টান হন। শেষ বয়সে স্বামী সারদানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। তিনি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে ক্ল্যারিঅনেট ও হারমোনিয়াম বাজাতেন।

স্বামীজীর মা (ভুবনেশ্বরী দেবী) ও দিদিমা (রঘুমণি দেবী) উভয়েই অতীব সৌষ্ঠবসম্পন্না, দীর্ঘাকৃতি, পরম সুরূপা। নাক মুখ চোখ—বড় বড়। আয়তনে উন্নত পরিপুষ্ট। চাকা মুখ, বনেদী চেহারা। সেকালের শক্ত গিন্নি। মায়ে-ঝিয়ে খুবই ভাল রান্না করতে পারতেন—সব রকম। আমিষ ও নিরামিষ।

দুইজনেরই চোখের সামনে দীপ্তিমান নরেন্দ্রের সমগ্র জীবনপটখানি আরম্ভ হলো, ফুরোল। খেলার মতো। সবটাতেই এঁরা বিরাজমানা। প্রথমে উদয়, সাফল্যের প্রখর মধ্যাহ্ন। পুনরায় সায়ংসূর্যের ন্যায় গঙ্গার পশ্চিম কূলে আলো করে জগৎকে আঁখিজলে ভাসিয়ে অস্তমিত।

বুড়িরা এক আধারে আনন্দের ভাগ পেলেন, আবার চরম নিরানন্দে উন্মাদের ন্যায় আপনহারা হলেন। সিমলের বিশ্বনাথ দত্তের বাড়ির একতলার তখনকার ছাদের উপর খড়ের আতুরঘরে নরেন্দ্রের আবির্ভাব। শ্রীমান বিল্লে সুন্দর, সুচারু, সুদৃঢ় শরীরের গঠন। কালের কবলে পিতৃদেবের অপসারণ। তখন একমাত্র আশা-ভরসাস্থল সংসারের ঐ জ্যেষ্ঠ বালক। সমর্থ, সুশিক্ষিত। মা ও দিদিমা দুজনেরই প্রাণ

কাঁদিয়ে নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরের টানে মায়ার ফাঁস কাটতে দ্বিধা করলেন না। সাধু হলেন। রানী রাসমণির মহাপীঠে, কাশীপুর উদ্যানে, দূরে পাহাড়-কান্তারে লোকলোচনের অন্তরালে ধীরে ধীরে তপঃশক্তি সঞ্চয়। ব্রাহ্মীস্থিতি।' পরে ভুবন ভোলালেন। মা ও দিদিমা সেই মাহেন্দ্রক্ষণে দশদিকে জয়দুন্দুভি শ্রবণ করে চরম উল্লসিতা। আদরের নিধির গৌরবে তাঁরাও গৌরবজ্জ্বলা। নরেন্দ্র যে তাঁদেরই কোলেপিঠে চেপে সোহাগ ও চড়-চাপড় খেয়ে 'মানুষ' হয়েছেন।

তারপর বেলুড়ে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের অস্থিস্থাপন ও অনেকদিনের প্রাণাকাঙ্ক্ষা পূরণ—মঠস্থাপনা। নবীন ভারতের সাধন ও কর্মচক্র প্রবর্তন। আবার বারাণসী সমতুল বেলুড়ের ঐ তীর্থকেন্দ্রে অমানুষিক তপোদ্যম ও কর্মোদ্যম-অন্তে চিরবিশ্রাম গ্রহণ। 'জায়তে' থেকে 'লীয়তে' পর্যন্ত সবটাই মাতৃকাদের দেখতে হলো। কোথায় শ্রীমান নরেন্দ্রনাথের কোলে এঁরা যাবেন, না এঁদের ফেলে তিনি ফাঁকি দিয়ে পালালেন।

এই দুই সাক্ষীস্বরূপা বৃদ্ধা, সতৃষ্ণ নয়নে, আবার অতীব কাতর প্রাণে পরদার পর পরদা একে একে দেখলেন। নরেন্দ্র যখন ত্রিশ বর্ষে মার্কিন মুলুক তোলপাড় করছিলেন, এঁরা লোকমুখে, সংবাদপত্র মাধ্যমে বৃত্তান্ত শুনে ও পাঠ করে আহ্লাদে আটখানা। এই মহান দিগ্‌বিজয় ঘটনাটির আবার নয় বৎসর পরে মহান বিষাদের পরিস্থিতি তাঁদের ঘিরে ফেলল।

দিনে দিনে, তিলে তিলে প্রসূতি-আগার থেকে, ন্যাতা-কাঁথা থেকে নরেন্দ্রনাথের জীবন-নাট্যের সব পদচিহ্নগুলি এঁদের একে একে মনে পড়তে লাগল। ১৯০১-০২ খ্রীস্টাব্দের কথা। জগজ্জয়ী হয়েও তিনি যে এঁদের স্নেহের পুত্র ও নাতি ছিলেন। সেইভাবেই তিনি ওঁদের সাগ্রহ আহ্বানে প্রখরোজ্জ্বল আঁখি দুটি নিয়ে বেলুড় থেকে আবার রামতনু বোসের গলিতে মামার বাড়িতে গেলেন। মামাবিহীন মামার বাড়ি। এধারে আবার রঘুমণি দেবীর একমাত্র অঞ্চলমণি, একমাত্র সন্তান—ভুবনেশ্বরী দেবী। তাই দিদিমা মাকে বড় একটা চোখের আড়ালে রাখতে চাইতেন না। এবারে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত সিদ্ধযোগীকে দিদিমা নিজ দুয়ারে ফিরে পেয়েছেন। বাহ্যতঃ তাঁর নাতি, কিন্তু প্রত্যুতঃ অন্য মানুষই। দিদিমার বাড়িতে দিদিমাকে সীমাহীন আনন্দ দিতে স্বামীজী মধ্যে মধ্যে যেতেন। পঠদ্দশায় তাঁর বড় ন্যাওটা ছিলেন স্বামীজী। দিদিমার ওখানেই একটি নির্জন কক্ষে—যেটিকে তিনি 'টঙ' বলতেন—পাঠাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস করতেন। মা ইদানীং তাঁর মায়ের কাছেই থাকতেন। মাকে ছাড়িয়েও দিদিমা অপার্থিব সুন্দরী ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর রূপ ফেটে পড়ত।

নানা ব্যঞ্জন প্রস্তুত হতো। নানা ছাঁদে হরেক রকমের পাক-প্রস্তুতপ্রণালীতে দুজনেই পরম দক্ষা। চেলা-চাপাটি সঙ্গে নিয়ে স্বামীজী খেয়ে আসতেন। এঁদের রান্না শুকতো ও মোচার ডালনার খুব তারিফ করতেন। রঙ্গ করে বলতেন, বাঙলা-দেশের এই দুটোর জন্যে আবার কিন্তু জন্ম নেওয়া যায়। এইভাবে মা ও দিদিমা কিয়ৎ পরিমাণে সেবাযত্ন করতে পেরে খুশি। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন স্বামীজীর সেবা

যত্ন করার অনেক ব্যক্তির সমাবেশ বেলুড়ে। স্বামীজীর প্রতি তাঁদের দরদও অসীম। ভক্তি অপরিমেয়। বাড়িতে ঐরূপ যত্ন কল্পনাতেও আসে না। মা দিদিমার তা দেখে খুব আহ্লাদ। 'আমাদের' জিনিস যখন 'অনেকেরই' পরম শ্রদ্ধার আস্পদ হয়—দৃশ্যে দেখে তাঁদের মুগ্ধ হবার কথা। পুরাণের পাতায় বর্ণিত গুরুভক্তির কথা 'পড়া' এক, আর স্বামীজীর শিষ্যদের স্বামীজীর প্রতি জীবন্ত ভক্তি 'দেখা' আর এক। বাস্তব কাহিনীকেও সময়ে সময়ে পরাস্ত করে।

ভুবনেশ্বরী-জননীর সঙ্গে স্বামীজীর নাতি-দিদিমা সম্বন্ধ। ঠাট্টা তামাসা চলত। 'ভুবন-প্রখ্যাত' 'ভুবন-বিজয়ী' 'ভুবন-মোহন' নাতিকে তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "আর কেন, তোর তো সব হলো। এইবার বিয়েটা বাকি আছে। বিয়েটা করে ফেল।" স্বামীজী শুনে হাসির হররা তুললেন। ঐ কথার উত্তরে কি আর বলবেন? রহস্যের অধিকার মাতামহীকে দিলেন।

কিন্তু তাঁদের দুজনেরই পূর্বে, দুই বৃদ্ধাকেই অকূল শোকসাগরে ভাসিয়ে নরেন্দ্রনাথ সহসা চলে গেলেন। সন্ন্যাসীর দেহান্তে শোক করতে নেই। কিন্তু মা ও দিদিমার মন মানবে কেন?

স্বামীজী বহু জননীকে সত্যসন্ধান ও স্থায়ী প্রশান্তি-সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন। নিজের মায়ের প্রতিও নিষ্ঠুর হননি। তাঁকে যথেষ্ট ভক্তি করতেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে অসুস্থ শরীর নিয়েও মাকে কামাখ্যা ও চন্দ্রনাথ তীর্থে নিয়ে যান। সেদিন মার মন কত উৎফুল্ল। স্বামীজী মধ্যে মধ্যে মা ও দিদিমাকে বেলুড় থেকে উপঢৌকন—ফলমূল তরিতরকারি পাঠিয়ে তত্ত্ব নিতেন। আর বিশেষ আবশ্যক হলে রাখাল মহারাজকে মায়ের কাছে পাঠাতেন।

একদিন মায়ের আহারের স্বল্প পরে স্বামীজী গিয়ে হাজির। ইচ্ছা, মার পাতের একটু প্রসাদ খান। সজনে খাড়াটুকু মাত্র অবশেষ ছিল। মা সংকুচিতা। একটু আগে আসতে হয়। 'কি হয়েছে', বলে সমাদর করে ঐ টুকরোটি খেয়েই পরিতৃপ্ত।

একদিন রাত্রে সিমলেয় মার কাছে খাওয়া-দাওয়া করে হেঁটে হেঁটে উনি বাগবাজারের দিকে যাচ্ছেন। আমিও সঙ্গে। বেথুন কলেজের ফুটপাতে একটি ভিখারি পয়সা চাওয়াতে পকেটে একটা কি ছিল না দেখে ফেলে দিয়ে সটান চললেন। খানিক বাদে হাঁফাতে হাঁফাতে লোকটি এসে বলছে, "সাধু বাবা, আপনি ভুল করে সোনার পয়সা কেন দিলেন, পুলিস দেখতে পেলে আমাকে ধরবে।" স্বামীজী গিনিটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও যখন তোকে দিয়েছি, ফেরত নেব না, ও তোরই। লুকিয়ে রাখ।"*

* আরেকবার। সেও কলকাতাতেই। রাত্রে স্বামীজী ঘোড়ার গাড়িতে বলরাম মন্দিরে ফিরছেন। সঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামীজীর বুক পকেটে ছিল একটা সোনার ঘড়ি। সেটা বের করে দেখছেন সময়। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান সেই সময় পিছন ফিরেছে। চোখ পড়ল স্বামীজীর

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

আমি তখন হাবড়াতে এক খুল্লতাত-গৃহে থেকে এণ্ট্রান্স দ্বিতীয় কি প্রথম শ্রেণীতে পড়ছিলাম। খুড়ো মশায়ের কাছে ইংরেজী বাঙলা কাগজ আসত। আমি বাল্যকাল থেকেই সংবাদপত্র-ভক্ত ছিলাম। পড়লাম, "আমাদের নরেন্দ্রনাথ ফিরে এসেছেন। দিগ্বিজয় করে সনাতন ধর্মকে পাশ্চাত্য জগতে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে স্বদেশের ধন মাতৃ-ক্রোড়ে ফিরে এসেছেন।" ঐদিন থেকে আমি প্রতিদিন প্রতি সুযোগে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকাহিনী জানবার জন্য উৎসুক হলাম। তখন বালক ছিলাম, তাই তিনি কি করেছেন না করেছেন, কি জয় করেছেন, কি প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই সব জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করে কেবল তাঁর জীবনের ঘটনাবলী জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমি বাল্যের ঐ শুভ মুহূর্তকে, ঐ ব্যাকুলতাপূর্ণ শুভ আগ্রহকে এখনো প্রতিদিন ভক্তিপূরিত নয়ন-জলে স্মরণপথে এনে থাকি।

সেইদিন থেকে স্বামীজীকে আমি জানি। কলেজে পড়তে আরম্ভ করে স্বামীজীর সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানতে লাগলাম। এখন যতই দিন যাচ্ছে—তাঁর সেই তেজোময় চক্ষু ততই যেন আমার চক্ষের উপরে প্রতি মুহূর্তে বিভাসিত হয়ে উঠছে। প্রতি মুহূর্তে যেন দেখছি, অনতিদূরে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বদিকে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক প্রেমের রবে জগৎবাসিগণকে ডাকছেন—সেই ঋষিকণ্ঠ-মুখরিত চিরপুরাতন বাণী তাঁর মুখে যেন আবার নবীনতর হয়ে উঠেছে ঃ

"ভাইসব, ওঠ, জাগ, আর ঘুমিও না! মৃত্যু তো দিন দিন কাছে আসছে।"

কলেজে পড়তে আরম্ভ করে তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হলাম। বেলুড় মঠের দিকে ছুটতাম। আমার বলবার চাইবার বিশেষ কিছু ছিল না। নিজের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করে শুধু শুনবার জন্য নম্রহৃদয়ে বসতাম। মঠের অন্যান্য সাধুগণ—যাঁদের

হাতে সোনার ঘড়িতে। লোভীর দৃষ্টিতে সে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। স্বামীজী সহজভাবে তাকে বললেন, "কিরে নিবি এটা?" সে কিছু বলার আগেই স্বামীজী তাঁর হাতের ঘড়িটি তার হাতে দিয়ে দিলেন। রাজা মহারাজ কিছু বললেন না। জানতেন স্বামীজীকে বাধা দেওয়া বৃথা। সোনার ঘড়ি বলে নয়, স্বামীজীর ব্যবহৃত জিনিস, তার মর্ম ঐ গরিব গাড়োয়ান কি বুঝবে। সে তো কারও কাছে তৎক্ষণাৎ তা বিক্রি করে দেবে। বলরাম মন্দিরে গাড়ি পৌঁছানোয় স্বামীজী নেবে গেলেন। রাজা মহারাজ বললেন, "তুমি চল, আমি ওকে ভাড়ায় টাকাটা মিটিয়ে যাচ্ছি।" স্বামীজী চলে গেলে রাজা মহারাজ গাড়োয়ানকে বললেন, "তোমাকে দেড়শ টাকা দিচ্ছি, তুমি ঐ ঘড়িটি আমাকে দিয়ে দাও।" গাড়োয়ান তো খুব খুশি। দেড়শ টাকা দিয়ে রাজা মহারাজ ঘড়িটি ফিরিয়ে নিলেন। সেই ঘড়িটি এখন বেলুড় মঠের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। —সম্পাদক।

পবিত্র জীবন, জলন্ত স্বার্থত্যাগ এবং ধর্ম ও কর্মনিষ্ঠা আজও শত শত জনকে ঐ মঠের দিকে দ্বিগুণতর বেগে আকর্ষণ করছে—সকলেই বসতেন। কত লোক আসতেন, কত কথা হতো, ঐসব দিনের কথা মনে হলে যেন এক স্বপ্নরাজ্যে চলে যাই। সকলে মুগ্ধ হয়ে, যেন এক নতুন সম্পত্তির অধিকারী হয়ে প্রেমপূর্ণ মুখে উঠে যেতেন। আর বাক্য নেই। আর ক্ষুদ্র কথা নেই। সকলেই নীরব, চিন্তাশীল। আমি তো অতশত কিছু বুঝতাম না। শুধু শুনতাম—আর মাঝে মাঝে তীব্র বৈরাগ্যের বাণী হৃদয়ে উপলব্ধি করে—যেমন আবালবৃদ্ধ সকলেরই কোন কোন শুভ মুহূর্তে হয়ে থাকে—আমার হৃদয় জেগে উঠত, চোখে জল আসত।

এইরূপ সকাল-সন্ধ্যায় অনেকদিন আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে মঙ্গল ইচ্ছাগুলি প্রাণে নিয়ে জাহ্নবী পার হয়ে কলকাতায় ফিরতাম। এভাবে আমি স্বামীজীকে জানি। অথবা তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানি না বলাই ভাল।

একদিন বিভিন্ন কলেজের কয়েকজন যুবক-বন্ধুর সঙ্গে স্বামীজীর কাছে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। কত কথা হচ্ছে। প্রশ্ন করা মাত্র আর কথা নেই, অমনি মুহূর্তমধ্যে most conclusive জবাব দিচ্ছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "তোরা তো কত European philosophy, metaphysics পড়ছিস, কত কত দেশের নতুন নতুন কাহিনী জানছিস, আমাকে বল দেখি—what is the grandest of all the truths in life?"

আমরা মনে করলাম, তিনি না জানি কি প্রশ্ন করেছেন। সকলেই উত্তরবিমুখ, ভাবতে লাগলাম না জানি কি উত্তর তিনি অপেক্ষা করছেন। অমনি বাঙ্গপূর্ণ ভাষায় বলে উঠলেন :

"দেখ শোন, we shall all die—আমরা সকলেই মরব। প্রতিদিন এইকথা মনে রাখিস, তবেই প্রাণ জেগে উঠবে। তবেই নীচাশয়তা দূর হয়ে যাবে, কার্যে সক্ষম হবি, শরীর-মন সবল হবে। আর তোদের সংস্পর্শে যারা আসবে, তারা সকলেই তোদের কাছ থেকে কিছু পাবে।"

আমি অমনি বলে উঠলাম, "স্বামীজী! মৃত্যুর কথা মনে এলে তো হৃদয় ভেঙে পড়বে, নিরাশা এসে হৃদয়কে অধিকার করবে।"

স্বামীজী। তুই ঠিক বলেছিস, প্রথমে হৃদয় ভেঙে পড়বে, নিরাশা আসবে বটে। কিন্তু যাক না দু-দশ দিন। তারপর? তারপর দেখবি হৃদয়ে জোর এসেছে, মৃত্যু-চিন্তা সর্বদা হৃদয়ে থেকে তোদের নবীন জীবন দান করছে। প্রতি মুহূর্তে রক্তমাংসের নশ্বরতা জানিয়ে দিয়ে তোকে চিন্তাশীল করে তুলছে। দুদিন যাক, দুমাস-দুবছর যাক, দেখবি তুই সিংহবিক্রমে জেগে উঠছিস। ক্ষুদ্র শক্তি মহৎ শক্তি হয়ে উঠেছে। মৃত্যুচিন্তা কর দেখি—দেখবি, তোরা নিজেরাই উপলব্ধি করবি। কথায় আমি আর কি বোঝাব!

কোন এক বন্ধু নম্রভাবে স্বামীজীর গুণানুবাদ করতে লাগলেন।

স্বামীজী। আমাকে প্রশংসা করিস না। জগতে প্রশংসা-নিন্দার কোন মূল্য

নেই। মানুষকে দোলাতে নাচায় মাত্র। প্রশংসা বহুৎ পেয়েছি। গালিবর্ষণও কম হয়নি। ওসব দিকে তাকিয়ে আমার কি হবে। সকলেই নিজ নিজ কাজ কর। দিন আসলেই আমি, তুই সব মিলিয়ে যাব। কাজ করতে এসেছি, ডাক পড়লেই তুই আমি চলে যাব।

আমি। আমরা কত ক্ষুদ্র—স্বামীজী।

স্বামীজী। ঠিক বলেছিস তুই, ঠিক বলেছিস। এই যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, কোটি কোটি সৌরমণ্ডলের কথা একবার চিন্তা করে দেখ দেখি—কি এক অনন্ত শক্তিতে প্রবুদ্ধ হয়ে এ জগৎ যেন কার চরণে ছুটে চলেছে, আমরা কত ক্ষুদ্র, ভাব দেখি। এখানে কি আমাদের ক্ষুদ্রতা নীচাশয়তাকে প্রশ্রয় দিতে আছে? এখানে কি শত্রুতা দলাদলি করতে আছে? তোরা সব কলেজ থেকে বেরিয়ে শুধু পরসেবায় লেগে যা দেখি? আমার কথা বিশ্বাস কর, টাকা পয়সায় পূর্ণ ভাণ্ডারের বোঝা নিয়ে যত সুখ না পাবি, তার চেয়ে অনেক আনন্দ পাবি, একদিকে পরসেবা করবি অপর দিকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হবি।

আমি বললাম, "আমরা যে বড় দরিদ্র স্বামীজী।"

স্বামীজী। রেখে দে দারিদ্র্য। তুই কিসে দরিদ্র বল দেখি? তোর জুড়ি-গাড়ি নেই তাই দুঃখ করছিস? আরে তুই পায়ে হেঁটে দিনরাত খেটে যে সব কাজ করে যাবি। ঐ দেখ জীবন-জাহ্নবীর পরপার দেখা যাচ্ছে—ঐ দেখ মরণের পরদা খুলে গেছে। তোরা কী এক অমৃত রাজ্যের অধিকারী।

আমি। আপনার কাছে বসলে আমাদের কথা বলতে ইচ্ছা করে না—শুধু শুনি।

স্বামীজী। দেখ, এই যে কত বছর ভারতের নানাদেশ ঘুরেছি—কত হৃদয়বান মানুষ দেখেছি। কত কত মহাপুরুষ দেখেছি, তাঁদের কাছে বসলে হৃদয়ে এক অদ্ভুত শক্তি আসত, তারই জোরে তোদের দুই এক কথা বলছি মাত্র, আমাকে তোরা একটা মস্ত কিছু ভাবিস না।

আমি। আমরা মনে করি, আপনি ভগবানকে পেয়েছেন।

যেই এই কথা বললাম, এখনো আমার সেই আকর্ণ-বিস্তৃত জলপূর্ণ-চক্ষু মনে পড়ে—অমনি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আস্তে আস্তে বলে উঠলেন:

> "ঐ চরণে জ্ঞানিগণের জ্ঞানের সার্থকতা। ঐ চরণে প্রেমিকের প্রেমের সার্থকতা। কোথায় যাবে জগতের নরনারী—ঐ চরণে আসতেই হবে।"

কিছুক্ষণ পরে বলতে লাগলেন:

"জগতের মানুষগুলি পাগলামি করে সমস্ত দিন মারামারি কাটাকাটি করছে। সারাটা দিন কি আর এইভাবে চলে? সন্ধ্যায় মায়ের কোলে আসতেই হবে।"

এইরূপে বেলুড়ের পুণ্য মঠে কতদিন গিয়েছিলাম, স্বামীজীর কত কথাই শুনেছিলাম। জাপান যাবার উদ্যোগ হচ্ছে, শরীরও পূর্বাপেক্ষা সুস্থ হচ্ছে, এমন

সময় হঠাৎ ৫ জুলাই প্রাতঃকালে কি এক নিদারুণ বাণী পৌঁছল, "স্বামী বিবেকানন্দ ইহলোকে নেই!"...

তিলক 'কেশরী' পত্রিকায় লিখেছিলেন: "স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান সময়ে ভারতে দ্বিতীয় শঙ্কর ছিলেন।"

এ ব্রহ্মাণ্ডে কত নর নারী, আসছে, যাচ্ছে। অনন্ত কাল প্রবাহে নবীন পুরাতন হচ্ছে, পুরাতন নবীন হবে, যেসব মহাপুরুষের জীবন শত শত ভ্রান্ত ও ক্লান্তজনকে কঠোর জীবনপথে চলবার আশা ও বল দিয়ে যাচ্ছেন:

"Well have they lived, who leave the world bestowing upon posterity a hallowed name."

অথবা তোমার জন্য, আমরা দুঃখ করবই বা কেন? তুমি তো চলে যাওনি—অতি নিকটে রয়েছ—

তুমি,

> **Ah ! you who turned the spirit's mystic tide**
> **And gave new life-blood into foreign lands**
> **Thy country's hero and thy nation's pride.**
> **Oh ! hear the prayers she weeping upwards sends,**
> **And take the offering from her trembling hands.**

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্যাতনামা সাহিত্যিক। সাহিত্যিক মহলের শ্রদ্ধেয় 'দাদামশাই'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রাপ্ত, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

বহুদিনের কথা। বোধ হয় সেটা ছিল ইংরেজি ১৮৮১ কি ১৮৮২। খুব সম্ভব রবিবার কি ছুটির দিন। দক্ষিণেশ্বরে আমাদের বাড়ি ভাগীরথীর সন্নিকট—মিনিট পাঁচেকের পথ। তাই আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে আমার সমবয়স্ক বন্ধু-বান্ধবদের সমাগম ছিল প্রায় নিত্যই। প্রাতে স্নানে যাবার সময় এবং সন্ধ্যার পর আমাদের আড্ডা বসত। থাকতাম আমরা জন সাতেক।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। দাবাবোড়ে, তাসখেলা, নানাকথা ও গল্পাদি চলছিল। বাচস্পতি পাড়ার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, তিনি তখন বি. এ পড়েন—এসে বললেন, "তোমাকে আমার বড় দরকার, আমাদের বাড়ি একবার যেতে হবে। কলকাতা হতে আমার এক সহপাঠী বন্ধু এসেছেন, তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দোব। তাঁকে মুড়িগুড় খেতে দিয়ে, বসিয়ে এসেছি। উঠে পড়, বিলম্ব করো না।"

উঠতে হলো। পথে জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি একটু বল। আমাকে ডাকবার একটা কোন কারণ তো আছে, শুনে রাখি।"

হরিদাস হাসতে হাসতে বললেন, "বিশেষ কিছুই নয়। এই তুমি যেমন আমাদের দলের প্রধান বক্তা ও রহস্যপটু আনন্দদাতা, তিনিও কলেজে আমাদের গল্পে ও কথায় রসমুগ্ধ করে রাখেন। তাঁর সঙ্গ সকলেই খোঁজেন, তাঁর মতো রসমধুর বক্তা বিরল।"

শুনে আমি চিন্তা-চঞ্চল হয়ে পড়লুম। এ যেন পরীক্ষা দিতে যাওয়া। ভাববার সময় নেই, সামনাসামনি এসে পড়েছি। বেশ এক মুঠো মুড়ি মুখে ফেলে, "Welcome my mighty mate"—বলে, মুড়ির থালাখানি আমার দিকে একটু ঠেলে দিয়ে বললেন, "লেগে যান।"

বললুম, "মাজতে নাকি? সে কাজটা আর এখানে কেন। হরিদাস বড় সৌখীন লোক।"

"সৌকি ফুরিয়ে গেল নাকি, Haridas a damn thrift"—হাসি পড়ে গেল। আমাদের কথাও আরম্ভ হয়ে গেল।

হরিদাস আমাদের পরিচয় করে দিলেম—ইনি কলকাতার সিমলা-নিবাসী শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত, আমাদের সহপাঠী হলেও দুনিয়ার কি বা কোন্ বিষয় যে জানেন না সেইটি জানি না।

নরেন্দ্রনাথ বললেন, "কেন—ম্যাথামেটিক্স? বিদ্যাসাগর মশাই এখনো বেঁচে আছেন—সদা সত্য কথা কহিবে।"

থাক, নরেন্দ্রের কথার হাটে আর ঢুকব না। আমাকে দেখিয়ে হরিদাস বললেন: "ইনি হচ্ছেন আমাদের পল্লীবন্ধু শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"কি বললে—বন্দ্যোপাধ্যায়! আর বলতে হবে না, অর্থাৎ আত্মঘাতী, তা না তো আর তোমাদের স্থান দিয়ে নিজের আশ্রম পীড়া খুঁজেছেন। শাণ্ডিল্যেরা শিবের বংশ, তাঁর ঐশ্বর্যের দৌড় দেখেছ তো—শেষ বস্ত্রহীন উলঙ্গ হয়ে থাকা পর্যন্ত। সাবধান—"

থাক, আর নয়। আমি তাঁর কথাবার্তার দু-একটা পরিচয় দিয়ে রাখলুম মাত্র। তিনি যেমন সুপুরুষ, তেমনি সুবক্তা। তাঁকে দেখলে ও তাঁর কথা শুনলে, মুগ্ধ না হয়ে কেউ পারতেন না। পাছে কেউ ভুল বোঝেন তাই বলে রাখছি তাঁর রহস্যমাখা ভাষা ছিল শোনবার জিনিস, কিন্তু বস্তু থাকত "ভাবে"। এমন কথা কইতেন না যাতে পাবার কিছু থাকত না। সবই সদর্থপূর্ণ ও দরকারি। শ্রোতা যদি নিবিষ্ট সমঝদার হন শুনে অবাক হয়ে ভাবতেন বয়সের অনুপাতে এতটা জ্ঞান হয় কি করে! এ যে শাস্ত্রজ্ঞ বড় বড় পণ্ডিতদেরও চমকপ্রদ। তাঁর কাছে সেসব কিন্তু হাসি রহস্য-চ্ছলেই প্রকাশ পেত।

এমন অদ্ভুত যুবা দেখিনি। আমার চেয়ে মাত্র মাস দেড়েকের বড় ছিলেন। আবশ্যকবোধে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু বলে রাখতে বাধ্য হলুম। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

বিকালে তাঁরই ইচ্ছামত রানী রাসমণির ভাগীরথীতীরস্থ কালীবাড়ি দেখতে যাওয়া গেল। নরেন্দ্রনাথ বললেন, "না হয় ঠকাই যাবে, শুনেছি একটি নিরক্ষর ব্রাহ্মণ, যিনি ইতিপূর্বে মা কালীর পূজারী ছিলেন, এখন সহসা সিদ্ধপুরুষ। আমাদের দেশে যা সহজেই হওয়া যায়। তাঁকে দেখাও হবে। আমাদের দেশে লোক পয়সা দিয়েও ভেল্কি দেখে। শুনেছি এখানে পয়সাও লাগে না। নিরক্ষরের কাছে আমার শোনবার কিছু নেই, দেখবার থাকে তো দেখা যাবে হে। আমি একদিন ঘুরে ফিরে চলে গেছি।" কথাটা এই ভাবের হয়েছিল।

শুনে আমি চমকে উঠি। তিনি সেটা লক্ষ্য করেছিলেন, বললেন, "ব্যানার্জির দেখা আছে বুঝি, ব্যানার্জিরা কি এমন মওকা ছাড়েন! ওসব যে ওঁদের জন্যেই।"

বললুম, "কেশববাবু কোন সময়ে তাঁর Sunday Mirror-এ 'দক্ষিণেশ্বরের যোগী' বলে যাঁর কথা লিখেছিলেন, ইনিই কি?"

"হাঁ হাঁ, আর বলতে হবে না—ইনিই সেই সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাহলে জানা শোনা আছে?"

"না। সেই 'না-থাকার' অপরাধটা স্মরণ হওয়াতেই চমকে উঠেছিলুম। আমার অগ্রজ মীরাটে থাকেন—তিনি জানতে চেয়েছিলেন ও আমাকে সাধুর সঙ্গে দেখা করে কিছু লিখতেও বলেছিলেন। কোন কারণে তা হয়ে ওঠেনি, পরে ভুলেও গিয়েছিলুম। ভারী অপরাধ হয়ে গেছে।"

"ও—তাই। চলো, অপরাধ মিটিয়ে আসবে। ব্যানার্জি plus ব্যানার্জি তোমাদের শোনাই যথেষ্ট, তাঁকে না দেখেও দাদাকে লিখতে পার 'সিদ্ধ মহাপুরুষ'। তোমরা ধর্মবিশ্বাসী, চল।"

রাসমণির বাগানের পোস্তায় বসে নরেন্দ্রনাথের গান চলছিল। একজন এসে বললেন, "পরমহংসদেব ডাকছেন।"

"চল দেখে আসা যাক" বলে নরেন্দ্রনাথ উঠলেন—আমরা সঙ্গ নিলুম।

উত্তর পশ্চিম প্রান্তের ছোট একটি কুটুরি। আমরা অভ্যাসমত কাজ-সারা হাত-তোলা নমস্কার করতে করতে ঢুকলুম। ছোট একটি তক্তপোশে, ছোট একখানি পাড়ী কাপড় পরা। যিনি বসেছিলেন তাঁর হাস্যমুখ—নিচে কয়েকটি আগন্তুক।

নরেন্দ্রের দিকে চেয়ে বললেন, "আস না কেন, আমি যে তোমার অপেক্ষা করে রয়েছি। একদিন যেন এসেছিলে, এদিক ওদিক ঘুরে চলে গিয়েছিলে।" এইরূপ দু-এক কথার পর একটা গান শুনতে চাইলেন।

আশ্চর্য যুবা, দ্বিধা নেই শঙ্কা নেই, বলবামাত্রই নরেন্দ্র গান আরম্ভ করে দিলেন। অন্তরাতেই সাধু সহসা সোজা দাঁড়িয়ে উঠেই পড়ে যাচ্ছিলেন। দু-তিনজন তাঁকে ধরে শুইয়ে দিলেন, তিনি সমাধিস্থ। নরেন্দ্র নির্বাক হয়ে দেখতে লাগলেন। সকলেই দেখলুম। জীবনে সমাধি দেখা আমার এই প্রথম।

একজন বললেন, "গান শুনতে ভালবাসেন, কিন্তু পুরো শোনা বড় ঘটে না— সমাধি হয়ে যায়।"

পরমহংসদেবকে আমার সেই প্রথম দেখা। বাড়িতে গৃহদেবতা নারায়ণাদি থাকায় রানী রাসমণির বাগানে প্রায়ই ফুল তুলতে যেতুম, কতবারই তাঁকে দেখে থাকব। সে দেখায় কোন বিশেষত্ব ছিল না, সাধারণ মানুষ, সাধারণ আটহাতী লালপেড়ে কাপড় পরা, না গেরুয়া, না ফোঁটা তিলক। আজ যা দেখলুম, সে স্বতন্ত্র বস্তু। দেখা বললে ভুল হবে—পেলুম বলাই উচিত। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হতেই তিনি হাসিমুখে বললেন, "হয়েছে? এখন দাদাকে চার পৃষ্ঠা লেখগে।" তাঁর কথাগুলি আমার ঠিক ঠিক মনে নেই—ভাবটাই জানাচ্ছি।

ঠাকুর তাঁকে বললেন, "মাঝে মাঝে এস।" শুনে নরেন্দ্রনাথ বললেন, "আমি পড়ছি, আমার কলেজ আছে।" তিনি বললেন, "এও থাকনা, ভাল কথা শুনতে ক্ষতি কি?" তাতে নরেন্দ্র বললেন, "আপনি যা বলবেন সে আপনার শোনা কথা, শুনেছি আপনি তো নিরক্ষর লোক। আপনি যা বলবেন সেসব আমার জানা আছে।"

নরেন্দ্রনাথের কথা শুনে আমি শিউরে উঠেছিলুম, অনেকটা পালাই পালাই করছিলুম। ঠাকুর হাসতে হাসতেই বললেন, "এ তো খুব আনন্দের কথা—আমার বেশি বকতে হবে না। এক একবার এলে তোমার বিশেষ ক্ষতি হবে কি? ধর আমিই তোমাকে চাই। ও কলেজ-ফলেজ থাকবে বলে যে মনে হচ্ছে না। আচ্ছা—আজ যেতে পার, আবার ইচ্ছা হলে এস। কেমন, তাতে আপত্তি নেই তো?" নরেন্দ্রনাথ বললেন, "না, বেড়াতে আসতে আর আপত্তি কি!"

সকলে উঠে যেন বাঁচলুম, ভাল লাগছিল না। বাইরে বেরিয়ে নরেন্দ্রনাথ বললেন, "আমার কথাগুলো বড় বিশ্রী লাগছিল, না বাড়ুজ্যে?" বললুম, "সেটা নিজেই বুঝতে পারছেন।"

"না, আমি ভাল বুঝতে পারিনি, তাই দ্বিতীয়বারের জন্য একটু কড়া ভূমিকা ছেড়ে চললুম। এইবার সাক্ষাতে খোলসা হতে পারে। এবার আর হরিদাসের মুড়ি নষ্ট করব না, সোজা একাই চলে আসব।" আর দাঁড়ালেন না।

ঠাকুরের কথা মনে রইল না, নরেন্দ্রনাথের কথাই ভাবতে ভাবতে ফিরলুম। সমবয়সী হলেও এরূপ ছেলে পূর্বে দেখিনি—যেমন নির্ভীক, কথাবার্তাতেও তেমনি বহুদর্শী জ্ঞানীর মতো। এ ছেলে কারও মুখ চেয়ে কথা কবার নয়, Leader বা নেতা হবার জন্যেই জন্মেছে—কোন মহাপুরুষের ধার ধারে না বা ধারবে না। একথা বা এ ধারণা সেই প্রথমদিনেই কে যেন আমাকে দিয়েছিল। দেখলুম ঠাকুরও এঁকে চান। এ ছেলে Commander-in-Chief হবার ছেলে—সোলজার নয়।

সেটি আমার পরম সৌভাগ্যের দিন ছিল, এক ক্ষেত্রে উভয়কেই দেখা হয়ে যায়। কিন্তু তখন কে তা জেনেছিল।

প্রবোধচন্দ্র বসু

কলকাতার বাগবাজার-নিবাসী 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থ-প্রণেতা ডাঃ শশিভূষণ ঘোষের ভাগ্নে।

ঠাকুরের তিথিপূজা। বেলুড় মঠ। তামাক খাবার জন্য গুলের আগুন একটা গামলায় ছিল, চলাচলের পথে। স্বামীজী বললেন, "ওটা একপাশে সরিয়ে রাখ"। আমি গামলাটা আমপাতা দিয়ে ধরে তুলেছি, ওঁর কথামতো সরিয়ে রাখব এই উদ্দেশ্যে। সেই সময়ে স্বামীজী আবার বললেন, "দেখিস! হাত না পুড়ে যায়।" উনি এই কথা বলা মাত্রই গামলাটা পড়ে গেল। আগুন সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। আমি তো থমকে গেলাম। জনৈক মহারাজ ঐ দেখে বকলেন খুব। তাতে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বললেন, "আরে ওর দোষ নেই। ও তো ঠিকই ধরেছিল। আমি কথা বলাতেই ও ঘাবড়ে গেল। তাই হাত থেকে পড়ে গেল।"

নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির মঠে আমরা একবার বিকালে গেছি। তখন কালবৈশাখীর সময়। শরৎ সরকার প্রভৃতি ছোকরারা ছিল। আকাশে ঘনঘটা দেখে একেবারে নৌকার কাছ পর্যন্ত নিজে এসে সবাইকে তুলে দিলেন। আর মাঝিকে বললেন, "বাবা, বড্ড মেঘ উঠেছে, এদের সাবধানে নিয়ে যেয়ো।"

স্বামীজী প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসে যখন বলরামবাবুর বাড়িতে থাকতেন, তাঁর দুবেলার খাবার মামাবাবুর (ডাঃ শশিভূষণ ঘোষের) বাড়ি থেকে তৈরি হয়ে আসত। যোগেন মহারাজ এই কালে দুধ-ভাত খেতেন। স্বামীজীর খাওয়ার একটি বিশেষত্ব দেখা যেত—তিনি এই সময় মাংস ও দুধ দুই-ই একসঙ্গে খেতেন। আয়ুর্বেদ মতে কিন্তু এ দুটি বিরুদ্ধ-আহার। শশীবাবুর দ্বিতীয়া পত্নী নানাপ্রকার রান্না-বান্নায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাঁর সেবাভাব খুব প্রবল ছিল। স্বামীজী তাঁর খুব সুখ্যাতি করতেন; বলতেন, "পৃথিবীর অনেক বড় বড় জায়গায় রান্না আমি খেয়েছি। এঁর রান্না খুবই প্রশংসার।"

পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এলে একদিন গিরিশবাবু স্বামীজীকে বলেন, "কি ভাই, সেসব দেশে কেমন লোক দেখলে? তোমার সঙ্গে (প্রতিভায়) লড়নেওয়ালা কাউকে পেলে কি?" স্বামীজী হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, "আরে রাখ রাখ, বলব কি জি. সি. যার হাতে হাত দিয়েছি, সেই কাবু হয়ে গেছে। তোমার মতনও কাউকে পাইনি।"

স্বামীজী বলরাম-মন্দিরে এসেছেন। গান করবেন। বললেন, "ওরে, কাছেই এই সরকার বাড়ি লেনে জগন্নাথ ঠাকুর নামে আমার এক বাল্যবন্ধু পাখোয়াজী আছে। যা যা ছুটে যা। তাকে গিয়ে বল নরেন ডাকছে। বাজাতে হবে।" ঐ কথা যেই তাকে বললাম, সে ব্যক্তি মুহূর্তমধ্যে সত্যি সত্যিই ছুটে এল। আর দেখলাম স্বামীজী ঠিক

বাল্যকালের মতোই তার সঙ্গে ব্যবহার করলেন। একদম নিরভিমান। তাকে বললেন, "ভাই, অনেক লেকচার দিয়ে গলা খারাপ হয়ে গেছে। আগেকার মতন আর নেই।" আমরা কিন্তু যা শুনলাম তাতে চমৎকৃত হলাম। তাঁর গান খুবই জমল। হাতি মরে গেলেও তার দাম লাখো টাকা। পরে শিবানন্দ স্বামী গাইলেন, স্বামীজী বাজালেন।

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি পরমহংসদেবের জন্মতিথি তাঁর জীবদ্দশায় সামান্য আয়োজন সম্ভারে, কিন্তু গভীর অনুরাগভরে দক্ষিণেশ্বরে স্বল্পমাত্র ভক্তগোষ্ঠী কর্তৃক উদ্‌যাপিত হয়। নরেন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য কণ্ঠে 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপ রাশি' গানখানি গেয়ে গুরুদেবকে মোহিত করে দিবাভাগেই স্থানত্যাগ করেন। সন্ধ্যার পর পরমহংসদেব মাস্টার মহাশয়কে সাগ্রহে বলেছিলেন, "মনটা এখনো যেন টেনে রেখেছে।" তা বাস্তবিকই আজ প্রায় চারযুগের কালব্যবধানেও আমাদের মতো এই ঠুনকো, ছটাকী মনকেও স্বামীজী তাঁর সেই অনুপম রাগচ্ছটায় এখনো তেমনিভাবে টেনে রেখেছেন—মাতিয়ে, তাতিয়ে রেখেছেন। কত কি শুনি, কত কি ভুলি, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ ভুলবার নয়। মনে হচ্ছে এই গতকালই যেন তাঁর গান শুনলাম।

আমি তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে এফ. এ. পড়ি। আমার এক সহপাঠী বন্ধু ভাল ইংরেজি জানত। ইংরেজি বক্তৃতাদি শুনতে তার খুব আগ্রহ ছিল, বিশেষতঃ সুবক্তাদের সে গোলাম ছিল। ছুটে যেত শোনবার জন্য। স্বামীজীর লেখা পড়ে খুব আনন্দ পেত। স্বামীজী প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে আসার পর একদিন ওঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেবার জন্য বন্ধুকে নিয়ে বলরামগৃহে গেলাম। রাখাল মহারাজ বললেন, "আজ স্বামীজীর শরীর খারাপ। কথা কইতে ডাক্তারের মানা।" অগত্যা আমরা বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে পাঁচিলে দুজনে বসে আছি। মনে ইচ্ছা, যদি ভাগ্যযোগে স্বামীজী একবার অন্ততঃ বারান্দাতে এসে দাঁড়ান, তাহলে ওর দেখাও হয়। কি আশ্চর্য, ঠিক তিনি বেরোলেন। আমার ওপর চোখ পড়াতে চেঁচিয়ে বললেন, "কিরে, তোরা ওখানে কেন, ওপরে আয়।"

ভারি খুশি হয়ে বন্ধুকে নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। বন্ধুকে বললেন, "আর একদিন এস। আজ আমার শরীর খারাপ।" বন্ধু এতে খুব উৎসাহিত হলো।

শোভাবাজার রাজবাড়িতে তাঁর লেকচার শুনেছি। কণ্ঠস্বর অতুলনীয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীরও ওরূপ শুনিনি। ভিড়ের চোটে স্বামীজী সেদিন রাজবাড়ির সামনের ফটক দিয়ে ঢুকতে পারলেন না। স্টার থিয়েটারেও তাঁর বক্তৃতা শুনে ধন্য হয়েছি।

একজন কবিরাজ মহাশয়কে স্বামীজী ভালবাসতেন। তাঁকে এক-আধবার নিজের শরীর দেখিয়ে নিয়ে কিছু টাকা দিয়ে দিতেন। অনেক প্রসঙ্গ দুজনে হতো।

প্রত্যেক শিষ্যের ক্ষমতামতো তার ব্যক্তিত্বের উপর নজর রেখে স্বামীজী উপদেশ-আদেশ দিতেন। কৃষ্ণলাল মহারাজ আমাদের বলেছিলেন, "স্বামীজীকে স্পষ্ট একদিন

বললাম, পড়াশোনা আমি খুব কমই করে এসেছি। বেশি জোর করে এখানে পড়াশোনা করতে পারছি না।" তিনি জবাব দিলেন, "বেশ, তোকে বই পড়তে হবে না। খুব করে জপ করবি, তাতেই তোর হবে।" স্বামীজীর আদেশ কৃষ্ণলাল মহারাজ পূর্ণ করেন। শুদ্ধানন্দ স্বামীর মুখে শুনেছি, স্বামীজী শেষে একদিন তাঁকে বলেছিলেন, "কেষ্টলাল জপে সিদ্ধ।"

আরও কথা মনে পড়ছে—স্বামীজীর অশেষ স্নেহাস্পদ কানাই মহারাজের (স্বামী নির্ভয়ানন্দের) তল্পির মধ্যে একখানি পুরাতন কাগজের টুকরো দেখেছি। স্বামীজীর নিজের হাতে লেখা—কানাই মহারাজের স্বভাব ও সংস্কার অনুযায়ী স্নেহশীল পিতার ব্যবস্থাপত্র। উপরে লেখা—'Routine for Kanai.' তাতে উল্লেখযোগ্য—নানা কাজের সময় বাঁধা এবং অন্যান্যের অপেক্ষা একটু বেশি ঘুমের মাত্রা (দিবাভাগে) মঞ্জুর করা আছে। সেবক কানাইলালকে বলেছিলেন, "যেখানে বেদান্ত ব্যাখ্যা হবে, সব বুঝতে পারিস না পারিস, বসে শুনবি। তাতে তোর কল্যাণ হবে।" দেখতাম অক্ষরে অক্ষরে কানাই মহারাজ ঐকথা পালন করছেন। মনে পড়ে, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে (কলকাতায়) বেলুড় মঠ থেকে সাধু এসে সপ্তাহে এক ঘণ্টা বেদান্ত ব্যাখ্যারত, আর স্বামীজীর নির্দেশ পালনকারী কানাই মহারাজের সেই আসনে স্থির হয়ে উপবেশন এবং নিয়মিতভাবে শ্রবণ। এইভাবে স্বামীজী প্রত্যেক সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীকে ক্ষেত্র অনুযায়ী পঠন-ব্যবস্থা ও অনুশাসন বিধান দিয়েছেন। প্রত্যেককে ঈশ্বরমুখী করে গড়বার জন্য তিনি পরিশ্রম করতেন। সকলের উপর তীক্ষ্ণ নজর, সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

একবার বলরামবাবুদের বাড়ির সবাই কোঠারে গেছেন। বাড়ি খালি। উনি খুব বড় একটা বাথটবে শুয়ে স্নান করলেন। কী সুন্দর যে দেখলাম কি বলব। পবিত্র অপরূপ মুখশ্রী, তেমনি দেহ।

তাঁর সবটাই সুন্দর—হাসি, তামাশা, ছুটোছুটি—সব। মঠে বাঁধানো চাতালে, বিস্তীর্ণ মাঠে কুকুর, ভেড়া, হরিণ নিয়ে খেলা, গরুর গায়ে হাত বোলানো, কিংবা এমনি পায়চারি করে বেড়ানো—সব সুন্দর।" একদিন তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে বলেছিলুম, "মশায়, আপনার পায়ের মাসলগুলি তো বড় সুন্দর"। তিনি অতি সহজভাবে উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁরে, তা হবে না? ঠাকুর যে আমাকে দেখতে বড় ভালবাসতেন।"

শৈলেশ্বর বসু

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত বলরাম বসুর প্রতিবেশী। পোর্ট কমিশনে চাকরি করতেন।

আলমবাজার মঠ। সেদিন জন্মাষ্টমী। "গুডউইন কোথায়" বলে স্বামীজী ব্যস্ত হয়ে খোঁজ করছেন। গুডউইন খুব আমুদে। খানিক খানিক বাঙলা বুঝতেন। স্বামীজীর চেয়ে বেঁটে। দাড়ি-গোঁফ কামানো। বয়স মনে হয় চল্লিশ। কোটপ্যান্ট পরা। মাথায় চুল। গুডউইন স্বামীজীর সামনে এসে গরুড় পাখির মতো হাঁটু ভেঙে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। "তুই নাকি উপোস করেছিস? কে করতে বললে? তোরা বড় জ্বালালি। এত বাড়াবাড়ি সইবে কেন?"

একবার গুডউইনের পেটের অসুখ। স্বামীজী বললেন, "আর কিছু খেয়ো না, খালি দুধ আর সোডাজল।" অন্য সাধুদের ডেকে বললেন, "তোমরা কিছুই নজর রাখ না এদের কি হচ্ছে না হচ্ছে। বিলেত থেকে এসেছে, এদের সাবধানে রাখবে।"

বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগান। দিনের বেলা একদিন স্বামীজী বাঘছাল পরা, সারা গায়ে ভস্মমাখা, কানে কুণ্ডল, পাহাড়ীদের মতো কানবালা, মাথায় জটা, তানপুরা নিয়ে খানিক ভজনগানের পর 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকটি সুর করে আবৃত্তি করলেন। রাখাল মহারাজও স্বামীজীর মতো শিব সেজে চুপচাপ বসে।

আমার বাবার ঢালাও মত ছিল ওঁর বা ওঁদের সঙ্গে মেলামেশার। বাবা পরমহংস-দেবকেও দর্শন করেছিলেন। বেলুড় মঠে স্বামীজীর সঙ্গে কাটিয়েছি। বাগান কোপানো, গরুবাছুর সেবা, এটা-ওটা-সেটা ফাইফরমাশ খাটা কত আনন্দের সঙ্গে করা গেছে। খুব স্ফূর্তি হতো তাঁর সঙ্গে থাকতে পেতাম বলে। স্বামীজীকে কখনো কেউকেটা বোধ হয়নি। ধর্মকর্ম কিছু বোঝবার সাধ্য তখন আমার হয়নি। এখন মনে হচ্ছে অতি ছোটও তাঁর আওতায় বড় হয়ে যেত।

বলরামবাবুর বাড়িতে স্বামীজী আছেন। বাড়ির ভেতরে মেয়েরা কেউ নেই। বিকেলের দিকে ওঁর খাবার দরকার হয়েছে। আমি সামনে থাকায় বললেন, "তুই চুনীবাবুর (কথামৃতের চুনীলাল বসু) ওখান থেকে আমার খাবার আনতে পারিস?" সেইমতো আমি চুনীলাল-গৃহিণীর কাছ থেকে রুটি-তরকারি নিয়ে এলাম। তাঁর সামনে থালা নামিয়ে উপরের বাটিটা নাড়াবার সময় একখানা রুটি মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা সংস্কৃত শ্লোক বললেন, যার অর্থ—"যাক, যাক, ধরিত্রীর অংশ ধরিত্রীতে গেল।"

একবার বাগবাজার মদনমোহন তলা থেকে দেশি পাউরুটি এনে আমার মা গরম করে ওঁর জন্য দিলেন। নোন্তা খাবার স্বামীজীর পছন্দ ছিল।

বাগবাজারে গিরিশ-ভবন। স্বামীজী, রাখাল মহারাজ দুজনে আছেন। স্বামীজীর শিষ্য পাড়ার ছেলে শরৎ সরকারকে রাখাল মহারাজ বললেন, "স্বামীজীর পা টিপে

দাও।” আমিও পা টিপতে চাই, তাই ইতস্তত করছি। স্বামীজী বললেন, “দুজনে দুটো টেপো।” স্বামীজীর পায়ের তলা খড়ুমে, arched। সেইটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, “এতে দেহের ভার ধারণ করা যায় বেশি।” কে একটা দামী আংটি এনেছেন। বললেন, “বা বা বেশ তো।” পরলেন একবার। কে যেন বললে, “আপনার বুঝি খুব সাধ!” কোন উত্তর নেই, চুপ।

পরমহংসদেবকে বলরামবাবুর হলঘরে একদিন সমাধিস্থ অবস্থায় দর্শন করি। জ্যোতির্ময় শ্রীমুখের শোভা ভুলবার নয়। একটি চোখে মাছি বসেছিল, চোখ চাওয়া, বাহ্য হুঁশ একদম নেই। আর একবার ঐখানেই দেখলাম—সমবেত সকল ভক্তের পাদস্পর্শ করে তিনি প্রণাম করছেন। অদ্ভুত আচরণ!

বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার ভাড়াবাড়িতে স্বামীজী বসে আছেন। জনৈক বৃদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনারা যে ত্যাগী কি করে বুঝব?”

স্বামীজী উঠে দাঁড়ালেন। পা দিয়ে তাকিয়া ঠেলে দেখালেন, “টাকাকড়ি। এই দেখুন আছে কিনা, আমরা চাবি-টাবি দিই না। বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখে আসুন। স্বচ্ছন্দে যান, আমাদের ভেতর-বার নেই।”

বলরামবাবুর বাড়িতে একদিন একটি লোক জিজ্ঞাসা করলেন, “কতকগুলো কাজের ভিতর মনে করলুম—এ কাজটা করা উচিত নয়। আমি আর করব না। কিন্তু তা পারি না। হঠাৎ সে কাজটাই করে ফেললুম। কেন এমন হয়?”

স্বামীজী বললেন, “ইঞ্জিন দেখেছেন তো? চালাবার সময় একটু টিপে দিলেই চলে। আবার একটু বন্ধ করলেই ভসভসানি বন্ধ হয়। কিন্তু গাড়ি দাঁড়ায় না। গাড়ি হুড়হুড় করে চলতে থাকে। আবার ব্রেক কষলে খানিকটা চলে ক্যাঁচকোঁচ করে গিয়ে দাঁড়ায়। আমাদের জন্মজন্মান্তরীণ সংস্কার ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। করব না—করব না—করব না—করতে থাকুন। তখন গাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে। আপনার মনে আর ঐ চিন্তাই উঠবে না।”

জগৎজোড়া প্রসিদ্ধি তখন স্বামীজীর। কিন্তু ছোট ছেলের কাছ থেকেও শিখতে প্রস্তুত। ছাগলছানার মার অসুখ। স্বামীজী যেন বিব্রত—কি উপায়ে ছানাকে দুধ খাওয়ানো যায়। একটি ছেলে এক বুদ্ধি বাতলালো—লম্বা সলতে দুধে ভিজিয়ে তার মুখে ধরতে। স্বামীজী তাকে তারিফ করলেন। বললেন, “তুই ঠিক বলেছিস। এইতেই হবে। তুই পারবি। বোস—খাওয়া।”

বাগবাজারে ৫৭নং-এ (বলরাম-ভবনে) কতকগুলো লোকের সঙ্গে সোঽহং-বাদ প্রসঙ্গ ক্রমে চলছে। সবাই উঠে গেছে। আমিও উঠছি। আমায় বললেন (আঙুল দেখিয়ে), “তুই—সে-ই।”

একবার মৃত্যু নিয়ে কথা হচ্ছে। আমাকে বললেন, “তুই যে রোজ রোজ মরছিস, বুঝতে পারিস না?” আমি বললাম, “না।” “পাঁচ বছরের মার কোলের ছেলে যখন

ছিলি, এখনো কি তাই আছিস ? Waste of tissues বুঝিস ? অনবরত শরীরতন্তুর ক্ষয় ও পরিবর্তন হচ্ছে।"

শেষের দিকে একদিন বাগবাজার সরকার বাড়ি লেনের ঘাটে একজনের কাঁধ ধরে নৌকা থেকে নামছেন আর বলছেন, "কত পাহাড়-পর্বত ঘুরে এলাম, আর আজ এই অবস্থা।"

শিবরাত্রি—বেলুড় মঠে। স্বামীজী শিবপ্রণাম করতে এসে মগ্ন হয়ে গেলেন, বাহ্যশূন্য। শরৎ মহারাজ বললেন, "ধর ধর, যেন পড়ে না যান।" অন্যরা ধরলেও শেষে শরৎ মহারাজ নিজে উঠে এসে একেবারে স্বামীজীকে জাপটে ধরলেন আর বললেন, "অমন করে ধরলে হবে না।"

একদিন বলেছিলেন, "তোর কি চাই ?" আমি উত্তর করলাম, "ভিতরে যেটা আছে—সেইটে ফুটুক। আশীর্বাদ করুন।" মাথায় পিঠে কমল হস্ত বুলোলেন।

বাগবাজারের নন্দ বোসের বাড়িতে প্রতীচী-প্রত্যাগত স্বামীজীর অভ্যর্থনা।

রসরাজ অমৃতলাল বসু গলায় মাল্যদান করলেন। স্মিত মুখে স্বামীজী বললেন, "এই যে দাদা।" অমৃতলাল উত্তরে বললেন, "আমি ভেবেছি, তুমি বুঝি আমাদের ভুলে গেছ।" স্বামীজী—"সেকি ?"

বৌদ্ধশাস্ত্রে তথাগতের শারীর-লক্ষণ বর্ণনা আছে। সবগুলি পরীক্ষিত সত্য কিনা জানি না। বক্ষদেশে লোমের প্রাচুর্য হৃদয়বত্তার নাকি ইঙ্গিত করে। কিন্তু আচার্যদেবের প্রায় লোমবিহীন বক্ষস্থল এর বিপরীত দৃষ্টান্ত। অথচ বিবেকানন্দের হৃদয়বত্তা তো বুদ্ধের মতো।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দ। সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারি। রাত প্রায় ৯টা। বলরামবাবুর বাড়ির হলঘরে ফরাস পাতা। একটা ডেস্কে কি সব লিখছেন। নিচে অনেক কাগজপত্র। তাতে এত তন্ময় যে, আমি প্রণাম করলুম, মোটেই নজরে এল না। আমি কথা কইনি, চোখ চেয়ে খালি তাঁকে দেখতে লাগলুম। মনে হলো দুটো চোখে দেখে তৃপ্তি হচ্ছে না। চারটে চোখ হলে খানিকটা মনের মতো হতো। অপরূপ শরীর-সৌন্দর্য। মাথা কামানো, গেরুয়া আলখাল্লা পরা। শান্তিরামবাবু (শান্তিরাম ঘোষ) প্লেটে মাংস আর খানকতক রুটি-লুচি নিয়ে এলেন। কাগজপত্র নামিয়ে ঐ ডেস্কের উপরই রাখলেন। আমাকে শান্তিরামবাবু বললেন, "তোমার খাবার ভেতরে দেওয়া হয়েছে, চল।" স্বামীজী হাসলেন—কোন কথা বললেন না।

পরে আরেক দিন। দিনের বেলা। বলরাম-ভবনের বারবাড়ির ভিতরের বারান্দা। বেঞ্চির ওপর স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ, লাটু মহারাজ প্রমুখ। গঙ্গাধর মহারাজ খুব হাসছেন ও চিৎকার করে কথা বলছেন। এমন সময় ত্রিগুণাতীত স্বামী এলেন। রামকৃষ্ণবাবু (বলরামবাবুর ছেলে) আমার পরিচয় ত্রিগুণাতীত মহারাজকে

বললেন। শুনে ত্রিগুণাতীত স্বামী বললেন, "এরা সব এখানে এসে পড়েছে, এরা তো জীবন্মুক্ত।" স্বামীজী আমাকে বললেন, "এঁকে চেনো হে?" আমি বললুম, "আজ্ঞে না।" স্বামীজী বললেন, "এঁর নাম সারদা মহারাজ। মহাকর্মী, উদ্বোধনের সমস্ত ভার এঁর মাথায়।"

দক্ষিণেশ্বর। ভক্তের চোখে কলির বৈকুণ্ঠ। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ। ঠাকুরের মহোৎসব। পঞ্চবটীর চাতালে গাছে ঠেস দিয়ে ঠাকুরের পট সাজানো। স্বামীজী চাতালের ওপরেই বসে। তাঁর পাশে ও চতুর্দিকে বহু সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্ত। গিরিশবাবু, রাখাল মহারাজ আছেন। হ্যারিসন সাহেব এলেন। বয়স আন্দাজ চল্লিশ। স্বামীজীকে প্রণাম করে বললেন, "ঠাকুরবাড়ির চারিদিক আমাকে দেখাবে এমন একজন গাইড পেতে পারি কি?" স্বামীজী চারিদিকে ভক্তবৃন্দের প্রতি তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের ভেতর কে যাবে হে?" কিন্তু তাঁকে ছেড়ে যেতে কেউ রাজি হলো না।

আমি অগ্রসর হয়ে বললুম, "মহারাজ, আমি সাহেবকে নিয়ে যেতে পারি কি?" তাতে খুব আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, "তুমি পারবে?" আমি, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" তখন তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই যাবে। I want such bold young man (আমি এরকম সাহসী যুবক চাই)।" হ্যারিসনকে বললেন, "This young man will be your guide (এই যুবকটি তোমার গাইড হবে)।" অতঃপর তাঁকে সব ঘুরিয়ে দেখালুম। কথায়, কথায় হ্যারিসনকে বললুম, "মরা মানুষকে বাঁচাবার শক্তি যেন স্বামীজীর আছে। কারণ দেখ, আমার মতো একজন লাজুক ছোকরাকে তিনি তোমার পথপ্রদর্শক হবার জন্য অলক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করেছেন।" তাতে তিনি বললেন, "তোমরা ওঁর বাইরেটা দেখেই মুগ্ধ। ভেতর এখনো দেখতে পাওনি। আমরা মার্কিনে দেখেছি এদেশের দরিদ্রদের জন্যে ওঁর কি অসীম দরদ।"

ফিরে এসে স্বামীজীকে সাহেব বললেন, "আমি সব দেখে খুব খুশি। আর এ আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়েছে।" তখন আমার পিঠ চাপড়ে স্বামীজী আদর করলেন।

একটি পনের-ষোল বছরের ছেলে। খুব ভাল স্বাস্থ্য। বলরামবাবুর গৃহে স্বামীজীর দর্শনপ্রার্থী। দোতলার ভিতরের বারান্দার একখানি লম্বা বেঞ্চের ওপর স্বামীজী বসে আছেন। ছেলেটির পরনের কাপড়-চোপড় খুব পরিষ্কার ধবধবে। প্রণাম করে মেজেতে বসতেই তিনি বললেন, "কাপড়টা নোংরা করছ কেন? ওপরে উঠে বস। জান না—cleanliness is next to godliness (ঈশ্বরপরায়ণতার পরেই পরিচ্ছন্নতা)।"

দুর্গাপদ ঘোষ

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। প্রখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক ও সমাজসেবী, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম 'বাঙালী রেসিডেন্ট সার্জেন', যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ হাসপাতালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক। আদি নিবাস অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলার বাসুরাড়ী গ্রামে।

স্বামীজী নবীন সন্ন্যাসীদের খেলাধুলাতেও উৎসাহ দিতেন। মনে পড়ে, স্বামীজী দেখছেন আর মূলে মঠবাড়ির সামনের লনটুকুতে সুশীল মহারাজ প্রভৃতি একটি ন্যাকড়ার বল তৈরি করে খেলছেন।

দেশে রজোগুণের বিকাশ ক্রমশঃই হতে থাকবে, একথা তিনি বলতেন। বলেছিলেন, "এরপর দেখবি, কলকাতা শহরে গলির মোড়ে মোড়ে, রাস্তায় রাস্তায় পানের দোকানের মতো চপ-কাটলেটের দোকান হবে।"

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে শীতকালে দেরাদুনে গিয়েছিলেন। একদিন সকালবেলা চা-আদি খাচ্ছেন কয়েকজনের সঙ্গে টেবিলে বসে, খানিকটা আনমনা হলেন, স্থির হয়ে চিন্তা করে সমবেত কয়েকটি লোককে বললেন, "ওহে একটা যুদ্ধ বেধে গেল যে।" এর কিছুদিন পরেই বুয়র যুদ্ধ লেগেছিল। ১১ অক্টোবর, ১৮৯৯—২১ মে, ১৯০২। স্বামীজীর যোগজ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল। তিনি ইচ্ছা করে বিভূতি প্রকট করতে চাইতেন না। গুরুদেবের নিষেধ ছিল। কোন কোন সময়ে আপনাআপনি একটু-আধটু বেরিয়ে পড়ত।

বলরামবাবুর বাড়ির ডাক্তার স্বামীজীকে দেখতে এসেছেন। সারা কলকাতা জুড়ে ডাক্তারের খুব নামডাক। স্বামীজীর জীবনের শেষাশেষি। চিকিৎসককে লক্ষ্য করে অন্যদের বলছেন, "কি ছাই জানে। দু-চারখানা বই পড়ে ভাবে—আমরা সব মেরে দিয়েছি। আমরা স-ব জানি। আমরা স-ব বুঝি।"

একদিন ঐখানেই একজন ছুৎমার্গী ব্রাহ্মণ স্বামীজীর সঙ্গে সমাজ সম্বন্ধে তর্ক করতে এলেন। ওঁর অপারিসীম ধৈর্য সেদিন দেখলাম। তিলমাত্র বিরক্ত না হয়ে পণ্ডিতের সঙ্গে শান্তভাবে কথাবার্তা কইলেন, জবাব দিলেন। তাঁর আপত্তিগুলি সংযত হয়ে শুনলেন, একে একে খণ্ডন করলেন।

আর এক দৃশ্য। স্টার থিয়েটারে (বিডন স্ট্রীটে) রঙ্গমঞ্চের উপর পায়চারি করতে করতে স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিচ্ছেন। শ্রোতাদের দিকে যেন মোটেই লক্ষ্য নেই। **Speaking within himself, thinking aloud as it were** (যেন নিজে নিজে আপনমনে আপন ভাবে বক্তৃতার তোড় চালিয়ে যাচ্ছেন—চিৎকার করে চিন্তা করছেন)। দুঃখ হয় সেই অনুপম শব্দের, সেই প্রাণোন্মাদকারী অমৃতনিঃসারী বাক্যচ্ছটার—শব্দ ব্রহ্মের কোন রেকর্ড রইল না, আর প্যালা পণ্ডার গলার রেকর্ড হয়ে গেল—রয়ে যাচ্ছে।

একবার ট্রেনে যাচ্ছেন, দার্জিলিং-এ মহেন্দ্র ব্যানার্জীদের সঙ্গে। স্টেশনে তুলে

দিতে গিছলুম। একটা লম্বা গেরুয়া আলখাল্লা পরা, পায়ে একজোড়া মাদ্রাজী স্লিপার, যেন কাউকে দেখছেন না—আলুথালু অবস্থায় চ্যাটাংচ্যাটাং করতে করতে ফার্স্ট ক্লাসে গিয়ে উঠলেন। সাহেব, বাঙালী, হিন্দুস্থানী—স্টেশনে যত লোক ছিল, সব হাঁ করে চেয়ে রইল। ব্যক্তিত্বের অমোঘ আকর্ষণ!

আর একবার আমরা জনকয়েক কলেজের ছোঁড়া বিকেল নাগাদ চড়ুইভাতি করতে বেলুড়ে গেছি। নীলাম্বর মুখুজ্যের গঙ্গার ওপর বাগানবাড়িতে তখন ভাড়াটে বাড়িতে মঠ। স্বামীজী দেখেই খুব খুশি। গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) লম্বা-চওড়া খুব বলবান, সুন্দর চেহারা, লন-এ পায়চারি করছিলেন, যেন কোন দেবতা। তাঁকে তখন বললেন, "ওরে গুপ্ত, এই ছোকরারা সব এসেছে। এদের তাড়াতাড়ি একটা খাবার ব্যবস্থা করে দে।" আমরা বললাম, "না, আমরাই করে নেব এখন।" যা হোক, গুপ্ত মহারাজ খুব expert ছিলেন। ঘণ্টাখানেকের ভিতরে চমৎকার খিচুড়ি ও মাংস করে এনে হাজির। স্বামীজী তাঁর সেই peculiar strong সুরে বললেন, "নে, সব খেয়ে নে।" যেন কত আপনার।

আর একবার কি একটা খাওয়া-দাওয়া ছিল। আমি এমনি গেছি। অতি সহজ-ভাবে বললেন, "আয়! ওরে একে একখানা পাত দে তো। বোস! খা!" তাঁর voice একটা চমৎকার জিনিস। অমন কারুর শুনিনি। একথা একেবারে লোকের heart-এ পেঁছিত, ধাক্কা দিত, গঙ্গায় স্টীমারে যেমন ভক্‌ভক্‌ করে স্টীম ছাড়ে, সেই রকম এক একটা impression দিয়ে যেত, ভুলতে পারা যেত না, গাঁথা থাকত যেন বুলেটের মতো খাপে খাপে লোকের আঁতে গিয়ে বসছে আর ঘা মারছে।

নীলাম্বরবাবুর বাগানে একদিন আমরা গেছি। এমনি, ধর্ম-টর্ম কিছু নয়, বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দকে দেখতে গেছি। চিঠি-পত্তর লেখাচ্ছিলেন—বড় ব্যস্ত। বাবুরাম মহারাজ এসে বললেন, "চান করবে চল। বেলা হয়েছে ঢের।" বললেন, "যাচ্ছি, চ।" তারপরেই উঠলেন।

কিছুক্ষণ পরে একজন, কামারপুকুর অঞ্চলের, আস্ত গেঁয়ো লোক যাকে বলে, একেবারে ঠিক তাই, এল। ঠাকুরের আমলের লোক বোধ হলো। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করত। অতবড় যে বিবেকানন্দ—তিনি যেন তা এক নিমেষে ভুলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে সহজ, সরলভাবে আগেকার ঘরোয়া রকমে বসে আলাপ-সালাপ, হাসি, ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগলেন। ঠাকুরের দেশের লোক বলে খুব খাতির। খাবার-দাবার ব্যবস্থা, আদরযত্ন যথেষ্ট করলেন। সে লোকটি গোড়াগুড়ি একটু অবাক-অবাক ভাব দেখাতে লাগল। তারপর সবই এক হয়ে মিলেমিশে গেল। আবার যখন গম্ভীর হতেন, কার সাধ্য এগোয়! আমাদের সামনে তো দেখলুম খুব active, লোককে খালি কাজ করতে, organize করতে বলছেন। বেলুড় মঠের গঙ্গার ধারে বারান্দায় একদিন দেখি একা পায়চারি করছেন। আর গুনগুন করে আপন মনে গাইছেন, "পিলেরে অবধূত হো, মাতুয়ালী পিয়ালা হরি রস কা রে।" ছবি! ছবি!

নরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। কর্মজীবনে ডিস্ট্রিক্ট জজ—শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য।

আমাদের তখন একসঙ্গে বিরাট যৌথগোষ্ঠী। দাদু (কথামৃতের ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পের পর, আমার বি. এ. পাসের পর, তিয়াত্তর-চুয়াত্তর বছর বয়সে গঙ্গালাভ করেন। নাতি-নাতনি, আশ্রিত-কুটুম্ব ইত্যাদি নিয়ে প্রায় আমরা চুয়ান্নজন মেছোবাজারের বৃহৎ বাড়িতে থাকি। আমাদের ভদ্রাসন হরিনাভি গ্রামে—ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদেরই গ্রামের। ঠাকুর যখন দাদুর কাছে আমাদের বাড়িতে (এখন ১৯নং কেশব সেন স্ট্রীট) পদধূলি দিতেন, তখন আমার বয়স সাত-আট।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাদের ন-কাকা। স্বামীজী (তখন নরেন্দ্রনাথ) তাঁর সহপাঠী। দুজনে খুব গলাগলি ভাব। বাবা ও কাকাবাবুদের দুটো বৈঠকখানাকে বলা হতো অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজ। বাবার (শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) মেধার জন্য কলকাতার তখনকার বাছা বাছা এলেমদার ছাত্রদের জমায়েত এই জোড়া-ঘরে—আমরা দেখেছি ও গর্ব অনুভব করেছি। আমরা তখন স্কুলের পড়ুয়া। স্বামীজী এইসব গুণীদের মজলিসে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান আলোচনায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতেন। তিনি জ্ঞানগুণসাগর। তখন থেকেই সব ছোকরারা ওঁকে, সমবয়সী হলেও চিহ্নিত সর্দারের মতো একটা আলাদারকম সমীহ, শ্রদ্ধা করত। সেটা তাঁরই অপূর্ব, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি আর বাগ্‌বিভূতির দরুন। গলার আওয়াজ গম্ভীর, ভারি। সে সময়ে দেখতে একহারা। চোখ দুটো চমৎকার। মুখ যেন মনস্বিতা দিয়ে মাজা। আরও বৈশিষ্ট্য, তাঁর মুখে হাসি দেখলেই সবাই আমোদ-আহ্লাদ করবার অধিকার পেতেন। যখন তিনি রগড় করতেন, হেসে হেসে পেটের নাড়ী ছেঁড়বার উপক্রম হতো। কিন্তু স্বামীজীকে আমরা ভয়ও করতাম। মুখে গাম্ভীর্য-মেঘ দেখা দিলে কার বাবার সাধ্য এগোয়! যেন আগুন!

কৈলাস খাবারওয়ালা নানা রকমারি খাবার ঝুড়ি ভরে রোজ বাড়িতে আনত। সব ছেলেরা মিলে পরমানন্দে জলপান করা হতো। স্বামীজী ন-কাকার বন্ধু হওয়ায় ঠিক বাড়িরই একজন ছেলের মতো গণ্য হতেন। আমাদের সব কারুর দুপয়সা বরাদ্দ, কারুর চারপয়সা, কারুর বা দুআনা। যার যা স্কেল বাঁধা, মাথা খুঁড়লেও তার একরতি বেশি পাবার উপায় নেই। স্বামীজী সিনিয়র গ্রেড, ন-কাকার 'র‍্যাঙ্কের', বড়দের দলে যেদিন আসতেন, তাঁরও ওঁদের মতো হার বাঁধা। জিভে-গজা ওঁর বড়ই প্রিয়। একদিনের কথা, ওঁর বখরায় যা পেলেন, তাতে তুষ্ট নন। একখানা গজা হঠাৎ তুলে নিয়ে সব্বাইয়ের সামনে নিজের জিবে ঠেকালেন এবং অম্লানবদনে হাঁড়ির মধ্যে টপ করে ফেলে দিয়ে হো হো করে হেসে বললেন, "ওরে তোরা কেউ গজা

খাসনি—এই-য্যা—সব এঁটো হয়ে গেল!" হাঁড়িসুদ্ধ একাই মেরে দিলেন। কী আমোদই করতেন!

আমাদের সঙ্গে ছোটদের দলে ঘুড়িও ওড়াতেন। ছুটোছুটি, লুটোপুটি, গলদঘর্ম। আবার এক একদিন ঘুড়িটুড়ি সব টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। কেউ কেউ কেঁদে ফেলত তাই দেখে। আমাদের অব্জ ওস্তাদ বলে একজন বাঁধা ওস্তাদ থাকতেন। দাদু অব্জর শ্যামাসঙ্গীত অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তাঁর কাছে স্বামীজীও গানবাজনা শিখতেন। ন-কাকা পাখোয়াজ বাজাতেন। দুই দোস্ত—খুব আনন্দ। অমন কণ্ঠ তো শোনা যায় না। কাকা আর স্বামীজী একদিন রাস্তা দিয়ে আসছেন। পথে একটা কলেরা রোগী দেখলেন। হাসপাতালে তাকে নিয়ে গেলেন। কাকা বলতেন, "কলেজে অধ্যাপক লেকচার দিচ্ছেন, নরেন তা না শুনে ভ্রূক্ষেপ না করে এক একদিন গীতা উপনিষদ্ পাঠ করতেন।"

এরপরে স্বামীজী যখন বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ, তখনকার কথা। প্রথম সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে। আট নম্বর রামতনু বসু লেনে আমার বাবা তখন আমাদের নিয়ে ভাড়া থাকতেন, স্বামীজীর মাতামহীর বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িতে। (আমাদের মেছোবাজারের বাড়িতে তখন আর থাকি না)। স্বামীজী যখন ঐখানে তাঁর মার সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, আমরাও তাঁর কাছে যেতাম। তিনি ওখানে খেয়েদেয়ে আমাদের বৈঠকখানায় বিশ্রাম করতেন। ১৮৯৮, তখন আমি আইন পড়ি। অনেক কথা, গল্প হতো। তখন সন্ন্যাসীর চেহারা। দেশের ও পরদেশের তুলনামূলক আলোচনা করতেন—সমাজ, রাষ্ট্রগঠন, অর্থনীতি সব বোঝাতেন। আমাদের চোখ ফুটোবার প্রয়াস পেতেন। দাদুর কথা কইতেন, ন-কাকার কুশল প্রশ্ন করতেন।

বেলুড় মঠে স্বামীজীকে পরে দু-চারবার দর্শন করে ধন্য হয়েছি। দেখলাম বড় গুরুগম্ভীর, মঠের সকলে বাঘের মতো ভয় করছেন। আমরা সন্ধ্যার একটু আগে একবার নৌকা করে গেছি। বৈঠকখানায় একজন গান করবে—স্বামীজী ওপর থেকে নামছেন শুনে সব ভড়কে গেল। গানবাজনা সব বন্ধ, চুপচাপ—পাছে কি ভুলচুক হয়। বড় রাশভারি ব্যক্তিত্ব দেখলাম। স্বামীজী নিচে গঙ্গার ধারে এসে 'আয়াহি বরদে দেবি'—গায়ত্রী আবাহন মন্ত্র সুস্বরে আবৃত্তি করতে করতে উঠোনে আমগাছের কাছে সমাধিস্থ। বাবুরাম মহারাজ ইত্যাদি তটস্থ। চোখ লাল জবাফুলের মতো, যেন মদ খেয়ে টলছেন। তারপর ভাব কেটে গেলে গাছতলায় পায়চারি করতে লাগলেন অনেকক্ষণ। মাঝে মাঝে কি যেন হুঙ্কার দিয়ে বলতে লাগলেন। সেবার ঐ দূর থেকেই দর্শন। যখন নরম হতেন, মানুষ তো দূরের কথা, সামান্য কুকুর বেড়ালটাও ছুটে ভাব করতে যেত। তখন এক অনির্বচনীয় আকর্ষণী শক্তি দশদিকে বিকীর্ণ হতো। আমাকে একবার স্বাবলম্বন শিক্ষা দিয়েছিলেন। বললেন, "কারুর সেবা নিবি না। নিজে সব কাজ করবি। কোন কাজই ছোট নয়, মনে নিশ্চিত জানবি।" তাঁর সম্বন্ধে সত্যিই বলা যায়—তিনি হাসলে ভুবন হেসে উঠত, আর কাঁদলে পৃথিবী কাঁদত।

তুলসীরাম ঘোষ

স্বামী প্রেমানন্দজীর অগ্রজ, তিন বৎসরের বড়—স্বামীজীর থেকে পাঁচ বৎসরের বড়।
বলরামবাবুর পত্নী কৃষ্ণভাবিনী বসু এঁর দিদি।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে বলরামবাবুর দেহান্ত হয় নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে। শেষের দিকে সব সময় 'মিলর্ড', মিলর্ড', প্রভু, প্রভু' বলতেন। হলঘরে পয়লা বৈশাখ দেহান্ত হয়। খবর পেয়ে পশ্চিম থেকে স্বামীজী এসে একমাস হলঘরে থাকেন। শ্রাদ্ধ-শেষ পর্যন্ত। যতদূর মনে পড়ে—ঠাকুরের দেহান্তের পর আঁটপুরে স্বামীজীর সঙ্গে বাবুরাম, শশী, নিরঞ্জন, কালী, শরৎ, গঙ্গাধর, শিবানন্দ ও সারদা যান।

স্বামীজী বলরামবাবুকে বলতেন, "আপনার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আলাদা। আপনি যদি আমাদের এ দরজা দিয়ে বার করে দেন তো আবার ও দরজা দিয়ে ঢুকব।" আঁটপুরে প্রথমবার তিনদিন, তিনরাত্রি ধুনি জ্বলে। স্বামীজী ঠাকুরের আদেশ পেলেন—আর কেউ বাড়ি ফিরে না যায়। ইতিমধ্যে কলকাতায় সুরেশচন্দ্র মিত্রের উপর স্বপ্নাদেশ হলো। তিনি সস্তায় বরাহনগরে একটা পড়ো ভূতের (টাকির রায়েদের) বাড়িতে মঠ স্থাপনা করলেন। স্বামীজী এতই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মানুষ ছিলেন যে, বলতেন, "ওরে এ আমাদের সুরেশ-মঠ।"

প্রথম পশ্চিমে যাবার আগে স্বামীজী একদিন অনবরত এদিক-ওদিক পায়চারি করছেন আর আপনমনে চেঁচিয়ে বলছেন, "ওসব ইশারা-টিশারা বুঝি না, তুমি হাত ধরে সব করিয়ে দাও।"

বলরামবাবুর বাড়ির—দোতলার হলঘর। একদিন ঠাকুর দক্ষিণ-শিয়রী শায়িত। মধ্যাহ্ন। নরেন্দ্রনাথ কিছু দূরে পূর্বদিকের দেওয়ালে মুখ করে দক্ষিণ-শিয়রী শুয়ে। ঠাকুরের দিকে পিছন। ঠাকুর বসে হামা দিতে দিতে ওঁর কাছে এসে ওঁকে আস্তে আস্তে স্পর্শ করছেন। সহসা চমক লেগে নরেন্দ্রনাথের নিদ্রাভঙ্গ। চিৎকার করে বললেন, "Lo! the man is entering into me!" (দেখ, লোকটা আমার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে!) তাই শুনে ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, "শালা মনে করেছ, তোমার কিড়ির-মিড়ির ইংরিজি বুলি বুঝি না? তুমি বলছ, আমি তোমার ভিতর ঢুকে যাচ্ছি।"

হরেরাম ঘোষ

স্বামী প্রেমানন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা তুলসীরাম ঘোষের ছেলে।

বলরাম ভবনে হলঘরের মাঝখানে স্বামীজীর ঠাঁই হয়েছে, খাবেন। আমি চটিজুতো পায়ে ওঁর আসনের সামনে দিয়ে যাচ্ছি। ডেকে বললেন, "কেউ খেতে বসলে তার সামনে বা তার পাশ দিয়ে জুতো পরে যাওয়াটা অভদ্রতা তো বটেই, অস্বাস্থ্যকরও। কেননা, পায়ের ধুলোটুলো খাবারে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনা।"

আমার ঠাকুমা (স্বামী প্রেমানন্দের মা মাতঙ্গিনী ঘোষ) একদিন স্বামীজীকে খেতে বলেছেন। স্বামীজী বাড়ির ভিতরের দালানে খেয়ে, বাইরে সিঁড়ির পাশের ঘরে এসে বসেছেন। একটু বিশ্রাম করবেন। আমরা ছেলেরা তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। সেবক তামাক আনতে গেছেন। এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে আমার ছোট বোন বিশ্বেশ্বরী এসে ওঁর সামনে দাঁড়াল। তিনি একটু vacant look-এ (শূন্য দৃষ্টিতে) ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ দু-চার সেকেন্ড পরে সে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল। সবাই জিজ্ঞাসা করলে, "কেন কাঁদছিস?" সে জবাব দিলে, "সন্ন্যাসী আমায় কি করে দিলে!" ঠাকুমা ঐ শুনে এসে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নরেন, মেয়েটা কি বলছে? কি ব্যাপার বল তো?" স্বামীজী বললেন, "মেয়েটার ভিতরে আমি জগদম্বার আবির্ভাব দেখছিলুম। খুব ভাল আধার।"

বলরাম-ভবনে রাখাল মহারাজ রয়েছেন। ওঁকে নেবার জন্য স্বামীজী একদিন বেলুড় থেকে নৌকা করে এলেন। রাখাল মহারাজ যাবার সময় তাঁর সঙ্গে আমাকে নিলেন। নৌকায় তাঁদের অনেক কথাবার্তা হচ্ছিল। সেসব আমার মনে নেই। রহস্য করতে করতে স্বামীজী চিংড়িমাছের গান গাইলেন। গানের বক্তব্য, নৌকাগুলোকে চিংড়িমাছের দল তাদের দাড়া দিয়ে আটকে দিচ্ছে।

স্বামীজী এলেই খেলাধুলো ছেড়ে ছেলেপুলেরা আমরা তাঁর কাছে দৌড়ে গিয়ে হাজির হতাম। বুঝতে পারি না পারি, তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগত। একদিন বিবাহতত্ত্ব সম্বন্ধে বাবার (তুলসীরাম ঘোষের) সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়েছিল। আমাদের সঙ্গে বালকের মতো খেলা করেছেন। গেরুয়ার কাপড় দিয়ে মুখের একপাশ ঢেকে বলেছেন, "বল দিকিন আমাকে মেয়েছেলের মতো দেখতে লাগে কিনা?"

যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত

স্বামী নির্মলানন্দের ভাইপো, ডাকনাম ভুঁদি, কাগজ কোম্পানী জন ডিকিনসনের বড়বাবু ছিলেন।

আমরা তখন স্কুলে পড়ি। পনের ষোল আন্দাজ বয়েস। তখন কীই বা তাঁর মাহাত্ম্য বুঝব! আমার খুড়োমশাই (পরে স্বামী নির্মলানন্দ) স্বামীজীর খুব স্নেহভাজন ছিলেন। আমাদের বাগবাজার বোসপাড়ার বাড়িতে স্বামীজী এলে গান-বাজনায় প্রায়ই সরগরম হতো। খুড়োমশাই তবলা বাজাতেন। পাখোয়াজ সঙ্গতও করতে পারতেন। খাওয়া-দাওয়ার ধুম পড়ে যেত। বাড়ির ছেলেরা স্বামীজীর বড়ই প্রিয়। তাদের নিয়ে খুব আনন্দ। খুড়োমশাই রাশভারি লোক। বাড়িসুদ্ধ সবাই তাঁর ভয়ে কেঁচো। মনে পড়ে, একদিন স্বামীজী আমাদের বৈঠকখানায় এসেছেন। আমাদের বাড়ির একটি বৌ পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে স্বামীজীকে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে গিয়ে বেকায়দায় একটা পা কেটে রক্তারক্তি ঘটালেন। তখনকার যুগে আবরুর বেজায় বাড়াবাড়ি। ঐ দুর্ঘটনার কথা বাইরের ঘরে, বিশেষ খুড়োমশায়ের ভয়ে, আদপে জানতে দেওয়া হয়নি। তাড়াতাড়ি জলপটি আর কি ওষুধ-বিষুধ দিয়ে ব্যাপারটি গায়েব করা হলো।

ছাড়া ছাড়া ছবি—স্বামীজী প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফিরছেন। আমরা ছেলেরা তো বরাবরই যেমন হয়, আমুদে আর হুজুগে। শিয়ালদহ স্টেশনে গেছি আমোদ দেখতে। জাহাজ থেকে সম্ভবতঃ ডায়মণ্ডহারবারে[১] নেমে একখানি স্পেশাল ট্রেনে স্বামীজী এসে পৌঁছলেন। স্টেশন লোকে লোকারণ্য। স্বাগত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সংবাদপত্রের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। প্লাটফরমের ওপর ভিড়ের চাপের চোটে স্বামীজীকে হাত ধরে নামাতে গিয়ে সেন মহাশয় একেবারে চিৎপাত হয়ে গেলেন। তাঁর স্থূল দেহ, পরনে চোগাচাপকান ও মাথায় পাগড়ি। স্বামীজী তড়াক করে নেমে অতি সহজভাবে নরেনবাবুকে হাত ধরে তুলে ওঠালেন—এ দৃশ্য মনে আছে। স্বামীজীকে পালোয়ানের মতো সবল বোধ হলো।

পরের একটি ঘটনা। বিডন স্ট্রীটে তখন এমারেল্ড থিয়েটার। সেখানে সভা। সভাপতি স্বামীজী। বক্তা বিলাত-মার্কিন-আগত স্বামী সারদানন্দ। বিষয়—আমেরিকায় আমাদের মিশন বা প্রচার। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং আনন্দ চার্লু এই মঞ্চে সমাসীন। দু-এক কথা জগদীশচন্দ্র বসুও বললেন। স্বামীজী দক্ষিণ দেশের বিখ্যাত নেতা আনন্দ চার্লুর পরিচয় দিলেন। ভঙ্গিটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর

১ ডায়মণ্ডহারবারে নয়, স্বামীজী নেমেছিলেন বজবজে।—সম্পাদক।

জোরালো মর্মস্পর্শী বলার ভঙ্গি এবং তাঁর আভাময়, জ্যোতির্ময় উপস্থিতির স্মৃতি যাঁর রয়েছে, তিনি অতীত দিনের দিকে তাকিয়ে দেখছেন যে, স্বামীজীর ছাপ স্বামীজী নিজেই রেখে গেছেন। ইংরেজীতে বললেন। এক একটা বাণী মাত্র স্মৃতিতে ভেসে উঠছে।—"ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের কাছে মিঃ চার্লুকে কিছু বলবার জন্য আহ্বান করছি। তিনি বিন্ধ্যগিরির ওপার থেকে আসছেন, যে-স্থানের সঙ্গে আচার্য শঙ্কর, আচার্য রামানুজ, আচার্য মধ্ব প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সংশ্লিষ্ট।"

চার্লু বললেন, "বৈজ্ঞানিক বসুর ন্যায় আমার কিন্তু বলা চলবে না যে, ধর্ম আমার এলাকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়।"

এই সভার শেষে স্বামীজী উঠে আসছেন, স্টেজের ওপর স্বামীজীকে রাম মুখুজ্যে ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। ইনি রাজবল্লভ পাড়ার কীর্তি মিত্রের ছেলে প্রিয় মিত্রের আখড়ায় কুস্তি করতেন। সুন্দর সুদৃঢ় ইস্পাতসদৃশ শরীর, স্বামীজী যেমনটি চাইতেন। স্বামীজী হাসতে হাসতে তাঁর বিপুল বলশালী দেহের উপর সস্নেহে হাত বুলুলেন। বললেন, "হাঁ, এই রকম সব হওয়া চাই। হয়েছে বাবা, ওঠো, ওঠো।"

পুলিনবিহারী মিত্র

কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে থাকতেন, সুপ্রসিদ্ধ গায়ক, স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য।

স্বামীজী ডায়েবিটিসে ভুগে মারী পাহাড়ে চেঞ্জে গেছেন। অক্টোবর, ১৮৯৭। সেখানেই প্রথম দেখা। তাঁর শরীর কাহিল। আমরা একটা বাঙালী মেসে থাকতুম। সেখানে একদিন বেড়াতে গেছেন। সঙ্গে গুপ্ত মহারাজ আছেন। বদ্যিতে তাঁকে গান করতে মানা করেছেন। কিন্তু আমার ঘরে একটা তানপুরা দেখে ভারি খুশি। বেঁধে গাইতে আরম্ভ করলেন, "গাও জীব জন্তু আদি যে আছ যেখানে।" গানটার এইখান থেকেই ধরলেন। গুরুগম্ভীর জমজমাট, অসামান্য গলা। শুনেই মনে হলো, এমন গলা শোনা যায় না। গুপ্ত মহারাজ হুঁশ করিয়ে দিলেন, "মহারাজ। তবিয়ত ভাল নয়। আপনার গান গাওয়া মানা আছে।" স্বামীজী বললেন, "আরে রেখে দে তোর ডাক্তার-ফাক্তার।"

আমার গান শুনে ভারি খুশি হয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, "বাবা। ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্যই আসল। সত্যেন লভ্য স্তপসা হ্যেষ আত্মা…ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যং।" কি সুন্দর শুদ্ধ সংস্কৃত আবৃত্তি।

কখনো কখনো তিনি ছেলেমানুষের মতো হয়ে যেতেন। ঠিক যেন বন্ধুর মতন। নিজের গুরুত্ব একদম তখন ভুলে যেতেন। আবার অন্য কালে অন্য রূপ। আমরা তখন ছোকরা। একদিন আমাদের 'মেসে' বেড়াতে এসেছেন। কচুরি ভেজে দেওয়া হয়েছে, খাচ্ছেন, খুব ভাল লেগেছে। একটু খেয়ে আমাকে খেতে দিলেন। আমি তাঁর প্রসাদ খাচ্ছি। আবার বলছেন, "ঐটে থেকেই আর একটু দে না। বেশ চমৎকার, কি বলিস?" সখার মতো আচরণ।

লম্বা একগাছি পাহাড়ী লাঠি হাতে নিয়ে সকালে একদিন স্বামীজী বেড়াতে বেরিয়েছেন। পথে কাঠের বোঝা মাথায় একজন কাঠুরিয়ার সঙ্গে দেখা। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "এই লোকটি ঈশ্বরের পথে অনেক অগ্রসর।" আমরা কি বুঝি? দেখলাম মাত্র—লোকটি অতীব ভক্তিভরে স্বামীজীকে পথের ওপরই মাথার বোঝা নামিয়ে প্রণাম করল। তার সঙ্গে হিন্দিতে দু-চারটি কথা কয়ে স্বামীজী অতিশয় আনন্দিত হলেন।

গানে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। রাগের অমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রকমফেরের সঙ্গে কণ্ঠ-পরিচয় কারুর বড় একটা দেখা যায় না। মনে আছে, এক কানাড়া রাগের অনেকগুলো রকমারি বোল একদিন আমাদের ভেঁজে শোনালেন। অসাধারণ অধিকার—সর্ববিষয়ে, মানুষকে মুগ্ধ করে রাখতেন।

স্বামীজীর কাছে বেলুড়ে বসে আছি। পূর্ণবাবুও (পূর্ণচন্দ্র ঘোষ) আছেন। পূর্ণবাবুর বড় ইচ্ছে হলো স্বামীজীর কিছু প্রসাদ পান। হঠাৎ স্বামীজী উঠে একটা দামী সিগার ধরালেন। বললেন, "দ্যাখো কত দামী জিনিস দিয়ে গেছে, পূর্ণ ভাই।" নিজে একটান টেনে বললেন, "নাও টানো"।

নীলাম্বরবাবুর বাগানে একদিন গঙ্গায় স্নান করে স্বামীজী উঠে এসেছেন। গুডউইনের ইচ্ছে পা মুছিয়ে দেয়। কানাই মহারাজ, সুরেন মহারাজ তোয়ালে করে তাঁর মাথা মুছছেন। তিনি গুডউইনকে "Sit down and rub it"—বলে পা বাড়িয়ে দিলেন।

ষষ্ঠীপদ দে

কলকাতার ঢাকুরিয়া অঞ্চলে বাস করতেন। সরকারী কর্ম করতেন।

ইংরেজি ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগ। আমার বয়স তখন সতের। সিটি কলেজে প্রথম বর্ষে পড়ি। সেই সময় কম্বুলিটোলার ভাড়াবাড়ি উদ্বোধন অফিসে সারদা মহারাজের (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের) কাছে যাতায়াত করি এবং যথেষ্ট উপদেশাদি তাঁর কাছে পাই। এইকালে স্বামীজী অসুস্থ অবস্থায় কাশীধামে আছেন। আমি মধ্যে মধ্যে সারদা মহারাজকে স্বামীজী কবে আসবেন জিজ্ঞাসা করতাম। তিনি বলতেন, "স্বামীজী এলেই আমি তোমাকে সঙ্গে করে তাঁর কাছে নিয়ে যাব।"

স্বামীজী যেদিন কাশী থেকে ফিরলেন, সেটা ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ।[১] দিন ঠিক মনে নেই। সারদা মহারাজের সঙ্গে বেলুড় মঠে এলাম। আমরা যখন নৌকা থেকে মূল মঠবাড়ির সামনের ঘাটে নামলাম, স্বামীজী তখন ঘাটের ধারে পোস্তার ওপর দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দেহ রোগক্লিষ্ট হলেও সেই সৌম্য স্নিগ্ধ সহাস্য মূর্তি, যা এই প্রথম দর্শনে দেখলাম, জীবনে ভুলতে পারিনি। শুনলাম তিনি এইমাত্র এসেছেন, গুরুভ্রাতারা গঙ্গায় স্নান করছেন জেনে ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সেই মুহূর্তে স্বামীজীর পরিধানে সিপিয়া রঙের একটি নিকারবকার। গলা থেকে পা পর্যন্ত। পায়ে মোজা ও জুতা ছিল। তখন রাখাল মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও আরও দুই-চারজন সাধু স্নান করছিলেন। স্বামীজী সহাস্যবদনে তাঁদের সঙ্গে পরিহাস কৌতুক করতে লাগলেন এবং বললেন, "ওরে রাখাল, শরতা—তোরা ডুব দিচ্ছিস না কেন, ভাল করে ডুব দে না, ভয় হচ্ছে ডুব দিতে নাকি? ভয় নেই। ডুব দিলে তলিয়ে যাবি না।" ইত্যাদি। আমরা উপস্থিত সকলে সেই সহাস্য পরিহাসে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করলাম এবং স্বামীজীর এই বালসুলভ আলাপন শুনতে পেয়ে পুলকিত হলাম। তাঁর বিশাল উৎফুল্ল নয়ন এবং হাস্যদীপ্তিময় আনন দেখে মনে হলো কোন রোগই তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর পাদপদ্মে প্রণত হয়ে কৃতার্থবোধ করলাম। তিনি বড়ই মধুর স্বরে পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করলেন এবং আর একদিন আসতে বললেন। পরে তিনি কাপড়-চোপড় ছেড়ে বিশ্রামের জন্য চলে গেলেন।

কয়েকদিন পরে একদিন বিকালে পুনরায় বেলুড় মঠে গেলাম। স্বামীজী তখন পিছনের চত্বরে গাছের তলায় একখানি বেঞ্চের উপর বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। পদধূলি নিলে তিনি স্নেহপূর্ণস্বরে বললেন, "দ্যাখো বাবা, তোমাদের আর কি বলব?

১ ৮ মার্চ, ১৯০২ স্বামীজী কাশী থেকে বেলুড় মঠে ফিরে আসেন—সম্পাদক।

তোমরা এখনো বালক মাত্র। তবে একটা কথা বলি, ধর্মকর্ম কিছু কর আর না কর, বিবাহ করো না। বিবাহ করলে মানুষ নিজের স্বাধীন ভাব, সত্তা হারিয়ে ফেলে, তার দ্বারা কোন বড় কাজ করা হয় না।"[১]

আমি বললাম ধর্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিন। উত্তর করলেন, "ওটার সম্বন্ধে তোমাদের এখন কিছুই ভাবতে হবে না। এখন যাতে বদ্ধ না হও, যা বললাম তাই কর।" তাঁর কথা আমি রাখতে পারিনি।

-যতক্ষণ তাঁর কাছে ছিলাম, মনে হলো তাঁর শরীর থেকে একটা স্নিগ্ধজ্যোতিঃ বের হয়ে আমার শরীরকে এমন ঠাণ্ডা করে দিল যা পূর্বে কখনো অনুভব করিনি।

আর একদিন সকাল-সকাল কলেজের ছুটি হলে বেলুড়ে গেলাম। শরৎ মহারাজ পূর্বদিকের রোয়াকে বসে ধূমপান করছিলেন। কাছে রাখাল মহারাজ বসেছিলেন। সম্মুখের মাঠে একজন প্রৌঢ় সাঁওতাল মাটি কোপাচ্ছিল। তাকে ঘর্মাক্ত-কলেবর ও পরিশ্রান্ত বোধ হচ্ছিল। স্বামীজী সম্ভবতঃ বেড়াতে যাবেন বলে নিচে নেমে এলেন। ঐখানে দাঁড়ালেন। সাঁওতালের অবস্থা দেখে মনে হলো তাঁর খুব কষ্ট-হচ্ছে। সাঁওতালটিকে মিষ্ট স্বরে বললেন, "যা রে, আজকের মতো কাজ বন্ধ করে বাড়ি যা। আর কাজ করতে হবে না।"

আর একদিনের ঘটনা। তারিখ মনে নেই। স্বামীজী অসুস্থ। ওপরে শয্যাশায়ী। রোগের বৃদ্ধি হয়েছে। জাপানের ওকাকুরা এসেছেন। ওকাকুরার বয়স আন্দাজ চল্লিশের ওপর। গঙ্গার সম্মুখে ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর একজন জাপানী সঙ্গী নিচে পদচারণ করছিলেন। ইনি জাপানের প্রাচীন রাজবংশীয়, নাম প্রিন্স হারা। তখন কম বয়স। সুপুরুষ, ছিপছিপে, চ্যাপটা নাক নয়, বাঙালী ধাঁচের চেহারা, বয়স ২৪-২৫। ইনি পরে শান্তিনিকেতনে দেহত্যাগ করেন।

রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, স্বামীজী বলেছেন, "আমার শরীর খারাপ, আমার নিজের কোন ইচ্ছা নেই, তবে যদি জগন্মাতার ইচ্ছা হয় তো তোমাদের দেশে আমার যাওয়া হবে।"

১ "স্বামীজীর এই উপদেশ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি। জনৈক প্রাচীন সাধুর কাছে শুনেছি: 'আমার সামনে একদিন স্বামীজী তাঁর পূর্বাশ্রমীয় কনিষ্ঠ সহোদরকে বিবাহ করবার জন্য পুনঃপুনঃ জোরের সঙ্গে আদেশ করতে লাগলেন। সেটা ভাইকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে কিনা জানি না। কিন্তু সহোদর কিছুতেই রাজি হলেন না'।"—স্বামী নির্লেপানন্দের সংযোজন।

হরিচরণ মল্লিক

বাড়ি কলকাতার আহিরিটোলায়। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে শ্রীম-র ছাত্র। পরে ওখানেই তাঁর শিক্ষক-সহকর্মী। গুরু ব্রহ্মানন্দ তাঁকে 'পর্বত' নামে ডাকতেন। সেই নামেই ভক্তমহলে পরিচিত ছিলেন।

কলকাতা হ্যারিসন রোডের মাড়োয়ারি বগলা হাসপাতালবাড়ি তখন সবে তৈরি হচ্ছে। প্রকাণ্ড চারতলা অট্টালিকা। খেতড়ির রাজা ওপরটা ভাড়া নিয়েছেন। রাজাবাহাদুর স্বামীজীর শিষ্য। রাজার ঐকান্তিক আহ্বানে স্বামীজী ঐ বাড়ির চারতলার ওপর তাঁর অতিথি হয়ে কয়েকদিন কাটান। আমরাও খবর পেয়ে গেলাম। ওপরের খোলা ছাদে আমরা দুটি ছেলে বেড়াচ্ছি। স্বামীজী টের পেয়ে খুব জোরে ডাকলেন, "নেবে আয়, নেবে আয়—তোরা শিগগির নেবে আয়। ওখান থেকে পড়লে আর আস্ত থাকবি না।" মাস্টার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র আমার সঙ্গী। স্বামীজী আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "যা, বাড়ি যা"। একটা জিনিস এই সামান্য ব্যবহারে খুব সহজে বোধ হলো—ইনি বড়ই স্নেহশীল, আর ইনি আমাদের প্রকৃত অভিভাবক।

এইখানে একদিন এক বাজিকর ওঁর কাছে এল। সে চাইছিল স্বামীজী যেন তাকে রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সে কিছু বাহাদুরি, হাতসাফাই, কারসাজি রাজাজীকে দেখাবে, এবং পারলে কিছু অর্থলাভ করবে। উনি তাকে আমলেই আনলেন না। খালি বললেন, "ম্যায় তো সন্ত হ্যায়। দো রোটী খাতা আউর পড়া রহতা।"—বলেই গম্ভীর হলেন। বাজিকর আর তাঁর সামনে দাঁড়ানোর সাহস পেল না।

আর একবার ওখানেই একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এসেছেন। শ্রৌত পণ্ডিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় স্বামীজীকে আশীর্বাদ করলেন। স্বামীজী তখন একটা ক্যাম্প খাটে শুয়ে। শিবানন্দ স্বামী মেজেতে বসে। শিবানন্দ স্বামী পণ্ডিতজীকে বললেন, "আপ তো গৃহী হ্যায়। উনহে পরমহংস বন গয়া। আপকী এয়সী আশিস উনকে শিরপর দেনা আচ্ছি নহি।" স্বামীজী দুজনের কথাই শুনলেন। পরিশেষে পণ্ডিতকে কয়েকটি কথা বললেন—সংস্কৃত ভাষাতেই। তা স্মরণে নেই। তার ভেতর একটি কথামাত্র মনে আছে। তিনি শান্ত অথচ জোরালোভাবে বলেছিলেন, "সুষ্ঠু প্রোক্তং ত্বয়া"—আপনি বেশ বলেছেন। বেশ মনে পড়ে, কথাবার্তার পর সে ব্যক্তি খুবই নরম হয়ে গেলেন।

স্বামীজী তাঁকে পরে বললেন, "আলমবাজারে আমাদের একটি মঠ আছে। সেখানে মহাত্মা লোক সব থাকেন। আপনি পারলে তাঁদের সঙ্গ করবেন।"

আলমবাজার থেকে মঠ উঠে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে এসেছে। খেতড়ির রাজা একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি খুঁজছেন। হিসেব-টিসেব যিনি ঠিকমতো রাখতে

পারবেন, এমন বেশ দুরন্ত লোক চান। যোগানন্দ স্বামী ও স্বামীজীর মধ্যে এই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে—কাকে দেওয়া যায়। যোগেন মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, "ওকে দাও, বেশ পারবে।" স্বামীজীর কিন্তু তখন ইচ্ছা হরমোহনবাবুকে দেন। কারণ তাঁর সংসার ছিল। ছেলে-পিলে নিয়ে, বড় কষ্টে ছিলেন। তাতে যোগেন মহারাজ বলছেন, "হরমোহন বড় ন্যালাখ্যাপা। কি করতে কি বেঢপ করে বসবে আবার! আমাদের মুখ থাকবে না। কাজ নেই—তুমি একেই দাও।" স্বামীজী তা মত করলেন না। হরমোহনবাবুকেই দিলেন। বোধ হয় মাসিক নব্বই টাকা করে মাইনে। তখনকার দিনে ভালই রোজগার। তাঁকে বলছেন, "ঠিক সময়ে হাজিরা দিবি। ভাল কাপড়-চোপড় পরে যাবি। পাগলামো করলে হবে না।" এই রকম বেশ আচ্ছা করে তালিম দিলেন।

একদিন বড়বাজারে খেতড়িরাজের ঐ ভাড়াবাড়ির চারতলায় স্বামীজী শুয়ে আছেন। নাটু ও চারুকে (মাস্টার মহাশয়ের দুই পুত্র) লক্ষ্য করে হরি মহারাজ বলছেন, "এদের চিনতে পারছ?" স্বামীজী, "হাঁ, হাঁ, খুব।" ওদের বললেন "কিরে, তোদের বাবা কেমন আছেন? চ, চ—তোদের বাড়ি যাই।"

যেমন বলা, তেমনি কাজ। অমনি চললেন—ওদের সঙ্গে। আমিও আছি। হরমোহনবাবু যাবার জন্য নিচে আসতে চাইলেন। তাঁকে ভীষণ ধমক দিলেন। নতুন কাজে বহাল হয়েছেন কিনা! বললেন, "কাজ ছেড়ে হতভাগা তুই কোথায় যাবি? যা যা, মন দিয়ে নিজের কাজ করগে যা।"

হিন্দু হোস্টেলের কাছে ভবানী দত্তের গলি। পাড়াটার নাম সানকী-ডাঙা। কলুটোলায় কেশববাবুর পৈতৃক বাড়ির পেছনে একখানি ভাড়াবাড়িতে মাস্টার মহাশয় তখন থাকেন। তিনি ঠিক সেই সময়ে কালো চাপকান পরে ইস্কুলের সাজে, কাজে চলেছেন। পথে স্বামীজীর সঙ্গে হ্যালিডে স্ট্রীটে দেখা। তাঁর তখন ওঁকে পেয়ে স্কুলে যাওয়া হলো না। ফিরে এলেন। স্বামীজীর সঙ্গে হরি মহারাজও ছিলেন। বাড়িতে ঢুকলেন। দোতলায় একটি হলগোছের ছিল। স্বামীজী সটান সেখানে ঢুকে, পাতা বিছানায় শুয়ে পড়লেন। মাস্টার মহাশয় শীঘ্র শীঘ্র জামাজোড়া সব খুলে ফেললেন। একান্ত ঘরের লোকের মতো স্বামীজী বলছেন, "মাস্টার মশাই, তরমুজ-টরমুজ কিছু আনান। একটা কামড় দিয়ে যাওয়া যাক।" গ্রীষ্মকাল। কথামতো জিনিস এলো। স্বামীজী একটু একটু সব খেলেন। এমন সময় একটি লোকের প্রবেশ হলো। প্রতিবেশী, রাণা-উপাধিধারী ব্যক্তি। খেলো হুঁকো হাতে। চোখে মোটা চশমা। প্রচণ্ড তীক্ষ্ন সমালোচক গোছের ব্যক্তি। পেশায় এঞ্জিনিয়ার। স্বামীজীকে চেখে দেখবার জন্যই দুচারটি প্রশ্ন বর্ষণ করলেন, "বলুন তো মশাই, আমাদের সংক্ষেপে কি করে ধর্মকর্ম হয়?" স্বামীজী প্রথমটা চুপ করেই ছিলেন। পরে পুনঃ-পুনঃ জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, "দরকারই বা কি?" রাণা তখন চুপ। পরে জানলাম, স্বামীজীকে দর্শন করবার জন্য মাস্টার মহাশয়ই রাণাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তারপর স্বামীজী একবার বাইরে শৌচে গেলেন। ফিরে এসে দাঁড়িয়েছেন, হাত মুখ ভেজা। মাস্টার মহাশয় নিজের কাপড়ের খুঁট এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নাও না, পোঁছ না।" উনি ইতস্ততঃ করছেন। শেষে মাস্টার মহাশয় নিজেই মুখ মুছে দিলেন। উনি ছোট ছেলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। "নাও, নাও, কাচা কাপড়—নইলে দেব কেন?"—মাস্টার মহাশয় বললেন।

সোমানন্দ নামে স্বামীজীর একজন দাক্ষিণী চেলা ছিলেন। তিনি আমাদের তাঁর প্রথম গুরুসন্দর্শনের কথা বেশ বলতেন।—"ঘুরে ঘুরে হিমালয়ের ওপর হিমালয়-সদৃশ শ্রেষ্ঠ-পুরুষ স্বামীজীকে প্রথম দেখলাম। কোন আশ্রম-টাশ্রমে নয়, একলা থাকেন, সম্পূর্ণ ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, মাধুকরী করে আহার সংগ্রহ করেন। কিন্তু হলে কি হবে? ফকিরের আবরণেই তাঁকে বোধ হলো a king of kings—যেন রাজরাজেশ্বর। আমি তখন পেটের ব্যামোতে খুব কাবু—purging and purging. দেহের ঐ অবস্থা শুনলেন—তাঁর mother's heart দেখলাম। পথ্য স্বহস্তে প্রস্তুত করে খাওয়ালেন—মা বিবেকানন্দ।"

যোগীন-মার বাড়ি কলকাতা ৫৯নং বাগবাজার স্ট্রীটে খুব ঘটা করে জগদ্ধাত্রী পুজো। ঠাকুর-দালানের বারান্দায় দুখানা চেয়ারে স্বামীজী ও নিবেদিতা বসে আছেন। আমি পেছনে ছিলাম। সোমানন্দ আমাদের পাশেই ছিলেন। একটু ইতস্ততঃ করছেন। স্বামীজীর সামনে যাওয়া উচিত কিনা। তিনি কিন্তু ওঁকে দেখেই নিবেদিতাকে বলছেন, "Do you know this boy? A very good lad" (তুমি এই ছেলেটিকে জান? বড় ভাল ছেলে।)

আরও কত সব কথা মনে পড়ছে। নিবেদিতার সেই প্রথম উদ্যম। বাগবাজার পল্লীতে বালিকা বিদ্যালয় খুলবেন। একদিন বলরামবাবুর বাড়িতে গৃহস্থ-ভক্তদের একটি ঘরোয়া সভা হলঘরে হলো, যাতে গৃহস্থরা ঐ স্কুলে মেয়ে দেন—এই আবেদন। সকলে বসে আছেন। এমন সময় অতর্কিতভাবে স্বামীজী সবার পেছনে আসন গ্রহণ করলেন। নিবেদিতা ইংরেজীতে বক্তৃতা দিলেন। মাস্টার মহাশয়, সুরেশ দত্ত, হরমোহনবাবু প্রভৃতি ছিলেন। স্বামীজী কয়েকজনকে হাসতে হাসতে খেলাচ্ছলে গুঁতো দিচ্ছেন আর বলছেন, "ওঠ ওঠ। ওঠ না। শুধু মেয়ের বাপ হলেই তো হবে না। জাতীয়ভাবে তাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাতে সহযোগিতা তোদের সবাইকে করতে হবে। উঠে বল—আবেদনের প্রত্যুত্তর দে। বল—হ্যাঁ, আমরা রাজি আছি। আমরা তোমাকে আমাদের মেয়ে দেব।" কেউ ওরূপ বলতে সাহস করছিলেন না। শেষে স্বামীজী হরমোহনবাবুকে জিদ করে চাপা গলায় বললেন, "তোকে দিতেই হবে।" তাঁর হয়ে স্বামীজী নিজে তখন বললেন, "Well, Miss Noble, this gentleman offers his girl to you." (মিস নোবল, এই ভদ্রলোক তাঁর মেয়েটিকে তোমায় দিচ্ছেন।) নিবেদিতা প্রথম দেখতে পাননি যে, ভিড়ের মধ্যে স্বয়ং স্বামীজী আছেন। তাঁকে দর্শন করে ও তাঁর ঐ উৎসাহবাণী শুনে নিবেদিতা

খুব বেশিরকমের খুশি হলেন। হাততালি দিতে লাগলেন। এবং শেষে আনন্দে বিভোর হয়ে নাচতে লাগলেন। ঠিক যেন একটি ছোট বালিকা।

নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়িতে মঠ। হরিপ্রসন্ন মহারাজ এখানে যোগ দেন। বেলুড় মঠ তখন সবেমাত্র তৈরি হচ্ছে। একতলা একটি বাড়ি—জমি সমেত প্রথম কেনা হয়েছিল। নীলাম্বরবাবুর বাগানে বুড়ো গোপাল-দা ও হরিপ্রসন্ন মহারাজ এক ঘরে থাকতেন।

একদিন সুরেশ মিত্রের বাড়ি নিমন্ত্রণ। মিত্র তখন পরলোকে। স্বামীজী প্রভৃতি এখান থেকে যাবেন। নৌকো ঘাটে বাঁধা রয়েছে। সকলেই চাপবার জন্য প্রস্তুত। শরৎ মহারাজের খালি আসতে দেরি হচ্ছে। গুরুভাইরা এই সময় পরস্পর রহস্য করে দুই বিলেত-ফেরত স্বামীকে—বড় সাহেব ও ছোট সাহেব বলতেন। স্বামীজী—বড় সাহেব, আর শরৎ মহারাজ—ছোট। স্বামীজী বললেন, "শরৎকে ডাক। কি করছে এতক্ষণ ধরে?" উত্তর—"কামাচ্ছেন"। তখন স্বামীজী আবার রগড় করে বললেন, "ছোট সাহেবকে বল গে—অত ফিটফাটে কি হবে? যেন স্মরণ থাকে, আমাদের গাছতলাই সার।" শরৎ মহারাজ সেই সবে পাশ্চাত্য-ফেরত। তাঁর ঘরে জিনিস-পত্তর, সব একটা টেবিলে সাজানো গোছানো থাকত। লাটু মহারাজ একদিন ঢুকে ওলোট-পালট করে দিতে লাগলেন। শরৎ মহারাজ শান্তভাবে অথচ স্পষ্ট বিরক্তি জ্ঞাপন করে বলছেন, "কি করছ? সব ওলোট-পালট করছ কেন?" উত্তর—"তাতে কি হয়েছে?"

এই বিখ্যাত বাগানে রাখাল মহারাজ ও স্বামীজী একদিন পরস্পর কাঁধে হাত দিয়ে লনে বেড়াচ্ছেন—স্মৃতির অম্লানপটে আজও সেই দেবদুর্লভ দৃশ্য জীবন্ত হয়ে উঠছে থেকে থেকে—বর্তমান যুগের এই দুই সাধু-শ্রেষ্ঠের—সম্পূর্ণ মুক্ত ব্যক্তিত্বের প্রোজ্জ্বল চিত্র যেন দেখতে পাচ্ছি।

এক ব্যক্তির সঙ্গে শরৎ মহারাজের খুব ভাব ছিল। স্বামীজী সেটা মোটেই পছন্দ করতেন না। একখানি ইংরেজী পত্রমধ্যে লিখেও ছিলেন, "Beware of him, my child (ওর থেকে সাবধান, বাবা)"। তাঁরা দুজনে একান্তে বসে কথা কইছেন। স্বামীজী ঠাট্টা করে বললেন, "ওরে শরৎ, এধারে আয়! দুজনে স্বামী-স্ত্রীর মতো কোণে বসে কি গুজুর গুজুর করছিস?"

স্বামীজীর প্রতি কি অপরিসীম শ্রদ্ধাই না শরৎ মহারাজের ছিল। একটু বেশি রাত্রে শরৎ মহারাজ কলকাতার কাজ সেরে এসেছেন। পাছে দোতলায় উঠলে পায়ের শব্দে স্বামীজীর ঘুমের ব্যাঘাত হয় সেইজন্য ওপরে তাঁর নির্দিষ্ট জায়গায় শুতেই গেলেন না। বাগানবাড়ির নিচে হলে আমাদের সকলের সঙ্গে[১] চুপটি করে শুয়ে রইলেন।

এই বাগানে একবার ঠাকুরের জন্মোৎসব। স্বামীজী কানে কুণ্ডল পরেছেন।

১ লেখক অনেকদিন মঠে বাস করেছিলেন। স্বামীজীর দেহান্তের পরেও বেশ কয়েক বছর বেলুড় মঠে থেকেছেন।—সম্পাদক।

ছাই মেখে একেবারে শিবটি সেজেছেন। তাঁর ডাকাবুকো চেলা গুপ্ত মহারাজকে বললেন, "জি. সি.-কে (গিরিশবাবু) গেরুয়া পরা, ছাই মাখা।" একটা জটা ছিল, সেটা পরাতে বললেন, "দে, দে, ওকে ভৈরব সাজিয়ে দে।"

গিরিশবাবু একটু কিন্তু কিন্তু করছেন। বলছেন, "আরে, আমার সর্দি হয়েছে যে!" স্বামীজী ছাড়বার পাত্র নন। শেষে তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধে ছাই-টাই মেখে গিরিশবাবু হাসতে হাসতে বলছেন, "তাই তো হে নরেন, এখন দেখছি, সর্দি একটু একটু করে কমে যাচ্ছে যে!"

এই বাগানের ঠাকুরঘর ছিল ছপ্পর ও গোলপাতার চালা। মেজে ও দেওয়াল পাকা সিমেন্ট করা। স্বামীজী সকলকে নিয়ে তার ওপর বসলেন। বললেন, "এইবার সবাই মিলে ধ্যান লাগাও।" গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর তাঁর একটি মর্মস্পর্শী কবিতায় ঠাকুরকে সম্বোধন করে বলেছেন, "তব ধ্যান পরম উৎসব!" এইবারের অনুষ্ঠান থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন কি না জানি না।

শরৎ মহারাজ তানপুরা হাতে গান করছিলেন। স্বামীজী ধ্যানের কথা বলাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তানপুরার আওয়াজ থামালেন। স্বামীজী বললেন, "তুই থামলি কেন রে?" তখন তানপুরার সুমিষ্ট তারের আওয়াজটুকু শরৎ মহারাজ ছাড়তে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে সকল ভক্তদের ধ্যান চলতে লাগল।

গুপ্ত মহারাজ এই সময়টায় ঠিক যেন ভৃঙ্গীর মতো একটা ডাণ্ডা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। স্বামীজী বললেন, "শালা, খালি কুলিগিরি করবি কি? বোস, বোস, ধ্যান লাগা।" গুপ্ত মহারাজ সঙ্গে সঙ্গেই মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলছেন, "এ মহারাজ! ধেয়ান তো আতাহি নেহি।" কথামতো বসলেন অবশ্য। স্বামীজী এই সময় নিজে পাখোয়াজ বাজিয়ে স্বরচিত "খণ্ডন ভববন্ধন" ভজনটি গাইলেন। হরি মহারাজ ঘণ্টা বাজালেন, কেউ বা কাঁসর ইত্যাদি। খুব চমৎকার জমল।

শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে দিয়ে আমাদের কয়েকজনকে গায়ত্রী সূত্র দেওয়ালেন। লাল কম্বল একখানা গায়ে দিয়ে গড়গড়া হাতে সাক্ষিস্বরূপ সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তখন তামাক খাচ্ছিলেন। ঐভাবে কোন কথা না বলে তিনি সকলের ভেতর শক্তিসঞ্চার করলেন। বাহ্যতঃ তিনি তামাক খাচ্ছিলেন বটে। কিন্তু চোখ দেখে বোধ হলো তিনি আত্মস্থ, ভেতরে ঢুকে রয়েছেন। কাজ হয়ে গেলে, লম্বাপানা কাপড়ে বাঁধা উপনিষদ্ ও শ্রীভাষ্য—বইগুলো আমাদের প্রত্যেকের মাথায় স্বামীজী ঠেকালেন। প্রশান্ত হয়ে আমাদের সবাইকে বললেন, "তোদের আজ থেকে বেদে অধিকার করে দিলুম।" স্বামীজী নিজে সকলকে হাতে করে সূত্র দিলেন। সবাই আমরা অব্রাহ্মণ। মাস্টার মহাশয়ের দুই ছেলে—নটি, চারুও ছিল। প্রথমটা মাস্টার মহাশয় একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। ওঁর ছেলেদের সম্বন্ধে স্বামীজী বললেন, "আপনার ছেলেদেরও এই সঙ্গে হয়ে যাক। আপনার খরচা বাঁচিয়ে দিচ্ছি।" মাস্টার মহাশয় একটু চুপ

করে বলছেন, "তুমি নিজে যদি দাও, তো দাও। আমার আপত্তি করবার কিছু নেই।" স্বামীজী বললেন, "এ তো আমিই দিচ্ছি।"

এইখানে একদিন বৌদ্ধ-সাধু ধর্মপাল স্বামীজীকে বললেন, "I am starting Pali class in Calcutta. Will you help me? (আমি কলকাতায় একটি পালি ভাষা শেখাবার ক্লাস খুলছি। আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?)" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ বললেন, "Yes, certainly. I shall help you by being your first student. (নিশ্চয়ই, আমি আপনার ঐ ক্লাসের প্রথম ছাত্র হয়ে আপনাকে সাহায্য করব।)"

মঠের কাজের জন্য আমেরিকা থেকে শরৎ মহারাজকে স্বামীজী ডেকে আনিয়েছেন। একদিন এই বাগানে মঠের অনুরাগী ভক্তদের জড়ো করে শরৎ মহারাজকে সম্বর্ধনা করবার জন্য একটি বৈঠকের আয়োজন স্বামীজী করলেন। নিজেই সভাপতি হলেন। নিবেদিতা প্রভৃতি উপস্থিত। রাখাল মহারাজ সভায় বক্তৃতাদি দেওয়ার পক্ষে বড়ই নারাজ ছিলেন। স্বামীজী রগড় দেখবার জন্য প্রথমেই উঠে বললেন, "আমি সর্ব-প্রথম স্বামী ব্রহ্মানন্দকে আহ্বান করছি, তিনি যেন এই সভায় সকলকে কিছু বলেন।" ব্রহ্মানন্দস্বামী একটু ফাঁপরে পড়লেন। কিন্তু বেশ চমৎকার ভাবে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন। কথামতো সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়েই বললেন, "সভাপতি মহারাজের আদেশ, শিরোধার্য। কিন্তু আপনারা আমাকে মাফ করবেন। আমি আজ মোটেই প্রস্তুত হয়ে আসিনি।"—বলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আসন গ্রহণ করলেন। স্বামীজী হাসতে হাসতে ওঁর চমৎকার উপস্থিতবুদ্ধির তারিফ করলেন।

পাঁচজন বললেন। শেষে শরৎ মহারাজ উত্তর দিলেন। তাঁর বক্তৃতা আজ প্রায় কিছুই মনে নেই। তবে তাঁর একটি কথা এখনো কানে লেগে আছে। তিনি প্রথমে দাঁড়িয়েই স্বামীজীর দিকে চেয়ে ও তাঁর প্রতি সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "What have I done? I have simply followed the foot-prints of our illustrious leader. (আমি আর কি করেছি? আমাদের মহান অধিনায়কের পদাঙ্কই অনুসরণ করে এসেছি মাত্র।)"

পরিশেষে স্বামীজী সভাপতির অভিভাষণ দিলেন। সন্ন্যাসীর আদর্শ তাঁর ভাষণের বিষয়। ইংরেজীতে—যদিও অল্পক্ষণ, খুব সুন্দর বলেছিলেন। তার মর্মমাত্র মনে আছে।—"আমরা—এই যে সব ঠাকুরের পুজো-টুজোর ব্যবস্থা করেছি—এসব আমাদেরই creation (তৈরি)। অতএব একে secondary place (অপ্রধান স্থান) দেওয়া উচিত। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যা আমাদের করতে বলেছেন তাকেই first place (প্রথম স্থান) দেওয়া উচিত। তিনি আমাদের ধ্যান-জপ করতে বলেছেন। দশ হাজার ছবি পুজো করে যা না ফল হবে আধ ঘণ্টা ধ্যান করতে পারলে তার চেয়ে ঢের বেশি ফল হবে। আমাদের যেন এই কথা স্মরণ থাকে।"

কপালের সামনে আঙুল তুলে বললেন, "স্মরণ রেখ, আমাদের আদর্শ—ত্যাগ—

ত্যাগ—ত্যাগ।" বলতে বলতে খুব মেতে উঠেছিলেন। তখন রাখাল মহারাজ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "থাক থাক—আজ আর কাজ নেই। ঢের হয়েছে আজ, তোমার শরীর খারাপ।" তখন উনি শেষ করলেন। সব শেষে বললেন, "Remember—Renunciation, Renunciation and Renunciation (মনে রেখ, বৈরাগ্য, বৈরাগ্য এবং বৈরাগ্য)।"

স্বামীজী একদিন গঙ্গাতীরে বাগানের তৃণভূমিতে পায়চারি করছেন। সুরেশ দত্তকে লক্ষ্য করে একজন ভক্ত বললেন, "এঁকে চিনতে পারছেন?" সুরেশ দত্ত ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে ঠাকুরের জীবদ্দশায় সর্বপ্রথম পুস্তিকাকারে তাঁর অমিয় উপদেশ প্রচার করেন। ইতিপূর্বে নেপাল সরকারে কাজ করার জন্য বহুদিন প্রবাসে ছিলেন। স্বামীজী তখনি ওঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "হাঁ, এ যে আমাদের হারানিধি।" মুর্শিদাবাদে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দুর্ভিক্ষ সেবাকার্যে সেবকদের মধ্যে সুরেশ দত্তও একজন।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে ঠাকুরের জন্মোৎসব হচ্ছে। ধর্মপাল মহাশয় শশী মহারাজকে বলছেন, "What are you doing? Give them spiritual food (এসব আপনারা কি করছেন? মানুষকে অধ্যাত্ম-খাদ্য দিন।)" শশী মহারাজ ছুটতে ছুটতে (খিচুড়ির বালতি হাতে) বলছেন—চেঁচিয়ে—"Yes, but now I am giving them material food. (হাঁ, ঠিক। তবে এদের এখন আমি ঐহিক খাদ্য দিচ্ছি।)" শরৎ মহারাজ ভোগরাগ সব পাহারা দিচ্ছেন। মন্দির অভ্যন্তরে বিরাট চাতালে অনেকগুলো সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। স্থানে স্থানে কীর্তন, নামগান হচ্ছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী দলবল সমেত স্টীমারে আমাদের সকলের সঙ্গে উচ্চরোলে হরি-সংকীর্তন করতে করতে এলেন। শ্রীশ্রীমার নহবতের কাছে স্টীমার থেকে নামবার জেটি তৈরি হয়েছিল। জয় রামকৃষ্ণ—জয় রামকৃষ্ণ'—হুঙ্কার দিতে দিতে গোস্বামীপাদ পরম উৎসাহ অনুরাগভরে উদ্দাম নৃত্য করতে করতে রামকৃষ্ণ-লীলার মূলকেন্দ্র শ্রীদক্ষিণেশ্বর-পীঠে নামলেন। মাস্টার মহাশয় অবনত হয়ে সম্ভাষণ জানালেন, পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। কোঁচড়ে করে প্রসাদী পান তিনি সকলকে বিতরণ করছিলেন। গলায় কাপড়—বিনয়াবনত। পরে নাটমন্দিরে সকলের খাওয়া-দাওয়া হলো। হাণ্ডা হাণ্ডা খিচুড়ি।

গিরিশবাবু একদিন তাঁর বাড়িতে যোগেন মহারাজকে বলছেন, "যোগেন, একটু সরো তো। পা-টা একটু বাড়াই। নরেন, রাখাল-টাখাল, তোমাদের সবাইকে ভালবাসি কেন জান? তোমাদের সাধুগিরির বড়াই নেই বলে। তোমরা সাধু হয়ে কারুর মাথা কিনে নাওনি। সেইজন্যেই তোমাদের ভালবাসি।" যোগেন মহারাজ তখন নিকটেই বাগবাজারে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। রোজ দুপুরবেলা গিরিশবাবুর বাড়িতে এসে তাঁর ভাত খাবার সময় বসে গল্প করতেন। গিরিশবাবু আমাদের বহুবার বলেছেন,

"নরেন, রাখাল—এদের সব ছেলে বলে দেখলে হবে না। সেই প্রদীপ থেকে জ্বলা—সব এক একটি প্রদীপ।"

রামকৃষ্ণপুরে নবগোপালবাবুর বাড়িতে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা। স্বামীজীর সঙ্গে বহু লোকের ভেতর আছি। আলমবাজার ভাড়াটিয়া মঠ-বাড়ি থেকে নৌকা করে সবাই গিয়েছিল। গঙ্গার তীর থেকে স্বামীজীকে ঘোষেদের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য একখানি চার ঘোড়ার ফিটন গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু খোল করতাল নিয়ে গঙ্গাতীর থেকে পায়ে হেঁটে কীর্তন করতে করতে স্বামীজী গেলেন। গাড়িতে চাপলেন না। রাস্তার দুধারে কাতারে কাতারে নরনারী, বিলেত-ফেরত জগৎপ্রসিদ্ধ বিবেকানন্দের নামকীর্তনমত্ত মনোলোভা মোহনমূর্তি দেখবার জন্য সকলেই উদগ্রীব। আমি যখন ঘোষেদের ঠাকুরঘরে গেলাম, তখন দেখি—বেদীর সামনে পূজার আসনে বাবুরাম মহারাজ বসে পূজা করছেন। হরি মহারাজ—তন্ত্রধারক। আর স্বামীজী পাশে বসে আছেন।[২] রাখাল মহারাজও গিয়েছিলেন। ক্রমে হোম হয়ে গেল। স্বামীজী ঘৃত পুষ্প উপচার নিয়ে দাঁড়িয়ে পূর্ণাহুতি দিলেন। যেন ইন্দ্র-বরুণ সব দেবতা নেমে এসেছেন পৃথিবীর মাটির ওপরে। এখনো যেন দেখতে পাচ্ছি। অপূর্ব শোভাময়। স্বামীজীর গা দিয়ে যেন জ্যোতির ধারা ফেটে ফেটে বেরুচ্ছে।

দুখানা নৌকা হয়েছিল। লাটু মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতিরাও ছিলেন। নৌকায় যেতে যেতে নানা রঙ্গরস সব করা হচ্ছিল। 'Fy' দিয়ে কে কত ইংরেজী শব্দ বলতে পারে। এক একজন একটা বলতে লাগলেন, যার যেমন যোগাল।—Ramify Verify Justify Clarify Rarefy Magnify Glorify Beautify Codify Vilify Mummify Simplify Fructify Classify Modify Startify Solidify Specify Notify Amplify Petrify. সকলের বলা শেষ হয়ে গেল। কেউ আশা করেননি যে, লাটুমহারাজ কিছু বলবেন। তাঁর মনের ঝুলিতেও যে কিছু কিছু ইংরেজী শব্দ—লোকমুখে শুনে, সংগ্রহ করা ছিল, তা কারুরই কল্পনায় আসেনি। সকলে থামলে তিনি হাসতে হাসতে ঝট করে বলে উঠলেন—"Stultify!"

মনে আছে, সব কাজকর্ম উৎসবাদি অন্তে রাস্তার ওপর সকল লোকের সামনেই স্বামীজী নবগোপালবাবুকে মাথা নুইয়ে নমস্কার করলেন। ঘোষজা সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়ে করজোড়ে বলে উঠলেন, "করেন কি, করেন কি?" এই বলে স্বামীজীর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হলেন।

২ 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এ (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১ম সং, ১৩৬৯ পৃঃ ৭০) বর্ণিত নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বিবরণের সঙ্গে বর্তমান বর্ণনার ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এর বিবরণই সঠিক। কারণ তা সংশ্লিষ্ট দিনের ডায়েরী থেকে লিখিত এবং বর্তমান স্মৃতিকথা ঘটনার সুদীর্ঘকাল পরে লিখিত।—সম্পাদক।

পশ্চিমে সর্বত্র সুবিখ্যাত বাবা কালী-কমলীওয়ালা কলকাতার বড়বাজারে এসেছেন। সারদা মহারাজের (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের) কথায় আমি তাঁকে শ্রীশ্রীমার বাগবাজারে ৩নং সরকার বাড়ি লেনের ভাড়াবাড়িতে রাখাল মহারাজ, যোগেন মহারাজের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে নিয়ে গেলাম। স্বামীজী তখন প্রথমবার পাশ্চাত্যে। রাখাল মহারাজ স্নান করছিলেন। তাড়াতাড়ি সেরে ওঁর সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, "ম্যয় আপকা ক্যা সেবা করু"—আপ ক্যা পাওয়েঙ্গে, মহারাজ।" উত্তর—"যো কুছ মিলেগা।"—ওখানেই ঠাকুরের প্রসাদ পেলেন। সঙ্গে একটি চেলা ছিল। তিনি নৈষ্ঠিক, আচারী ব্যক্তি। বললেন, "উসকো কুছ ফল দীজিয়ে। আপকে হাথকী রসুই উহ নহি খায়েগা।" কমলীবাবা তাঁর প্রতিষ্ঠিত সব ছত্রগুলো স্বামীজীকে দিতে ও স্বামীজীর তত্ত্বাবধানে সব চালাবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁর কতকগুলো শর্ত ছিল। আলমবাজার মঠ থেকে সেসব লিখে স্বামীজীকে গুরুভাইরা জানান। শর্তগুলো স্বামীজীর পছন্দ হলো না। তাই তিনি ছত্রগুলির ভার নিলেন না।

বেলুড় মঠ।—স্বামীজীর কয়েকটি খণ্ড খণ্ড স্মৃতিকণা। জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীর মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়াতে যা-তা করতেন। মঠের কোন সদস্য তাঁর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত খারাপ ব্যবহার করতেন। যখন তখন অপ্রয়োজনে দূর-ছাই করতেন। স্বামীজীর কানে তা এল। তিনি তখুনি তাঁকে খুব বকে দিলেন। বললেন, "মাথা খারাপ হয়েছে। তোদের পূজনীয় ও। আজ যদি আমার মাথা খারাপ হয়, তাহলে তুই দেখছি, আমার সঙ্গেও এইরকম করবি।"

কোন গুরুভাইয়ের বিধিগত পূজাদির ওপর অত্যধিক ঝোঁক দেখে তাঁকে একটু সামলে দেবার জন্য বলছেন, "ঘণ্টা-ফণ্টা থাক। কোথায় যাচ্ছিস পুজো করতে? রামকৃষ্ণ কি ঐখানেই আছেন বসে, যে তুই ওখানে পুজো করতে যাচ্ছিস? যা—পাড়ার গরিবদের ডেকে নিয়ে আয়। এদের সেবা করলেই তাঁর সেবা করা হবে।"

ঠাকুরঘরে দিনকতক ঘণ্টা বাজানো ঐ গুরুভাই ভয়ে ভয়ে বন্ধ রেখেছিলেন এবং স্বামীজীকে একরকম লুকিয়ে ঠাকুরপুজো করতে যেতেন। কারণ এধারে বহু লোকের কল্যাণের জন্যে ঠাকুরের সেবা-পুজো তো স্বামীজীই প্রবর্তন করেছিলেন। সেটা তো আবার বজায় রাখতে হবে!

পূর্বোক্ত কথাবার্তা যখন পরস্পরে চলছে সেই সময় রেদো নামে পরিচারকটি হঠাৎ গঙ্গায় শাক ধুতে যাচ্ছিল। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলছেন—"ঐ দ্যাখ—দ্যাখ। রামকৃষ্ণ যাচ্ছে!"

এই কথোপকথন শুনে নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে সংশয়াকুল এক ব্যক্তিকে স্বামীজী বললেন, "ওকে ও-কথা ওর ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্যে বললুম। তোদের পুজো-আচ্চা দরকার। তাতে তোদের কল্যাণই হবে। আমাকে আর এবিষয়ে কি জিজ্ঞাসা করছিস? এইবার তো সব নিজেই বুঝলি।"

বেলুড় মঠে জ্ঞান মহারাজের ঘরে তখন মঠের লাইব্রেরী। খান কয়েক লম্বা

টেবিল পাতা। আমি শুয়ে—টেবিলের ওপর। আজেবাজে কার সঙ্গে গল্পগুজব করছি। স্বামীজী উত্তর দিকের বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন। দরজার চৌকাঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। মুখে কোন দাবড়ি দিলেন না বা কোন কিছু অনুযোগ করলেন না। কিন্তু বকুনির চোদ্দপুরুষ ঐতেই হয়ে গেল। মনে হলো আমার অন্তরের সব কিছু পরীক্ষা করে নিচ্ছেন। আমি অযথা আড্ডা দিচ্ছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই অপরাধী মন নিয়ে ঐজন্য নিজেই অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে গেলাম। ভয়ে দিশেহারা। খানিকক্ষণ থেকেই স্বামীজী চলে গেলেন। এমন রাশভারি ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল যে, চাহনিমাত্রেই বারআনা কাজ সেরে নিতে পারতেন।

আর একবারের কথা, তখন রাত্রি আটটা-নটা হবে। খুব জল-ঝড় চলছে। একখানি চলতি নৌকো কলকাতা থেকে যাত্রী ভরে নিয়ে আসছে। বেলুড় মঠের ঘাটে অগত্যা ভিড়তে বাধ্য হলো। লোকগুলি গঙ্গার ঘাটেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। মঠের ভিতর যেতে সংকুচিত হচ্ছিলেন। স্বামীজী সেই সময় একতলায় বারান্দায় একখানি কৌচে বসেছিলেন। তিনি তাঁদের সবাইকে আপ্যায়িত করে ডেকে ওপরে বসালেন এবং আন্তরিকভাবে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা কইলেন। ঝড় থামলে খুশি হয়ে তাঁরা সবাই চলে গেলেন।

অর্ধরাত্রি! বেলুড় মঠের সকলে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়েছেন। গঙ্গার মাঝ থেকে হঠাৎ আর্তনাদ শোনা গেল—কে তারস্বরে কাকে ডাকছে—"কানাই, কানাই—ও কানাই! মা গঙ্গে বাঁচাও!"—কে যেন ডুবে যেতে যেতে কথাগুলো প্রাণের দায়ে বলছে। স্বামীজী ওপরে ছিলেন। তিনি ঐ শুনে তৎক্ষণাৎ বললেন, "দ্যাখ না রে, কে ভেসে যাচ্ছে।" কানাই মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় অনেকটা গেলেন। কিন্তু কিছু পাত্তা পেলেন না। স্বামীজী এই সময়ে বলেছিলেন, "দ্যাখ, এই যে লোক ডুবে যাচ্ছে। যে তাকে রক্ষা করবার জন্যে নিজের প্রাণ দিতে পারবে—তার আর কোন কিছুর দরকার নেই—তক্ষুণিই—মুক্তি।"

কুসুমকুমারী দেবী

'গোপালের মা'-র শিষ্যা। গোপালের মা-র পাদমূলে উপবিষ্টা নিবেদিতার যে সুপরিচিত ছবি আছে, তাতে পাখা হাতে মহিলাই কুসুমকুমারী দেবী।

আমার বয়স তখন তের মাত্র। শ্বশুরবাড়ি পানিহাটি। রাঘব পণ্ডিতের চিঁড়ার মহোৎসব দেখতে ঠাকুর গৌরাঙ্গের মতো পথঘাট আলো করে প্রাণ মাতিয়ে কীর্তন করতে করতে যাচ্ছেন। আমি সেকালের ঘরের কনে-বৌ। ভাল করে দর্শন ঘটল না। ঐ দূর থেকে আবছা আবছা। সে খেদ পূর্ণ করলেন স্বামীজী। আমাদের কলকাতায়

বাপের বাড়িতে স্বামীজী অনেকবার এসেছেন। আমাদের বাড়িতে কয়েকবার আপনার লোকের মতো খেয়েছেন। কলায়ের ডাল ও কৈ মাছের ঝাল পছন্দ করেছিলেন, মনে আছে। আমার পিসতুতো বোন ভাবিনী দেবী। সে তখন আমাদের বাড়িতে থাকত। সে খুব ভাল রাঁধতে পারত। ভাগ্য খুব, ঠাকুর ওর রান্না খেয়ে খুশি হয়েছিলেন। আমাদের দুজনেরই তখন কন্যা-বিয়োগে মন কাতর। তিনি সান্ত্বনা দিলেন। বাংলা যোগবাসিষ্ঠ পড়তে বললেন। সংসারটা খেলা মাত্র—এই বোধ আনবার চেষ্টা করতে বললেন। আমরা দুজনে বিধবা তখনই। নির্জলা একাদশী সইবে না, অল্প কিছু শরবত, ডাব, মিষ্টান্ন ঠাকুরকে নিবেদন করে খেতে বললেন।

তাঁর শরীর খারাপ। বেলুড়ে আমরা কয়েকজন মেয়ে তাঁকে দেখতে গেছি। তিনি নিজে কথা কইলেন না বেশি। শিবানন্দ স্বামীর সঙ্গে আলাপ করতে বললেন। আমাদের খেতে বেলা হয়েছিল। একটু হাতে প্রসাদ পেয়েই চলে আসার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিবানন্দ মহারাজ ও স্বামীজীর অনুরোধে আমাদের ঠাকুরের অন্নপ্রসাদ বসে পেয়ে আসতে হলো। এর জন্য সন্ন্যাসীদের আবার চালে ডালে চড়াতে হলো, তাও বুঝলাম। স্বামীজী নৌকা পর্যন্ত এসে আমাদের বিদায় দিলেন। বললেন, "এর পর যখন আসবে, আগের দিন একখানা পোস্টকার্ড লিখে জানালে প্রসাদ প্রস্তুত থাকবে।" জানতাম না যে, সে-ই আমাদের শেষ দর্শন।

কেদারবদরী যাবার ইচ্ছা তাঁর জীবদ্দশাতেই আমার ছিল। তাঁকে জানানোতে তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিলেন। বললেন, "খুব ভাল। মন ভাল হবে।" কিন্তু তিনি থাকতে থাকতে আর আমার যাওয়া ঘটে উঠল না। হঠাৎ তাঁর দেহান্ত হলো।

এর আগে কাশীতে গোপাললাল ভিলাতে তাঁর কাছে গেছি। আমরা ভাগ্যযোগে তখন কাশীতে রয়েছি। তিনি ঐ বাগানের গাছের ফুল ছিঁড়তে বারণ করলেন। দেখা হবার আগে কয়েকটি ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। বললেন, "গাছেই যে পুজো হয়ে থাকে। ছিঁড়লে কেন ?"

আমরা সেই দলে কয়েকটি বিধবা ছিলাম। তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছে। কে কি কাজ করে দিন কাটায়, প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করলেন। সকলেই একে একে নিজ নিজ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করলেন। শেষে তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, "কাশী তো ঘুমিয়ে রয়েছে। শিবও ঘুমোচ্ছেন। তোমরা সাধনার দ্বারা তাঁকে জাগাও। কাশীনাথকে জাগাও। ফুল-চন্দন দিয়ে ঠাকুর পুজো ছাড়। গু-মুত পরিষ্কার করে এইবার ঠাকুরসেবায় লাগ দেখি, নতুন ঢঙে।" রোগীর সেবায় নারায়ণ-পুজোর ভাবটি আমি তাঁরই কৃপায় জীবনে কার্যে যথাসাধ্য পালন করে এসেছি।

নরেশচন্দ্র ঘোষ

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল বাবা-মা বা অভিভাবকেরা যেসব ছেলেকে স্বেচ্ছায় শিক্ষার জন্য বেলুড় মঠে পাঠাবেন অথবা যেসব ছেলে অনাথ তারা মঠে গৃহীত ও শিক্ষিত হবে। অবশ্য মঠের অংগ হতে পারবে না। শিক্ষা সমাপ্তির পর বিবাহ করা বা না করা ছেলেদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন থাকবে। জীবদ্দশায় স্বামীজী এটি বেলুড় মঠে কাজে পরিণত করে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে চার-পাঁচটি ছেলেকে ঐভাবে শিক্ষা দেবেন বলে গ্রহণ করেন। তারা মঠে থাকত এবং লৌকিক শিক্ষার জন্য বালী বা কলকাতার বিদ্যালয়ে যেত। বর্তমান স্মৃতিকথাটি সেই চার-পাঁচ জনের অন্যতম নরেশচন্দ্র ঘোষের। তিনি স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য প্রত্যাবর্তন (রাত্রি ১০টা—৯ ডিসেম্বর, ১৯০০) থেকে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুলাই (যে রাত্রে স্বামীজী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন) পর্যন্ত বেলুড় মঠ, বুদ্ধগয়া, কাশী এবং শেষে আবার বেলুড় মঠে তাঁর সংগে কাটান। নরেশচন্দ্রের ডাক নাম ছিল 'গৌর'। এই গৌর এবং বলরাম-ভ্রাতুষ্পুত্র নিতাই (নিত্যানন্দ বসু) হরিহর-আত্মা। গৌর বাবার একমাত্র পুত্র। কিন্তু নিজের পৈতৃক বাড়ি অন্যকে দিয়ে দেন, আজীবন অকৃতদার থাকেন। বলরাম-আবাসের বারবাড়ির দোতলায় সারা জীবন কাটিয়েছিলেন বাড়ির লোকের মতোই। ইনি শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য, স্বামীজী কাশীতে এঁকে ইষ্টের মানস পূজাপদ্ধতি দেন। উপবীত দেন আগেই। এঁর দিদির নাম মেনী, স্বামীজীর শিষ্যা। এঁর মা—'মেনীর মা'—শ্রীমায়ের সেবিকা। বলরাম-আবাসে মা থাকলে তাঁর কেশবিন্যাস মেনীর মা-ই করতেন।

বেলুড়ে স্বামীজীর সংগে আছি। স্কুলে পড়ি আর যথাসাধ্য তাঁর খিদমৎ খাটি। ভালবাসা পাই বিপুল। পিলে-চমকানো বকুনিও মাঝে মাঝে জোটে। কিন্তু পরে খাবার-দাবার, যত্ন-আত্তিতে সব ভুল হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণ শেষ করে ভগ্নদেহ নিয়ে স্বামীজী ফিরেছেন। আমরা খুব ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আশেপাশে ঘোরাফেরা করেছি। কে জানত তখন যে তনুত্যাগের দিন ঘনায়মান। মহাযাত্রার দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, ততই তিনি যেন অলক্ষ্যে অপার স্নেহে আমাদের অন্তর প্লাবিত করতে লাগলেন। সেই সর্বগুণাকর, দয়ার সাগর দয়া করে কাছে রেখেছিলেন। অন্য কাউকে আর তাঁর চেয়ে বড়, তাঁর চেয়ে ভাল বলে কখনো চোখে লাগেনি। জ্ঞানী বলেন, কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, অগ্নি তার ক্রিয়া করবেই। অল্পবুদ্ধি আমি, সব কিছু তো বুঝি না।

একদিন জ্ঞান মহারাজের ঘরের কাছে ঝাঁটা হাতে নালা সাফ করছেন স্বয়ং তিনি। আমাকে একটা ঝারি থেকে জল ঢেলে দিতে বলেছেন। দিতে দিতে অন্যমনস্ক হয়েছি। যেই ওরূপ হওয়া, সংগে সংগে এমন ভীষণ আওয়াজে বকুনি ঝাড়লেন যে,

অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে আসবার জোগাড়।—"বলি মনটা কোথায় ?"—বলে বকুনি দিলেন। আমি একেবারে ভয়ে জড়সড়। তারপর জলঢালাটা ঠিক হতে লাগল। পরক্ষণেই অন্যমূর্তি। পুরোপুরি প্রেমের মূর্তি। তিনি নিজেই একেবারে জল। দুটো পার্ট প্লে হয়ে গেল। অপার স্নেহের সুরে বলতে লাগলেন—যেন নিজেই কুণ্ঠিত, "বাবা, আর একটু জল দে তো।" পরপর তাঁর এই দুই মূর্তি আজও আমার বুকের মাঝে সুস্পষ্ট আঁক কেটে রেখেছে। প্রত্যেক ছোট ছোট কাজের মধ্যেও আমাদের সম্পূর্ণ নিখুঁত করে তোয়ের করবার অপূর্ব শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর ছিল। একটা বাহ্যিক রাগ মাত্র দেখাতেন, যখন দরকার বোধ করতেন। যত দিন যাচ্ছে বুঝছি।

বেলুড় মঠে সেই প্রথম দুর্গোৎসব। স্বয়ং তাঁর তত্ত্বাবধানে। শ্রীমা উপস্থিত। স্বামীজীর গর্ভধারিণী, ভগিনী ও দিদিমা মঠে এসেছিলেন। তাঁদের নিয়ে সমস্ত মঠ স্বামীজী নিজে ঘুরেফিরে দেখালেন। সঙ্গে আমি ছিলুম। পরে স্বামীজীরও জ্বর, আমারও জ্বর। আমি বেজায় বেহুঁশ। নিবেদিতা, ম্যাকলাউড ওঁর পরিচর্যা করতে ওঁর বিছানার কাছে গিছলেন। তিনি সাফ বলেছিলেন, "সকলে মিলে আমার কাছে ভিড় করা অনর্থক। আমাকে দেখবার অনেক লোক আছে। ও ছোঁড়াটা যে একধারে একা কাতরাচ্ছে, ওর মাথায় গায়ে তোমরা হাত বুলিয়ে দাও গে।" পুজো উপলক্ষে নলদময়ন্তী পালা অভিনয় হয়েছিল। আমার রোগের দরুন কিছুই দেখা হলো না। অসুখের ঘোরে খালি দেখলাম মেয়েরা সযত্নে মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। স্বামীজীর আদেশ।

বরানগর থেকে স্বামীজীর জন্য পানীয় কলের জল আনতে হরিপদ মহারাজ যেতেন। স্বামীজীর প্রিয় কুকুর বাঘা একদিন পুজোর জল নষ্ট করে দেওয়াতে স্বামীজী হরিপদ মহারাজকে আদেশ দিলেন, "বাঘাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দাও।" ওপারে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবার হুকুম। তথাস্তু। কিছুক্ষণ পরে সেইদিনই খেয়া নৌকার উপর সহসা বাঘা এসে জমিয়ে বসল। মাঝিরা তাকে মঠের কুকুর বলে চিনত। তারা নির্বিবাদে তাকে পার করে দিলে। বাঘা নাচতে নাচতে স্বামীজীর কাছে গিয়ে হাজির। তিনি তো দেখেই চটে লাল। হরিপদ মহারাজের ডাক পড়ল। সত্যি তাকে ওপারে বিদায় করা হয়েছিল কিনা জানলেন। মাঝিদের সাহায্যে সে ফিরে এসেছে তাও জানলেন। আবার আজ্ঞা দিলেন, ফের ঐভাবে ওপারে দিয়ে আসতে। বললেন, মাঝিদেরও যেন সঙ্গে সঙ্গে বলে দেওয়া হয়, তাকে ফিরিয়ে আনতে নিষেধ আছে।

বাঘা কিন্তু নাছোড়বান্দা। দ্বিতীয়বার একপ্রকার জোর করেই সে নৌকায় চেপে জমি নিলে। কিছুতেই নামবে না। লাঠির ভয়েও দমল না। ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। মাঝি বেচারিরা আর কি করবে। ফের নাচতে নাচতে বাঘা মঠে উপস্থিত। স্বামীজী দেখে হেসে ফেললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার কি ব্যাপার ?" শেষে বললেন, "আর তাড়াতে হবে না, যা।"

একদিন অন্ধকারে স্বামীজী বাঘার ওপর পা দিয়েছিলেন। বুঝতে পারেননি। বললেন, "একটা বালিশ না কি পড়ে আছে দেখ তো।" আশ্চর্য, বাঘা ওঁকে কিছুই বলেনি। অন্যলোক ওরূপ করলে নির্ঘাত কামড়াত। খোকা মহারাজ এক রাত্তিরে বাঘাকে মেরেছিলেন। সেকথা স্বামীজীকে জানাবার জন্য বাঘা পরদিন ভোরেই ঠাকুরঘরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে সটান স্বামীজীর কাছে উপস্থিত। স্বামীজীর পা ধরে আঁচড়-কামড় করতে লাগল। উনি তখন খোঁজ নিলেন কি ব্যাপার। খোকা মহারাজ বৃত্তান্ত বললেন।[১]

একদিন রাত্তির প্রায় দেড়টার সময় স্বামীজী নেদাকে (নাদু—স্বামীজীর ভাগ্নে) ও আমাকে ডাকলেন, "ওরে ওঠ, ওঠ। দেখ্, ভেড়ার বাচ্চাটা চেঁচাচ্ছে। চোর-টোর ঢুকল নাকি?" ওকাকুরা যেসব জাপানী ভোজালি দিয়েছিলেন, তারই দু-একখানা হাতে নিতে বললেন। নেদা ও আমি তৎক্ষণাৎ লণ্ঠন হাতে ঐভাবে গোয়ালঘরের দিকে ছুটলাম। গিয়ে দেখা গেল—বাচ্চার চিৎকার ঠিকই। তার মা সরে যাওয়াতে বাচ্চা চেঁচিয়েছিল মাত্র।

গোবিন্দবাবু নামে তাঁর একজন বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্য কাছের গ্রাম থেকে বেলুড়ে প্রায়ই আসতেন। তিনি ব্রাহ্মণ। স্বামীজীর সেবার জন্য জিনিসপত্তর অনেক আনতেন। তাঁর সঙ্গে মাটির গড়গড়ায় তামাক খাওয়া নিয়ে স্বামীজী কত বালকবৎ রগড় করতেন। শুনতে শুনতে হেসে পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হতো। তামাক খাবার ইচ্ছা হলে বলতেন, "ওহে, একটু নেড়ে বাঁধো।" (অর্থাৎ পল্লীতে গরু যেমন বিভিন্ন খোঁটায় বাঁধে—তেমনি)। আবার গম্ভীর হলে কার বাপের সাধ্যি এগোয়।

কোন পাশ্চাত্য-মোহগ্রস্ত ব্যক্তির চমক ভাঙাবার জন্য নিবেদিতাকে সকলের সামনে বললেন, "যাও, আমার জন্য এক ছিলিম তামাক সেজে আন।" পরে ঐ লোক চলে গেলে বললেন, "ইচ্ছে করেই করলুম। এদের চৈতন্য আনা দরকার।"

একদিন ভোরে বেলুড়েই তাঁর জনৈক সন্ন্যাসী-সন্তান ঠাকুরঘরে যাচ্ছেন। রাখাল মহারাজ এক ছিলিম তামাক সেজে দিতে তাঁকে বললেন। তিনি সটান বললেন, "আমি এখন ঠাকুরঘরে যাচ্ছি।" স্বামীজী দোতলা থেকে নামতে নামতে শুনতে পেলেন। সজোরে বললেন, "হতভাগা! রাজাকে এক ছিলিম তামাক দিলে তোর লক্ষ জপের ফল হবে। এক্ষুণি দিয়ে তবে যা।"

১ গ্রহণের দিন বাঘা গ্রহণ লাগার অল্প পরেই গঙ্গাস্নান করত। তারপর গ্রহণ ছাড়তে সকলের আগে মুক্তি স্নান করে নিত। যত সাহেব-সুবো মঠে আসত, বাঘাই তাদের অগ্রগামী হয়ে স্বামীজীর কাছে নিয়ে আসত। তখন গেস্ট হাউস হয়নি। সাহেবরা ক্যাম্প ফেলে থাকত। বাঘাই ছিল তাদের দিনরাতের পাহারাদার। মারা যাবার পর তার শরীর গঙ্গায় জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল। পরে দেখা গেল ভাঁটার টানে আবার মঠের ঘাটের কাছে ফিরে এসেছে। তখন মঠের ধারে গঙ্গাতীরে তাকে সমাধি দেওয়া হলো।

বেলুড় মঠের মাঠে সাঁওতাল কেষ্টার সঙ্গে মশগুল হয়ে স্বামীজী তার সুখ-দুঃখের কথা শুনছেন, আলাপ করতে করতে মেতে গেছেন। কোথাকার দেওয়ান না কোন রাজার সেক্রেটারি দেখা করতে ঐ সময়ে এসেছেন। জানান হলো। পরিষ্কার বললেন, "বল গে—তিনি এখন ব্যস্ত। আজ দেখা হবে না।"

স্বামীজীর দলের সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় চলেছি। কি অপরিসীম আনন্দ যে হচ্ছে তা ব্যক্ত করা যায় না। জাপান থেকে ওকাকুরা এসেছেন—তাঁকে নিয়ে বুদ্ধগয়া দেখাতে স্বামীজী যাচ্ছেন। মিস ম্যাকলাউডও সঙ্গে। কানাই মহারাজ (স্বামী নির্ভয়ানন্দ, স্বামীজীর শিষ্য) প্রধান সেবক।[২] তাঁর সহায়কারী—নেদা (নাদু) ও আমি। হাওড়া থেকে তখন গয়া যেতে হলে বাঁকিপুরে গাড়ি বদল করতে হতো। ভোরে বাঁকিপুর এল। সঙ্গে সঙ্গে গয়া যাবার গাড়ি। দুই তিন ঘণ্টার পর গয়া পৌঁছানো গেল। ওকাকুরার কাছে তদানীন্তন লাট সাহেব লর্ড কার্জনের একখানি পরিচয়পত্র ছিল। আগে থেকেই তার (Telegraph) করা হয়েছিল। তাই এই দলটিকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য সরকারি মহল, ঐ পত্রের জন্যই প্রস্তুত ছিলেন। উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁরা দলটিকে যথাযথ অভিবাদন জানালেন। সবাই মিলে ডাকবাংলোতে ওঠা গেল। সঙ্গে পাহারা মোতায়েন। দুই দিন ডাকবাংলোতে সবার থাকা হলো। ম্যাকলাউড ও ওকাকুরার জন্য বাবুর্চির ব্যবস্থা, স্বামীজীর জন্য তাঁর প্রিয় খাদ্যগুলি প্রস্তুত করলেন কানাই মহারাজ। তাঁর পেট বুঝে আয়োজন হলো। নিরামিষ ঝোল হয়েছিল, বেশ মনে আছে। স্বামীজী সকলের খাওয়াদাওয়া তদারক করলেন। তখন রোগের দরুন তাঁর নিজের খাওয়া অত্যন্ত কমে গিয়েছিল।

স্বামীজী বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করলেন। তারপর চা-পানাদি শেষ হলে ঘোড়ার গাড়ি করে সকালবেলা বুদ্ধগয়া যাত্রা হলো। সেখানে দশটা এগারটায় পৌঁছানো গেল। মোহন্ত মহারাজের বাড়ির সামনেই ফটক। সেইখানে গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল। সে সময় (জানুয়ারি ১৯০২) যিনি বুদ্ধগয়া দশনামী মঠের অধীশ—তিনি বয়সে তরুণ ছিলেন--আন্দাজ আঠাশ-ত্রিশ। নাম—কৃষ্ণদয়াল গিরি, নেপালের লোক। শিষ্যদের নিয়ে তিনি স্বামীজীকে সুস্বাগতম জানাবার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। আগে থেকে খবর

---

২ স্বামী নির্লেপানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত স্বামী নির্ভয়ানন্দের স্বামীজীর স্মৃতিকথা : "ভুরুর উপর একটা দাগ ছিল। বড় শান্তশিষ্ট ছেলে ছিলেন কিনা! বেশ নাচতে পারতেন। বেলুড় মঠে তাঁর ঘরে সাহেবি নাচ আমাকে দেখিয়েছিলেন। নানা রকম নাচ। আর একবার খোল করতালের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে তাঁকে যেতে দেখেছি রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে, যেদিন তিনি সেখানে স্বয়ং ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করলেন। ছেলে একেবারে স্কোয়ার ছিলেন।"

দেওয়া ছিল। স্বামীজীও তখন বয়সে তরুণ। মনে পড়ে ওখানকার মোহন্ত মহারাজের খুব সুন্দর চেহারা। ধবধবে রং। কৌপিন বহির্বাস। হিন্দুস্থানের সাধুরা যেরূপ গাঁতি দিয়ে, পিঠে গেরো লাগিয়ে কাপড় পরেন—সেইরূপ পরা। পায়ে খড়ম। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। বিনয়ের মধুর মূর্তি। নামামাত্রই স্বয়ং মোহন্ত মহারাজ স্বামীজীকে প্রণাম করলেন এবং সমস্ত দলটি সঙ্গে নিয়ে ভিতরে চললেন। আগে স্বামীজী—পশ্চাতে ম্যাকলাউড ও ওকাকুরা এবং বাকি সেবকবৃন্দ। ওপরে নিজের গদির কাছে সকলকে নিয়ে গেলেন। মহৎ-ই মহতের সেবা করতে জানেন, দেখা গেল। স্বামীজীকে গদিতে বসালেন। ম্যাকলাউড ও ওকাকুরা স্বামীজীর পাশে গদির ওপরই বসলেন। মোহন্ত কোনই আপত্তি করলেন না। নিজে নিচে হাতজোড় করে স্বামীজীর পায়ের কাছে বসে রইলেন। স্বামীজীর তখন পাঞ্জাবি গায়ে, গেরুয়া বহির্বাস, মোজা-জুতো কান-ঢাকা টুপি। মোহন্ত বলতে লাগলেন বার বার, "ধন্য আমি—অহো, ভাগ্য আমার!"

স্বামীজীর থাকবার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে চমৎকারই হলো। আলাদা একটা বাড়ি। মোহন্ত চেলাদের বলে দিলেন, যখনই যা দরকার যেন তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। বুদ্ধগয়ার মঠের অভাবও কিছু ছিল না। এই প্রকাণ্ড বাড়িটি গার্ড দেবার জন্য দুজন সরকারি প্রহরী নিযুক্ত থাকত। বাড়িটায় অন্ততঃ ৪০-৫০টা ঘর ছিল। দোতলায় একটি প্রকাণ্ড হল। হলেতেই স্বামীজী রইলেন। ম্যাকলাউডের আলাদা বাসস্থান। ওকাকুরারও আলাদা আড্ডা ঠিক হলো। এক বাড়িতেই।

দশ পনর মিনিটের ভেতরই বড় বড় থালায় সিধে এল। চাল, ডাল, নুন, ঘি, মসলাপাতি। আমাদের সঙ্গে একটি পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। ম্যাকলাউড সেদ্ধ জিনিস সব খেতেন। প্রত্যহ একথালা কমলালেবু, বিভিন্ন রকমের মেওয়া, বাদাম পেস্তা ইত্যাদি আসত।

মোহন্ত মহারাজ রোজ সকালে, কোন কোন দিন বিকালে প্রায় ঘণ্টা দুই স্বামীজীর সঙ্গে অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ, ধর্মালোচনা করতেন। হিন্দীতেই আলোচনা চলতো। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক অনর্গল বলতেন। স্বামীজী দেখেশুনে আলাপ করে পরে বলেছিলেন, "খুব পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, অতি সৎ, অতি মহৎ ব্যক্তি। সচরাচর এমন দেখা যায় না। যথার্থ সাধু দেখা গেল।" এই সব প্রসঙ্গে দুজনেরই ভরপুর আনন্দ। আলোচনার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে রস উপলব্ধি করার সাধ্য আমার ছিল না। বাইরের আবহাওয়াটাই দেখে যেতাম। মোহন্ত দীনভাবে সর্বক্ষণই স্বামীজীর পায়ের কাছে বসে থাকতেন। আর সর্বদা লক্ষ্য ছিল, যেন কোনমতে সেবার ত্রুটি না হয়।

বুদ্ধগয়ার এই মোহন্তের ত্যাগের খুব প্রশংসা স্বামীজী করতেন। শতমুখে সুখ্যাতি। সেই মঠে দেখলাম রোজ বিকালে একশ দেড়শ বলদে কাঠ বয়ে আনছে। তাই থেকে সাধুদের ধুনা ও রান্নার ব্যবস্থা হতো। বিরাট জমিদারি। বললেন, "দেখ দেখি, কেমন বিপুল সম্পত্তিতে এঁকে একেবারেই বাঁধতে পারেনি—গোলাম

বানাতে পারেনি।" প্রায় ৫০-৬০ জন সাধু ওঁর বাড়িতে নিত্য তখন থাকতেন দেখলাম। প্রত্যেকের খোঁজ নিতেন। সেবা হয়েছে কিনা, ঠিকমতো সিধে পেয়েছেন কিনা। তারপর নিজে আহার করতে যেতেন। একবেলা হবিষ্য আহার করতেন।

একদিন কতকগুলি বর্মী স্ত্রী-পুরুষ বৌদ্ধযাত্রী এলেন। আমাদের বাড়িটিতেই রাত্রিবাসের উপায় হতে পারে কিনা মোহন্তকে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন। সাধারণতঃ আমাদের নির্দিষ্ট ডেরাটিই তখন যাত্রীনিবাসরূপে ব্যবহৃত হতো, বুঝলাম। মোহন্ত বিনয়ের প্রতিমূর্তি ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "আমি স্বামীজীকে সমস্ত বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি। উনি অনুমতি দিলে তোমরা থাকতে পার অনায়াসে। বাড়ি এখন ওঁরই।" স্বামীজী তখনই সম্মতি দিলেন।

সেই সময় বুদ্ধগয়ার ডাকবাংলোতে একটি বাঙালী ভদ্রলোক কয়েকদিন ছিলেন। তিনিও প্রত্যহ স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তিনি স্বামীজীর প্রতি অত্যন্ত ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন। প্রত্যহ এক কলসি তালের রস ও এক কলসি খেজুর রস পাঠাতেন। ওকাকুরাকে স্বামীজী তালের রস খাওয়াতে বলতেন। আমরা সবাই খেজুর রস খেতাম। ওকাকুরার নেশা হতো। ওকে নিয়ে রগড় করতেন খুব। ঠাট্টা-তামাশা করতেন এবং বলতেন, "এই আমাদের দেশের পল্লীলব্ধ মদ।"

স্বামীজী মাথা থেকে সব নতুন নতুন উদ্ভাবন করতেন। বলতেন, "অত খেজুর রস আসে, নষ্ট হয়, এক কাজ কর—আজ খেজুর রসের জলে ভাত রাঁধ।" সেইভাবে রান্না হলো। উনিও দুটি খেলেন। আমাদের পাঁচজনকে খাওয়াবেন বলে এক একদিন এক এক রকম বাজার থেকে জিনিসপত্তর আনিয়ে রাঁধাতেন। তিনি নিজে পাকা রাঁধুনী ছিলেন। কোনটার পর কোনটা দিতে হবে, সব বলে দিতেন।

সাত-আটদিন বুদ্ধগয়ায় থাকা হলো। স্বামীজী প্রত্যহ মন্দিরে যেতেন। আমাদের সকলকে প্রত্যেক প্রস্তর-মূর্তির ভাব, শিল্পনৈপুণ্য সব বুঝিয়ে দিতেন। মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি ঘরে জাপানী বুদ্ধ-মূর্তি ছিল। সেটি অবিকল স্বামীজীর বসা-চেহারার মতো লাগল। মনে হলো বুদ্ধের মতোই যেন একজন স্বয়ং পাথরের সুন্দর আর একটি নিস্পন্দ বুদ্ধকে দেখাচ্ছেন।

তারপর একদিন কয়েক মাইল দূরে বৌদ্ধ গুহাগুলি দেখতে যাওয়া হলো। স্বামীজী ডাণ্ডিতে; ম্যাকলাউড, ওকাকুরা ও আমি হাতিতে; নাদু ও কানাই মহারাজ বোধহয় ঘোড়ায়। তিনরকমই যান ছিল। লোক-লস্কর সব সেখানে মোতায়েন। চা ইত্যাদির ব্যবস্থা সব ঠিক। শরবত ফল মিষ্টান্ন সব একটু একটু খাওয়া হলো। স্বামীজী বিশ্রাম করে গুহা দেখতে উপরে পাহাড়ে উঠলেন। তিন-চারটি গুহা খুব সুন্দর। ভিতরে দেওয়ালের গায়েও বেশ চমৎকার সব খোদিত মূর্তি। প্রাচীনকালে সাধুরা সেখানে ধ্যান-ধারণা করতেন। সব দেখেশুনে সন্ধ্যা নাগাদ ফেরা হলো।

স্বামীজীকে তখন বহুমূত্র রোগে ধরেছে। খুব সাবধানে থাকতে হয়। প্রকৃতির নিয়মে পালোয়ানও কাবু হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁকে এই কয়দিন বেলুড় মঠের বাইরে

দেখলাম, পুরোদস্তুর বালকের মতো সদা হাস্যমুখ—আনন্দে বিভোর। মুখ-চোখ দেখলে রোগের চিহ্নমাত্র বোধ হতো না। ছোট জাগুলিয়া[৩] গ্রামে তাঁর বোনের[৪]

৩ ছোট জাগুলিয়া নয়—বড় জাগুলিয়া (নদীয়া জেলা)।

৪ আপন বোন নন—দূরসম্পর্কিত বোন এবং মন্ত্রশিষ্যা—মৃণালিনী বসু। বড় জাগুলিয়া গ্রামের জমিদার সর্বেশ্বর সিংহের কন্যা মৃণালিনী দেবী বাপের বাড়িতে থাকতেন। সেখানেই স্বামী বিবেকানন্দ দেহান্তের মাসখানেক আগে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৬ জুন যান এবং ১২ জুন মঠে ফিরে আসেন (স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিনলিপি)। সর্বেশ্বর সিংহের বাড়িতে প্রস্তরফলকে অবশ্য স্বামীজী ১৯০২-এর মে মাসে যান এবং ৬/৭ দিন থাকেন বলে লেখা আছে। এগার বছর বয়সে মৃণালিনী দেবীর বিবাহ হয়। তাঁর পুত্র বিষাদ বসুর যখন দু-বছর বয়স তখন তাঁর স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি থেকে চলে যান। স্বামীর নাম বেণীমাধব বসু। বেণীমাধব বসু কলকাতার বাগবাজারের বিখ্যাত বসু পরিবারের কালীকৃষ্ণ বসুর পুত্র। মৃণালিনী দেবী স্বামীর গৃহত্যাগের পর শ্বশুরবাড়িতে কিছুদিন থাকেন। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার হতে থাকায় তাঁর বাবা তাঁকে বড় জাগুলিয়াতে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। সর্বেশ্বর সিংহের একমাত্র পুত্র যক্ষ্মারোগে মারা যায়। পুত্রের মৃত্যু, জামাতার সন্ন্যাসী হওয়া এবং কন্যার শ্বশুরবাড়ির ব্যবহার তাঁকে মানসিক দিক থেকে খুবই আঘাত করে এবং তিনি মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর একমাত্র উত্তরাধিকারী মৃণালিনী দেবীই বাবার জমিদারি দেখাশোনা করতেন। তাঁর একমাত্র পুত্র বিষাদ বসু কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে পড়াশুনো করতেন। বড় জাগুলিয়ায় সর্বেশ্বর সিংহের বাড়ি অধুনা 'বিষাদ বসুর বাড়ি' বলেই পরিচিত।

বিষাদ বসুর কন্যা কাঁচড়াপাড়া নিবাসী কাঞ্চনমালা পালিত (যিনি শৈশবে পিতামহী মৃণালিনী বসুকে দেখেছেন এবং তাঁর স্নেহধন্যা ছিলেন) জানিয়েছেন: "ঠাকুমার কাছে শুনেছি স্বামীজী ট্রেনে কাঁচড়াপাড়া এসে সেখান থেকে গরুর গাড়ি করে বড় জাগুলিয়া আসেন। মৃণালিনী বসুকে দেওয়া স্বামীজীর একটি ফটো আজও বড় জাগুলিয়ার বাড়িতে রক্ষিত আছে। স্বামীজী সপ্তাহখানেক ওখানে থাকাকালীন দেখেছিলেন ছেলে (বিষাদ বসু) না পড়লে মৃণালিনী দেবী তাকে মারধর করতেন। তাতে স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, 'শিশুদের ইচ্ছামত পড়তে দিতে হয়। তবেই তারা পড়ার প্রতি আগ্রহী হবে। শিশুকে জোর করা বা কঠোর ভর্ৎসনা বা মারধর করা কখনোই উচিত নয়। শিশুমন তাতে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং পড়াশুনোকে সে ভীতির চক্ষে দেখতে থাকে।' শিশু স্বামীজীর সঙ্গে নিঃসংকোচে মিশত, স্বামীজী যেন তার খেলার সাথী। স্বামীজীও তখন যেন আরেকটি শিশু হয়ে যেতেন। যে কদিন ওখানে ছিলেন হৈ চৈ আনন্দে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিলেন স্বামীজী। স্বামীজীর সঙ্গে আরও দুজন সাধু বড় জাগুলিয়ায় এসেছিলেন।" [বড় জাগুলিয়া উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের (রাজলক্ষ্মী কন্যা বিদ্যাপীঠের) প্রধান শিক্ষিকা রেখা দে-র সৌজন্যে প্রাপ্ত।] এই সাধু দুজনের নাম কাঞ্চনমালা দেবী জানেন না। স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিনলিপি অনুসারে এঁরা হলেন কানাই মহারাজ (স্বামীজীর শিষ্য স্বামী নির্ভয়ানন্দ) এবং নাদু মহারাজ (স্বামীজীর ভাগ্নে)। 'পত্রাবলী'তে মৃণালিনী দেবীকে লেখা 'মা' সম্বোধনে স্বামীজীর দুটি চিঠি প্রকাশিত

বাড়ি এবং বর্ধমানের ভেঁটে গ্রামেও তাঁকে এইরূপ দেখেছি। এটা-সেটা অনবরত পাঁচজনকে খাওয়াচ্ছেন।

নানারকমের রাঁধাবাড়া করে স্বহস্তে তিনি সকলকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। নিরামিষ-আমিষ হরেক রান্না জানতেন—দেশেবিদেশে বেড়িয়ে শিখে নেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর প্রচুর। নিরামিষ ঝোল, যাকে আমরা চলিত কথায় 'ঝালের ঝোল' বলি, নতুনভাবে রাঁধতেন। মসুর, মুগ বা অড়হর ডাল খুব পাতলা করে সেদ্ধ করে নিয়ে যে ক্বাথটা হতো তাই দিয়ে ঝালের ঝোল তিনি তোয়ের করে খাইয়েছেন। সুন্দর আস্বাদ হতো।

আবার একবার বেলুড়ে খাইয়েছিলেন মনে আছে—চালের গুঁড়ো দিয়ে তোয়ের করা সরুচাকলি জাতীয় জিনিস। 'প্যান'টা ধরে এমন একটা হাতের কায়দায় জিনিসটা উলটে দিয়ে ভাজতেন—হাওয়ায় দু-তিনটে পাক খেয়ে সেটা আবার প্যানের ওপর পড়ত। ওর সংগে পাতলা মিছরির রস দিয়ে খেতে হতো। পুরনো ঠাকুরঘরে ওঠবার সিঁড়ির নিচে বসে তোলা উনুনে ভাজছেন ও সংগে সংগে খাওয়াচ্ছেন। এখনো যেন মুখে লেগে রয়েছে।

তিনি বরাবরই অন্ধকার থাকতে ভোরে উঠতেন। নিজেই কামাতেন। এতে দক্ষ ছিলেন যে বিনা আয়নাতেই কামাতে পারতেন। আমেরিকায় একবার এক দোকানে কামাতে গেলে তারা তাড়িয়ে দেয়। কালা আদমী ঢুকলে 'আমাদের খদ্দের হবে না'—এই অজুহাত। তিনি বলতেন, "সেই থেকে নিজে কামাতে শুরু করেছি।" শেষের দিকে একদিন অন্তর কামাতেন।

পাশ্চাত্য থেকে যখন দ্বিতীয়বার ফিরে এলেন, তখন থেকেই তাঁর শরীরে ভাঙন ধরেছিল। গায়ের বর্ণ পূর্বের অনুপাতে নীরেস হতে আরম্ভ হলো। কিন্তু অনুপম ব্যক্তিত্ব কোথা যাবে? যখন যেখানে বসছেন সেই জায়গাই জমজমাট হয়ে উঠছে। বিরাট পুরুষোত্তম—সর্বত্র অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করছেন। অত মান-যশের ভিতরও সেই চিরশিশু।

শেষ তীর্থ শ্রীকাশী। তীর্থের সার। মোক্ষক্ষেত্র। গয়া থেকে কাশী যাওয়া হলো। ম্যাকলাউড কলকাতা ফিরে গেলেন। আমাদের সংগে যে ওড়িয়া পাচক ব্রাহ্মণটি ছিল—তার নাম কৃপাসিন্ধু। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে ট্রেনে চাপা গেল। স্বামীজী ও ওকাকুরা সেকেন্ড ক্লাসে। মাল-টাল সব তোলা হলো। কানাই মহারাজ কুলিদের যখন পয়সা দিতে যাবেন—এক বিপত্তিতে পড়লেন। স্বামীজী

হয়েছে। প্রথমটির তারিখ ১৮৯৮-এর ৩ জানুয়ারি এবং দ্বিতীয়টির ১৯০০-এর ২৩ ডিসেম্বর। দুটি চিঠিই দেওঘর থেকে লেখা। স্বামীজীর চিঠি থেকে বোঝা যায় তাঁর এই শিষ্যা খুবই বিদুষী এবং মনস্বিনী ছিলেন।

টাকা-পয়সার হিসাবে কোন খেয়াল করতেন না। সব ভার কানাই মহারাজের ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। স্বামীজীর একটি হাতব্যাগ ছিল। সেই হাতব্যাগের ভেতর মানিব্যাগটি কানাই মহারাজ রেখেছিলেন। হাতব্যাগটির চাবি লাগছে না—খোলা যাচ্ছে না কিছুতেই। মহা বিপদ। টানাটানি, প্রাণপণে মোচড় দিয়েও হাতব্যাগ খুলতে পারলেন না। শেষে স্বামীজীকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি ওকাকুরার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে কুলিদের বিদেয় করা হলো।

বেলা দুটোর সময় ট্রেনে চেপে কাশী পৌঁছতে সন্ধ্যা সাতটা হলো। এধারে তিন-চার ঘণ্টা ধরে আমরা হাতব্যাগটি খোলবার যথাসাধ্য চেষ্টায় আছি। কী কলই বিগড়েছিল। কিছুতেই খোলা গেল না। ব্যাগটি কুমিরের চামড়ার। খুব দামী। এখনো স্বামীজীর ঘরে বেলুড়ে সেটি সুরক্ষিত আছে। তার ভেতর স্বামীজীর সর্বদা ব্যবহার্য তোয়ালে ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলো ছিল। কি হবে?—এখুনি ট্রেন থেকে নেমেই দরকার হবে। বুক দুরুদুরু করতে লাগল কানাই মহারাজের। মুখ চুন। ঐ ব্যাগটি স্বামীজীর সঙ্গে মার্কিন, ইওরোপ অনেক জায়গা ঘুরে এসেছিল।

ট্রেন শিগগির কাশীতে না আসে—কানাই মহারাজের একান্ত মনোভিপ্রায়। কিন্তু হায়, কাশী এসে গেল। প্লাটফরমে যামিনীবাবু, চারুবাবু (পরে স্বামী শুভানন্দ) প্রভৃতি সকলে অপেক্ষা করছিলেন। স্বামীজীকে ও ওকাকুরাকে তাঁরা ফুলের মালা দিলেন। স্টেশনে প্রায় পাঁচশত লোক জমেছিল। স্বামীজী নামতেই যেন একটা পরমানন্দের ফোয়ারা ফর ফর করে খুলে গেল।

কানাই মহারাজ কিন্তু একা ঐ আনন্দের স্রোতের মধ্যে মুখ কালো হাঁড়ি করে নামলেন। কি হবে, ভীষণ বকুনি খেতে হবে এখুনি। তিনি তৎক্ষণাৎ যামিনীবাবুর হাতে ব্যাগটা দিলেন—ব্যাপার সব বললেন। দৌড়ে গিয়ে কামারকে দিয়ে ওটা খোলবার দ্রুত চেষ্টা যাতে হয়। গোপাললাল ভিলা—কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান, স্বামীজীর বাসের জন্য পূর্ব হতে নির্দিষ্ট ছিল। সেখানেই ওঠা হলো। সুন্দর বাগান। প্রকাণ্ড কমপাউণ্ড। শিখরোল নামক পাড়ার দিকে। বাগানে তখন অতি উৎকৃষ্ট দুই-আড়াই হাজার পেয়ারা গাছ ছিল। সেই সব গাছগুলি শীতের মরশুমে আপাদমস্তক ফলভারাক্রান্ত। কাশীর পেয়ারা সর্বত্র বিখ্যাত। সাদা ধবধবে।

বাগানের মধ্যে একটি সুবৃহৎ হল। তার দুই পাশে কামরা। পাশের ঘরগুলি সব এক ছাঁচে নিখুঁতভাবে সাজানো। প্রত্যেক খুঁটিনাটিটির পর্যন্ত সুসমঞ্জস সমাবেশ। প্রতি ঘরের আসবাবপত্র সাজানো-গোছানো, পরদা ইত্যাদি সব এক ধাঁচের। এক ঘরে ঢুকতে অন্য ঘরে ভুল করে প্রথম প্রথম যেতে হতো। রাত প্রায় বারটা-একটা পর্যন্ত লোকজন কেউ না কেউ নিত্য থাকত। স্বামীজীর সঙ্গে কথাবার্তা অবিরাম চলত। একটা জমজমে ভরাট ভাবে বাগান পরিপূর্ণ থাকত। শিবানন্দ স্বামী ও নিরঞ্জন মহারাজ মধ্যে মধ্যে বংশী দত্তের কাশীর বাড়ি থেকে এসে তাঁর সঙ্গে সংলাপ করতেন। বংশী বরানগরের মসলা ব্যবসায়ী ধনী সওদাগর। মহারাজদের ভক্ত।

বাগানে পৌঁছেও এধারে প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাগ বন্ধই রইল। ওঁর সর্বদা ব্যাগ দরকার। চটি, মুখ ধোয়ার সরঞ্জাম, ওষুধ সবই ওর ভেতর। মহা মুশকিল। "ওরে এটা দে" অনবরত বলছেন। অথচ হুকুম তামিল হচ্ছে না। শেষে ব্যাপারটা ভেঙে বলতেই হলো। শুনে একেবারে চটে আগুন হয়ে গেলেন। "তোরা মহা অলবড্ডে। যা তোদের থাকতে হবে না। বেরো।" কামারশালা থেকে ব্যাগমশাই আরাম হয়ে এলেন প্রায় দেড়-দুই ঘণ্টা পরে। পরদিন সকালেও রাগ থামল না স্বামীজীর। বেশ গম্ভীর স্থির স্বরে বললেন, "কানাই তুমি বেরোও। নাদু তুমিও যাও। তোমরা মহা careless। ও (অর্থাৎ আমি) ছেলেমানুষ। ও-ই একলা এখন থেকে আমার কাছে থাক। কানাই, তুমি দশাশ্বমেধ ঘাটে তপস্যা করবে, সমস্ত দিন। ভিক্ষে করে খাবে। রাত্রে এখানে এসে শোবে। আমার কাজ তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।" দশাশ্বমেধ ঘাট ওখান থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে। স্বামীজীর উৎসাহ-উদ্দীপনায় কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সেই সবে মাত্র পত্তন আরম্ভ হচ্ছে রামাপুরার সামান্য একখানি ভাড়াটিয়া বাড়িতে। সেবাশ্রমের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "নাদুকে তাহলে আমাদের দিন।" তিনি উত্তর দিলেন, "বেশ, ও রোগীর সেবা করুক।"

কানাই মহারাজের শাস্তিটা কিন্তু খুব কষ্টকর বোধ হলো। তিনি অগত্যা তাই করতে লাগলেন। এদিকে কয়েকদিন যেতে না যেতেই স্বামীজীর মন বলল, কানাই ধ্যান জপ কিছুই করছে না। একদিন তিনি দুপুরবেলা হঠাৎ একজনকে বললেন, "দেখে আয় তো, কানাই কি করছে ?"

লোকটি গিয়ে দেখে কানাই মহারাজ সটান খাটে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। রাত্রে কানাই মহারাজকে স্বামীজী ধরলেন। বললেন, "কি হে কানাই, বলি কি ব্যাপার ? তোমাকে কি ঘুমুবার জন্য ওখানে পাঠিয়েছি ? কাল থেকে সাবধান। ঠিক জপ করবে।"

এইভাবে দশ-পনর দিন কাটল। শেষে একদিন বললেন, "আর তোকে যেতে হবে না।" নেদাকেও (নাদুকে) আবার সেবাশ্রম থেকে নিয়ে নিলেন। মধ্যে অসাবধানতার দরুন কয়েকদিন শাস্তি-ভোগ দুজনেরই হয়ে গেল।

এই সময় স্বামীজীর শরীর দিন দিন খারাপই হচ্ছিল। সারা রাত বাতাস করতে হতো। তিনটে লোক হিমশিম খেয়ে যেত। ব্যাঙ্কে কাজ করতেন হরিনাথ ওদেদার। এই কালে স্বামীজীর কাছে আসেন। ইনি পরে ভক্তরাজ মহারাজ বা স্বামী সদাশিবানন্দ নামে পরিচিত হন।

পাঁচ-সাতদিন পরে ওকাকুরাকে কালাপেড়ে ধুতি, সিল্কের পাগড়ি ইত্যাদি পরিয়ে সাজালেন। লোকে দেখে মনে করলে, নেপালের রাজবংশীয় হয়তো কেউ এসেছেন। বিশ্বনাথ-দর্শন করতে পাঠালেন। ওকাকুরার সঙ্গে পনের-কুড়িজন গেলেন। স্বামীজী নিজে গেলেন না। চার-পাঁচখানা ঘোড়ার গাড়ি করে ওকাকুরার দল যাত্রা করল বিশ্বনাথ-দর্শনের জন্য। আমি ছেলেমানুষ। ভারি সখ ঐ দলের সঙ্গে যাই।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। স্বামীজী কিন্তু আমাকে ক্রমাগত বলতে লাগলেন, "কোথা যাবি? আরে আমায় ছেড়ে কোথায় যাবি?" এই বলে তিনি ঠিক যেন বন্ধুভাবে আমাকে তাঁর নিজের সম্বন্ধে কতকগুলো অতি গোপনীয়—অতিপ্রাকৃত কথা বললেন। তা কারুর কাছে প্রকাশ নিষেধ। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সম্বন্ধে যা যা বলেছিলেন, তাও ব্যক্ত করলেন। আমার কিন্তু সে-সময় এসব নিগূঢ় কথা বিশেষ ধারণা হয়েছিল বলে বোধ হয় না। শুধু শুনে গেলাম।

ভক্তরাজ প্রভৃতি পাঁচ-সাতজন এই সময় তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রার্থী। তিনি একটি ভাল দিন দেখে দিলেন। এই বাগানেরই একটি ঘরে হলো। দীক্ষার্থীরা পট্টবস্ত্র পরে প্রস্তুত হয়ে এলেন। দেখলাম, সেদিন ভোর থেকে উঠে অবধি সারা সকালটাই স্বামীজীর গরুগরু আবিষ্টের অবস্থা। যেন মেতে রয়েছেন।

পিছন দিকের রান্নাবাড়ির একটি পাশের ঘরের ভিতরে দুইখানি আসন পেতে দিলাম। আমাকে বললেন, "তুই বাইরে টুলে বোস। ঘরে কাউকে ঢুকতে দিবি না।" এরপরে দীক্ষার্থীকে একক নিয়ে ঘরের দরজাটি বন্ধ করলেন, পনর-কুড়ি মিনিট করে এক-একজনের লাগল। স্বামীজীর দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম, যখন যখন কপাট খুলল। গুরুর আসনে বসে আছেন। নিশ্চল, স্থির, চোখ লাল, শরীর সিধে, সুস্মিত বদন। সকলের দীক্ষা হয়ে যাবার পর উনি আমাকে বললেন, "শোন, এদিকে আয়।" আমার ঠিক এই সময় মনে হচ্ছিল—আমাকেও যেন উনি ডেকে কিছু বলেন। তখন তাঁকে খুব ভাল লাগছিল। যেন ভালবাসা জমাট।

আমাকে সেদিন কতকগুলো উপাসনা-পদ্ধতি শেখালেন। বললেন, "এই-এইভাবে ধ্যান করবি। এমনি-এমনি ভাববি। মনে মনে এইগুলো সব করবি। ধূপ-দীপ উপচার দেওয়া সব মানসে।" তার আগেই কিন্তু আমার শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা হয়ে গেছে। আমি কোনদিন তাঁকে সে কথা বলিনি। উনি আমাকে এই সময় ইষ্টচিন্তার প্রণালীটি বলে দিলেন। বললেন, "আজ থেকে মানস-পুজোর অধিকার তোকে দিলুম। ফুল চন্দন দিয়ে তোকে আর পুজো করতে হবে না।" এই জিনিসটা পেয়ে আমার মনটা পরম শান্ত হলো।

সব শেষ হয়ে যাবার পর অল্প একটু জলযোগ করলেন এবং সকলকে প্রসাদ একটু একটু দিলেন। এইকালে কাশীধামের বড় বড় সন্ন্যাসী, পণ্ডিত শিবনাথ প্রভৃতি অনেকে তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালাপ, সৎপ্রসঙ্গ করতে আসতেন প্রায় নিত্যই। শিবনাথ পণ্ডিত পাঁচ-ছয় ঘণ্টা আলাপ করতেন এক নাগাড়ে। কাশীপ্রবাসী প্রমদাদাস মিত্রের ছেলেরা (কালিদাস মিত্র প্রমুখ) প্রায়ই আসতেন। প্রমদাবাবুর পুত্রের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক আত্মীয়তা ছিল। একদিন দুপুরবেলা আমাকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। স্বামীজী এই সময় ওঁকে বলে দিলেন—বিশ্বনাথ দেখিয়ে দিতে।

একদিন পশ্চিমের পিঁজরাপোলওয়ালা আসেন। তাঁর ভারি চেষ্টা ছিল—স্বমতে স্বামীজীকে নেওয়ার। বললেন—ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যা, গোমাতার সমস্যা, এই

কথায় যেন স্বামীজীও পুরোপুরি সায় দেন। স্বামীজী কিন্তু তাঁকে স্পষ্টই বললেন, 'আগে মানুষ-মাতাকে ঠিক কর। তারপর গোমাতার ব্যাপারে মাথা ঘামাবে।"

দুপুরবেলা, স্বামীজী বিশ্রাম করছেন। আমরা ছেলেমানুষ। সটান একটা গাছের সব নারকোল কুল খেয়ে সাবাড় করলাম দুজনে মিলে। গাছগুলো জমা গাছ ছিল। খুব অর্থকরী সামগ্রী। বাগানের মালীটি অত্যন্ত কাতর হয়ে স্বামীজীর কাছে পরে এসে নালিশ করল। স্বামীজী আমাদের কিছুই বললেন না। সে যা টাকা চেয়েছিল তাকে তাই দিয়ে দিলেন। মালীর সঙ্গে মালীর স্ত্রীর খুব ঝগড়া হতো। চেঁচামেচি চলত। বউ রান্নাবাড়া করত আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে গাছ থেকে কাকপক্ষী তাড়াত। স্বামীজী বলতেন, 'মালী বউটার কি সাধা গলা!'

বাগানের ভেতরই বেড়াতেন। একদিনও বাইরে গেলেন না। তাঁর ইংরেজী জীবনীগ্রন্থে লেখা আছে ঃ তিনি নিত্য গঙ্গাতীরে বেড়াতেন, স্বাস্থ্য সুবিধে থাকলে মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নান করতেন, কাশীর অগণন দেবমন্দিরে, বিশেষতঃ বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করতে যেতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই একমাস কোথাও নড়েননি। গাড়ি করে বাগানে ঢুকলেন, একমাস পরে আবার গাড়ি করে স্টেশন পানে চললেন—কাশী ছাড়লেন।

'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ'—নামক পুস্তিকায় দেখেছি, এই বাগানে স্বামীজীর সঙ্গে শিবানন্দ স্বামী ও নিরঞ্জন স্বামীর একসঙ্গে থাকা ও পরস্পরের কথাবার্তার উল্লেখ আছে (পৃঃ ১৬, ৩৩, ৬৯-৭০, ৮১, ৮৩)—আর স্বয়ং স্বামীজীর কথায় রয়েছে যে, তিনি বাগান ছেড়ে কেদারমঠের মোহন্তের কাছে যাচ্ছেন (পৃঃ ৩৮), ভূঙ্গার রাজার বাগানবাটীতে যাচ্ছেন (পৃঃ ৬৫)। আমাদের স্পষ্ট মনে আছে, কারণ কাশীবাসের গোটাটাই সর্বক্ষণই আমরা স্বামীজীর একরকম কাছ-ছাড়া মোটেই হইনি। শিবানন্দ স্বামী ও নিরঞ্জন স্বামী ঐ সময় ঐ বাগানে একদম থাকেননি। স্বামীজী তো বাইরে বাগান থেকে কোথাও যানইনি।

নেদা একদিন তাঁর পা টিপতে টিপতে পড়ে গেল। পরদিন আমাদের দুজনের জন্যে আধসের করে মাংসের ব্যবস্থা করলেন। বলতে লাগলেন, "ছেলেগুলো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।"

কাশীর কনকনে শীত। একদিন তখন বেলা তিনটে, রান্নাবাড়ির দিকে চাকর বামুন কেউ নেই ; এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম। একটা ঘরে ঢুকে দেখি, স্বামীজী সোফার ওপর একদম খালি গায়ে একটি নেংটি পরে খাড়া বসে ধ্যান করছেন। নিথর নিস্পন্দ। চক্ষু অর্ধনিমীলিত। সমস্ত গা, বুক, পিঠ যেন চকচক করছে। মনে হচ্ছিল যেন কেউ বিভূতি মাখিয়ে দিয়েছে। অস্বাভাবিক রকমের রুপোলী রঙের আভা! বর্ণনায় আনতে পারা যায় না। চোখ দুটি ঢুলঢুলু। আমি দেখেই পিছু ফিরে সরে এলাম, পাছে ব্যাঘাত হয়। সে ঘরে উনি শুতেন না। সম্পূর্ণ অন্য ঘর। ব্যক্তিগত কথাগুলি যা গোপনে বলেছিলেন দপ করে মনে উঠল। তাঁর সেই ধ্যানস্তিমিত

শান্তবপু দেখছিলাম আর মনে হচ্ছিল—স্বামীজী যেন অপ্রাকৃত। চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। একি বাস্তব সত্য না অলীক, স্বপনে দেখা, থিয়েটারে দেখা—দৃশ্যপট। পুরাণবর্ণিত তুষারধবল রজত-ভূধর কান্তি কৈলাসেশ্বর কি আমাদের মধ্যে এলেন? চাক্ষুষ সেদিন তাঁকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত দেখলাম।

তাঁর সঙ্গে যাঁরা যখন থাকতেন তাঁদের তিনি তখনকার মতো জগৎ ভুল করিয়ে দিতে পারতেন। তাঁর কৃপায় তাঁর পদছায়ায় বসে তা বহুবার বুঝেছি।

গঙ্গার চলন্ত ধারার সঙ্গে সঙ্গে বেলুড় মঠে তাঁর সময়ে একটা নিরন্তর আনন্দধারা বয়ে যেত। যাঁরা এই স্রোতের মধ্যে এসে পড়েছেন তাঁরা সবাই একবাক্যে এই কথায় সায় দেবেন। একদিন সকালে ৯-১০টার সময় গোপাল-দাকে (স্বামী অদ্বৈতানন্দকে) বললেন, "দেখ, তুমি দিন দিন বুড়ো হয়ে যাচ্ছ। এইবেলা সাবধান। এবার থেকে কেবল ফল ও দুধ খেতে থাক। ফল দুধ বরাবর খেয়ে যদি কেউ জীবন কাটায় তাহলে তার আর হাড়ে জং ধরে না।"—এইরকম পাঁচটা কথা বলতে বলতে বলছেন, "লোকে কথায় বলে, জান তো দুধে আঁচালুম। ঘোলে ছোঁচালুম। তা তুমি হলে আমাদের সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ। কাল তোমার দুধে অভিষেক করা যাবে।"

পরের দিন ঐ কথামতো প্রায় দশ-বার সের কাঁচা দুধ নিয়ে সকলে মিলে (স্বামীজীসুদ্ধ) গোপাল-দার স্নানের সময় তাঁর সর্বশরীরে ঢেলে তাঁকে চান করানো হলো। খুব হাসির তোড় বইতে লাগল। পরে আবার অবশ্য গঙ্গাজল দিয়ে গোপাল-দাকে পরিষ্কার করে দেওয়া হলো। নতুন কাপড় পরানো, ভাল খাবার-দাবার ফল দুধ মিষ্টান্ন ইত্যাদি ওঁর জন্য সেদিন বিশেষ সব ব্যবস্থা স্বামীজী করালেন। সেদিন ঐ নিয়ে খুব আনন্দ।

শিবরাত্রির দিন মঠের অনেকেই উপবাস করেছেন। আমারও দেখাদেখি শখ গেল। খেলাম না। কাউকে বলিনি। সকাল থেকে যথাযথ স্বামীজীর যা যা কাজ আমার করণীয় ঠিক সব করে যাচ্ছি। দোতলার বারান্দায় টেবিলে বসেই সেদিন স্বামীজী আন্দাজ একটা-দেড়টায় খাচ্ছেন। ওঁকে খেতে দিচ্ছি। এদিকে তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, সামলাতে পারছি না, আবার জল খেতেও কিন্তু কিন্তু করছি। শেষে আর পারা গেল না। এক ফাঁকে একলা ওঁর ঘরে গিয়ে ওঁর কুঁজো থেকেই এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়েছি। মুখ মুছে আবার বাইরে ওঁর কাছে টেবিলে এসে দাঁড়িয়েছি। উনি মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "হ্যাঁরে তুই আজ উপোস করেছিস নাকি?" বললুম, "হ্যাঁ"। পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "একদম কিচ্ছুটি খাসনি?" আমি আমতা-আমতা করছি—চুপ করেই আছি। হাঁ-না বলতে পারছি না। অগত্যা বাধ্য হয়ে শেষে বলে ফেলতেই হলো।

বললেন, "ও। তাতে কিছু দোষ নেই। খেয়েও শিবরাত্তিরের ফল হবে। নে—খা—আয়।" বলেই নিজের পাত থেকেই ফল মিষ্টান্ন খেতে দিলেন।

কি খেলে মঠের ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে—সহজে হজম হবে, অথচ পুষ্টিকর

—ইদানীং এইসব খুব ভাবতেন। পুনঃপুনঃ দেখেছি, বরাবরই এই দিকে তাঁর তীব্র নজর।

জাগুলিয়ার ভগ্নী (মৃণালিনী বসু) আসবার সময় সঙ্গে এক ঝুড়ি ভাল কালজাম দিয়েছিলেন। মঠে আনা গেল। বললেন, "আগে সব জামগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে রস করে ফেল।" তারপর কতকগুলো বোতল সাফ করে ঐ রস অনেকগুলোতে ভরা হলো। ছিপি এঁটে বেশ মজবুত করে দড়ি দিয়ে মুখগুলো বাঁধতে বললেন। পাঁচ-সাতদিন রোদ্দুর খাওয়ানো হলো। তারপর ওঁর রান্নাঘরের পাশে সিঁড়ির নিচে একটা কুঠরিতে বোতলগুলো রেখে আসতে বললেন, অন্ধকার ঘরে।

একদিন চায়ের টেবিলে উনি বসে আছেন, হঠাৎ দূর থেকে দুম করে একটা আওয়াজ সকলের কানে এল। বললেন সঙ্গে সঙ্গে, "দ্যাখ দ্যাখ—বোতল ফাটলো বুঝি"—বাস্তবিকই তাই। ফারমেন্ট হয়ে রস তেজী হওয়ার দরুন একটা বোতল ঐরূপ ফেটেছিল। বললেন, "এই-ই শিরকা। ভারি হজমি। এইবার—এতদিনে ঠিক তৈরি হয়েছে। তোরা সব রোজ একটু একটু খাবি।"

কী ভালবাসাই সেবক-ছেলেদের প্রতি ছিল। অগাধ-অপার। মঠে কানাই মহারাজের ম্যালেরিয়া জ্বর। একশো পাঁচ-ছয় কাঠি উঠেছে। আমারও দুই-তিন। দুজনে নিচে দুঘরে পড়ে আছি। আমার, ছাড়ছে আসছে। কুইনিন খাচ্ছি। কানাই মহারাজের কিন্তু দু-তিনদিন এক অচৈতন্য অবস্থা। ছাড় নেই। সম্পূর্ণ বেহুঁশ। স্বামীজী উপর থেকে নেমে দেখতে এলেন। বাবুরাম মহারাজকে ডাকলেন। বললেন, "তাই তো, কানাই-এর জ্বর কিছুতেই ছাড়ছে না। এক কাজ কর। ঠাকুরঘর থেকে চরণামৃত এনে খাইয়ে দে। তাহলেই সেরে যাবে।" বলে চলে গেলেন। কথামতো বাবুরাম মহারাজ দুজনকেই খাওয়ালেন।

পরের দিন সকালবেলা স্বামীজী এলেন। খবর নিলেন। জানলেন—কানাই মহারাজ সেই একই রকম। বিন্দুমাত্র উপশম নেই। আমারও পূর্ববৎ—আসছে, যাচ্ছে। তখন বাবুরাম মহারাজকে, "হ্যাঁরে, ঠাকুরের চরণামৃত দিয়েছিস তো ?" উত্তর—"হ্যাঁ"।

স্বামীজী ফের বললেন, "ঠাকুরের চরণামৃত খাইয়েছিস—অথচ জ্বর ছাড়ল না কেন ? নিশ্চয়ই তুই অবিশ্বাস করে খাইয়েছিস। তাই ছাড়ল না।—ঠাকুরের চরণামৃত খাইয়েছিস—অথচ ছাড়ল না কেন"—বলতে বলতে নিজে তখন সেই অবস্থায়, সটান ঠাকুরঘরে গেলেন। গিয়ে ভেতর থেকে দরজা, জানালা সব বন্ধ করে দিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঘর থেকে বেরোলেন। চক্ষু লাল—মূর্তি অন্যপ্রকার। হাতে করে চরণামৃত নিজে নিয়ে এসে, খাইয়ে দিলেন। একঘণ্টার মধ্যে দুজনেরই জ্বর সম্পূর্ণ ছেড়ে গেল।

সেই দিনই ঠাকুরঘর থেকে নেমে এসে বাবুরাম মহারাজকে বকেছিলেন। একটা দুটো পিঁপড়ে ঠাকুরের বিছানায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে দেখেছিলেন, "হ্যাঁরে, এই রকম

করে তোরা ঠাকুরের সেবা করিস? কিছু দেখিস না। মনে করেছিস বুঝি—তিনি এখানে নেই। একি ছেলেখেলা!"

বাগবাজার বলরামবাবুর বাড়ির একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে স্মরণ হচ্ছে। বসু এস্টেটের কর্মচারী হরিনাথবাবু স্বামীজীকে তখনো দেখেননি। ভারি ইচ্ছা—একবার দর্শন হয়। স্বামীজী একদিন একখানি ঘোড়ার গাড়ি করে বসুদের ফটকে এসেছেন। হরিনাথবাবু খবর পেয়ে খুশি হয়ে দোতলায় সিঁড়ির কাছে অপেক্ষায় রইলেন—উঠলেই দেখবেন। উঠেই আশ্চর্য, স্বামীজী হরিনাথবাবুকে প্রথমেই সম্বোধন করে বলছেন, "ওহে হরিনাথ, একগ্লাস খাবার জল নিয়ে এস তো! বড় তেষ্টা পেয়েছে।"

শুনে হরিনাথবাবু স্তম্ভিত। কি করেই বা নাম জানলেন? ইতিপূর্বে পরিচয়ও নেই, দেখাও নেই।

নাদুকে, আমাকে আদর করে বলতেন, "আমার নন্দী-ভৃঙ্গী, হার্মাটি-ডামাটি।" কখনো আবার বলতেন, "গোরে-নেদা আমার তাল-বেতাল। তোরা আমার সঙ্গে মানুষ হ—খালি এই চাই, বাবা।"

স্বামীজীর জন্মতিথি, বেলুড়ে। অল্প-স্বল্প ভক্তের মজলিস। বাসন্তী রঙে ছোপানো নতুন বস্ত্র একবার পরে স্বামীজী, ঠাকুর-প্রণাম করে এসে সে কাপড় খুলে ফেললেন। এন্টালির উপেন দেবের দেওয়া অঢেল আহার্যবস্তুতে ভাঁড়ার থৈ থৈ। স্বামীজী মাংস খুব ভালবাসতেন। খানিকটা অগ্রভাগ ঠাকুরের ভোগের জন্যে পাঠালেন। ঠাকুরের ঘটা করে পুজো হলো।

কী পরম বালকই দেখা গেছে। গ্রীষ্মকালে বাক্সের ভেতর তাঁর কথামতো বরফের মধ্যে খাবার, ফল, বোতল ভরে দুধ রাখা হতো। প্রাক্-রেফ্রিজারেটার যুগ। সকালে চায়ের সঙ্গে দুধের ওপর ননীটুকু চামচে দিয়ে চেঁচে চেঁচে খাচ্ছেন। খুব ভাল লেগেছে। অমনি খেতে খেতে একটু নিয়ে বলছেন, "ওরে—খা—খা। খেয়ে দেখ—কী চমৎকার!"

১২৩, মানিকতলা স্ট্রীটের শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা ঘোষ, স্বামীজীর সম্পর্কিত বোন, তাঁর অশেষ অনুগ্রহভাজন, সম্ভবতঃ শিষ্যা। শুধু বোন বলে নয়—ঈশ্বরে ভক্তিও এই অনুগ্রহের মস্ত কারণ। ইদানীং গড়ে মাসে একবার বা দুইবার তিনি বেলুড় থেকে বাগবাজারে নেমে ঘোড়ার গাড়ি করে ঐখানে যেতেন। রাত্রে থাকতেন। ভগ্নীর ইচ্ছা, উনি খুব খান। নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত হতো। স্বামীজীর সেবকদেরই পেটে বেশি যেত। স্বামীজীর এই বোনের বজ্রপাত বাই বা আতঙ্ক বিলক্ষণ ছিল। আকাশে মেঘ ডাকলে, বিশেষতঃ বর্ষা বা কালবৈশাখীর ঝড়ের সময় মেঘ-গর্জন কিঞ্চিন্মাত্র ঘটলে আর রক্ষা নেই। বাজের ডাক থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তিনি ঘরের দরজা-জানালা এঁটে বন্ধ করে ভয়াতুর নিস্পন্দ অবস্থায় বসে থাকতেন। কানের মধ্যে যাতে ঐ ধ্বনি বিন্দুমাত্রও না পৌঁছায়, দুই কানে তুলো গুঁজে দিতেন। তাঁর ঐ অবস্থা দেখে পরিবারস্থ অনেকেই রহস্য করত।

স্বামীজী একথা জানতেন। একবার বড় মজা হলো। স্বামীজী ঐ বাড়িতেই এসেছেন। তার পরেই আকাশে আচম্বিতে বাজ ডাকতে আরম্ভ করল। দোতলার ঘরে স্বামীজীর সংগে বোনের সাক্ষাৎ। ঘরের দরজা-জানালা সব আগে থেকেই খোলা ছিল। আশ্চর্য ব্যাপার! ঐরূপই রইল, কিন্তু তিনি মোটেই বিচলিত হলেন না। কানে তুলো দেবার কথা মনেই উঠল না। স্বামীজী উচ্চরোলে হাসতে হাসতে বললেন, "কিরে, আজ তোর ভয়ডর সব গেল কোথায়? বলি হলো কি?" উত্তর, "আজ কিন্তু আমার মোটেই ভয় হচ্ছে না।"

কাছেই স্বামীজীর সহপাঠী এবং শিষ্য, অশেষ অনুগ্রহভাজন প্রিয়নাথ সিংহ থাকতেন। এখানে এলে সিংহের সংগে আমোদ-গল্প খুব করতেন। রসিকতা করে তাকে ডাকতেন, "সিয় প্রিঙ্গী।" মনে পড়ছে, জাগুলিয়া গ্রামে বাড়ির পুকুর পাড়ে স্বামীজী সহাস্য আননে প্রদীপ্ত মুখশোভা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলকে উৎসাহ দিচ্ছেন।[৫] ছেলেমেয়েরা আনন্দে সাঁতার কাটছে। সামনে উনি। সকলকে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে রেখেছেন। (জাগুলিয়া গ্রামে অপর এক সম্পর্কিত ভগ্নীর বাড়িতে স্বামীজীর যাওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। অল্পবয়সে বিধবা তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন এই ভগ্নীকে স্বামীজী সদুপদেশ দিয়ে পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।) স্বামীজী থাকতে থাকতে বেলুড় মঠেও একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নানা প্রকারের দৌড়, ঝাঁপ, শারীরিক কসরত দেখানো হলো। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে সকলকে প্রচুর উৎসাহ আনন্দ দেন। দেশে শরীরচর্চার উপর তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। এই প্রতিযোগিতায় একটি ভারতীয় ক্রীশ্চান যুবক নাম এন. ঘোষ একা দুটি প্রথম পুরস্কার পান। সাইকেল রেস—মন্থর ও দ্রুত—দুই বিভাগেই এই যুবক সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব দেখান। স্বামীজীর আশীর্বাদও পান। একদিন একটি মিনমিনে পিনপিনে ভিজে বেড়াল গোছের ছোকরা বেলুড়ে তাঁর কাছে এল। বলে, "মশাই, সাধু হব।" আগপাশতলা একবার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওহে, সাধু হওয়া অত সহজ নয়। আগে চুরি-ডাকাতি কর গে যাও, তারপর সাধু।"

একবার বেলুড়ে স্বামীজী মাথা কামিয়েছেন। মাথার চুলগুলো, নাপিত সচরাচর

৫ এই প্রসংগে রাম মহারাজের স্মৃতিকথার উল্লেখ করা হলো: ...মাঝে মাঝে শনিবার বেলুড়ে গিয়ে রবিবার কাটিয়ে আসতাম। একবার গেছি। স্বামীজী ছাগল দুইবেন। সটান বললেন, "ক্যাবলা, ছাগলটা ধরতো, দুইয়ে।" দুইছেন, ঠিক যেমন করে লোকে পাম্প করে! আমাকে 'ক্যাবলা' বলে সম্বোধন করেছেন। নিজে থেকেই বলে উঠলেন, "নাম একটা, যেমন বলে বিবেকানন্দ—একটা নামমাত্র।" এখন মনে হচ্ছে, পাছে আমি মনে দুঃখ করি, তাই ঐ কথা বলেছিলেন। ...[রাম মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্ত্রশিষ্য। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত ছিলেন। তবে তিনি গুরু কর্তৃক গৈরিক পরিধানের আদেশ পেয়েছিলেন। এঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্যামানন্দ। স্মৃতিকথাটি স্বামী নির্লেপানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত।]

যেমন করে থাকে, তাল পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। তিনি হাসতে হাসতে অতি সহজভাবে বললেন, "ওরে, দেখছিস কি, এরপরে বিবেকানন্দের একগোছা চুলের ডগার জন্য World-এ clamour পড়ে যাবে।"

একজনকে বড় একটি মজার কথা স্বামীজী বলেছিলেন ঃ

"ফ্রান্সে যাচ্ছি (শেষ পাশ্চাত্য ভ্রমণ)—জাহাজে শুয়ে আছি। সকালবেলা। তখনো চোখে তন্দ্রার আমেজ। অল্পস্বল্প ফরাসী ভাষা সবে শিখেছি। এমন সময় শুনেছি, কানের কাছে ক্রমাগত কে যেন বলছে ঃ 'ব্যাঙ মশায়ের বে, ব্যাঙ মশায়ের বে, ব্যাঙ মশায়ের বে।' তারপর চমক ভাঙতে উঠে বুঝলাম, সকালবেলা ওয়েটার সব যাত্রীকে মুখ ধোবার জন্য গরম জল দিচ্ছে। কেবিনে কেবিনে ধাক্কা মারছে আর বলছে, 'ব্যাঁ মঁশিয়ে এ-প্রে'—গরম জল এনেছি মশাই।"

একবার বড়দিনের অনুষ্ঠান। বেলুড় মঠে প্রভু যীশুর জন্ম-স্মরণে স্বামীজী কতিপয় সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দকে নিয়ে শান্তভাবে সন্ধ্যার পর আনন্দোৎসব করলেন। তাঁর ঘরের বারান্দায় 'ঈশ্বর পুত্রের' একখানি আলেখ্য টেবিলের উপর মালা দিয়ে সাজানো হলো। সামনে কেক, বিস্কুট, নানাপ্রকার ফল নৈবেদ্য। স্বামীজী বাঙলায় সেই প্রাচীন মহনীয় যুগাচার্যের কাহিনী বললেন। সম্ভবতঃ শরৎ মহারাজ বাইবেল পাঠ করলেন।

নিবেদিতাও এই উৎসবে যোগ দেন। তিনি ইংরেজীতে কিছু বললেন। এই শুভতিথিতে বিশেষ করে শিশু ও বালকদের উপঢৌকন দেবার জন্য পাশ্চাত্যরীতিতে একটি 'ক্রীসমাস ট্রি' নানাবিধ মনোহারী জিনিস দিয়ে সাজালেন। যেসব বালক বেলুড়ে ছিল, নিবেদিতা তাদের সকলকে এক-একটি উপহার নিজ হাতে দিলেন। আমি সেলুলয়েডের খাপে একটি টুথব্রাশ পেয়েছিলাম। স্বামীজীর অধ্যাত্ম-মহিমার অপার গুণে শিশুরূপী ভগবান যীশু যেন আবার সকলের মধ্যে জেগে উঠলেন।

কাশীতে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাগান। বোধানন্দ স্বামী কাশ্মীর বা পেশোয়ার অঞ্চল থেকে খুব ভাল পেশোয়ারী চাল স্বামীজীর জন্য আনেন। তখন কাশীতে টাকায় ষোল সের মহিষের দুধ। এক টাকার দুধ আনা হলো, তাই ঐ চালের পায়েস হলো। স্বামীজীও একটু খেলেন।

ভক্তরাজ মহারাজ সংক্রান্ত একটি অলৌকিক ঘটনা।—কাশীর মধ্যে বিখ্যাত ল্যাংড়া আমের গাছ ছিল তাঁর ব্যাঙ্কের বাগানে। তাঁর সঙ্গে ঐ আমের সুখ্যাতি-কথা চলছে। তখন ভরা শীতকাল। আশ্চর্য, ঠিক তার পরদিন তিনি সেখানকার একটি গাছ থেকে দুটি গাছপাকা আম সম্পূর্ণ ভাগ্যক্রমে পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে স্বামীজীর সেবার জন্য আনলেন। স্বামীজী অসময়ের ঐ আম খেয়ে খুশি হলেন।

বেলুড় মঠে তখন বেশি লোক সমাগম হতো না। গিরিশ স্মৃতিমন্দিরের পশ্চিম-দিকের দেওয়ালেই তখনকার মঠের ফটক। এখনকার মতো পাকা নয়। রাত্রে ঠাকুরের ভোগ নেমেছে। আমরা সবে খেতে বসেছি। হঠাৎ মালী বলল, এক সাহেব এসেছেন।

তখন দশটা। সাহেব চাবির জন্য অপেক্ষা করতে পারলেন না। তারের বেড়া টপকে মঠভূমির মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। মজার সাহেব—বাবরি চুল, টেরি—ঠিক ছবির মতো। সাহেবী পোষাকেও চমৎকার মানিয়েছে। "ওরে বাবুরাম, কি আছে নিয়ে আয়। বড্ড খিদে পেয়েছে। আমি পালিয়ে এলুম।" সে রাত্রে রান্না হয়েছিল—খিচুড়ি আর মঠেই উৎপন্ন কাঁচকলার ডালনা। বাবুরাম মহারাজ আহ্লাদে আটখানা, "কি খাবে? একটু বস না, লুচি ভাজিয়ে দিচ্ছি।"—"আরে না না। ঐ বেশ হবে। অনেকদিন খিচুড়ি খাইনি।"

সারারাত গল্পে কেটে গেল। মেন বিল্ডিং-এর বড়দার ঘরের দিকের ঘরখানিতে সবাই জমায়েত। স্বামীজী ঐখানে একখানি চৌকির উপর বসে গল্প জমালেন। গল্পের রাজা!

সকালে নাপিতের ডাক পড়ল। চুল কেটে ফেললেন। যে ভারতীয় সন্ন্যাসী—সেই ভারতীয় সন্ন্যাসী।

১৯০১-র কথা মনে হচ্ছে। সারারাত্র প্রহরে প্রহরে শিবপূজা, ঠাকুরঘরে। আর ঠিক তারই নিচে বারান্দায় পাখোয়াজ সঙ্গতের সঙ্গে তানপুরা হাতে স্বামীজী গান গাইছেন। গলাটি যেন একটা তানপুরা, যেমন গম্ভীর, তেমনি সুমিষ্ট।[৬] শিবের নামগান আর ভজনগানে সকলকে মোহিত করলেন।[৭] স্বামী নির্মলানন্দ ও স্বামী আত্মানন্দ পাখোয়াজ বাজালেন। সারারাত আনন্দের ফোয়ারা ছুটল। পবিত্র, মধুর, স্বর্গীয়!

তিন-চারদিন মঠের তিনটি পায়খানার ময়লা সাফ হয়নি। মেথর আসেনি। তাঁর নাকে দুর্গন্ধ গেছে। সটান ময়লার বালতি নিজে বয়ে টালীখোলার দিকে ফেলে দিয়ে এলেন। ছেলেদের শরীর খারাপ হবে, এই ভাবনায় অস্থির। তাঁকে ঐ কাজ করতে দেখে যাঁরা এগিয়ে এলেন, তাঁদের সবাইকে ভীষণ দাবড়ি দিলেন। বললেন, "এখন কেন? এতক্ষণ করতে পারনি?" একটি বালক বালতি করে জল ঢালতে লাগল। তিনি ঝাঁটা দিয়ে অতি সহজভাবেই সব পরিষ্কার করতে লাগলেন। কোন দ্বিধা নেই, সঙ্কোচ নেই।

একাই ছিলেন একশো। এমন আর কোন লোক আমাদের চোখে ঠেকে না। আর

৬ মনে পড়ছে, স্বামীজীর গলার উদাহরণ দিয়ে সারদানন্দ মহারাজ বলতেন—গলার জোয়ারী খুলে গেলে গলা থেকে একটি অপূর্ব রেশ বার হয়। এ স্ব-সংবেদ্য। ধাতবিক পদার্থের উপর আওয়াজ করলে যে রেশ ওঠে, গলা থেকে তখন তাই উঠতে থাকে।—স্বামী নির্লেপানন্দ।

৭ একটি ভক্ত বলেছিলেন, ঠিক এইভাবে একদিন বিভূতি মেখে মৃদঙ্গ বাজাতে বাজাতে তিনি স্বরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনা গেয়েছিলেন। গিরিশবাবুকে জোর করে লাল কাপড় পরিয়ে 'ভৈরব' সাজিয়ে দিলেন নীলাম্বরবাবুর বাগানে। পাঁচজনের ভিড়ের মধ্যে গোপালের মা বললেন, "তোমরা সবাই একটু সরো, আমি শিবদর্শন করি।"—স্বামী নির্লেপানন্দ।

গুরুভাইদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কি অদ্ভুত বিশ্বাস! কি ভালবাসা! মায়ের পেটের ভায়েরাও এমন হয় না। কেউ মঠের কাজকর্মসংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "আমি কিছু জানি না। রাজার কাছে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) যাও।" তাঁর মন আমাদের মতো দোকানদারী মন ছিল না। রাজাকে যে মঠাধীশ করেছেন, তা ষোলআনা মনেপ্রাণে জানেন, রাজাই রাজা, আর নরেন তাঁর প্রজা।

আমি ছেলেবেলায় বকাটে হয়ে যাওয়ায় আমার গর্ভধারিণী মঠে তাঁর কাছে রেখে দেন শোধরাবার জন্য। আমি রাখাল মহারাজের পকেট থেকে পয়সা চুরি করতাম। আমার সামনে তিনি স্বামীজীকে অনুযোগ করলেন, "তুমি গৌরকে আশকারা দাও, ও এমন কাজ করে।" আমি ভয়ে কাঁপছি। আশ্চর্য হৃদয় তাঁর। আমাকে মোটেই বকুনি দিলেন না। উলটে বললেন, "তুই মোহন্ত, সকলকে দেখার ভার তোর ওপর। ও ছেলেমানুষ, স্কুলে যায়, টিফিনে অবাক জলপান, নকুলদানা, ঘুগনিদানা খাবার শখ স্বাভাবিক, যেমন তোর আমার ছেলেবেলায় ছিল। মাঝে মাঝে দু-চার আনা ওকে দিয়ে দেখ চুরি বন্ধ হয় কিনা।"

নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ি। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দ। পাশ্চাত্যে অসম্ভব খাটুনির পর শরীরে রোগ আশ্রয় করেছে। বায়ুপরিবর্তনে যাবেন। মূত্র পরীক্ষা করাতে হবে। যোগেন মহারাজ বলছেন, "ভাই অমুক ডাক্তারের কাছে এটা পাঠান যাক। তোমাকে ভালবাসে।" স্বামীজী জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলছেন, "সে কিরে! তার ভালবাসার কাঁথায় আগুন! ভাল আমায় এরাই বাসে (দুটি সংসারত্যাগী যুবক তখন সেখানে, তাদের দেখিয়ে)। তবে তুমি একথায় রাগ করো না ; যেখানে পাঠাবে মনে করেছ, সেখানেই পাঠিও।"

একটি ছেলের উপর স্বামীজী ভার দেন সব সাধুদের ভোরে ঘণ্টা বাজিয়ে জাগিয়ে তুলতে। ঐ কাজ করে ছেলেটি কারুর কারুর বিরাগভাজন হতো। একদিন স্বামীজী নিজেই ছেলেটির সঙ্গে গেলেন। তার হাত থেকে ঘণ্টাটি নিয়ে প্রত্যেকের কানের কাছে বাজিয়ে জাগাতে লাগলেন। তাঁরা কেউ কেউ চোখ বুজে বিরক্তি প্রকাশ করে চোখ খুলে চড়কগাছ—কর্তা স্বয়ং! ধড়মড়িয়ে লজ্জিত হয়ে উঠে পড়লেন। স্বামীজী হাসতে লাগলেন। স্বামীজী বা রাখাল মহারাজ এই কালে (ডিসেম্বর ১৯০০ থেকে জুলাই ১৯০২) সাধারণতঃ ধ্যানঘরে সকলের সঙ্গে ধ্যান করতেন না।

জীবনের শেষ দিন শুক্রবার সকালে, তিন ঘণ্টা পরম ধ্যানের পরে শেষ গানে তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত হলো শ্যামার মহিমা—ঠাকুরঘরের উঠানের দিকে লম্বা দোতলার বারান্দায় পায়চারি করতে করতে মঠভূমি ভরিয়ে দেওয়া অপূর্ব সুরের রেশ—'শ্যামা মা কি আমার কালো রে—! কালোরূপে দিগম্বরী, হৃদ্পদ্ম করে আলো রে—!" কেউ কেউ বলেছেন, নিচে উঠানে নেমে এসে তিনি গুনগুন করে গেয়েছিলেন, "মন চল নিজ নিকেতনে।" হতে পারে। কিন্তু খোলা গলার গান—শেষ গান—"কালোরূপে দিগম্বরী!"

সূত্রনির্দেশ

চতুর্থ অধ্যায়

স্বামী ধীরানন্দ : স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন
শচীন্দ্রনাথ বসু : উদ্বোধন, ১ম সংখ্যা, মাঘ, ১৩৫৯
ঐ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৫৯
ঐ, ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৬০
গোবিন্দচন্দ্র বসু : উদ্বোধন, ২৫ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩২৯
কুমুদবন্ধু সেন : উদ্বোধন, ৬২ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৬৭
ঐ ৬৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৬৮
ঐ, সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৫৪
তারকনাথ রায় : উদ্বোধন, ৫৬ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৬১
সুরেন্দ্রনাথ সেন : উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২
ভুবনমোহন হাওলাদার : উদ্বোধন, ১৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩২৩
দেবেন্দ্রনাথ রায় : উদ্বোধন, ২৮ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৩
যতীন্দ্রমোহন দাস : স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন
সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী : উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা, পৌষ, ১৩৭০
হেমচন্দ্র ঘোষ : রাখাল বেণু, ১ম বর্ষ, মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৬
সুরেন্দ্রনাথ দত্ত : স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা, ১ শ্রাবণ, ১৩১২
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : উদ্বোধন, ৫০ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৫৪
প্রবোধচন্দ্র বসু : স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন
শৈলেশ্বর বসু : ঐ
দুর্গাপদ ঘোষ : ঐ
নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : ঐ
তুলসীরাম ঘোষ : ঐ
হরেরাম ঘোষ : ঐ
যতীন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত : ঐ
পুলিনবিহারী মিত্র : ঐ
ষষ্ঠীপদ দে : ঐ
হরিচরণ মল্লিক : ঐ
কুসুমকুমারী দেবী : ঐ
নরেশচন্দ্র ঘোষ : ঐ

পরিশিষ্ট

যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস

শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী—যোগীন-মা। খড়দহের বিখ্যাত বিশ্বাস-পরিবারের অম্বিকাচরণ বিশ্বাসের পত্নী।

আহা! সেই সদাহাস্যময় মুখখানি মনে আসছে। যেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। বেলুড় থেকে সকাল সকাল অন্নপূর্ণার ঘাটে নেমে, আমাদের বাড়ি এলেন। ফটক পেরিয়ে বারবাড়ির উঠান থেকেই, ডেকে-হেঁকে বলছেন, "ও যোগেন-মা, আজ বেলায় কাজ সেরেসুরে এসে তোমার এখানেই বসব। ভাল করে এই-এই রাঁধবে।"

আবার একদিন বাবুরামকে রঙ্গ করে বলছেন, "দ্যাখো ভেঁপু, তোমার ও খালি 'হায়রে লিতাই, হায়রে লিতাই', আমার এ মঠে চলবে না। এখানে পড়াশুনো করতে হবে।"

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে একদিন গল্পে-গল্পে আমাদের বলেছিলেন, "ওগো, অত নাম-রূপ সম্মান-খ্যাতি কি আমার শক্তিতে হয়েছে? না, ওসব হজম করা আমার ক্ষমতা? আমি সেই মস্ত বড় সভায় বলতে দাঁড়িয়েই—অতলোক একসঙ্গে, গিসগিস করছে দেখে কী যে বলব কিছুই বুঝতে পারিনি। কখনো অত লোকের সামনে কথা বলা অভ্যেস ছিল না। একদম তৈরি ছিলাম না। আমার বাহ্যজ্ঞান চলে গেল। আর দেখি কি, এই শরীরটার ভিতর ঠাকুর এসে, যা বলবার বলে যাচ্ছেন। যখন বলা শেষ করে বসে পড়লাম তখনো আমি জানি না, আমি কি বললাম!"

নৃপবালা ঘোষ

ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগরের অধিবাসী এবং মীরাটের সরকারি হাসপাতালের সহকারী শল্যচিকিৎসক ছিলেন। স্বামীজী অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে পরিব্রাজক অবস্থায় ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর / ডিসেম্বর মাসে অসুস্থ শরীরে মীরাটে উপস্থিত হয়ে তাঁর বাড়িতে পনের দিন ছিলেন। সেইকালে ত্রৈলোক্যনাথের দুই কন্যা স্বামীজীর সঙ্গলাভ করেন। স্বামী নির্লেপানন্দের সংকলন থেকে ত্রৈলোক্যনাথের প্রথমা কন্যার স্মৃতিকথাটি এখানে উপস্থাপিত করা হলো। দুঃখের বিষয়, তাঁর নাম জানা যায়নি।

আমরা ছোট তখন। আমাদের পিসিমা বলতেন, "তোমরা ওঁদের বিরক্ত করো না। ওঁরা শান্তভাবে আপনাদের ধ্যান-পাঠ করছেন।" স্বামীজী কিন্তু আমাদের খুব ভালবাসতেন, কাছে ডাকতেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের শেষের কথা। বাবা স্বামীজীদের চেয়ে বয়সে বড়। স্বামীজী বাবার সামনে তামাক খেতেন না। বাগানের দিকে একধারে এক ঘরে তক্তপোশের উপর বসে খুব তামাক খেতেন। হাসতে হাসতে বলতেন, "বাবাকে যেন বলিসনি।" তখন তিনি তপস্বী, পরন্তু সদা আনন্দময়। আমাদের দু-বোনকে, নিকষা মাসী, শূর্পনখা মাসী বলে খেপাতেন। আমরা রেগে গেলে বলতেন, "তোরা চটিস কেন? ওরা দুজনে কি কম? স্বয়ং রাম যাদের নাক কেটেছেন; বিভীষণ একজনের ভাই।" চাটনি পরিবেশনের সময়ে মজা করতেন, "দেখিস যেন লাল না পড়ে দিতে দিতে।" বাগানে বেড়াতে বেড়াতে তুড়ি দিয়ে গান গাইতেন। আলু কলাইশুঁটি সেদ্ধ জামবাটি ভরে খেতেন শীতকালে আগুন পোয়াতে পোয়াতে। এই সময় গঙ্গাধর মহারাজকে (স্বামী অখণ্ডানন্দকে) আমরা ছোট স্বামীজী বলতাম। ছিপছিপে চেহারা, অদ্ভুত স্মরণশক্তি। খড়ের গাদার উপর উঠে একলাটি বসে থাকতেন। স্বামীজী আমাদের বলতেন, "কেন একলা বসে আছে জানিস? ওর মা-মাসীর জন্যে চুপি চুপি কাঁদছে রে! কেউ না দেখতে পায়! কান্না কেন বাপু? দেশে গিয়ে দেখে এলেই হয়। তারা বোধকরি যেতে মানাই করেছে। আর এখান থেকে যাবে বা কি করে? এমন খ্যাটের বহর কোথায় পাবে?" শুনে হো হো হাসি সবাই মিলে। আমরা সবাই যেন একটা সুবৃহৎ পরিবার। সাধু বলে সংকোচ হতো না, পিসিমার হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও। ঘরের লোক, আপনজন মনে হতো।

স্বামীজী লাইব্রেরী থেকে বড় বড় বই আনাতেন, একদিনেই ফেরত দিতেন। একবার গ্রন্থাধ্যক্ষ এসে বললেন, "মশাই, এসব বই একমাসে কেউ শেষ করতে পারে না। আর আপনি একি করছেন?" স্বামীজী বললেন, "এসব বই থেকে আপনাদের যা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন।" তিনি পরখ করে অবাক।

স্বামীজীর দুখানি গাওয়া গান মাঝে মাঝে মনে আসে—"ভজন পূজন কিছুই নাহি জানি। জানি মা তোর চরণ সার" এবং "পরাণপুতুলি মোর ওমা হর রমা।"

নিত্যানন্দ বসু

বলরাম বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র, সাধুপ্রসাদ বসুর পুত্র।

স্বামীজীর শেষদিকের অসুখ। বেলুড়ে তাঁকে দেখতে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে নৌকো করে আমরা সবাই যাচ্ছি। আমাদের বাড়ির মেয়েরা অনেকে আছেন, এক নৌকো লোক। যোগীন-মা, সম্ভবতঃ গোলাপ-মাও রয়েছেন। ওপরে দোতলায় স্বামীজীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমার কথাবার্তা হলো। তারপর স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে এগিয়ে দিতে নিচে নেমে এলেন, সামনের ঘাট পর্যন্ত। আমাদের নৌকোখানা ভাটায় পলিমাটি ও বালিতে ঠেকে গিয়েছিল। স্বামীজীর গায়ে গেঞ্জি। আমি তখন ছোট ছেলে। বয়স বার-তের বছর। সব খবর জানি না, বুঝি না, আমার তো তাঁকে বেশ মনে হলো তিনি আমাদের একজনেরই মতো, বালকের মতোই মালকোঁচা এঁটে নিজেই শ্রীশ্রীমার নৌকো ঠেলে জলে ভাসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে—আর সব মহারাজরা যোগ দিলেন। মাঝিরাও ভাবিত হয়েছিল—এক নৌকো-ভরা লোক, কি করে ঠেলে জলে ভাসাব—তাদের কাজটা স্বামীজীই আগ বাড়িয়ে করে দিলেন। আরও মনে হচ্ছে, যেন স্বামীজী শেষমেশ—"জয় শ্রীগুরু মহারাজজী কি জয়"—বা ওরূপ কিছু একটা বলে নৌকোখানা ঠেলে দিলেন।

প্রিয়নাথ সিংহ

খেতড়িরাজ ও বিবেকানন্দ

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজী রাজপুতানায় আবু নামক পাহাড়ে তাঁর একজন উকিল-বন্ধুর কাছে আছেন। এমন সময় তাঁর একজন ভক্ত খেতড়ির মহারাজের সচিব মুন্সী জগমোহনলালজীকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন। জগমোহনলাল দেখলেন, স্বামীজী একটি কৌপীন ও বর্হির্বাস পরে নিদ্রা যাচ্ছেন। জগমোহনলাল একজন ইংরেজী শিক্ষিত যুবা, গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীরা সব চোর, বদমায়েশ, এই বিশ্বাস। নিদ্রা ভাঙলে স্বামীজী জগমোহনের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বললেন। জগমোহনের কুসংস্কার ঘুচল, প্রবল বাসনা হলো, স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রভুরও পরিচয় করিয়ে দেন। স্বামীজীর কাছে খেতড়ির মহারাজের সঙ্গে আলাপ করবার প্রস্তাব করলে স্বামীজী সম্মতি প্রকাশ করলেন এবং বললেন, "আগামী পরশু মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।" জগমোহন আপনার প্রভুকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালে মহারাজ স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন, বললেন, "আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।" স্বামীজী একথা শুনে বিলম্ব না করে স্বয়ং তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

মহারাজ অভিবাদন করে তাঁকে উপবেশন করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "Swamiji, what is life (জীবনটা কি) ?" স্বামীজী উত্তর করলেন, "Life is the tendency of the unfolding and development of a being under circumstances tending to press it down. (অর্থাৎ কোন পুরুষ যেন নিজ স্বরূপ প্রকাশ করবার চেষ্টা করছেন আর কতকগুলি শক্তি যেন তাঁকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিসমূহকে পরাস্ত করে নিজ শক্তি প্রকাশের অবিরত চেষ্টার নামই জীবন)।"

এইরূপ নানা প্রশ্নোত্তরে মহারাজ স্বামীজীর প্রত্যুৎপন্নমতি এবং বিজ্ঞতার পরিচয় পেলেন বলে তাঁর বোধ হলো। তাঁর প্রাণের মধ্যে যতপ্রকার প্রশ্নের উদয় হলো, তিনি সমস্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামীজীও প্রীত হয়ে তার উত্তর দিলেন। খেতড়িরাজ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "Swamiji, what is education ?" রাজার প্রশ্ন শেষ হতে না হতে স্বামীজী উত্তর করলেন, "Education is the nervous association of certain ideas" এই কথা বলে আবার বুঝিয়ে বললেন, শিক্ষাটি সংস্কারে পরিণত হয়ে ধমনীগত হলে তবে তাকে শিক্ষা অর্থাৎ education বলে। অগ্নির দাহিকাশক্তি যতক্ষণ আমরা উপলব্ধি না করি, ঐ জ্ঞান যতক্ষণ না আমাদের ধমনী ও মজ্জাগত হয়, ততক্ষণ আগুনের জ্ঞান জন্মায় না। ন্যায়-বিজ্ঞান কতকগুলো মুখস্থ করলেই শিক্ষা হয় না। যা জীবনের সঙ্গে মিশে যায়, তাই যথার্থ শিক্ষা। পরমহংসদেবের যেমন কাঞ্চনত্যাগ, নিদ্রাবস্থায়ও তাঁর অঙ্গে কাঞ্চন স্পর্শ করালে অঙ্গের বিকৃতি উপস্থিত হতো। এই প্রকার সংস্কারগত যা হয়, তাই প্রকৃত education—শিক্ষা। রাজার প্রশ্ন স্বামীজী এইপ্রকার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে বুঝিয়ে উত্তর দিতে লাগলেন। রাজা পরম প্রীতিলাভ করে নিমন্ত্রণ করে আপন রাজ্যে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলেন, স্বামীজীও তাঁর সঙ্গে খেতড়ি যেতে সম্মত হলেন। জয়পুর পর্যন্ত ট্রেনে এবং সেখান থেকে রথে চড়ে প্রায় নব্বই মাইল গিয়ে খেতড়ি পেঁছিলেন। মহারাজ স্বামীজীকে পেয়ে পরম আহ্লাদে তাঁর সেবা করতে লাগলেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বামীজী, সত্য কাকে বলে (What is Truth) ?" স্বামীজী উত্তর করলেন, "Truth is one absolute, man travels from truth to truth and not from error to truth." (মানুষ আজ যা সত্য বলে অবলম্বন করে, জ্ঞান বাড়লে তা ছেড়ে অপর সত্য অবলম্বন করে। যেটি ত্যাগ করে সেটি মিথ্যা নয়, যেটি নতুন ধরে, সেইটি উচ্চতর মাত্র। যা absolute truth, এ অবস্থায় তার উপলব্ধি হয় না। কিন্তু তার উপলব্ধি হলে relative truths [আপেক্ষিক সত্যজ্ঞান]-সকল আর থাকে না)।

বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ প্রায়ই হতো। রাজা একদিন science পড়বার প্রস্তাব করলেন। স্বামীজী তাঁকে science primer-সকল আনিয়ে পড়াতে লাগলেন; ক্রমে একজন বি. এ. ফেল যুবাকে আনিয়ে মহারাজকে science পড়াবার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং

ক্রমে ক্রমে সকলপ্রকার বিজ্ঞানের যন্ত্রাদিও আনাতে লাগলেন। এই সময় পণ্ডিত নারায়ণদাস নামক একজন বৈয়াকরণ এসে উপস্থিত হলেন। ইনি রাজপুতানায় ব্যাকরণের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। স্বামীজী তাঁকে পেয়ে তাঁর কাছে মহাভাষ্য পাঠ করতে লাগলেন। পণ্ডিত মশায় স্বামীজীকে প্রথমদিন পড়িয়ে বললেন, "মহারাজ, আপকা মাফিক বিদ্যার্থী মিলনা মুশকিল।" পণ্ডিত মশায় একদিন একটু বেশি করে পড়ালেন। পরদিন তিনি স্বামীজীকে সেইসকল বিষয়ে প্রশ্ন করলে স্বামীজী সমস্ত আবৃত্তি করে বুঝিয়ে দিলেন। পণ্ডিত মশায় কিছু আশ্চর্য হয়ে আরও বেশি বেশি পড়াতে লাগলেন। স্বামীজী কিন্তু যেসকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, বৈয়াকরণ তার উত্তর করতে না পারায় স্বামীজী দিনকয়েক বাদে ভাবলেন যে, পণ্ডিতজীর কাছে প্রকৃত কিছুই শিখতে পারছেন না এবং পণ্ডিতজীও স্বামীজী নিজে প্রশ্ন তুলে নিজেই মীমাংসা করছেন দেখে বললেন, "মহারাজ, আপনাকে আর কিছুই শেখাবার নেই।"

স্বামীজী যখন কোন বই পড়তেন, তিনি বইয়ের দিকে চেয়ে দ্রুত পাতা উল্টে যেতেন। মহারাজ তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বামীজী, এত শীঘ্র কিভাবে পড়েন?" স্বামীজী বললেন, "বালক যখন প্রথম পড়ে, সে এক একটি অক্ষর দুবার তিনবার করে উচ্চারণ করে তারপরে শব্দটি উচ্চারণ করে। এ সময়ে তার দৃষ্টি এক একটি অক্ষরের উপর থাকে। কিন্তু যখন আরও বেশি শিক্ষা করে, তখন আর অক্ষরের উপর নজর না পড়ে এক একটি শব্দের উপর পড়ে এবং অক্ষরের উপলব্ধি না করে একেবারে শব্দের উপলব্ধি করে; যখন আরও অগ্রসর হয় তখন একেবারে এক একটি sentence-এর উপর নজর পড়ে ও তারই উপলব্ধি করে; এই উপলব্ধি আরও বাড়িয়ে দিলে একটি পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠার উপলব্ধি হয়। কেবল মনঃসংযম, সাধনা। আপনিও চেষ্টা করুন, আপনারও হবে।"

সৎ চর্চা সর্বদাই হচ্ছে। কথা প্রসঙ্গে মহারাজ আর একদিন প্রশ্ন করেন, "স্বামীজী, নিয়ম কি (what is law)?"

স্বামীজী। There is no law in the external world. Law is the mode in which the mind grasps a series of phenomena. —বাহ্যজগতে নিয়ম কিছুই নেই। তবে কতকগুলি ঘটনাপরম্পরার উপলব্ধি আমাদের মনে যেভাবে হয়, তারই নাম নিয়ম অথবা law, যেমন আলোকের পরমাণু চোখের উপর প্রতিবিম্বিত হলো। চোখ আবার তার অন্তর্বর্তী ইন্দ্রিয়ের কাছে তাকে প্রেরণ করল। পরে ইন্দ্রিয় মনকে, মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে, বুদ্ধি অহঙ্কারকে, অহঙ্কার পুরুষকে তা পাঠাল। তারপরে পুরুষের যেন আজ্ঞাক্রমে আবার সেই ক্রিয়াটি ফিরে চোখ পর্যন্ত এলে তবে বাহ্যবস্তুর বা আলোকের উপলব্ধি হয়। এই process বা ক্রিয়াটি একটি নিয়ম বা law, এটি অন্তর্জগতের নিয়ম।

মহারাজ প্রত্যহ রাত্রি দুটো তিনটের সময় শয্যা থেকে উঠে স্বামীজীর কাছে এসে অতি সাবধানে তাঁর পদসেবা করতেন, পাছে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়। দিবাভাগে

পদসেবা স্বামীজী করতে দিতেন না, সকলের সমক্ষে মহারাজকে পদসেবা করতে দিলে মহারাজকে বড় হালকা করা হয় এইজন্য। মহারাজ এত সেবা করেও তখন স্বামীজীর পরিচয় পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করেও জানতে পারেননি। একদিন মহারাজ নিঃসন্তান বলে আপন মনোবেদনা স্বামীজীকে জানিয়ে বলেন, "স্বামীজী, আপনি আশীর্বাদ করুন যে, আমার একটি পুত্রসন্তান হয়, তাহলেই আমার নিশ্চয়ই পুত্রসন্তান হবে।" ব্যাকুল দেখে স্বামীজী সেইমতো আশীর্বাদ করেন এবং সেখান থেকে অন্যত্র চলে যান। এখানে তাঁর প্রায় দুমাস থাকা হয়।

এই ঘটনার প্রায় দু বৎসর পরে খেতড়ির মহারাজের একটি পুত্রসন্তান জন্মায়। মহারাজের বড় আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা—স্বামীজীকে আনিয়ে উৎসব করেন। তাঁর প্রিয় সচিবকে ডেকে বললেন, "জগমোহন, স্বামীজীকে না আনতে পারলে সমস্তই বৃথা হবে। তাঁরই আশীর্বাদে এই বংশধর জন্মেছে, অতএব যাতে তাঁকে আনতে পার, তার ব্যবস্থা কর।" সচিব প্রভুর আজ্ঞা পেয়ে একেবারে মাদ্রাজে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর জানা ছিল স্বামীজী মাদ্রাজে আছেন। মাদ্রাজ শহরে গিয়ে কোন ঠিকানায় আছেন জানবার চেষ্টা করতে করতে সন্ধান পেলেন যে, স্বামীজী শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য, Assistant Accountant General-এর বাড়িতে আছেন। সচিব সেখানে গিয়ে ভৃত্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামীজী কোথায়। তারা জানাল যে স্বামীজী সমুদ্রে গেছেন। জগমোহনের ভয় হলো হয়তো স্বামীজী বিলেত যাবার জন্য জাহাজে উঠেছেন। তাহলে সমস্তই বিফল হবে। এই ভাবছেন, এমন সময় এক স্থানে রাখা গেরুয়া কাপড়ের উপর তাঁর নজর পড়ল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর গুরুদেব সেইখানেই আছেন। মাদ্রাজী চাকরের ভাষা জানা না থাকায় তিনি ভুল বুঝেছিলেন। এইপ্রকার চিন্তা করছেন, এমন সময় গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দ হলো। স্বামীজী এবং মন্মথবাবু একখানি গাড়ি করে সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে ফিরে এলেন। স্বামীজী গাড়ি থেকে নামামাত্র জগমোহন তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে দাঁড়ালেন এবং পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। জগমোহন তাঁর প্রভুর বাসনা জানালে স্বামীজী বললেন, "জগমোহন, আমাকে বিলেত যাবার সব বন্দোবস্ত করে নিতে হচ্ছে। এখন তোমার মহারাজের কাছে যাই কেমন করে?" জগমোহন ছাড়লেন না। বললেন স্বামীজীকে যেতেই হবে। বিলেত যাবার বন্দোবস্ত তিনিই করে দেবেন। এজন্য স্বামীজীকে নিশ্চিন্ত হতে অনুরোধ করলেন। অগত্যা তিনি সম্মত হলেন। স্বামীজী তাঁর মাদ্রাজী ভক্তদের সঙ্গে জগমোহনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দিনকয়েকের মধ্যে স্বামীজীর খেতড়ি যাবার বন্দোবস্ত হলো। মাদ্রাজের বন্ধুগণ তাঁকে অতি দুঃখিত অন্তরে বিদায় দিলেন। একখানি প্রথম শ্রেণী রিজার্ভ করে জগমোহন স্বামীজীকে নিয়ে চললেন।

রাত্রি প্রায় নটা বেজেছে। খেতড়ির মহারাজের প্রাসাদে বড় ধুম। প্রাসাদের মধ্যে একটি সুসজ্জিত পুষ্করিণীতে ফুল-ফল-মণি-মুক্তায় সজ্জিত একটি নৌকায়

মহারাজ বসে আছেন। চতুর্দিকে সঙ্গীত হচ্ছে। অমাত্য পরিবেষ্টিত রাজপুতানার রাজন্যগণ উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট আছেন। আজ তিন-চারদিন উৎসব আরম্ভ হয়েছে। অনেক রাজা স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করেছেন। কিন্তু সর্বত্র অপূর্ব শোভায় শোভিত এবং আনন্দের স্রোত চলছে—জগমোহন স্বামীজীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। মহারাজ তাঁকে দেখামাত্র দ্রুত এসে সর্বসমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। স্বামীজী তাঁর হাত ধরে উঠিয়ে উপযুক্ত আসনে বসিয়ে নানা কথাবার্তা বলতে লাগলেন। খেতড়ির মহারাজা বিবেকানন্দের সঙ্গে উপস্থিত অন্যান্য সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমেরিকায় গিয়ে শিকাগো ধর্মসম্মেলনে উপস্থিত হয়ে সনাতন ধর্মের গূঢ় তত্ত্বসকল বোঝাতে মনস্থ করেছেন বলে তাঁকে বহু ধন্যবাদ দিতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে আমেরিকা যাবার জন্য জাহাজে উঠবার দিন নিকটবর্তী দেখে মহারাজ স্বয়ং জয়পুর পর্যন্ত এসে একখানি ফার্স্ট ক্লাস গাড়ি রিজার্ভ করে তাতে উঠিয়ে বিদায় নিলেন এবং নিজ সচিব জগমোহনকে বোম্বাই পর্যন্ত গিয়ে স্বামীজীর সমস্ত বন্দোবস্ত করতে আজ্ঞা দিলেন। আবুরোড স্টেশনে এসে তাঁর এক ভক্ত রেল কর্মচারীর আবাসে সেই রাত্রি রইলেন। ইতিপূর্বে স্বামীজীর দুজন গুরুভাই পীড়িত হওয়ায় স্বামীজী তাঁদের এই স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে আবু পর্বতে খেতড়ির গ্রীষ্মাবাসে রেখেছিলেন। এখানে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সংবাদ পাঠান। তাঁদের একজন যথাসময়ে এলেন। স্বামীজী, জগমোহন ও ভক্ত রেলওয়ে কর্মচারী একসঙ্গে পুনরায় বোম্বাই যাবার গাড়িতে উঠলেন।

স্টেশনে স্বামীজীর ভক্ত একজন বাঙালী ভদ্রলোক স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে বসে কথা বলছিলেন। এমন সময় একজন শ্বেতাঙ্গ টিকিট কালেকটার এসে সেই ভদ্রলোককে গাড়ি থেকে চলে যেতে আদেশ দিলেন। ভদ্রলোকটি তথাচ অপেক্ষা করতে লাগলেন। সাহেবের কথা গ্রাহ্য করলেন না দেখে সাহেব একটু গরম হয়ে রেলের আইনের দোহাই দিয়ে পুনরায় তাঁকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বললেন। ইনিও রেলের কর্মচারী, এঁরও আইন জানা ছিল। ইনি বললেন, এমন কোন আইন নেই, যার দ্বারা তিনি চলে যেতে বাধ্য। সুতরাং দুজনে বেশ বচসা আরম্ভ হলো। স্বামীজী তাঁর ভক্তটিকে পুনঃপুনঃ ঝগড়া করতে নিষেধ করলেও তিনি ক্রমে গরম হয়ে উঠছেন দেখে স্বামীজী তাঁকে নিবারণ করবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় গৌরাঙ্গ হঠাৎ স্বামীজীকে "তুম কাহে বাৎ করতে হো?" বলে ধমক দিলেন। গৈরিকধারী সামান্য সন্ন্যাসী ভেবে সাহেব বোধহয় ধমকেছিলেন। রেলে কত গেরুয়াপরা সাধু যাতায়াত করেন, সাহেবদের গুঁতোগাঁতা খেয়েও নিঃশব্দে চলে যান। কাজেই গৌরাঙ্গ এঁকেও সেইরূপ একজন ভেবেছিলেন। গৌরাঙ্গদর্শনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কে না ভীত হয়? কে না একটু সঙ্কুচিত হয়? গৌরাঙ্গেরাও এদেশে পদার্পণ করামাত্র দেশীলোকের মধ্যে এই ভাবটা দেখে বুক বিশ হাত লম্বা করে কালা আদমিকে মানুষজ্ঞান আর করেন না। আর এতে মজা এবং আনন্দও পান। আসুরিক ভাবের লোক, আনন্দ পাবারই কথা। যাইহোক

সাহেব এবার যে সিংহের সঙ্গে লেগেছেন, তা জানতেন না। স্বামীজী চক্ষু আরক্ত করে বললেন, "What do you mean by তুম? Can you not behave properly? You are attending 1st and 2nd class passengers and you do not know manners? Can't you say আপ and speak like a gentleman?" সাহেব উত্তর করল, "I am sorry, I don't know the language well, I only wanted this man..." স্বামীজী এইবারে আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, "You brute, you said you did not know the vernacular, and now you don't know English, your own language even! Can't you say this gentleman, you beast. Give me your name and number, I am bent on reporting your behaviour to the authorities."

একটা মহা গোলমাল পড়ে গেল, অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। স্বামীজীর দাবড়ানিতে গৌরাঙ্গজী কেঁচোপ্রায়, কোন উত্তর আর দেন না, পাশ কাটাবার চেষ্টা। স্বামীজী পুনরায় বললেন, "I give the last alternative, either give me your name and number or be the worst coward before the public."

সাহেবজী ঘাড় হেঁট করে সরে পড়লেন, গাড়ি ছেড়ে গেল। মুন্সীজী ও স্বামীজী একখানি ফার্স্ট ক্লাস গাড়িতে। এইবার স্বামীজী জগমোহনকে দুঘণ্টা ধরে গৌরাঙ্গ সমক্ষে আমাদের আত্মমর্যাদাবোধের অভাবের উপর বক্তৃতা দিতে লাগলেন। জগমোহন মহা অপরাধীর মতো অধোবদনে শুনতে লাগলেন। স্বামীজী বললেন, "জগমোহন, হিন্দুরা কত শত সহস্র গুণে অন্য জাতি অপেক্ষা উচ্চ অন্তঃকরণবিশিষ্ট। কেবল ধর্মশিক্ষার অপচারেই আপনাকে সকলের অপেক্ষা হীন ভাবে। তাই জন্য জুতোর ঠোক্কর খেয়ে ঝেড়ে ফেলে।"[১]

১ ট্রেনের কামরায় পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজীর সঙ্গে ইংরেজদের দুর্ব্যবহার এবং পরে তাঁদের স্বামীজীর কাছে পর্যুদস্ত হওয়ার ঘটনা আরও আছে। 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১ম সং, ১৩৭৩, পৃঃ ৩২৮) স্বামী গম্ভীরানন্দ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এছাড়া অন্ততঃ আরও দুটি ঘটনার কথা বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসী সূত্রে আমরা অবগত আছি। একবার কয়েকজন ইংরেজ প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করছিলেন। স্বামীজীও ছিলেন সেই কামরায়। তাঁরা স্বামীজী সম্পর্কে 'অসভ্য,' 'গাঁইয়া' প্রভৃতি শব্দ ইংরেজীতে ব্যবহার করে তাঁদের বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন। তাঁরা চাইছিলেন স্বামীজী যাতে কামরা থেকে নেমে যান। স্বামীজী তাঁর প্রথম শ্রেণীর টিকিটটি (কেউ তাঁকে তা কিনে দিয়েছিলেন) দেখিয়ে সহযাত্রীদের বললেন, তাঁর কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে। সুতরাং তাঁদের মতোই প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের তাঁর অধিকার রয়েছে। স্বামীজীর কথায় আরও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাঁরা বললেন, এমনিতে নেমে না গেলে তাঁরা চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা মেরে তাঁকে ফেলে দেবেন। তখন স্বামীজী শান্ত অথচ দৃঢ় ভাবে শুধু তাঁদের বললেন: "ধাক্কা দিতে পার। তবে তার আগে প্রস্তুত থেক তোমরা সবাই ধাক্কা খেয়ে

বোম্বাই এসে মুন্সীজী সমস্ত জিনিসপত্রের বন্দোবস্ত করে দু-চারদিন পরে স্বামীজীকে জাহাজে চড়িয়ে দিতে গেলেন। সঙ্গে স্থানীয় ভদ্রলোকও দু-একজন গেলেন। স্বামীজী আপনার নির্দিষ্ট একটি ফার্স্ট ক্লাস কেবিনে গিয়ে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি জগমোহন কিভাবে সাজিয়েছেন দেখে নিলেন। একজন শ্বেতাঙ্গ দ্বারে হাজির, স্বামীজীর পরিচর্যায় নিযুক্ত। আহারের জন্য ঘণ্টা বাজল, সকলে আহার করতে গেলেন। স্বামীজী বললেন, "জগমোহন, আমরা যে যেমন লোক, তার সঙ্গে সেই প্রকার ব্যবহার করিনি, তাই ওরাও পেয়ে বসে। এই যে গৌরাঙ্গটি দেখছ, এ আমার হুকুম শুনবে বলে হাজির। এখন সব গৌরাঙ্গই একরকম টোলের, কেউ বা এসে এর সঙ্গে যেন মনিবের মতো আপনি হুজুর করবে। তা নয়, ও গোলাম। গোলামের মতো ওকে খাটিয়ে নিতে হবে, দাবে রাখতে হবে, রাশভারি হতে হবে; তোমরা রাশ হালকা করে ফেলো, সেই হয় দোষ। তুমি দেখবে, আমি কেমন রাশভারি হয়ে ওকে দাবিয়ে নেব, বাছাধন কেঁচো হয়ে থাকবে।"

জাহাজের সকল শ্বেতাঙ্গ এক টেবিলে বসে ভোজন করছেন, তার মাঝখানে স্বামীজী সুন্দর গেরুয়াপরা, মাথায় পাগড়ি। জগমোহন ভাবলেন, স্বামীজী যেন রাজশোভা ধারণ করে বসেছেন। আহারান্তে পুনরায় ঘণ্টা পড়ল। যাঁরা বিদায় দিতে এসেছিলেন, তাঁরা চলে গেলেন। জগমোহন সকলের শেষে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামলেন, অমনি জাহাজ খুলে গেল। স্বামীজী ইঙ্গিতে বিদায় নিলেন। জগমোহনের চোখ দুটি যতক্ষণ তাঁর গুরুকে দেখতে পেল, ততক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে রইল।

চলন্ত ট্রেন থেকে বাইরে পড়ার জন্য। ধাক্কা দিতে ওঠার আগে শুধু একবার আমার বাইসেপস আর ট্রাইসেপসগুলো ভাল করে দেখে নাও।" বলা বাহুল্য, সেদিনের সেই ইংরেজ সহযাত্রীগণ এর পর স্বামীজীকে আর বিরক্ত করেননি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো এই : স্বামীজী একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় ঢুকছেন। এক পা ধুলো, ঘর্মাক্ত কলেবর। স্বামীজীর কোন অনুরাগী ভক্ত তাঁকে প্রথম শ্রেণীর একটি টিকিট কিনে দিয়েছেন। কামরাটিতে ছিলেন দুজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সৈনিক। স্বামীজীকে উঠতে দেখে প্রচণ্ড অবজ্ঞা, ঘৃণা ও বিরক্তির সঙ্গে একজন বললেন : "Here comes a dog." অপর-জন যোগ করলেন : "No, here comes an ass" বলিষ্ঠ পদক্ষেপে তাঁদের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে দুজনের মাঝখানের জায়গায় গুছিয়ে বসে নির্ভীক কণ্ঠে স্বামীজী বললেন : "And I am sitting between the two." স্বামীজীর ইংরেজী শুনে এবং ব্যক্তিত্ব দেখে সিঁটিয়ে বসলেন ইংরেজ সৈনিকদ্বয়। —সম্পাদক।

প্রিয়নাথ সিংহ

বুদ্ধগয়ায় বিবেকানন্দ

ইংরেজী ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত পীড়িত। তাঁর গৃহীভক্তেরা লালাবাবুর কাশীপুরের বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। আর তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যেরা তাঁকে সেখানে রেখে কায়মনোবাক্যে সেবা করছেন। প্রত্যেকেই তাঁর সেবায় দিবানিশি নিযুক্ত। ঠাকুর কিন্তু স্বামীজীর সেবা গ্রহণ করতে পারেন না। বিবেকানন্দ সেবা করতে গেলে তাঁকে বারণ করেন, বলেন, "তোর অন্য পথ।" ঠাকুরের কোন কথা মেনে বিশ্বাস করে নিলে ঠাকুর বলেন, "তোর ও পথ নয়, তুই সব দেখে শুনে বুঝে নে।" ক্রমে গুরুর কৃপায় স্বামীজী বুঝেছেন সকল বিষয়ের অনুভূতি করে নিতে হবে। কিছুদিন আগে তিনি নির্বিকল্প সমাধিস্থও হয়েছিলেন। প্রচারকার্যের সম্পূর্ণ ভার তাঁর উপর। ঠাকুর বলতেন, "আপনাকে মারতে হলে একটিমাত্র ছুঁচের আবশ্যক, কিন্তু অপরকে মারতে হলে ঢাল, তরোয়াল প্রভৃতি সকল প্রকার অস্ত্রের আবশ্যক।" তাই বিবেকানন্দ অস্ত্রশস্ত্র-স্বরূপ বেদবেদান্ত ও নানা শাস্ত্রাদি অভ্যাস এবং সন্ন্যাসী গুরুভাইগণ গুরুসেবায় অবসর পেলেই তাঁদের নিয়ে পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞদের বিচার প্রণালী এবং তাঁদের মীমাংসার সঙ্গে প্রাচ্যপ্রথার তুলনায় বিচার মহা আগ্রহের সঙ্গে করছেন। পরমহংসদেব তাঁকে সন্ন্যাসী গুরুভাইগণের নেতা করেছেন। অতএব এইরূপ শাস্ত্রচর্চা ও সাধনার মধ্যে ঠাকুরের সেবার সকল প্রকার বন্দোবস্তও করছেন। ইতিমধ্যে বুদ্ধদেবের জীবন ও তাঁর ধর্মবিষয়ে বিশেষ চর্চা আরম্ভ হলো। স্বামীজীর নিজের তীব্র বৈরাগ্য যেন বুদ্ধদেবের তীব্র বৈরাগ্যের সঙ্গে মিশে গেল। তাঁর প্রাণে প্রবল বাসনা হলো বুদ্ধদেবের সাধনা ও সিদ্ধির স্থান দেখবেন। দিন দিন সেই বাসনা ক্রমে এমন বেড়ে উঠল যে, ঐ সিদ্ধস্থান না দেখে প্রাণধারণ করতে পারেন না। তাঁর মুখে সর্বদাই তখন বুদ্ধদেবের সেই বাক্য—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

কিন্তু গুরুদেবের সেবা স্বহস্তে না করলেও সমস্ত ভার যখন তাঁরই উপর, তখন কেমন করেই বা তাঁকে ফেলে যাবেন? গুরুদেব জানতে পারলে অবশ্যই প্রতিনিবৃত্ত করবেন। তার উপর প্রায় সকল গুরুভাইদের অমত হবে বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ রামকৃষ্ণ সেনাদলের তিনি নায়কস্বরূপ। সকলেই প্রায় বিবেকানন্দের উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হয়ে বাড়ি, ঘর, কলেজের লেখাপড়া ত্যাগ করে প্রাণপণে ঠাকুরের সেবাই জীবনের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য ধ্রুবনিশ্চয় করেছেন, এবং কাজেও সেইমতো করছেন, এমন সময় স্বামীজী অন্যত্র চলে গেলে কি হবে? এই চিন্তা তাঁকে অস্থির করে

তুলল। বুদ্ধগয়ায় যাবার বাসনা কিন্তু এইসকল প্রতিবন্ধকে আরও জ্বলে উঠছে। ক্রমে তাঁর চিন্তা নিবৃত্ত হয়ে এল, গুরুদেবের উপর অচল বিশ্বাস—তিনি দেখলেন, যাঁর জন্য এত চিন্তা করছেন, তিনি স্বয়ং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলকর্তা ভগবান। বিবেকানন্দ নিজেই তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছেন। স্বামীজী বুদ্ধগয়া গমনে স্থিরনিশ্চয় হলেন।

চৈত্রমাস, একদিন বিকালবেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় শিবানন্দ এবং অভেদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে বিবেকানন্দ বাগানের পশ্চাদ্‌ভাগের ছোট দ্বার দিয়ে গোপনে বের হলেন। পদব্রজে তিনজনে আলমবাজার ঘাটে এসে নৌকা করে অপরপারে উঠে বালি স্টেশনে উপস্থিত হলেন। সেখানে অনুসন্ধানে জানলেন, গয়া যাবার সুবিধামতো গাড়ি পরদিন সকালে পাবেন। সেরাত্রি নিকটবর্তী একটি দোকানে গিয়ে অবস্থান করলেন। রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই তিনটের সময় সকলকে উঠিয়ে খিচুড়ি প্রস্তুত করে আহার করে পুনরায় স্টেশনে গাড়িতে উঠলেন। রাত্রি বারটার সময়ে বাঁকিপুরে নেমে স্টেশনের বাইরে দোকানে বিশ্রাম করে প্রত্যূষে গয়ার গাড়িতে উঠলেন। কাশীপুর বাগান ত্যাগ করে অবধি বিবেকানন্দের মুখে বুদ্ধদেব, তাঁর অনির্বচনীয় ত্যাগ, বৈরাগ্য, সত্যলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, তাঁর ঘোরতর কঠোর সাধনা, অবশেষে বহুজন্মদুর্লভ বোধিজ্ঞান বা নির্বাণলাভ—এই সকল কথা ছাড়া অন্য কোন কথা ছিল না।

বেলা এগারটার সময়ে গয়ায় পৌঁছে স্বামীজী বললেন, "চল, ফল্গুতে স্নান করা যাক।" স্টেশন থেকে ফল্গু প্রায় এক মাইল পথ। ফল্গু বালুকাময়, মধ্যে অতি সংকীর্ণ স্রোত, জানুপরিমাণ জল অতি স্নিগ্ধ নির্মল। স্নান করতে করতে বিবেকানন্দ আবার বললেন, "আয়, রামচন্দ্র যেমন বালির পিণ্ড দিয়েছিলেন, আমরাও তেমনি বালির পিণ্ড দিই।" সকলে তা-ই করে নিকটবর্তী একটি শিবালয়ে এসে সকলে মিলে ডালরুটি রেঁধে ভোজন করলেন। একটু বিশ্রামের পর বিকালে বুদ্ধগয়া যাত্রা করলেন। প্রায় চার ক্রোশ হেঁটে সন্ধ্যার পর সেখানে উপস্থিত হলেন ও আহারান্তে ধর্মশালায় রাত্রি যাপন করে পরদিন প্রত্যূষে বোধিমন্দির দর্শন করতে গেলেন। ললিতবিস্তর ও অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থ স্বামীজীর বিশেষরূপে পড়া ছিল। সেইসকল গ্রন্থে বুদ্ধদেবের সাধনাবস্থায় তাঁর যেরূপ প্রগাঢ় সত্যপিপাসা ইত্যাদি ভাবের উদ্রেকের কথা বিবৃত আছে, বোধিমন্দিরে উপস্থিত হয়ে বিবেকানন্দের স্মৃতিতে সেইসকল ভাব যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। তাঁর সঙ্গিগণের মনে হলো যেন তাঁরা বুদ্ধদেবের সমসাময়িক লোক; সকলেই বুদ্ধদেবের ভাবে একেবারে বিভোর হলেন।

মন্দিরের প্রথম তলে উচ্চ প্রস্তরময় আসনের উপর বুদ্ধদেবের যে ধ্যানমূর্তি স্থাপিত, তার সম্মুখে বিবেকানন্দ দুই গুরুভ্রাতার সঙ্গে পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে গভীর ধ্যানস্থ হলেন। প্রায় দুঘণ্টা ধ্যানের পর উঠে আগত মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে অনেক কথাবার্তা বললেন। স্বামীজীর সঙ্গে আলাপে মোহন্ত মহারাজ বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আপনারা যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকুন। ভোজনাদি

মঠে গিয়েও করতে পারেন বা অনুমতি হলে এখানেও পাঠিয়ে দিতে পারি।" স্বামীজী বললেন, "আমরা মঠে গিয়েই ভোজন করে আসব।" আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তিনজনে বোধিমন্দিরের চারপাশে যা যা দেখবার আছে সমস্ত দেখলেন। মঠ ও অন্যান্য স্থানও দেখলেন।

সন্ধ্যার পর যখন বোধিমন্দির একেবারে জনশূন্য ও নির্জন হলো, তখন বিবেকানন্দ গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে বোধিদ্রুমের নিচে প্রস্তর-নির্মিত আসনোপরি উপবিষ্ট হয়ে পুনরায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ ধ্যানের পর হঠাৎ বালকের মতো কেঁদে উঠে পাশের গুরুভ্রাতাকে দুই হাত দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। গুরুভ্রাতা চমকে উঠে কারণ জিজ্ঞাসা করবেন, এমন সময় স্বামীজীকে পুনরায় গভীর ধ্যানে মগ্ন দেখে তিনি বিরত হলেন।

তিনদিন এইভাবে বোধিমন্দিরে বাস করবার পরে একদিন স্বামীজী ফল্গুর পূর্বধারে মোহন্তের যে শাখা মঠ আছে, তা দেখতে যান এবং সেখানে সেই রাত্রি থেকে পরদিন পুনরায় বোধিমন্দিরে ফিরে আসেন। এই সময় তাঁর গুরুভ্রাতাদের মধ্যে একজন বললেন যে, পীড়িত গুরুদেবের অজ্ঞাতসারে তাঁরা চলে এসেছেন, এজন্য কাশীপুরে সকলেই তাঁদের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবেন। এজন্য এখন তাঁদের কলকাতায় যাওয়া আবশ্যক বোধ করছেন। স্বামীজীর যেন চমক ভাঙল। তিনি সুপ্তোত্থিতের মতো উত্তর করলেন, "তবে চল, হেঁটে কলকাতায় যাওয়া যাক। কত নতুন নতুন দৃশ্য দেখা হবে, নানা রকম অবস্থার ভিতর দিয়ে যাওয়া হবে, অনেক জ্ঞান জন্মাবে।" কিন্তু আবার চিন্তা করে বললেন যে, পদব্রজে গেলে অনেক বিলম্ব হতে পারে, তাতে সকলের উৎকণ্ঠা আরও বাড়বে। এজন্য সকলে ট্রেনে করেই কলকাতায় ফিরলেন। কাশীপুর বাগানে উপস্থিত হয়ে গুরুচরণে প্রণাম করলেন, গুরুদেবের আর আনন্দের সীমা রইল না। গুরুভ্রাতাগণও আনন্দে নৃত্য করতে করতে হরিসংকীর্তন আরম্ভ করলেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবী

জয়পুরে স্বামীজী

সেটা ১৮৯০ অথবা ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দ।

কবে সেই দণ্ডকমণ্ডলুধারী নগ্নপদ গৈরিকবাস—তখন অখ্যাত, পরে বিশ্ববিখ্যাত অপূর্বদর্শন তেজস্বী সন্ন্যাসী কোন্ পথে জয়পুরে এসেছিলেন? কোন ধর্মশালায় অথবা খেতড়ি-মহারাজের জয়পুর প্রাসাদেই সে সময়ে ছিলেন?

সেই সময়েই মহারাজা তখনকার বিখ্যাত কোন গায়িকার গান শুনতে স্বামীজীকে আহ্বান করেন এবং স্বামীজী বাঈজীর সঙ্গীত শুনতে অনিচ্ছুক হন। পরে মহারাজার আগ্রহে একটু বসেন।

তাঁর দ্বিধার ভাব দেখে গায়িকা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন একটু। তবু গাইলেন, কবি সুরদাসের একটি বিখ্যাত গান—

প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো।
সমদরশী হ্যায় নাম তিহারো (তুমারো)।...
ইক লোহা পুজা মে রাখত ইক রহত ব্যাধ ঘর পরো,
পারশকে মন দ্বিধা নহী হৈ, দুহু এক কাঞ্চন করো।
ইক নদিয়া ইক নার, কহাবত মৈলো নীর ভরো—
জব্ মিলি দোনো এক বরণ ভয়ে সুরসুরি নাম পরো।...

গান শুনে সন্ন্যাসীর সহসা ভাবান্তর হলো। সন্ন্যাসীর এ ভেদজ্ঞান কেন? নর-নারী, সতী-নর্তকী—ভেদাভেদ কেন হবে তাঁর?

এর আগে আবু পাহাড়ে খেতড়ি মহারাজের মন্ত্রী জগমোহনলালজী তাঁকে দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে নিজের প্রভুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

কোন কোন বইতে দেখি, এ গানটি খেতড়ি রাজার জয়পুর-ভবনেই তিনি শোনেন। কিন্তু আমার অত হিসাব-নিকাশের তারিখের ভাবনা ভাবার দরকার নেই। ঠাকুরের কথাতেই আছে, "মিছরি রুটি আড় করেই খাও আর সিধে করেই খাও, মিষ্টি সমানই লাগবে।" মহাপুরুষের কথাও তাই। যেভাবেই শুনি, যাঁর মুখেই শুনি, তার মধুরতার সীমা নেই।

স্বামীজীর জয়পুরে যাওয়ার কথা শুধু কানেই শুনেছিলাম—বাবার কাছে, কাকার কাছে, পিসিমা ও মার কাছে। আমার তখনো জন্ম হয়নি। প্রায় ৭০ বছর আগের কথা, যখন স্বামীজী জয়পুরে গেছেন, সম্ভবতঃ ১৮৯২।৯৩ খ্রীস্টাব্দে।

হয়তো খেতড়ি-মহারাজের প্রাসাদে থাকার সময়েই আমার পিতা স্বামীজীকে দর্শন করেছিলেন। সেটাই সম্ভব। নইলে জয়পুরের বাঙালীরা এর আগে তাঁর কোন খবর

জানতেন না, কিংবা রাখতেন না। খেতড়ি-রাজার ভবনে ঐ বাঙালী-সন্ন্যাসীর আবির্ভাব সম্ভবতঃ তাঁদের কৌতূহলী করেছিল।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে একদিন বাবা-পিতামহদের খাবার সময় ছোটরা আমরা ভূত দেখা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছি, সেদিন বাবার কাছে প্রথম শুনি স্বামীজীর কথা ; তিনি কোন কোন সময়ে অশরীরীর দেখা পেয়েছিলেন। ছোটবেলায় কৌতূহল মিটে গিয়েছিল, স্বামীজীর আর কোন কথাই শুনতে আগ্রহ করিনি। শুনিওনি। শুনলে হয়তো কিছু 'অমৃত কথা' শুনতে পেতাম।

কিন্তু কে জানে সময় ও সুকৃতির গতি।

এতকাল পরে মাকে জিজ্ঞাসা করি, "মা, তুমি কি স্বামীজীকে দেখেছিলে?" মার অনেক বয়স, থাকেন প্রবাসে জয়পুরে। বহুদিন কাছাকাছি ছিলাম। আশ্চর্য! তখন এ প্রশ্ন মনে ওঠেনি! আসলে এই হলো সুকৃতি আর অকৃতির রহস্য। সৎকথাও সুকৃতি না থাকলে শোনা হয় না!

তবু মার কাছেই শুনি : মার তখন ষোল-সতের বছর বয়স। সে সময়ে সেকালের মেয়েদের কোনখানেই বেরুনোর প্রথা ছিল না।

বাড়ির বৈঠকখানা তখন চালাঘরে, সেই ঘরেই স্বামীজী বসেছিলেন।

মেয়েরা—মা, ঠাকুরমা, পিসিমা, অন্য আত্মীয়েরা সকলে পাশের একটি ঘরে চিকের আড়ালে বসে ঐ জগদ্বিখ্যাত সন্ন্যাসীকে দর্শন করেছিলেন। আর শুনেছিলেন কয়েকটি গান। সেই গানের কথাই তিনি বললেন। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব-চরিতের' বিখ্যাত গান—

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই
 কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি
 কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই। ইত্যাদি

প্রকাণ্ড গানটি। স্বামীজীর কণ্ঠও যেমন, ভাবও তেমনি—কে না জানে! এবং শ্রোতা ও শ্রোত্রীরাও জীবনে সে-গান ও সে-দিনের কথা ভুললেন না। তখন স্বামীজী 'বিবেকানন্দ'ও হননি। মেঘাবৃত সূর্য অনাবৃত হয়নি তখনো।

কে জানত ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মতো ঐ সন্ন্যাসীর দীপ্তি আর মহিমা? যখন ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে এক মুহূর্তে জগদ্বাসী আশ্চর্য হয়ে তাঁর দিকে চাইল, সেদিন বোধহয় ঐ প্রবাসী মানুষগুলি ও অন্তঃপুরবাসিনীরাও পরম বিস্ময়ে তাঁর জয়পুরবাসের ঐ ক-দিনের কথা মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিলেন। গান আরও দু-তিনটি হয়েছিল :

এল কৃষ্ণ এল ওই, বাজল বাঁশরী
রাধা-অভিলাষী, 'রাধা' বলে বাঁশী
 বাঁশী ডাকে তোরে, ওঠ লো কিশোরী।

এটিও গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলার গান।

গাইলেন আর একটি গান—

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে ॥

আর কোন কথা বলবার লোক আজ আর কাছাকাছি বেঁচে নেই।

সহসা শুনলাম, এক পিসিমা বললেন, তিনি তাঁর জননীর কাছে (আমার পিতামহীর কাছে) শুনেছেন। তখন আমাদের বাড়ি হয়নি। বৈঠকখানা একটি 'চারচালা'র মতো ঘরে ছিল। গভীর রাত্রে সন্ন্যাসী গাইছেন সেইখানে বসে—

'নিবিড় আঁধার মাঝে মা তোর চমকে অরূপ-রাশি।'

ভাবি, সে সময়ে তিনি ওই বাড়িতে ছিলেন দু-এক দিন কি? এতদিন পরে সে-কথা আমার মাকে জিজ্ঞাসা করি। মা বললেন, তিন-চার দিন তিনি ঐ বাড়িতে ছিলেন; এবং সেই গৃহস্বামীর নাম সংসারচন্দ্র সেন। মায়েরা স্বামীজীকে চোখে দেখেছিলেন, কিন্তু বাইরে আসেননি সেকালের প্রথা-মতো।

তবু মুগ্ধ বিস্ময়ে আনন্দে শুনি, তবু তো দেখেছিলেন। আমরা যে-দেখায় বঞ্চিত হয়েছি, সে-দর্শন তাঁদের হয়েছিল। জন্মালে বা বেঁচে থাকলেই যে মানুষের মহাপুরুষ-দর্শন হয়, তাও তো হয় না দেখি। কেননা শ্রীশ্রীমাও তো দীর্ঘ দিন এই ঘরের পাশে কলকাতাতেই উদ্বোধন লেনে কতদিন বাস করে গেছেন। তাঁকে দর্শন করাও তো হতে পারত।

স্বামী নিরাময়ানন্দ

স্বামীজীর সন্ধানে

বড় হয়ে যখন জানলাম, স্বামীজীকে দেখেছেন, এমন অনেকেই কাছাকাছি আছেন, তখন তাঁদের দেখবার জন্যে মন ব্যাকুল হলো। বেলুড় মঠে গিয়ে প্রথমেই দেখতে পেলাম 'জ্ঞানমহারাজ'কে—শুনলাম ইনি স্বামীজীর শিষ্য; শুধু দেখলাম—কথা কিছু হলো না। শুধু এই ভাব নিয়ে চলে এলাম—স্বামীজীকে দেখেছেন, এমন একটি মানুষ দেখেছি আজ।

একদিন শুনলাম—কলকাতায় অদ্বৈত আশ্রমে আছেন স্বামী শুদ্ধানন্দ, তিনিও স্বামীজীর শিষ্য, জিগ্যেস করলেই স্বামীজীর কথা বলেন। একদিন গিয়ে প্রণাম করে একটু-আধটু কথার পর মনের দুঃখ জানালাম, "মহারাজ, আমাদের ভাগ্যে আর স্বামীজীকে দেখা হলো না, কয়েক বছর আগে জন্মালে বেশ দেখা যেত।" তিনি বললেন, "না দেখেছ, ভালই হয়েছে।" "কেন মহারাজ?" "আমার কি হয়েছিল শুনবে?—

তখন মঠে স্বামীজীর সেবা করি, দিনরাতই কাছে কাছে থাকতে হয়। একদিন সকালে এক ছোকরা এসে বললে, 'স্বামীজী আপনি তো দেশ-বিদেশে নতুন এক ধর্ম প্রচার করে এলেন?' স্বামীজী বললেন, 'নতুন ধর্ম বলতে তুমি কি বোঝ?' সে বললে, 'আপনি তো—গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়—এসব মানেন না?' স্বামীজী বললেন, 'সে কি! আমি রোজ গঙ্গাস্নান করি, তা সম্ভব না হলে একটু গঙ্গাজল মাথায় দিই, মুখে দিই।' সে তো সব বুঝে চলে গেল। একটু পরে এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ এসে বলছেন, 'স্বামীজী, আপনি তো আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মই সারা পৃথিবীতে প্রচার করে এলেন? ধন্য আপনি!' স্বামীজী বললেন, 'সনাতন হিন্দুধর্ম বলতে আপনি কি বোঝেন?' 'এই কাশীতে মরলে মুক্তি হয়—এটা তো আপনি মানেন?' 'না, জ্ঞান বিনা মুক্তি হয় না। জ্ঞান হলে যেখানেই মরুক মুক্তি হবে। জ্ঞানের চর্চা করুন, আমি সর্বদা জ্ঞানের চর্চা করি।' আমি তো দুজনের সঙ্গে দু-রকম কথা শুনে অবাক। নতজানু হয়ে বললুম, 'স্বামীজী, ওরা তো যে যার চলে গেল, আমি যে পড়লাম মহা ফাঁপরে?' স্বামীজী বললেন, 'তুই জিগ্যেস কর, তোকে তোর মতো উত্তর দেব।' আমি বললুম, 'বলুন তাহলে কিসে মুক্তি?' স্বামীজী গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়ে বললেন—'গুরুসেবায়'।"

কিছুদিন পরে শুনলাম, বেলুড় মঠে এসেছেন মিস ম্যাকলাউড—স্বামীজীর মার্কিন শিষ্যা। একদিন বিকেলে গেলাম দেখা করতে—তখন শীতকাল। ৯০ বছরের বৃদ্ধা শাল মুড়ি দিয়ে একটা হেলানো চেয়ারে বসে আছেন, শ্রদ্ধা নিবেদন করে বসতেই বললেন, "ওরা আমায় বুড়ো বলে, আমি বুড়ো নই, আমি ৪৫ বৎসরের তরুণী! কেন জান? স্বামীজীর সঙ্গে যেদিন আমার দেখা হয়েছিল, সেই দিনটি থেকে আমি আমার জীবন গণনা করি।" বলতে বলতে এই অপূর্ব তরুণী—যাঁর দৃষ্টি ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ণ, যাঁর মুখমণ্ডলের চর্ম কুঁচকে গেছে অথচ শিশুর মতো—সোজা হয়ে বসতে চেষ্টা করলেন, মুখমণ্ডল এক অপূর্ব হাসিতে ভরে গেল—বললেন, "ওরা বলে, আমি স্বামীজীর শিষ্যা—না, তিনি আমায় তাঁর 'বন্ধু' বলতেন। জান, স্বামীজীকে যারা ভালবাসে; তাদের বড় ভালবাসি। তাই তো বছর বছর ছুটে আসি।"

বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখছি, স্নেহমধুর কণ্ঠে তিনি বললেন, "বল, স্বামীজীর সম্বন্ধে কি শুনতে চাও?" বললাম, "এক কথায় স্বামীজীকে বর্ণনা করুন!" মহীয়সী চমকে উঠলেন, "আমিও যে স্বামীজীকে বলেছিলাম—ঐ কথা তাঁর গুরুসম্বন্ধে। তিনি যা উত্তর দিয়েছিলেন, তাই আমি তোমাকে বলব—'Not that he was holy, but he was Holiness!'—তিনি পবিত্র ছিলেন, এ-কথা বললে ঠিক হবে না, তিনি ছিলেন পবিত্রতা! আরও তিনি ছিলেন শক্তি—সাহস, আরও তিনি ছিলেন যা কিছু ভাল, তার সমষ্টি।"

আরও কিছুদিন পরে গেছি সারগাছি। শুনেছিলাম স্বামী অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর অনুজোপম গুরুভ্রাতা—স্বামীজীগত প্রাণ, স্বামীজীর প্রিয় গঙ্গাধর বা 'গ্যাঞ্জেস'।

স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর ভ্রমণের অনেক কাহিনীই শুনলাম। বড় ইচ্ছা তাঁর মুখে স্বামীজীর আসল কথাটি শুনি। একদিন ম্যাজিক ল্যান্টার্ন দেখানো হচ্ছে—পর্দায় উঠেছে স্বামীজীর ছবি—"শিকাগো-মূর্তি"। ৭০ বছরের বৃদ্ধ ১৭ বছরের তরুণের মতো সোজা হয়ে বলছেন, "দেখেছিস, স্বামীজীর ছবি—অভয়ের প্রতিমূর্তি! স্বামীজীই এ যুগের প্রত্যক্ষ দেবতা—তাঁর কথাই লোকে আগে বুঝবে, তাঁর ভিতর দিয়ে ঠাকুরকে বুঝবে। ঠাকুরের দেখা পাওয়া সহজ নয়, স্বামীজীর দেখা পাওয়া সোজা। তিনি তোমার আশে-পাশে ঘুরছেন, দেখা দেবেন বলে।"

শ্রীজলধর সেন

[ভারতবর্ষ (১৩৪২) এবং মাসিক বসুমতী (১৩৪৩) পত্রিকায় জলধর সেনের স্বামীজীর 'স্মৃতি-তর্পন'-কে কেন্দ্র করে যে বাদ-প্রতিবাদ হয়েছিল তা এখানে সম্পূর্ণতঃ উপস্থাপিত করা হলো। বিষয়টি যেহেতু বিতর্কমূলক তাই কোনরূপ সম্পাদনা ছাড়াই (বানানের ক্ষেত্রেও) রচনাগুলি প্রকাশ করেছি।—সম্পাদক।]

জলধর সেন—খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক। 'গ্রামবার্তা', সাপ্তাহিক বসুমতী', 'হিতবাদী', 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনা বা সহ-সম্পাদনায় নিযুক্ত ছিলেন। পরে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর (১৩২০—১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) মাসিক 'ভারতবর্ষ" পত্রিকার সম্পাদক। সুতরাং বর্তমান স্মৃতিকথাটি যখন তিনি ভারতবর্ষে লেখেন, তখন তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

স্মৃতি-তর্পণ

আজ যাঁর স্মৃতি-তর্পণ করব, জগতের শিক্ষিত জনগণের কাছে তাঁর পরিচয় দেওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক। তিনি সর্বজনপরিচিত ছিলেন, এবং এখনও অসংখ্য জনগণের পূজা গ্রহণ করছেন।—তিনি সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় যুগমানব—মহামানব (superman), ভারতের উজ্জ্বলরত্ন স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের কথা মনে হলেই আমার হিমালয়ের কথা মনে পড়ে। নগরাজ হিমালয়ের যেমন তুলনা নেই—মানবশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দও তেমনই তুলনার অতীত।

ঊনবিংশ শতাব্দের শেষার্ধে যে কয়টি জ্যোতিষ্ক ভারতগগন আলোকিত ও উদ্ভাসিত করেছিলেন—শুধু ভারতবর্ষ কেন—সমগ্র সভ্যজগত যাঁদের অবদানে উন্নতশীর্ষ হয়েছিল—স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের অন্যতম। নিতান্ত অযোগ্য ভক্ত হলেও আজ বহুদিন পরে তাঁর স্মৃতির তর্পণ করতে বসেছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যিনি নরলোকে আমাকে ভাই বলে আলিঙ্গন করেছিলেন, আজ ত্রিদিবধামে অবস্থিত হলেও তাকে তিনি ভুলতে পারেন নি, তার শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করবেনই।

আমার বন্ধুগণের অনেকের ধারণা—নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) আমার সহপাঠী ছিলেন।—তা ঠিক নয়। আমি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৭৯ অব্দে এপ্রিল কি মে মাসে জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ (অধুনা স্কটিশ চার্চ্চেস) কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করি। আমার সহপাঠী ছিলেন —বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়। আর কে কে আমার সহপাঠী ছিলেন তাহা এখন আর মনে নাই। এতকাল পরে তাঁদের মধ্যে আর এক জনের নামই আমার মনে পড়ছে—তিনি বর্ধমান রাজষ্টেটের সহযোগী ম্যানেজার ছিলেন—নাম হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়। আমার সেই কলেজ সময়ের বন্ধু হৃষীকেশ আজ কয়েক মাস হ'ল পরলোকগত হয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৭৯ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮০ অব্দে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করেন। কয়েক মাস অধ্যয়নের পরই শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগ করেন। সে বৎসরটি তাঁর বৃথা যায়। ১৮৮১ অব্দে তিনি জেনারেল এ্যাসেমব্লিজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮৮০ অব্দের শেষে এফ, এ, পরীক্ষা দিয়ে আমি কলেজ থেকে বের হই। ১৮৮১ অব্দে আমি ঐ কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করি। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ আমার সহপাঠী ছিলেন না। আমার কলেজ ত্যাগের পরবৎসর তিনি কলেজে প্রবেশ করেন। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে পড়েন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি, হবার সম্ভাবনাও ছিল না; তবে তাঁকে আমি অনেক দিন দেখেছি এবং তিনিই যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাও জানতাম।

বাল্যকাল থেকেই আমি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতাম। আমাদের গ্রামে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের আমলে আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের অন্তর্ভুক্ত হয়, তার পর যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমাদের ব্রাহ্মসমাজও "সাধারণ" —দল-ভুক্ত হয়। স্কুলে পাঠের সময় থেকে কলেজের পাঠ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত 'আমি যথা-নিয়মে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিতাম। কলেজ ত্যাগের পরও যখনই কলকাতায় আসতাম তখনই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রবি-বাসরীয় উপাসনায় যোগদান করতাম এবং সে সময় যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁরা প্রায় সকলেই আমাদের গ্রামের সমাজের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে যেতেন। সেই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারপর কলিকাতাতেও 'তাঁরা আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। ব্রাহ্মসমাজের এই রবি-বাসরীয় উপাসনা উপলক্ষে একটি যুবক মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মসঙ্গীত গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন। আমার ব্রাহ্ম বন্ধুদের কাছে তাঁর পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি নরেন্দ্রনাথ

দত্ত। তিনি তখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু ঐ ধর্ম্মমতের প্রতি তাঁর আস্থা জন্মেছিল।

বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমি তাঁর গান শুনেছিলাম—তাঁর পরিচয়ও পেয়েছিলাম—কিন্তু সে সময় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার কথাও আমার মনে হয় নি এবং তিনি যে ভবিষ্যতে স্বামী বিবেকানন্দ হবেন, এ কথাও তাঁর হাবভাবে আমি বুঝতে পারি নি। কথাবার্ত্তা হলেও না হয়, হয় তো কিছু জানতে পারতাম, কিন্তু তাও তো হয় নি। আমার তখনকার স্মৃতি একটি সুন্দর-কায় আয়ত চক্ষু সু-গায়ক নবীন যুবকেই পর্য্যবসিত হয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ একযুগ চলে গেল। সংসার-নাট্যমঞ্চে কত নাটকের কত ভূমিকাই গ্রহণ করলাম। কত ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। কত আশা-আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুমের মত আকাশেই বিলীন হয়ে গেল। কত ক্ষণস্থায়ী সুখ জীবনান্ত স্থায়ী গভীর মর্ম্ম-বেদনায় পরিণত হয়ে রইল। কত আনন্দের সংসার গড়তে গেলাম। দেখতে দেখতে সে সকল শ্মশান-ভস্মে পরিণত হয়ে গেল। আমার জীবনের এই ১২ বৎসরের কাহিনী—কি হবে আর সে সকলের আলোচনা করে?

সংবাদপত্রাদিতে শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে নানা কথা পড়তে লাগলাম। দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে অনেক জ্ঞানী গুণী মনীষী যাতায়াত আরম্ভ করলেন। পরমহংসদেবের কৃপা অনেকে লাভ করে ধন্য হয়ে গেলেন। আমিও দু'একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। কত সাধু, কত ভক্তের সমাগম দেখেছিলাম। আমি দুয়োরের কাছ থেকে প্রণাম করেই বিদায় নিয়েছিলাম। কোন দিন তাঁর দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছিল কি না সন্দেহ—কৃপা-দৃষ্টি তো মোটেই নয়।

সেই সময় শুনতে পেতাম—নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে খুব বেশী যাতায়াত করছেন। লোকের মুখে আর খবরের কাগজে এই সব সংবাদ পেতাম এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত যে পরমহংসদেবের পরম ভক্ত হয়েছেন এবং কিছুদিন পরে সংসার ত্যাগ করে স্বামী বিবেকানন্দ নাম ধারণ করেছেন, এ সংবাদও বন্ধুবান্ধবগণের মুখে অথবা সংবাদপত্রের মারফত পেয়েছিলাম। সাক্ষাৎ পরিচয় কিন্তু তখনও হয় নি, হবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না।

তারপর এক অভাবনীয় ঘটনায় আমি স্বামী বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্তের নহে) দর্শন লাভ করি। দর্শনলাভ মাত্র; পরিচয় হয় নি, আর তখন পরিচয় হবার অবস্থাও তাঁর ছিল না।

এ কিন্তু প্রায় ১২ বৎসর পরের কথা। আমি তখন হিমালয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাই নি। যাবার কল্পনাও মনে হয় নি। কালীকান্ত সেন নামে বরিশাল জেলাবাসী—এক শিক্ষিত ভদ্রলোক ডেরাডুনে এক ইংরাজী স্কুল খুলেছিলেন। আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম ডেরাডুনে এই মাষ্টারজীর আশ্রয় লাভ করি।

মাষ্টারজী আমাকে পেয়ে বসলেন। তিনি বললেন—হিমালয়ে বেড়াতে হয় বেড়াবেন, যখন যেখানে ইচ্ছা যাবেন—একটা আড্ডার তো দরকার। যখন আমার এখানে এসেছেন, হিমালয়-ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে এইখানে এসেই বিশ্রাম করবেন এবং সেই বিশ্রামসময়ে আমার স্কুলে ছেলেদের পড়াবেন।

ওরে বাবা!—সেই মাষ্টারী। এই যে দেশ ত্যাগ করে এলাম—তুমি কিনা বিনা-টিকিটে আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে এই হিমালয়ের সানুদেশে ডেরাডুনেও উপস্থিত। কি করি,—ভদ্রলোক খেতে দেবেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেবেন, শীতবস্ত্র দেবেন—তার পরিবর্ত্তে যখন ডেরাডুনে থাকব তখন তাঁর স্কুলের ছেলেদের অঙ্কশাস্ত্রে গাধা বানাব।

অবান্তর হলেও, সেই সময়ে ডেরাডুনের করণপুরে যে বাঙ্গালী উপনিবেশ ছিল—সেই উপনিবেশের কয়েকজন বাঙ্গালীর নাম উল্লেখ করছি। পাঁচ সাত দিন এই উপনিবেশের বাঙ্গালীদের গৃহে যাতয়াত করে আমি একটা জিনিষ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। হিমালয়ের বক্ষে ডেরাডুনের ক্ষুদ্র এক পল্লীতে এতগুলি "কালী"র সমাবেশ আমার কাছে আশ্চর্য্য ঠেকেছিল।

সর্ব্বপ্রথম নাম করতে হয়—কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের। ইনি জি টি সার্ভে অফিসের প্রধান কম্‌পিউটার ছিলেন এবং আমি যতদূর জানি, গণিতে অত বড় বিশেষজ্ঞ সে সময়ে বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ ছিলেন না। পারি তো তাঁর কথা অন্য সময়ে বলব।

দ্বিতীয় "কালী"—কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইনি কালীমোহন বাবুর সহকারী ছিলেন। আর এক "কালী"—কালীকান্ত কর। ইনি ফরেষ্ট আফিসের "বড়বাবু" ছিলেন। আর "কালী"—আমার মাষ্টারজী—কালীকান্ত সেন। পঞ্চম "কালী" ছিলেন কালীপদবাবু। ইনি খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

এই পাঁচ "কালী"তেই পর্য্যাপ্ত হয় নি—সেই সময়ে যিনি বৎসরে ছয় মাসের অধিক ডেরাডুনে থাকতেন—তিনি কলিকাতার প্রথিতনামা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়।

এ ছাড়া আরও অনেকে ছিলেন, তাঁদের নাম করতে গেলে তালিকা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে দুইটি নাম বিশেষভাবে আমার মনে পড়ছে—শশিভূষণ সোম মহাশয় ও রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র দেব। সেই সময়ের একজন মাত্র এখনও বেঁচে আছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ সোম। আমাদের সময়ের তিনিই এখন বেঁচে আছেন এবং তিনি সেখানকারই অধিবাসী হয়েছেন। এখন ডেরাডুনে যাঁরা বেড়াতে যান বন্ধুবর বিমলাচরণ তাঁদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও সাহায্য করেন।

ও কথায় আর কাজ নেই। আমি মাষ্টারজীর স্কুলে পড়াই, খাই-দাই থাকি। প্রায় শনিবারেই অপরাহ্ন দু'টার সময় স্কুল থেকে ফিরে এসে জুতা, পায়জামা, লম্বা কোট এবং প্রকাণ্ড পাগড়ী—আমাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য দেবানন্দের জিম্মা করে দিয়ে একখানি কম্বল ও লাঠি নিয়ে মাষ্টারজীকে নমস্কার করে মহানন্দে বেরিয়ে পড়তাম।

দুই তিন দিন বনে জঙ্গলে ঘুরে আবার ফিরে এসে পাগড়ী মাথায় দিয়ে ছেলেদের মাথার ভেতর সাইমালটেনিয়াস্ ইকোয়েশন্ ঢোকাতে আরম্ভ করতাম।

এই সময়ে এক শনিবারে বেলা একটা কি দুটোর সময় লাঠি আর কম্বল নিয়ে নগ্নপদে বেরিয়ে পড়ি। সে দিন আমার লক্ষ্যস্থান ছিল—হৃষীকেশ।

আমার আর কিছু যোগ্যতা থাকুক আর না-ই থাকুক—সে সময়, এখনকার মত, যদি হাঁটার প্রতিযোগিতা থাকত—তাহলে আমি গর্ব্ব করে বলতে পারি যে, সব প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হতাম। পথে নামলে আমার পা দুখানিতে কে যেন পাখা বেঁধে দিত।

আমি সেদিন এমন হেঁটেছিলাম যে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হৃষীকেশে পেঁছাই। অবশ্য তখন গ্রীষ্মকালের দিন—কাযেই খুব বড়।

হৃষীকেশে তখন সন্ন্যাসীদের আহার যোগাবার জন্য গুটি দুই তিন সদাব্রত ছিল। এখন কি হয়েছে জানি নে। সেই সদাব্রতের লোকরা হৃষীকেশের গঙ্গার চড়ার ওপর ঘাস পাতা বাঁশ খড় দিয়ে ছোট ছোট কুটীর তৈরি করে রাখতো। সন্ন্যাসীরা এসে সেই সব কুটীরে বাস করতেন। কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করতে হ'ত না। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে সন্ন্যাসীরা সদাব্রতের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হতেন। সদাব্রতের লোকরা দুখানি মোটা রুটী, আর খোসা সুদ্ধ কলায়ের ডাল—আর কখন কখন বা তার সংগে একটু নুণ আর লঙ্কাও দিতেন। সন্ন্যাসীরা তাই নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে আহার করতেন, তারপর অঞ্জলিপুরে জল পান করতেন। রুটী দুই খানিই বটে—কিন্তু সেই দুই খানিই তৈরী করতে আধ সের তিন পোয়া আটা লাগতো। সুতরাং সদাব্রতওয়ালাদের আর সন্ধ্যাবেলার আহার জোগাতে হ'ত না, আর তার প্রয়োজনও হ'ত না।

আমার যদিও তখন লম্বা চুল ও দাড়ী, কম্বল ও লাঠিমাত্র সম্বল, তা হলেও আমি কখনও হৃষীকেশের কোন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করি নি। সন্ন্যাসীর আসন আমি অধিকার করব কেন?

আমি একটা সদাব্রতের বারান্দাতেই কি শীত কি গ্রীষ্ম পড়ে থাকতাম।

আমার তো আশ্রয়স্থানের ভাবনা ছিল না—কাযেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে হৃষীকেশে পেঁছে আমি সন্ন্যাসীদের কুটীরগুলি দেখতে গেলাম। সেইখানে ঘুরতে ঘুরতে একটি কুটীরের সম্মুখে দেখি—জন তিন চার বাঙ্গালী সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মুখে প্রবল উৎকণ্ঠা দেখে আমি হিন্দীতেই জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে। তাঁরা বল্লেন—স্বামী বিবেকানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসী মৃত্যুশয্যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ'! হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে এই ক্ষুদ্র কুটীরে পরমহংসদেবের পরম স্নেহপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ! আমি সন্ন্যাসীদের অনুমতি নিয়ে সেই কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। কুটীর-মধ্যস্থ ধুনীর অস্পষ্ট আলোকে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখলাম। তিনি তখন সংজ্ঞাশূন্য।

হিমালয়ের বনজঙ্গলের মধ্যে অনেক অসাধু সন্ন্যাসীও দেখেছি, আবার অনেক সাধু সন্ন্যাসীরও দর্শনলাভ হয়েছে। তাঁদের কারো কারো বিশেষ ক্ষমতাও দেখেছি। এমনও দেখেছি, কোন সন্ন্যাসী কোন্ একটা গাছের পাতা দিয়ে মুমূর্ষু রোগীর জীবন ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর কাছে সে পাতার সন্ধানও নিয়েছি। সে দিন স্বামী বিবেকানন্দকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে এবং তাঁর চিকিৎসার কোন সুবিধাই নাই দেখে আমার সে গাছের কথা মনে হ'য়েছিল। আমি তখন তাড়াতাড়ি কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে সেই প্রায়ান্ধকারে গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় সেই গাছের অনুসন্ধান করে সৌভাগ্যক্রমে অনতি-দূরেই সেই গাছ পাই। তারি ২।৩টি পাতা এনে হাতে রগড়ে রস বের করে স্বামীজীর মুখে দিলাম। দেখিই না কেন—সন্ন্যাসীর এ গাছ ফলপ্রদ হয় কি না। তারপর ঔষধের ফলাফল দেখবার জন্য কুটীরের বাইরে বালুকার আসনে বসে রইলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্বামীজী চৈতন্য লাভ করলেন। তাঁর সঙ্গীরা তখন কুটীরের ভিতরে ছিলেন। স্বামীজী ধীরে ধীরে বল্লেন—তোরা ভয় পাচ্ছিস কেন। আমি মরব না—আমার অনেক কায আছে। আমি দুয়ারের কাছ থেকে এই কথা শুনে, ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আমার সদাব্রতে এসে উপস্থিত হলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভের, বোধ হয়, ১০।১৫ দিন পরে সংবাদ পেলাম, সানুচর বিবেকানন্দ স্বামী ডেরাডুনে এসে সেখানকার কালীবাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সেই কথা শুনে আমি, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ এবং তাঁর খুল্লতাত সারভে অফিসের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী বন্ধুবর শশিভূষণ সোম—এই তিন জন কালীবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই রাত্রিতেই তাঁদের করণপুরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম, তাঁরা পরদিন প্রাতঃকালে আসতে স্বীকার করলেন।

শশিভূষণ সোম মহাশয়ের বাড়ী খুব বড় ও সুন্দর। সেইখানেই তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করলাম। শশীবাবুদের সকলেরই অফিস ছিল। কাজেই সন্ন্যাসীদের পরিচর্য্যার ভার—বাইরে আমি এবং ভিতরে শশীবাবুর বাড়ীর মেয়েরা গ্রহণ করলেন।

স্বামীজী এবং তাঁর সহচরবর্গকে আমরা কয়েকদিন আটকে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বামীজী অস্বীকার করলেন। তিনি বল্লেন—দ্বিতীয় তিথি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে নেই—সেই জন্যই নাম "অতিথি"। তার পরদিন প্রত্যূষে তাঁরা চলে গেলেন। স্বামীজী বলে গেলেন, তিনি উত্তরাপথ ত্যাগ করে এই বার দক্ষিণাপথে যাবেন।

সেই যে এক দিন তাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম, সে কথা আজও মনে আছে। গভীর ধর্ম্মচর্চ্চা, শাস্ত্রালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, সারা দিনরাতের মধ্যে তাঁর মুখে শুনতে পেলাম না। সুধু গান, সুধু আনন্দ, সুধু স্ফূর্ত্তি, সুধু রহস্যজনক গল্পগুজব। তিনি সেই দিনও রাতটা আমাদের একেবারে আনন্দের হিল্লোলে আপ্লুত করে রেখেছিলেন। এ স্মৃতি কি ভুলবার!

এই যে আমাদের সেদিনকার এত আনন্দ—এর মধ্যে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও হৃষীকেশে আমার সেই অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীজীর দর্শনলাভের কথার উল্লেখ

করি নি। স্বামীজী ত ন'নই, তাঁর সঙ্গীরাও ডেরাডুনে আমাকে চিনতে পারেন নি —পারবার কথাও নয় ; তখন আমি নগ্নপদ কম্বল-সম্বল সন্ন্যাসী, আর ডেরাডুনে আমি ভদ্রবেশী, প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী মাষ্টারজী। তা ছাড়া হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে প্রায়ান্ধকারে মানুষ চেনাও শক্ত ; সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে স্বামীজীর পরলোকগমন উপলক্ষে একদিন মাত্র টাউনহলের শোক-সভায় হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করতে না পেরে হৃষীকেশের ঘটনার সামান্য উল্লেখ মাত্র করেছিলাম। আজ তাঁর স্মৃতির তর্পণ-প্রসঙ্গে কথাটা এতদিন পরে উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারলাম না।

[ভারতবর্ষ, ২৩শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ফাল্গুন, ১৩৪২]

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক, সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকার প্রথমে সহ-সম্পাদক, পরে সম্পাদক ; নন্দনকানন মাসিক পত্রিকারও সম্পাদক। 'নন্দনকানন সিরিজ' বা 'রহস্যলহরী সিরিজ'-এর রবার্ট ব্লেকের গোয়েন্দা-কাহিনী অনুবাদ করে বাংলার কিশোর-সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

জলধর স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা

প্রথম প্রস্তাব

নিজের বিস্মৃত স্মৃতির তর্পণ করিতে গিয়া, রায় জলধর সেন বাহাদুর কেবল যে 'বসুমতীতে' আমার নিয়োগ সম্বন্ধেই সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, তাহা বলিলে ভুল হইবে। আত্মপ্রসাদ লাভের আশায় তিনি স্মৃতি-পূজার অন্তরালে আত্মপ্রশংসার প্রয়াসে যে অশোভন স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোন কারণেই উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ তিনি প্রবন্ধ-সূচনায় পূজনীয় পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের অনুরোধের নামে বিনয়ের আবরণে যখন উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন—"বাংলা সাহিত্যিকদিগের ইতিহাসের কিছু মাল-মসলা জমা হবে" (ভারতবর্ষ ১৩৪২ কার্ত্তিক ৭১০ পৃষ্ঠা) তখন সে ইতিহাস যাহাতে অসত্য-বিহীন—অসঙ্গতি-দোষ-বর্জ্জিত হয়, সাহিত্যিকগণের সে চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়—একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করি। আমার 'সেকালের স্মৃতি' কথায় বরোদা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর 'বসুমতীর' সেবা-ভার গ্রহণের কথা এবার স্থানাভাবে বলিতে পারিলাম না ; এবং সেই জন্যই জলধর বাবুর জীবন-স্মৃতির অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের—এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত নয় পর্ব্ব মধ্যে আদি—সভা —বন পর্ব্বের মহিমা-কীর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল।

বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদানপ্রসঙ্গে রায় বাহাদুর স্মৃতিতর্পণে লিখিয়াছেন ঃ—

"প্রায় শনিবারেই অপরাহ্ন দু'টার সময় স্কুল থেকে ফিরে এসে···একখানি কম্বল ও লাঠি নিয়ে···মহানন্দে বেরিয়ে পড়তাম।···

"এই সময় এক শনিবারে বেলা একটা কি দুটোর সময় লাঠি আর কম্বল নিয়ে নগ্নপদে বেরিয়ে পড়ি। সেদিন আমার লক্ষ্যস্থান ছিল—হৃষীকেশ।···

"পথে নামলে আমার পা দুখানিতে কে যেন পাখা বেঁধে দিত। আমি সেদিন এমন হেঁটেছিলাম যে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হৃষীকেশে পেঁছাই। অবশ্য তখন গ্রীষ্মকালের দিন।—কাযেই খুব বড়।" ('ভারতবর্ষ' ১৩৪২, ফাল্গুন, ৩৪৫ পৃষ্ঠা।)

গ্রীষ্মের "সন্ধ্যার প্রাক্কাল" বোধ হয় ৭টা পর্য্যন্ত ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ণ পাঁচ ঘণ্টায় জলধর বাবু ডেরাডুনের করণপুর হইতে হৃষীকেশে পেঁীছিয়াছিলেন। করণপুর হইতে ডেরাডুনের দূরত্ব বাদ দিলেও রেলপথে ডেরাডুন হইতে হৃষীকেশ ৫০ মাইল; পাহাড়ের পাকদণ্ডীর জঙ্গল পথে ৩৬ মাইল। এই সংক্ষেপ পার্ব্বত্য রাস্তা দিয়া জলধর বাবু তাঁহার "পাখা বাঁধা" চরণযুগল পরিচালনা করিয়া থাকিলেও কত সময় লাগিবার কথা, তাহা তাঁহার বর্ণিত 'হিমালয়' ভ্রমণ-কাহিনী হইতে দেখিবার প্রয়াস পাইতেছি।

(১৮৯০ খৃষ্টাব্দের) "৬ই মে বুধবার রাত্রি সাড়ে চারটার সময় দেশত্যাগের বন্দোবস্ত। তৎপূর্ব্বেই বন্ধুবর্গ বিদায়ের জন্য সমবেত হলেন।···সূর্য্যোদয় হ'ল! আমরা হৃষীকেশের পথে আসতে লাগলুম।···পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করে বেলা ১১টার সময় 'খালু' নামে একটা ছোট গ্রামে উপস্থিত হ'লুম।···অপরাহ্ন ৫টার সময় আবার যাত্রা আরম্ভ কল্লুম।···সন্ধ্যার সময় আমরা 'ভোগপুরে' উপস্থিত হলুম।···ভোগপুরের ধর্ম্মশালায় রাত্রিবাস করা গেল।···"

"৭ই মে বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে উঠে আবার যাত্রা।···বেলা একটার সময় হৃষীকেশে পেঁছিলুম।···অপরাহ্নে রৌদ্রের তেজ কমলে যাত্রা করে লছমন ঝোলায় উপস্থিত হতে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল।" ('হিমালয়' ১০ম সংস্করণ ৪—৭ পৃষ্ঠা)

হৃষীকেশ ও লছমনঝোলার মধ্যবর্ত্তী স্বর্গাশ্রমেই সদাব্রত ও সাধুদের ঝুপড়ী—এই স্থানেই স্বামীজী ছিলেন।

পরিব্রাজকরূপে মাষ্টার মহাশয় যে পথ দুই দিনে অন্ততঃ ১৮ ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়াছিলেন—এক শনিবারের বারবেলায় তাহাই পাঁচ ঘণ্টায় মারিয়া দিলেন। এ যেন সেই, "কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ'মাসের পথ, ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব-মনোরথ"। আশা করি, সে-দিনও তাঁহাকে যে পদ-যুগলের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল—এ দিনেও সেই পাখাবাঁধা পা দু'খানিই চালিত করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি অবশ্যই বলিতে পারেন "আমি গর্ব্ব ক'রে বলতে পারি যে, সব প্রতিযোগিতায় ফার্ষ্টক্লাশ ফার্ষ্ট হতাম।"

(ভারতবর্ষ ১৩৪২, ফাল্গুন, ৩৪৫ পৃষ্ঠা) এইবার হৃষীকেশে মুমূর্ষু স্বামীজীর জীবনদানের জন্য জলধর বাবুর মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা প্রদান কাহিনীটি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"সন্ধ্যার প্রাক্কালে হৃষীকেশে পেঁছে আমি সন্ন্যাসীদের কুটীরগুলি দেখতে গেলাম। সেইখানে ঘুরতে ঘুরতে একটি কুটীরের সম্মুখে দেখি, জন তিন চার বাঙ্গালী সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মুখে প্রবল উৎকণ্ঠা দেখে আমি হিন্দীতেই জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে ? তাঁরা বল্লেন—স্বামী বিবেকানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসী মৃত্যুশয্যায়।

"স্বামী বিবেকানন্দ! হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে এই ক্ষুদ্র কুটীরে পরমহংসদেবের পরম স্নেহপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ! আমি সন্ন্যাসীদের অনুমতি নিয়ে সেই কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। কুটীরমধ্যস্থ ধুনীর অস্পষ্ট আলোকে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখলাম। তিনি তখন সংজ্ঞাশূন্য।

"হিমালয়ের বনজঙ্গলের মধ্যে অনেক অসাধু সন্ন্যাসীও দেখেছি, আবার অনেক সাধু সন্ন্যাসীরও দর্শনলাভ হয়েছে। তাঁদের কারো কারো বিশেষ ক্ষমতাও দেখেছি। এমনও দেখেছি, কোন সন্ন্যাসী কোন একটা গাছের পাতা দিয়ে মুমূর্ষু রোগীর জীবন ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর কাছে সে পাতার সন্ধানও নিয়েছি। সে দিন স্বামী বিবেকানন্দকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে এবং তাঁর চিকিৎসার কোন সুবিধাই নাই দেখে আমার সে গাছের কথা মনে হ'য়েছিল। আমি তখন তাড়াতাড়ি কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে সেই প্রায়ান্ধকারে গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় সেই গাছের অনুসন্ধান করে সৌভাগ্য-ক্রমে অনতিদূরেই সেই গাছ পাই। তারি ২।৩টি পাতা এনে হাতে রগড়ে রস বের করে স্বামীজীর মুখে দিলাম। দেখিই না কেন,—সন্ন্যাসীর এ গাছ ফলপ্রদ হয় কি না। তার পর ঔষধের ফলাফল দেখবার জন্য কুটীরের বাইরে বালুকার আসনে বসে রইলাম। প্রায় আধঘণ্টা পরে স্বামীজী চৈতন্য লাভ করলেন।"

('ভারতবর্ষ" ১৩৪২, ফাল্গুন, ৩৪৬ পৃষ্ঠা।)

তাহার স্মৃতিতর্পণে এই অলৌকিক কাহিনী পাঠ করিয়া, কোন কোন কৌতূহলী পাঠক বিস্ময়াগ্রহে অধীর হইয়া, রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—দাদা, এমন মৃত-সঞ্জীবনী ঔষধ যখন জানেন, তবে এই সুদীর্ঘকাল এ কর্মভোগ করিতেছেন কেন ? সন্ন্যাসি-মুখ-শ্রুত এই এক জীবন-প্রদায়িনী ঔষধের কৃপায় অনায়াসে ত' এখনও ধনকুবের হইতে পারেন ;—সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মুমূর্ষু রোগীর জীবন দান করিয়া জগতের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করিতে পারেন।

আমরা শুনিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলাম, কোন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের সনির্বন্ধ নুরোধে অবশেষে আমাদের এই সার্ব্বজনীন দাদাকে মৃত-সঞ্জীবনী ঔষধের নামটি

বেফাঁস করিতে হইয়াছে! এই ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর দেশে অবশ্যই নামটি শুনিয়া কেহই চমকিত হইবেন না—মুমূর্ষু-দেহে জীবনীশক্তি-সঞ্চারিণী তুলসী—তুলসীগাছের পাতা। আকার ও প্রকার-ভেদে তুলসী-গাছের নানা জাত—বিভিন্ন নাম আছে। কোন জাতের তুলসীপত্র প্রাণশক্তি-প্রদায়ী, তাহা অবশ্য 'দাদা' এখনও খুলিয়া বলেন নাই—মনের নিভৃত গুহায় সংগুপ্ত রাখিয়াছেন। কিন্তু জলধর বাবুর পূর্ব্বে এবং পরবর্ত্তী ৪৬ বৎসরের ভিতর অসংখ্য বাঙ্গালী কেদার-বদ্রিনাথ-দর্শনে হিমালয়ে গিয়াছেন—যাত্রা-সূচনায় হৃষীকেশের গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় (?) পরিভ্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্য-ক্রমেই তাঁহারা এই পার্ব্বত্য-প্রদেশে ও গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় (?) তুলসী গাছ দেখিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছেন। তুলসীপত্র দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই বদ্রিনারায়ণের পূজার জন্য যাত্রিগণ শুষ্ক তুলসীপত্র লইয়া যান।

এ মৃত-সঞ্জীবনী ঔষধ কিন্তু যাহাই হউক—মাষ্টার মহাশয়—জলধর বাবুর অপার পরম কৃপায় মুমূর্ষু স্বামী বিবেকানন্দ পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিলেন। সেজন্য আজ সমগ্র বিশ্ব—ধর্ম্মজগৎ—বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসিমণ্ডলী—সংখ্যাতীত ভক্তসম্প্রদায় যে রায় বাহাদুরের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে চিরঋণী, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অলৌকিক শক্তিবলে জলধর বাবু পায়ে পাখা বাঁধিয়া পাঁচ ঘণ্টার ভিতর হৃষীকেশে উপস্থিত হইয়া—সেই প্রায়ান্ধকার গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় (?) ঔষধ সন্ধান করিয়া, যদি স্বামীজীর মুমূর্ষু দেহে জীবনীশক্তি সঞ্চার না করিতেন—তবে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইত কি?—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতের প্রবর্ত্তন হইত কি? —ভবিষ্যৎ জীবনে স্বামীজী চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসভায় বক্তৃতা করিয়া সনাতন ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী জগতে উড্ডীন করিতে পারিতেন কি?—বহু মুমুক্ষুকে তিনি শান্তি ও মুক্তির সন্ধান দিতে পারিতেন কি? রায় বাহাদুরের সে অসীম মহিমার সুযোগ্য ধন্যবাদ প্রদানের উপযুক্ত প্রশংসা কীর্ত্তন করিবার মত ভাষা আমি ত' 'অনুবাদ সাহিত্যিক' জানিই না—সাহিত্য-রত্নাকর নিঃশেষ করিলেও, বোধ হয়, যথাযোগ্য গুণগান সম্ভব হইবে না।

পরিব্রাজক-জীবনে হৃষীকেশে সাধনাকালে স্বামীজী এক দিন সহসা প্রবল জ্বর ও ডিফথিরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া অচৈতন্য হইলে এক জন বৃদ্ধ সাধুর প্রদত্ত ঔষধে তাঁহার চৈতন্য-সঞ্চার হইয়াছিল। ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা—স্বামীজীর অন্ততঃ দশখানি জীবনচরিতে এই ঘটনাটি বিবৃত হইয়াছে। স্বামীজীর গুরুভ্রাতৃবৃন্দের এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিশিষ্ট ভক্তগণের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া, বহু বৎসরের ঐকান্তিক সাধনায় আলমোড়া মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম হইতে স্বামীজীর যে সুপ্রকাণ্ড জীবনী প্রকাশিত—তাহা যে প্রামাণ্য গ্রন্থ; সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। আমরা সেই প্রামাণ্য জীবনী হইতে ঘটনাটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"In Hrishikesh the Swami and his 'gurubhais' passed a considera-

ble time, dwelling in a hut raised by their own hands, near the temple of Chandeswar Mahadev, and living on 'madhukari bhiksha'. Again the resolve of performing severe Sadhanas came upon the Swami, but as ill-luck would have it, hardly had he proceeded with them for a time than a severe illness frustrated all his intentions. One day the gurubhais' went into the jungle to cut bamboos for the purpose of extending their huts, and returning the Swami was suddenly attacked with high fever and diphtheria. He grew worse and worse until his brethren were in terror. One day his pulse sank lower and lower, and the life-blood turned, as it were, into perspiration. His body became cold, his pulse seemed to have stopped. Indeed, it appeared as though the Leader's last moments had come. He lay unconscious on his rude bed composed of a couple of coarse blankets on the ground. His Brothers overwhelmed with grief and anxiety, were at a loss to know what to do. In those days no help could be found within a great distance. While they were thus in the utmost agony of mind, praying that his life be spared and theirs taken in its stead, they heard a faint rustling sound caused by a movement in the grasses outside. And before the entrance of the hut stood a Sadhu. They invited him in, and when he heard the case he brought out from his wallet some honey and powdered Pichul, and mixing them together, forced the medicine into the Swami's mouth This seemed to be the one remedy, a god-send as it were.

"After a while the Swami opened his eyes and attempted to speak. One of the gurubhais' put his ear near his mouth and heard him utter in a feeble, almost inaudible voice, the words, 'Cheer up, my boys ! I shall not die ! Gradually he recovered and later he told his companions that during that unconscious state of his body, he had seen that he had a particular mission in the world which he must fulfil and that until he had accomplished that mission, he would have no rest".—The Life of the Swami Vivekananda, Vol. II, pp. 120-121.

তপস্যা-সঙ্গী গুরুভ্রাতৃগণ-প্রদত্ত বিবরণ হইতে সঙ্কলিত স্বামীজীর এই প্রামাণ্য

জীবনীগ্রন্থ নির্ভরযোগ্য হইলে স্বীকার করিতে হয়, সন্ন্যাসী ঝুলি হইতে যে ঔষধ দিয়া স্বামীজীর চৈতন্যসঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা পিপুল-চূর্ণ ও মধু—জলধর বাবু বর্ণিত গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় (?) সংগৃহীত গাছের পাতা বা তুলসী-পাতা নহে, এবং সময়টাও দনমান—'সন্ধ্যার প্রাক্কাল' নহে।

বেলুড় মঠ-পরিচালিত উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে সংক্ষিপ্ত জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণের ৩৩ পৃষ্ঠা হইতে সম্ভবতঃ জলধর বাবু এই কাহিনীটি আত্মসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও দেখা যায়,—

"এমন সময়ে সহসা একজন 'প্রাচীন' সাধু তথায় উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার নিকট ঔষধ ছিল। সেই ঔষধ প্রয়োগ করায় স্বামীজীর দেহে চৈতন্যোদয় হইল।"

ডেরাদুন হইতে যাত্রাকালে জলধর বাবু 'লাঠি আর কম্বল' লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু গেরুয়া পরিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমরা পরে দেখিতে পাইব, জলধর বাবুর বয়স তখন ৩০ বর্ষের বেশী নহে। সুতরাং স্বামীজীর গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে 'প্রাচীন সাধু' বলিয়া ভুল করিবেন কেন ?

অক্ষম ভাষার সাহায্যে ত' রায় বাহাদুরের এই অমর কীর্ত্তির যথাযোগ্য সম্বর্ধনা করিতে পারিলাম না। অঙ্কপাত করিয়া, তাঁহার জীবন-ইতিহাসের তারিখ নির্ণয়ে যদি সে গরিমা সমুজ্জ্বল করিতে পারি, সেজন্য প্রয়াস পাইতেছি। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় অঙ্কশাস্ত্রের পরম পণ্ডিত—

'মাসিক বসুমতী' ১৩৪০ আশ্বিন, ১০২৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন,—

"এই বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত উচ্চ গণিতের চর্চ্চা ক'রে আনন্দ পাই।"

আর কাকার কথায় আমি স্বীকার করিয়াছি যে "ওঁকে আমি গো-মুখ্খু" ('মাসিক বসুমতী' ১৩৪০ শ্রাবণ, ৫৭৮ পৃষ্ঠা)।

বিশ্ববিশ্রুত-নাম সাহিত্যিক রায় জলধর সেন বাহাদুরকে "কোন কোন বন্ধু ধারাবাহিক ভাবে লিখতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তা হলে যে জীবন-চরিত হয়, তা আমি এখন পারছিনে।" তাই তাঁহার জীবনী-সঙ্কলনের সুবিধার জন্য বিশেষ ঘটনাগুলির সন তারিখ তাঁহার স্মৃতিতর্পণ হইতে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

আদিপর্ব্ব—ছাত্রজীবনে

"আমি (জলধর সেন) জন্মগ্রহণ করি ১৮৬০ অব্দের ১লা চৈত্র, শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ঐ ১৮৬০ অব্দের—২রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার। আর তৃতীয় জন বাংলা দেশের

সুপ্রসিদ্ধ প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—জন্মগ্রহণ করেন ঐ ১৮৬০ অব্দেই—আমার অন্নপ্রাশনের দিন।” ('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ চৈত্র, ৫৩৯ পৃষ্ঠা)

“আমি তখন আমাদের গ্রামের (নদীয়া জেলার কুমারখালী) বাঙ্গালা স্কুলে পড়ি। সাল, তারিখ আমি ঠিক বলতে পারবো না ; মনে হচ্চে, সে হয় ত' ইংরাজী ১৮৭০ কি ১৮৭১ অব্দ। তখন আমার বয়স এই এগার বারো বৎসর।···

“আমি যখন বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময় একদিন শুনতে পেলাম যে, বিদ্যালয়সমূহের ইনস্পেক্টর ভূদেববাবু দু-একদিনের মধ্যে আমাদের স্কুল পরিদর্শনে আসছেন।—ভূদেববাবু কুষ্টিয়া থেকে নৌকাযোগে আসছেন, যদিও তখন আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে রেলপথ গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গিয়েছিল।···ভূদেববাবু ইংরাজী স্কুলেই পরিদর্শন করছেন আর আমরা বাঙ্গালা স্কুলের ছাত্রেরা দুয়ারের দিকে চেয়ে বসে আছি।···কাঙ্গাল হরিনাথের আদেশ পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে আবৃত্তি করলাম।···আমাদের সময়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'মিত্রবিলাপ কাব্য'।···আমার ঐ আবৃত্তি শুনে মহাত্মা ভূদেবের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হলো।···ভূদেব বাবু আমাকে আশীর্ব্বাদ করে যে বইখানি দিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানি ইংরাজি বই। তার নাম Spectator।”

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ পৌষ, ৪৩—৪৫ পৃষ্ঠা)

ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী সংখ্যায় (১৩৪২ মাঘ, ১৭৮ পৃষ্ঠা) রায়বাহাদুর লিখিয়াছেন,—

“গোয়ালন্দের উকিল, মোক্তার, বড় বড় কর্ম্মচারী সকলেই আমাকে ভালবাসতেন ও আদর করতেন, কারণ আমি বাল্যকাল থেকেই গোয়ালন্দে ছিলাম। গোয়ালন্দের মাইনর স্কুল থেকেই পরীক্ষা দিয়ে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাই, তারপর অবস্থা-বিপর্য্যয়ে (?) সেই মাইনর স্কুল এনট্রান্স স্কুলে পরিণত হলে আমি শিক্ষক হয়ে আসি।”

জলধর বাবুর গ্রাম কুমারখালি নদীয়া জেলায়—গোয়ালন্দ ফরিদপুর জেলায়—রেলপথে আসিতে এখন সওয়া এক ঘণ্টা লাগে—তখনও তাহাই লাগিবার কথা ; তিনি স্বগ্রাম কুমারখালির স্কুলে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে প্রাইজ পাইলেন, অথচ গোয়ালন্দে বাল্যকাল হইতে আছেন—গোয়ালন্দের মাইনর স্কুল হইতে তিনি পরীক্ষা দিয়া ৫৲ বৃত্তি পাইলেন কিরূপে? ইহার কোনটি সত্য, বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা একই বৎসরে—একই সময়ে গৃহীত হইত বলিয়াই ত' জানি। রায় বাহাদুর জীবনী-লেখককেও এখানে ধাঁধায় ফেলিলেন। তাহার পর—

“সে হচ্ছে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের কথা···এ সালটা মনে আছে, কারণ এইবার আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই,···আমি পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম আমাদের গ্রামের স্কুল

থেকে, আর দ্বিজেন্দ্রলাল পরীক্ষা দিয়েছিলেন কৃষ্ণনগর থেকে···আমি ও দ্বিজেন্দ্রলাল (অমর কবি ডি. এল. রায়) একই ব্রাকেটে স্কলারশিপ পেয়েছি।

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ কার্ত্তিক, ৭১১ পৃষ্ঠা)

"১৮৭৮ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হলাম। অভাবনীয় সৌভাগ্যের বশে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হয়েও মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি পেলাম, কারণ সেবার প্রথম বিভাগে বেশী ছাত্র উত্তীর্ণ হতে পারেনি,—বিশেষতঃ প্রেসিডেন্সী বিভাগের বৃত্তিসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকাতেই আমার সৌভাগ্যলাভ হয়েছিল।"

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ অগ্রহায়ণ, ৯৩১ পৃষ্ঠা)

উপসংহারে অশ্রু-বিসর্জ্জন-প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কথায় ব্রাকেট-মাহাত্ম্যের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসে কৌশল প্রয়োগ করিতেও রায় বাহাদুর বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলিতেছেন,—

"তারপর কলকাতায় কতবার দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রতিবারেই সকলকে শুনিয়ে তিনি বলেছেন—জলধর বাবু আর আমি এক ব্রাকেটে। এ ব্রাকেট ভাঙ্গবে না।

"হায়, সেই ব্রাকেটই ভেঙ্গে গেল তেইশ বৎসর আগে। একদিন অকস্মাৎ আমার শৈশবের (?) বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল ব্রাকেট ভেঙ্গে চলে গেলেন।"

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ কার্ত্তিক, ৭১৬ পৃষ্ঠা)

কিন্তু ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারীর 'কলিকাতা গেজেট' এই ব্রাকেটটি দিতে ভুল করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রেসিডেন্সী বিভাগের সেকেন্ড গ্রেড এবং কুমারখালি এইচ, ই, স্কুল হইতে জলধর সেন থার্ড গ্রেড জুনিয়ার স্কলারসিপ পাইয়াছেন। মধ্যে অনেকগুলি ছাত্রের নামের ব্যবধান ছিল বলিয়াই বোধ হয় এ ব্রাকেট দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দের ক্যালেন্ডারেও এই ব্র্যাকেটটি বর্জ্জন করিয়া, একইরূপে মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা উপাধির বর্ণানুক্রমে নাম সাজাইতে গিয়া R-এর কোটায় দ্বিজেন্দ্রলালের এবং S-এর কোটায় জলধর বাবুর নাম ছাপিয়া বিষম ত্রুটি করিয়াছেন। সেই জন্যই আজ তাঁহার ব্রাকেট ভাঙ্গার আক্ষেপ ভিত্তিহীন।

"১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এল-এ ফেল করে তার পর-বৎসরই আমাকে চাকরীতে প্রবিষ্ট হ'তে হয়েছিল।···১৮৮১ অব্দে পঁচিশ টাকা বেতনে গোয়ালন্দ স্কুলে থার্ড মাস্টার হয়েছিলাম।···খাই দাই, ছেলে পড়াই, পূর্ব্ব-সংস্কারবশে স্বদেশীও করি, ছেলেদের

নিয়ে সভাসমিতি করি, বড়দের সঙ্গে মিশে দেশোদ্ধারেরও পাণ্ডাগিরি করি।...সেই যে ৮১ অব্দে ২৫৲ বেতনে মাষ্টারী আরম্ভ করেছিলাম, ৮৫ অব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আমার সে মাইনে আর বাড়েনি। ঐ সালের শেষভাগে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়ল। তাঁরা আমার বেতন ৫৲ টাকা বাড়িয়ে দিলেন। এ যে আমার যোগ্যতার পুরস্কার, সে কথা মনে করবেন না...কারণ...সেই বৎসরের প্রথম ভাগে আমি বিবাহ করি।" ('ভারতবর্ষ' মাঘ ১৩৪২, ১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠা)

সভাপর্ব্ব—কংগ্রেসে

"...১৮৮৬ অব্দের শেষভাগে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা নগরীতে জাতীয়মহাসমিতি (কংগ্রেসের) দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে আমি গোয়ালন্দের জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে যাই।" ('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ মাঘ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

রায় বাহাদুরের এই নির্ব্বাচনে বাঙ্গালীর মানবুদ্ধি—মুখরক্ষা হইল। বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের সুবর্ণ-জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব করিবার সুযোগে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং মাদ্রাজী ডাক্তার পট্টভী সীতারামিয়া তাঁহার রচিত কংগ্রেস ইতিহাসে যে বলিয়াছেন, প্রাথমিক যুগের কংগ্রেসে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতেন না, রায় বাহাদুরের এই উক্তি তাহার মূর্ত্তিমান প্রতিবাদ। সহানুভূতি—করুণা উদ্রেক-প্রয়াসে জলধর বাবুর ছাত্র-জীবনে দুঃখের অবধি নাই—কিন্তু ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের মুদ্রিত রিপোর্টের ১৩৩ পৃষ্ঠায় তাঁহার পরিচয়—ভূস্বামী—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের গোয়ালন্দ শাখার প্রতিনিধি। তিনি নিশ্চয়ই এ মিথ্যা পরিচয় দেন নাই। 'কংগ্রেস ও বাঙ্গলা' নামে সম্প্রতি যে শতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ১১৬—১১৭ পৃষ্ঠার প্রদত্ত তালিকায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের গোয়ালন্দ শাখার নাম নিশ্চয়ই ভ্রমক্রমে প্রদত্ত হয় নাই। তাহা হইলেও গোয়ালন্দের স্বয়ংসিদ্ধ প্রতিনিধি—ভূস্বামিরূপেই জলধর বাবু যে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে হাজির হইয়াছিলেন, তাহাতে ত' সন্দেহের কারণ নাই। বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইবার বহু পূর্ব্বেই যে জলধর বাবু 'দেশোদ্ধারেরও পাণ্ডাগিরি' করিয়া বিভিন্ন সভায় বক্তৃতার প্রলয় ঝঞ্ঝায় পদ্মার প্রবল প্রবাহের মতই যে গোয়ালন্দে দেশাত্মবোধ উচ্ছ্বসিত করিয়াছিলেন—তাহাতেই বা সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

বনপর্ব্ব—হিমালয়ে

"ডিসেম্বর মাসের শেষে কংগ্রেস হয়ে গেল। জানুয়ারীর প্রথম ভাগে (অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে)...শনিবারের প্রত্যূষে মেল গাড়ীতে অশ্বিনীবাবু গোয়ালন্দ ষ্টেশনে পেঁীছিলেন।...এই দুই দিনে অশ্বিনীকুমার আমার ক্ষুদ্র কুটীরকে একেবারে আনন্দের

স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।—পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার নয়মাস পরে এক দিন অপরাহ্নে গোলদীঘির ধারের ফুটপাথের উপর অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে আমার দেখা—আমি তখন হিমালয়ের যাত্রী।...সব খবর শেষ হয়ে গিয়েছে।..."

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ মাঘ, ১৮০-৮৫ পৃষ্ঠা)

তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসের পূর্ব্বে তিনি হিমালয় যাত্রা করেন নাই। এই প্রসঙ্গ-সূচনায় তিনিও তাহাই লিখিয়াছেন—

"সে ইংরাজী ১৮৮৭ অব্দের কথা—প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমি তখন এল-এ ফেল করে ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দে মাষ্টারী করি।"

('ভারতবর্ষ' মাঘ, ১৩৪২ সাল, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

তাঁহার জীবন-স্মৃতির আলোচনা এবারের মত স্থগিত রাখিয়া এইবার মূল প্রসঙ্গের অনুসরণ করি,—কোন্ সময়ে জলধর বাবু স্বামীজীর জীবন দান করিয়াছেন? স্মৃতি-তর্পণে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"তারপর এক অভাবনীয় ঘটনায় আমি স্বামী বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্তের নহে) দর্শনলাভ করি। দর্শনলাভ মাত্র; পরিচয় হয় নি, তখন পরিচয় হবার অবস্থাও তাঁর ছিল না।"

"এ কিন্তু প্রায় ১২ বৎসর পরের কথা। আমি তখন হিমালয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাই নি। যাবার কল্পনাও মনে হয় নি।...আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম ডেরাডুনে...মাষ্টারজীর আশ্রয় লাভ করি।...ওরে বাবা! সেই মাষ্টারী! এই যে দেশ ত্যাগ করে এলাম—তুমি কিনা বিনা টিকিটে আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে এই হিমালয়ের সানুদেশে ডেরাডুনেও উপস্থিত!" ('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ ফাল্গুন, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু রায় বাহাদুরের স্মৃতিতর্পণের অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের এই দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী বনপর্ব্ব কোন্ বর্ষ হইতে গণনা করিব? জলধর বাবুর ১৮৮০-৮১ খৃষ্টাব্দের 'কলেজের পাঠসমাপ্তি পর্য্যন্ত'—'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রবিবাসরীয় উপাসনায় যোগদান' সময় হইতে দ্বাদশ বর্ষ গণনা করিলে ১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দ হয়; কিন্তু সে সময় ত' তিনি মহিষাদল রাজস্কুলের মাষ্টার এবং স্বামীজীও দাক্ষিণাত্য—বোম্বাই—খেতরি পরিভ্রমণ করিয়া আমেরিকাযাত্রী। জলধর বাবুর গোলদীঘির বিদায় পর্ব্ব ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে গণনা করিলে ১২ বৎসর পরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হয়। কিন্তু তিনি তখন ত' সশরীরে 'বসুমতী' কার্য্যালয়ে বিরাজিত।

"আমি ১৩০৪ সালের শেষে অথবা ১৩০৫ সালের প্রথমে বসুমতী আফিসে প্রবেশ করি ('ভারতবর্ষ' ১৩৪৩ আষাঢ়, ১২৩ পৃষ্ঠা)।

জলধর বাবু সাহিত্যিক ভায়ামহলে চিরদিন সুপ্রচার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার হিমালয়ে বনবাসপর্ব দ্বাদশবর্ষব্যাপী। সেইজন্যই বোধ হয় উচ্ছ্বাসের লম্ফ-কৌশলে এক যুগ—দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করিলেন। কিন্তু সময় নির্ণয়ের সুবিধার জন্য এই প্রসঙ্গে তিনি আর এক হদিস দিয়াছেন,—

"তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাই নি।"

তাঁহার বদরিকাশ্রম-ভ্রমণকাহিনী 'হিমালয়' পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে দেখি, তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে বুধবার রাত্রি সাড়ে চারটার সময় যাত্রা করিয়া—২৩ দিনে ২৯শে মে শুক্রবার বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন।

('হিমালয়' ৪ ও ২২৬ পৃষ্ঠা)

সুতরাং জলধর বাবু যে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের মে মাসের পূর্বেই সহসা হৃষীকেশে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর জীবন দান করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

জলধর বাবুকে তাঁহার জীবনের এই শ্রেষ্ঠ গৌরব হইতে বঞ্চিত করিবার জন্যই স্বামীজীর জীবনী-লেখকগণ বোধ হয় ষড়যন্ত্র করিয়া, হৃষীকেশে তপস্যাকালে স্বামীজীর জ্বরঘোরে অচৈতন্য হইবার তারিখটির উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত স্বামীজীর প্রামাণ্য জীবনী অনুসরণে তিনি কোন্ সময়ে গুরুভ্রাতৃগণ সঙ্গে হৃষীকেশে সাধনাকালে সাধুর প্রদত্ত ঔষধে চৈতন্যলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। এজন্য স্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবনের আনুপূর্বিক বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট রবিবার, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব লীলা সম্বরণ করেন।

"Sunday, August the sixteenth, eighteen hundred and eightysix,—the Master, breathing the most sacred word of the Vedas, entered Brahma-Nirvanam, passing into the uttermost peace" (Vol. I, page 430).

১৮৮৬ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ বরাহনগরে ছিল। "The Monastery was at Baranagore from the year 1886 to 1892". (Vol. II, page 15)

মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু নির্জ্জনে সাধনা করিবার জন্য প্রথমে স্বামী যোগানন্দ—অদ্ভুতানন্দ—ত্রিগুণাতীত (সারদা)—অখণ্ডানন্দ—পরে স্বামী সারদানন্দ—ব্রহ্মানন্দ—অভেদানন্দ—শিবানন্দ—কৃপানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিবৃন্দ তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইলেন। স্বামীজী, শশী মহারাজ (রামকৃষ্ণানন্দ) ও অন্যান্য গুরুভ্রাতৃগণ তখনও বরাহনগর মঠে থাকিয়া সাধন ভজন করিতে লাগিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত সিমুলতলা—বৈদ্যনাথ—আঁটপুর প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানে কয়েক দিনের জন্য গমন ব্যতীত স্বামীজী বরাহনগর মঠেই অবস্থান করিতেন।

"With the exception of several unimportant journeys, more in the nature of 'excursions' from the monastery, the Leader did not leave Baranagore until the year 1888 was well on the way. He had paid flying visits to Vaidyanath, Shimultola and for the second time to Antpur." [Vol. II, page 59]

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি সর্ব্বপ্রথম কাশী—অযোধ্যা—আগ্রা হইয়া পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। বেলুড় মঠে সংরক্ষিত এবং পত্রাবলী তৃতীয় ভাগের ১ ও ২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত—তাঁহার ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্টের পত্রে তিনি বৃন্দাবন হইতে লিখিতেছেন—"শীঘ্রই হরিদ্বার যাইব, বাসনা আছে।" ১৮৮৮, ২০শে আগষ্টের পত্রে স্বামীজী লিখিতেছেন—"গ—(স্বামী অখণ্ডানন্দ) দুইবার তিব্বত ও ভূটান পর্য্যন্ত গিয়াছিল। এই মাসেই বৃন্দাবন আসিবে। আমি তাহাকে দেখিবার প্রত্যাশায় হরিদ্বারে গমন কিছুদিন স্থগিত রাখিলাম।" গিরিগোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া, তিনি হাতরাসে কিছুদিন থাকিয়া, এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তকে (সদানন্দ স্বামীকে) প্রথম শিষ্যরূপে সঙ্গে লইয়া, হৃষীকেশ যাত্রা করিলেন। কিন্তু সদানন্দ স্বামী অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় স্বামীজী সত্বর হাতরাসে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। "But with his disciple ill, he was bound to give up the Kedar-Badri trip and even his life of 'tapasya' in Hrishikesh". (Vol. II, page 79)

এই সময় হৃষীকেশে কয়েক দিন অবস্থান-কালে স্বামীজী যে প্রবল জ্বরে অচৈতন্য হন নাই—সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন—সদানন্দ স্বামি-প্রদত্ত বিবরণই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

"I was ill and fainted with hunger and thirst. The Swami carried me on his shoulders for several miles, and thus undoubtedly saved me from certain death. On another occasion, like a syce he led the horse, which some one kindly lent us for the journey, across a mountain river which was very dangerous to ford, being extremely

swift, and slippery at the bottom....he carried my personal belongings, including my shoes, upon his head." (Vol. II, page 78)

যিনি কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রবল জ্বরে অচৈতন্য ছিলেন. তাঁহার পক্ষে এক জন যুবক-রোগীকে কয়েক মাইল বন্ধুর রাস্তা কাঁধে করিয়া আনা, অশ্ববল্গা ধরিয়া পার্ব্বত্যনদী ও অত্যন্ত ঢালু—বিপজ্জনক পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করা—শিষ্যের জুতাসহ দ্রব্যাদি মস্তকে বহন সম্ভবপর কি ?

গুরুভ্রাতৃগণের পত্র পাইয়া স্বামীজী হাতরাস হইতে বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসেন। কয়েক মাস পরে সদানন্দ স্বামীও বরাহনগর মঠে আসেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর, ১৮৮৯ ফেব্রুয়ারী—মার্চ্চ—জুন—জুলাই—আগষ্ট—সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর ১৩ই পর্য্যন্ত স্বামীজী যে বরাহনগর মঠে ছিলেন, তাহা বেলুড় মঠে সুরক্ষিত এবং পত্রাবলী তৃতীয়ভাগের ৩ হইতে ২৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁহার স্বহস্তে লিখিত পত্ররাজিতেই সুপ্রকাশ।

১৮৮৯ ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী বৈদ্যনাথে গিয়া কাশী যাইবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় যোগানন্দ স্বামীর কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া, তিনি এলাহাবাদে গমন করেন। পত্রাবলী তৃতীয় ভাগের ২৬—২৭ পৃষ্ঠায় এবং ৫ম ভাগের ৩ হইতে ১০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর বৈদ্যনাথের এবং ৩০শে ডিসেম্বর ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারীর প্রয়াগধামের পত্র ইহার প্রমাণ।

যোগানন্দ স্বামী আরোগ্য লাভ করিলে স্বামীজী কিছুদিন কাশীধামে থাকিয়া, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে পাওহারী বাবার সংগলাভের জন্য গাজীপুরে গমন করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে. ৩১শে জানুয়ারী—৪ঠা, ৭ই, ১৩ই, ১৪ই, ১৯শে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী—৩রা, ৮ই, ১২ই, ১৫ই, ৩১শে মার্চ্চ—২রা, প্রথম সপ্তাহ এপ্রিলে গাজীপুর হইতে স্বামীজীর লিখিত পত্রসমূহ পত্রাবলী ৩য় ভাগে ২৯ হইতে ৫৮ পৃষ্ঠায় এবং ৫ম ভাগে ১১ হইতে ২২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত। স্বামীজী যে এই সময়ে গাজীপুরে অবস্থান করিয়া, পাওহারী বাবার উপদেশ গ্রহণ করিতেছিলেন, তাঁহার স্বহস্তলিখিত এই পত্রগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গাজীপুরে অবস্থানকালে স্বামীজী অভেদানন্দ স্বামী হৃষীকেশে পীড়িত সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে কাশীতে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া, স্বয়ং কাশীতে আসিয়া সংস্কৃতে সুপণ্ডিত প্রমদাদাস মিত্রের অতিথি হইলেন। এই সময় কাশীতে ঠাকুরের প্রিয়তম গৃহী শিষ্য বলরাম বাবুর পরলোকগমন-সংবাদ পাইয়া, তিনি বরাহনগরে ফিরিয়া, দুই মাস মঠে ও বলরাম বাবুর বাড়ীতে অবস্থান করেন। পত্রাবলী ৩য় ভাগে ৫৯ হইতে ৭১ পৃষ্ঠায় তাঁহার বরাহনগর ও বলরাম বাবুর বাড়ী হইতে লিখিত—১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১০ই, ২৬শে মে—৪ঠা জুন—৬ই জুলাই তারিখের পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামীজীর স্বহস্তাক্ষরের পত্রগুলি আজও বেলুড় মঠে সংরক্ষিত।

স্বামী অখণ্ডানন্দ তিব্বত পরিভ্রমণ করিয়া, এই সময়ে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার মুখে তিব্বত—কাশ্মীর—কেদার-বদ্রিনাথের মহান্ সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাসময় বর্ণনা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া, স্বামীজী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত হিমালয় পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। ১৮৯০—৬ই জুলাই হিমালয় যাত্রার সূচনায় তিনি যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ ;—

"I had no intention to leave Ghazipur this time and certainly did not want to come to Calcutta but Kali's (অভেদানন্দ স্বামীর) illness made me go to Benares and Balaram's sudden death brought me to Calcutta. So Suresh Babu and Balaram Babu have both gone !......

"I intend shortly, as soon as I can get a portion of my fare, to go up to Almora and thence to some place in Gharwal on the Ganges where I can settle down for a long meditation. Gangadhar is accompanying me. Indeed, it was with this desire and intention that I brought him down from Kashmir...I am in fine health now..."

(Vol. II, pp. 101-102)

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা স্বামীজীর ভ্রমণসঙ্গী হইয়াছেন, কিন্তু বেলুড় মঠের বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট—ধর্মগুরু অখণ্ডানন্দ স্বামীই এই সময়ে স্বামীজীর সঙ্গী হইয়াছিলেন।

"At different times these different monks were the companions of the Leader in his travels in these days, but of all of them, the Swami Akhandananda remained with him for the longest period at a time, being with him from the end of July, 1890, till the latter part of the autumn of the same year." (Vol. II, page 61)

শালকিয়া ঘুসুড়ীতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পদধূলি লইয়া যাত্রা করিয়া, স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ স্বামী ১৮৯০ আগষ্ট মাসে ভাগলপুরে পৌঁছিয়া কয়দিন বিশ্রাম করেন। পরে বৈদ্যনাথে আসিয়া, তাঁহারা এক দিন শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, কাশী ও অযোধ্যা হইয়া পদব্রজে হিমালয়ের পাদদেশ নৈনিতালে উপস্থিত হন। নৈনিতালে স্বামীজী রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের ভবনে ৬ দিন আতিথ্য গ্রহণ করেন। নৈনিতাল হইতে আলমোড়ার পথে স্বামীজী ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিলেন, একজন ফকিরের প্রদত্ত একটি শশা খাইয়া তিনি তৃপ্ত হন। আলমোড়ায় পৌঁছিয়া

তাঁহারা হিমালয়-পরিভ্রমণকারী অপর দুই গুরুভ্রাতা—স্বামী সারদানন্দ ও কৃপানন্দের সহিত মিলিত হইয়া বদ্রীসার বাগানে কয়েক দিন অবস্থান করেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সংকলিত 'স্বামী সারদানন্দ' জীবনী-গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় বদ্রীসার বাগানে গুরুভ্রাতৃগণের মিলনসময়ের নিম্ন পত্রখানি আলমোড়া ডাকঘরের শীলে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯০ তারিখের প্রতিলিপিসহ প্রকাশিত হইয়াছে, কাশীর প্রমদাদাস মিত্রকে স্বামীজীর আলমোড়া আগমন সংবাদ দিবার জন্য শরৎ মহারাজ লিখিতেছেন :—

আলমোড়া, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯০

"মহাশয়—নরেন্দ্র ও গঙ্গাধর প্রায় ৬।৭ দিন হইল এখানে আসিয়াছে। অদ্য পুনরায় গাড়োয়ালের দিকে রওনা হইবে। নরেন্দ্র বার বার নিষেধ করাতে আপনাকে এত দিন উত্তর দিতে পারি নাই। তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। আমরাও নরেন্দ্রের সঙ্গে চলিতেছি। পত্রাদি কিছুকাল আর লিখিতে পারিব না। কারণ, তাহা হইলে আমাদিগকে সঙ্গে রাখিবে না।"···

গাড়োয়াল রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইয়া, কর্ণপ্রয়াগ অতিক্রম করিয়া, এক চটীতে বিশ্রামকালে স্বামীজী জ্বরে আক্রান্ত হন। সেই চটীতে তিন দিন বিশ্রাম করিয়া, রুদ্রপ্রয়াগের পরবর্ত্তী চটীতে তাঁহার আবার প্রবল জ্বর হয়। কাছারীর আমিন-প্রদত্ত কবিরাজী ঔষধে স্বামীজী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে তিনি তাঁহাকে দাণ্ডী ভাড়া করিয়া, শ্রীনগরে (গাড়োয়াল) পাঠাইয়া দেন। আলমোড়া হইতে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ১২০ মাইল পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছেন—এই স্থান হইতেই বদরিকাশ্রমের রাস্তা। শ্রীনগর (গাড়োয়াল) হইতে কাঠগোদামের দূরত্ব ১৬০ মাইল। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আলোচনা—ধ্যান-ধারণা—ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া, আলমোড়া হইতে শ্রীনগরের বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে তাঁহাদের দুই সপ্তাহেরও উপর সময় লাগিয়াছিল।

"It had taken them more than two weeks to accomplish the distance from Almora, and the time had been spent in wandering slowly up the mountain paths, begging their food, meditating, and holding religious conversation." (Vol. II, page 115)

তাহা হইলে স্বামীজী ও তাঁহার গুরু-ভ্রাতৃগণ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২০শে বা ২১শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে কোনমতেই গাড়োয়ালের শ্রীনগরে উপনীত হইতে পারেন নাই।

জলধর বাবু বদরিকাশ্রমের পথে দুইবার গাড়োয়ালের শ্রীনগর অতিক্রম করিয়াছেন। যাত্রাকালে—

(১৮৯০) "১৪ই মে বৃহস্পতিবার বেলা প্রায় এগারটার সময় গাড়োয়ালের প্রধান নগর শ্রীনগরে উপস্থিত হওয়া গেল।" ('হিমালয়', ৪৪ পৃষ্ঠা)।

(১৮৯০) "৮ই জুন—আজ আমার দীর্ঘ প্রবাসের সঙ্গী অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারীকে হারিয়েছি।...এই দিন থেকে আমি আর ডাইরি রাখিনি। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীনগর অবধি এসে আর আমার লেখবার তেমন ইচ্ছা হ'ল না।...বিশেষ যে পথে গিয়েছিলুম সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন; নূতন ব্যাপার, নূতন দৃশ্য কিছুই আমার সম্মুখে পড়েনি; ডাইরি না লিখবার ইহাও একটি কারণ।"

"শ্রীনগর হিমালয়ের মধ্যে হ'লেও সেটা লোকালয়। আমরা লোকালয়ে পেঁছিয়াছি, শ্রীনগরে আমার অনেক বন্ধু অনেক ছাত্র আছেন, তাঁদের সঙ্গে কয়েক দিন কাটিয়ে আমি ফিরে আসি।" ('হিমালয়', ২৮৭—২৮৯ পৃষ্ঠা)

জলধর বাবুর বন্ধু ও ছাত্রগণের সহিত শ্রীনগরে কয়েক দিন অবস্থান, এক সপ্তাহ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলেও স্বামীজীর শ্রীনগরে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে পেঁছিবার অন্ততঃ ৯৭ দিন পূর্ব্বেই ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন হইতে এক সপ্তাহ পরে ১৫ই জুন তারিখে যে জলধর বাবু শ্রীনগর ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। অথচ তিনি লিখিয়াছেন—"তখনো আমি বদরিকা-আশ্রমের দিকে যাই নি। যাবার কল্পনাও মনে হয় নি।"

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ ফাল্গুন, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

কিন্তু আমাদের প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীনগরে আসিয়া স্বামীজী ও তাঁর গুরুভ্রাতৃগণ অলকানন্দাতীরে একটি নির্জ্জন কুটীরে কিছুদিন সাধনা করিলেন। এই কুটীরেই পূর্ব্বে স্বামী তুরীয়ানন্দ তপস্যা করিতেন। শ্রীনগর হইতে তাঁহারা টিহিরী যাত্রা করিলেন। পথে ভিক্ষা মিলিল না। টিহিরীতে গঙ্গাতীরে একটি পোড়ো-বাগানের দুটি নির্জ্জন কুটীরে থাকিয়া, তাঁহারা সাধনা করিতে লাগিলেন। কয়দিন পরে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভ্রাতা—টিহিরী-রাজের দাওয়ান রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইলে, তিনি গণেশপ্রয়াগে—গঙ্গা ও ভিলাঙ্গন নদীর সঙ্গমস্থানে তাঁহাদের সাধনা করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই স্থানে সাধনাকালে স্বামী অখণ্ডানন্দ ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হন। পার্ব্বত্য বায়ু তাঁহার সহ্য হইবে না এবং শীত আসিতেছে বলিয়া স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শমত স্বামী অখণ্ডানন্দের চিকিৎসার জন্য তাঁহারা টিহিরী হইতে মুশৌরীর মধ্য দিয়া রাজপুর (ডেরাডুন) গেলেন।

"The physician at Tehori ordered him to go down at once to the plains, as the mountain air was proving too rarified for his lungs, and as the winter was approaching." (Vol. II, page 117)

রাজপুর উপত্যকায়—নব-রাত্রির একদিন পূর্ব্বে ১৩ই অক্টোবর ১৮৯০—বহুকাল পরে স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত তাঁহাদের মিলন হইল। ডেরাডুনে উপনীত হইয়া তাঁহারা সকলে স্বামী অখণ্ডানন্দকে ডেরাডুনের সিভিল সার্জ্জেনের নিকট লইয়া গেলেন। টিহিরীর দাওয়ানের অনুরোধপত্রানুসারে স্বামী অখণ্ডানন্দকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া সিভিল সার্জ্জন মত দিলেন যে, ইহাঁর আর পর্ব্বতে উঠা উচিত নহে—সমতল-ভূমিতে কিছুকাল থাকিয়া, ভাল করিয়া চিকিৎসা করা দরকার। স্বামীজী তাঁহার অসুস্থ গুরু-ভ্রাতার চিকিৎসার জন্য আশ্রয়প্রার্থী হইয়া ডেরাডুনের প্রত্যেক বাড়ীতে ঘুরিয়াও আশ্রয়স্থান পাইলেন না।

"After careful examination the Doctor advised Akhandananda not to return to the hills but to live carefully in the plains and have good medical treatment. But first of all some shelter had to be found for the sick monk. So the Swami himself went about the town of Dehra Dun, in search of a suitable place, entering many houses, and saying, "My 'gurubhai' is ill ! Can you give him a little place in your house and arrange for suitable diet for him ?" But the Swami only received cold-hearted replies and excuses. Nothing undaunted he went abegging from house to house and at last the Pandit Ananda Narayan, a Kashmiri Brahman and a vakil of the place, took charge of the sick monk. He rented a small house for him and provided him with suitable diet and warm clothing. The others stayed elsewhere, and begged their meals as fortune favoured them."

(Vol. II, pp. 118-119)

ইহা ১৮৯০—২০শে সেপ্টেম্বরের স্বামীজীর শ্রীনগরে পৌঁছিবার তিন সপ্তাহ পরে ১৩ই অক্টোবর মহালয়ার দিনের ঘটনা। জলধর বাবু নিশ্চয়ই এসময়ে ডেরাডুনে ছিলেন না। কিন্তু ইহার পরও কি জলধর বাবু বলিবেন ?—

"স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভের বোধ হয় ১০।১৫ দিন পরে সংবাদ পেলাম, সানুচর বিবেকানন্দ স্বামী ডেরাডুনে এসে সেখানকার কালীবাড়ীতে আতিথ্য-গ্রহণ করেছেন। সেই কথা শুনে আমি শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ এবং তার খুল্লতাত সার্ভে অফিসের একজন প্রধান কর্ম্মচারী বন্ধুবর শশিভূষণ সোম—এই তিন জন কালীবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই রাত্রিতেই তাঁদের করণপুরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম, তাঁরা পরদিন প্রাতঃকালে আসতে স্বীকার করলেন।

"শশিভূষণ সোম মহাশয়ের বাড়ী খুব বড় ও সুন্দর। সেইখানেই তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করলাম। শশীবাবুদের সকলেরই অফিস ছিল। কাযেই সন্ন্যাসীদের পরিচর্য্যার ভার—বাহিরে আমি এবং ভিতরে শশীবাবুর বাড়ীর মেয়েরা গ্রহণ করলেন।

"স্বামীজী এবং তাঁর সহচরবর্গকে আমরা কয়েকদিন আটকে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বামীজী অস্বীকার করলেন। তিনি বল্লেন, দ্বিতীয় তিথি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নেই—সেইজন্যই নাম 'অতিথি'। তার পরদিন প্রত্যূষে তাঁরা চলে গেলেন। স্বামীজী বলে গেলেন, তিনি উত্তরাপথ ত্যাগ করে এইবার দক্ষিণাপথে যাবেন।"...

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ ফাল্গুন, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

ধন্য জলধর বাবু! বিনয়ের অন্তরালে আত্মপ্রশংসা করিতে গিয়া, জলধর বাবু সত্যের প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দের মুখ দিয়াও মিথ্যা কথা বাহির করিয়া লইয়াছেন! যিনি পীড়িত গুরুভ্রাতার জন্য সেই সময়ে বা তাহার কিছুদিন পরে ডেরাডুনেই দ্বারে দ্বারে আশ্রয়প্রার্থী—পরিব্রাজকজীবনে যিনি বহুস্থানে বহুদিনব্যাপী আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন—সাধকজীবনে ভিক্ষান্নই যাঁহার সম্বল—সেই স্বামী বিবেকানন্দই কি না 'অতিথি' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণে মিথ্যার আরোপ করিয়া, জলধর বাবুকে সৌজন্যে বঞ্চিত করিলেন। 'অতিথি' শব্দের প্রকৃত অর্থ রায় বাহাদুরের জানা থাকিলে এরূপ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য প্রকট করিয়া, সুধীজনসমাজে মৃতসঞ্জীবনীসুধার সঙ্গে হাস্যরস পরিবেশন করিতে পারিতেন কি? অ+তিথি=যাঁহার তিথি বিচার নাই—যে কোন তিথিতে সহসা গৃহস্থের গৃহে আগমন করিয়া যিনি আতিথ্য গ্রহণ করেন, তিনিই অতিথি। রায় বাহাদুরের এই উক্তি কেবল অমার্জ্জনীয় অপরাধ নহে, ধৃষ্টতারও পরিচায়ক নহে কি?

কিন্তু ডেরাডুনে স্বামীজীর আশ্রয় মিলিল। পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ নামে একজন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ উকিল অসুস্থ অখণ্ডানন্দ স্বামীর জন্য একটি ছোট বাংলো ভাড়া করিয়া আশ্রয়—পথ্য—গরম কাপড় দিলেন। স্বামীজী ও অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। ডেরাডুনে প্রায় তিন সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া, অখণ্ডানন্দ স্বামী একটু সুস্থ হইলে তাঁহাকে কৃপানন্দের সঙ্গে চিকিৎসার জন্য এলাহাবাদে পাঠাইয়া, স্বামীজী তুরীয়ানন্দ সারদানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতৃসহ হৃষীকেশে আসিলেন।

"The Swami remained at Derah Dun for about three weeks and then advising Akhandananda to go to a friend's house in Allahabad.

(Vol. II, page, 120)

অখণ্ডানন্দ স্বামী সাহারাণপুর হইতে বন্ধু বাবুর পরামর্শে এলাহাবাদে না গিয়া, মীরাটে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের বাড়ী গেলেন—সেখানে দেড় মাস চিকিৎসার পর সুস্থ হইলেন।

ডেরাডুন হইতে হৃষীকেশে আসিয়া তপস্যাকালেই স্বামীজী এক দিন জ্বরঘোরে অচৈতন্য হইয়া, সাধুর প্রদত্ত ঔষধে সংজ্ঞালাভ করিয়াছিলেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী হইতে সে বিবরণ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

হৃষীকেশে প্রবল জ্বরে স্বামীজী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন, তিনি একটু সুস্থ হইলেই তাঁহার গুরু-ভ্রাতারা তাঁহাকে হরিদ্বারে আনিলেন। রাখাল মহারাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সে সময়ে হরিদ্বার কনখলে সাধনা করিতেছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সকলে সাহারাণপুরে আসিয়া বন্ধু বাবুর নিকট শুনিলেন, অখণ্ডানন্দ স্বামী মীরাটে আছেন। তাঁহারা মীরাটে আসিয়া অখণ্ডানন্দ স্বামীর সহিত শরৎকালের শেষভাগে কালীপূজার পর মিলিত হইলেন। "It was now past the time of the year when mother Kali is worshipped, that is, late in the autumn." (Vol. II, page 122). যথাযোগ্য চিকিৎসায় স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ স্বামী সুস্থ হইলেন। মীরাটে গুরু-ভ্রাতৃগণ সকলে সম্মিলিত হইয়া, বরাহনগর মঠের আনন্দের মত পরমানন্দে প্রায় তিন মাস ধর্ম্মালোচনা—সাহিত্য-দর্শন-চর্চা—ধ্যান-ধারণা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী ১৮৯১ জানুয়ারীর শেষে গুরুভ্রাতৃগণকে ৭ বৎসরের জন্য ত্যাগ করিয়া, মীরাট হইতে দিল্লী-যাত্রা করেন।

"And from the year 1891 for nearly seven years the Leader himself was absent. When he became the 'Parivrajaka', he was buried in forgottenness ; none of his brothers knew his whereabouts, though often they made efforts to find him out. But since the passing of Sri Ram Krishna for about four years he was on and off, with his gurubhais,' either at Baranagore or in the company of one or more of them on various pilgrimages, and only for short periods by himself. Then in the beginning of the year 1891 he broke free from his brother monks, leaving them finally at Delhi." (Vol. II, page 52-53)

দিল্লী হইতে ১৮৯১ ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজী আলোয়ারে উপনীত হন—পরে জয়পুর—আজমীর—আবু পাহাড়—খেতরি—গুজরাট—বোম্বাই হইয়া, দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন প্রদেশ—রামেশ্বর—কন্যাকুমারী পরিভ্রমণ করিলেন। পণ্ডিচেরী ঘুরিয়া স্বামীজী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে—হায়দ্রাবাদ—মাদ্রাজ হইয়া আবার খেতরি গিয়া; ১৮৯৩—৩১শে মে স্বামীজী আমেরিকায় যাত্রা করেন এবং ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগোর ধর্ম্মমহাসম্মেলনে যোগদান করেন। উহার বহুদিন পরে তিনি আবার হিমালয়ের বিভিন্ন প্রদেশ—কাশ্মীর প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা আমাদের আলোচ্য নহে।

স্বামীজী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর ডেরাডুনে পৌঁছিয়া, প্রায় তিন সপ্তাহ—৪ঠা নভেম্বর পর্য্যন্ত, ডেরাডুনে ছিলেন। কালীপূজার পর ১৫ই নভেম্বর নাগাৎ তাঁহারা মীরাটে সমবেত হন। ইহার মধ্যে কনখল ও সাহারাণপুরে অন্ততঃ ২ দিন ছিলেন। তাহা হইলে ৪ঠা হইতে ১২ই নভেম্বর মধ্যেই স্বামীজী হৃষীকেশে অচৈতন্য হইয়াছিলেন।

জলধর বাবু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন শ্রীনগরে ফিরিয়া কয়েক দিন—এক সপ্তাহ-পরেই ১৫ই জুন তাঁহার যাত্রাপথ দিয়াই ডেরাডুনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি ১৮৯০—৬ই মে তারিখে ডেরাডুন যাত্রা করিয়া ১৪ই মে—৯ দিনে শ্রীনগরে পৌঁছিয়াছিলেন। সুতরাং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন তাঁহার ডেরাডুনে ফিরিবার কথা। ইহার কিছু দিন পরেই তিনি স্বগ্রাম কুমারখালিতে ফিরিয়া—সাধকপ্রবর কাঙ্গাল হরিনাথের 'গ্রাম্যবার্ত্তা-প্রকাশিকা'র পরিচালনে সহায়তা করিতেছিলেন; এবং তাহার কিছুদিন পরেই মহিষাদল রাজস্কুলে তৃতীয় শিক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। 'ভারত-বর্ষে'র' ১৩৪২ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় জলধর বাবু স্বামীজীর 'স্মৃতিতর্পণ' করিবার ৩০ মাস পূর্ব্বেই 'মাসিক বসুমতীর' ১৩৪০ সালের ভাদ্র সংখ্যায় ৭৪৬ পৃষ্ঠায় আমার 'সেকালের স্মৃতি' কথায় এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং জ্বরঘোরে হৃষীকেশে স্বামীজী অচৈতন্য হইবার পূর্ব্বেই জলধর বাবু কুমারখালি ফিরিয়াছিলেন। বদরিকাশ্রম হইতে ফিরিয়া জলধর বাবু আবার ডেরাডুন স্কুলে মাষ্টারী করিতেছিলেন, এ কথা বলিবারও উপায় নাই। কারণ, তিনি প্রসঙ্গ-সূচনায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন ঃ—

"আমি তখন হিমালয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্চি। তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাইনি। যাবার কল্পনাও মনে হয় নি।...আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম ডেরাডুনে এই মাষ্টারজীর আশ্রয় লাভ করি।"

('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ ফাল্গুন, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

হৃষীকেশ হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। টিহিরী হইতে যাত্রা-সময়েই শীতের আগমন-সম্ভাবনায় স্বামীজীরা ডাক্তারের পরামর্শে অক্টোবর মাসে ডেরাডুনে ফিরিয়া-ছিলেন। নভেম্বর মাসে বাঙ্গালাদেশেই শীতের প্রাদুর্ভাব, হিমালয় প্রদেশে নিশ্চয়ই তখন গ্রীষ্মকাল। নচেৎ জলধর বাবু "গ্রীষ্মকালের···সন্ধ্যার প্রাক্কালে" হৃষীকেশে সহসা হাজির হইয়া—"সেই প্রায়ান্ধকারে গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় (?) সেই গাছের অনুসন্ধান ক'রে সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরেই সেই গাছ" পাইবেন কিরূপে ?—"তারি ২।৩টি পাতা এনে হাতে রগড়ে রস বের করে স্বামীজীর মুখে" দিলেন কিরূপে ?—"প্রায় আধঘণ্টা পরে স্বামীজী চৈতন্যলাভ করলেন" কিরূপে ?

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই এতকাল বাঁচিয়া নাই—দৈবাৎ বাঁচিয়া থাকিলেও ৪৬ বৎসর

পূর্ব্বে এক দিন হৃষীকেশে তিনি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জ্বরঘোরে অচৈতন্য স্বামীজীর চৈতন্যসঞ্চার করিয়াছিলেন বলিয়া, নিশ্চয়ই এই সুদীর্ঘকাল পরে সে গৌরবের দাবী করিতে আসিবেন না। অতএব সন্ন্যাসীর প্রাপ্য গৌরব সুকৌশলে আত্মসাৎ করিতে দোষ কি? জলধর বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—সাইমালটেনিয়াস্ ইকোয়েসনে তিনি ছাত্রদের গাধা বানান। ইহাও কি সেই সাইমালটেনিয়াস্ ইকোয়েসনের মোহিনী ধাঁধা? কিন্তু সুধীজনসমাজ—পাঠকগণের সকলেই ত' আমার মত তাঁহার ছাত্র নহেন—তাঁহাদের নিকট তিনি এ ছাইমালের সামাল দিতে পারিয়াছেন ত'?

জলধর বাবুর পক্ষে পরবর্ত্তী কালে স্বামীজীর জীবনী পাঠে ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার গানের প্রশংসা—ঘনিষ্ঠতার কথা অবগত হইয়া অনায়াসে স্মৃতিতর্পণে তাহার উল্লেখ সম্ভবপর হইতে পারে;—দক্ষিণেশ্বরে সে সময় বিশিষ্ট ভক্তগণ ব্যতীত বিরাট জনতা না থাকিলেও—ঠাকুরের ক্ষুদ্র কক্ষের "দুয়োরের কাছ থেকে প্রণাম করেই বিদায়" লওয়া —"কোনো দিন তাঁর দৃষ্টি না পড়াও" বিশ্বাসযোগ্য হইলেও হইতে পারে;—কিন্তু "সংসার ত্যাগ ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ নাম ধারণ করেছেন, এ সংবাদও বন্ধু-বান্ধবগণের মুখে অথবা সংবাদপত্রের মারফতে পেয়েছিলাম"—এবং হৃষীকেশে সেইজন্যই তিনি চমকিত—উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন—"স্বামী বিবেকানন্দ। হৃষীকেশে গঙ্গাতীরে এই ক্ষুদ্র কুটীরে পরমহংসদেবের পরম স্নেহপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ।" ('ভরতবর্ষ' ১৩৪২ ফাল্গুন—৩৪৪-৩৪৫ পৃষ্ঠা) কিন্তু সে সময়ে অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার ১২ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জলধর বাবু কোন্ কোন্ সংবাদপত্র পাঠে বা কোন্ কোন্ বন্ধুর নিকট স্বামী বিবেকানন্দের নাম জানিতে পারিয়াছিলেন—পরবর্ত্তী স্মৃতিতর্পণে তাহা প্রকাশ করিবেন কি? কিন্তু তাঁহার মত সপ্রতিভ রায় বাহাদুরও শুনিয়া বিস্মিত হইবেন—সংবাদপত্রে প্রশংসার ঢাক বাজান দূরের কথা, সাধনসময়ে—হিমালয়ে পরিভ্রমণকালে স্বামীজী এতটা আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন যে, কাহাকেও পত্রাদি পর্য্যন্ত লিখিতেন না এবং আত্মসংগোপনের জন্য তিনি 'বিবিদিষানন্দ' ও 'সচ্চিদানন্দ' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমেরিকা যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৮৯৩—মে মাসে—খেতরির রাজার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি গৈরিক রেশমী পরিচ্ছদ—পাগড়ী এবং গুরুদত্ত নাম সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করিতে সম্মত হন।

"Now he was known as 'Vividishananda', now as 'Sachchidananda' and so on. It is said that he finally assumed the name Vivekananda at the earnest entreaty of the Rajah of Khetri." (Vol. II, page 258).

ডেরাডুনে স্বামীজীর জলধর বাবুর আতিথ্যগ্রহণপ্রসঙ্গে জলধর বাবু লিখিতেছেন—

"এই যে আমাদের সেদিনকার এত আনন্দ—এর মধ্যে কিন্তু ঘূণাক্ষরেও হৃষীকেশে আমার সেই অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীজীর দর্শনলাভের কথার উল্লেখ করিনি। স্বামীজী ত' ন'নই, তাঁর সঙ্গীরাও ডেরাডুনে আমাকে চিনতে পারেন নি—পারবার কথাও নয়; তখন আমি নগ্নপদ কম্বল-সম্বল সন্ন্যাসী, আর ডেরাডুনে আমি ভদ্রবেশী, প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী মাষ্টারজী। তা ছাড়া হৃষীকেশে গঙ্গাতীরে প্রায়ান্ধকারে মানুষ চেনাও শক্ত।" ('ভারতবর্ষ' ১৩৪২ ফাল্গুন, ৩৪৬ পৃষ্ঠা)

ছাপার অক্ষরে—স্বাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধে এরূপ নির্লজ্জ মিথ্যার বিরাট বাহার আর কখনও দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে বলিয়া ত' স্মরণ হয় না।

উপসংহারে এই অলীক কাহিনীকে সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য রায় বাহাদুর লিখিতেছেন—

"সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে স্বামীজীর পরলোকগমন উপলক্ষে একদিন মাত্র টাউনহলের শোকসভায় হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করতে না পেরে হৃষীকেশের ঘটনার সামান্য উল্লেখমাত্র করেছিলাম।"

জলধর বাবু বিস্মৃত হইয়াছেন—টাউনহলের সেই শোক-সভা হৃষীকেশের অতীত যুগের কাহিনী নহে—স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবসানের পর সেদিনের শোক-সভায় উপস্থিত স্বামীজীর বহু ভক্ত আজও সশরীরে বর্ত্তমান। স্বামী বিবেকানন্দ 'বসুমতী'-প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম ছিলেন—'বসুমতী' নাম ও সম্পাদকীয় স্তম্ভশীর্ষে 'নমো নারায়ণায়'—সন্ন্যাসিগণের প্রণাম-মন্ত্র তাঁহারই প্রদত্ত। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জলধর বাবু 'বসুমতীর' সম্পাদক নামে অভিহিত হইতেন বলিয়াই তাঁহাকে স্বামীজীর স্মৃতিপূজা-সভায় বক্তৃতা করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল—৫ মিনিট মাত্র তাঁহার বক্তৃতার সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বোধ হয়, তৎপূর্ব্বে অন্য কোন বিরাট সভায় তিনি বক্তৃতা করেন নাই। সেই বিপুল জনতার সম্মুখে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া, তিনি ত্রাসজড়িত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে একটি মাত্র ছত্র—"হিমালয়ে একদিন স্বামী বিবেকানন্দ আমার উরুর উপর মাথা রেখে আট দশ ঘণ্টা বড় আরামে ঘুমিয়েছিলেন" —বলিয়াই যে কম্পান্বিত-কলেবরে বসিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন—তাহা আজও অনেকের স্মরণ আছে। সেই স্মৃতিসভায় উপস্থিত স্বামী সারদানন্দ বেলুড় মঠে জলধর বাবুর বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনাকালে এই কথা জানাইলে, স্বামী অখণ্ডানন্দ গ্রে স্ট্রীটে 'বসুমতী-কার্য্যালয়ে' পদধূলি প্রদান করিয়াছিলেন। আমার সম্মুখেই তিনি জলধর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"জলধর বাবু, আমরা মরিবার পর এইরূপ কথা প্রচার করিলেই ঠিক হইত না কি?" সে কথা আমার আজও বেশ স্মরণ আছে। জলধর বাবু শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন, স্বামীজীর হিমালয়ের সাধন-সঙ্গী পরম পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দ আজও সশরীরে বিদ্যমান;—তিনিই এখন বেলুড় মঠের প্রেসিডেণ্ট—ধর্ম্মগুরু। স্বামীজীর অন্যতম লীলাসহচর—গুরুভ্রাতা স্বামী

অভেদানন্দ বর্ত্তমান সময়ে দার্জ্জিলিংএ রহিয়াছেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেণ্ট।

রায়-বাহাদুরের স্মৃতি-তর্পণের অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের বনপর্ব্ব পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়াই পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় এবারের মত ক্ষান্ত হইলাম। আগামী সংখ্যায় 'বসুমতী'পর্ব্ব পর্য্যন্ত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। জলধর বাবুর ভাষায় ব্যক্ত করিতে গেলে বলিতে হয়, অন্যের সাফল্য-গৌরব আত্মসাৎ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তখনও তাঁহার যেরূপ ছিল—এখনও তেমনি আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন—Himalayan blunder,—ভাগ্যে এত দিন বাঁচিয়া আছি—তাই জলধর বাবুর 'হিমালয়' প্রসঙ্গে দুইবার সেই Himalayan blunder প্রত্যক্ষ করিয়া, হিমালয় সদৃশ মিথ্যার প্রকট পরিচয়ের সৌভাগ্যলাভে আমরাও তাঁহারই মত ধন্য—কৃতার্থ হইলাম।

বনপর্ব্বে সুধারস জলধর দান।
অতুল মহিমা ভবে, কর জয়গান॥

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

স্বাক্ষরযুক্ত হইলেও সম্পাদক-লিখিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ সেই সংবাদপত্র—মাসিকপত্রেই প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এজন্য এই প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। রায় জলধর সেন বাহাদুরে বা তাঁহার পক্ষ হইতে কোন সুপরিচিত সাহিত্যিক অনুগ্রহ করিয়া যদি কোন প্রতিবাদ করেন, তাহাও সাদরে প্রকাশ করিব।

—'মাসিক বসুমতী'-সম্পাদক। ['মাসিক বসুমতী'র তখন সম্পাদক ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।—সম্পাদক ঃ স্মৃঃ আঃ স্বাঃ]

[মাসিক বসুমতী, ১৫শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪০, পৃঃ ৩৭১-৩৮৩]

জলধর সেন

আমার 'স্মৃতিতর্পণ' সম্বন্ধে দু' একটি কথা

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়—

আষাঢ় সংখ্যা মাসিক 'বসুমতি'তে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাসয় আমার 'স্মৃতিতর্পণ' প্রবন্ধগুলিকে লক্ষ্য করে যে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন সে সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলতে চাই।

বয়স আমার আশীর কোঠায় গড়িয়ে আসছে। জীবন প্রদীপ স্তিমিতপ্রায়। এ সময় এরূপ অকারণ বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হবার মত উৎসাহ বা প্রবৃত্তি কোনটাই আমার নেই। কিন্তু কর্ম্মের দায়িত্ব থেকে আজও মুক্ত হতে পারিনি বলেই এ বিষয়ে কিছু বলতে হচ্ছে।

প্রথমেই আমি এই মূল কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমার স্মৃতি তর্পণের বহু স্থলে বার বার আমি একথা বলেছি যে অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল পরে 'স্মৃতি-তর্পণ' লিখতে বসে আমি কোন ঘটনারই সন তারিখ সঠিক বলতে পারবো না কারণ এত কাল পরে সন তারিখ মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে দু'একটা বিষয়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনার আলোচনা করে কোন কোন প্রসঙ্গের একটা সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু সেটা যখন নিতান্তই আন্দাজি তখন ভ্রম প্রমাদপূর্ণ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এমন কি অনেক স্থলে আমি ঘটনার পারম্পার্য্য পর্য্যন্ত যথাযথ-ভাবে রক্ষা করতে পারিনি। কিন্তু এসব কথা স্পষ্ট কবুল থাকা সত্ত্বেও দীনেন্দ্র বাবু দেখছি এই অশীতিপর বৃদ্ধের ক্ষীণস্মৃতি প্রসূত দুর্ব্বল সন তারিখগুলোকে আঁকড়ে ধরে অকারণ অনেকখানি উৎসাহ ও সময় নষ্ট করেছেন। তারিখের নিরিখ কসে আমার জীবনের কতকগুলি প্রধান ঘটনাকে 'মেকী' সাব্যস্ত করবার জন্য দীনেন্দ্র বাবুর এই বিপুল পরিশ্রম ও প্রাণপণ প্রয়াস দেখে আমি যথার্থই বন্ধুবরের জন্য একান্ত অনুকম্পা বোধ করছি।

পিতার স্বর্গারোহন আগে হয়েছিল না মাতার গঙ্গালাভের পর হয়েছিল এ যদি কেউ ভুল করে বসে তাহলে দেখছি দীনেন্দ্র বাবু তাকে 'অনাথ' বলে কিছুতেই স্বীকার করবেন না। সন্তানের জন্মতারিখ যদি কোন পিতার স্মরণ না থাকে তাহলে পিতৃ-পরিচয় থেকে তাঁকে কি বঞ্চিত হতে হবে? কোনটা আগে ঘটেছিল আর পরে ঘটেছিল কোনটা—এ যদি আমি গুছিয়ে বলতে না পেরে থাকি সেজন্য কি ঘটনাগুলিও মিথ্যা হয়ে যাবে?

দীনেন্দ্র বাবুর অসংখ্য বাক্‌বিস্তারের উত্তরে আমি শুধু দৃঢ়তার সঙ্গে এই একটি কথাই বলতে চাই যে আমার বর্ণিত ঘটনাগুলি, বিশেষতঃ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ

সম্বন্ধে বর্ণিত ব্যাপার দিবালোকের ন্যায় সম্পূর্ণ সত্য। উহার মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নাই। তবে খুঁটিনাটির ভুল থাকতে পারে বটে, কারণ অনেক দিনের কথা। আমি যে সময়ের কথা বলেছি, তখন দেরাদুন থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত কোন রেলপথ ছিল না। হৃষিকেশ যাবার একটি প্রসস্ত পথ ছিল, যে পথে গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন ও মালপত্র যাতায়াত করত'। এ ছাড়া জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আর একটা "একপেয়ে" সোজাপথ, ছিল, কাঠুরিয়ারা জঙ্গলে কাঠ কাটবার জন্য এই সঙ্কীর্ণ পথ ধরেই বনের মধ্যে যেত। সাহসী গ্রামবাসীরাও অনেকে প্রয়োজন হলে এ পথ ব্যবহার করত। আমি একাধিকবার এই পথ বেয়ে বেলা একটা দেড়টায় বেরিয়ে দেরাদুন থেকে হৃষিকেশ পেঁছেচি সন্ধ্যার প্রাক্কালেই। এ পথ সুরু হয়েছে দেরাদুনের 'দহিয়ালা' বা ঐরূপ একটা কি নামের গণ্ডগ্রাম থেকে। এ পথের দৈর্ঘ্য হবে অনুমান ২৫।২৬ মাইল মাত্র। আমি সে বয়েসে ঘণ্টায় পাঁচ ছয় মাইল পথ অবলীলায় চলে যেতে পারতেম এটা কিছুমাত্র বাহাদুরীও নয়, কারণ, আমারই জানিত একাধিক সাধু প্রতি ঘণ্টায় গড়ে এর চেয়েও দীর্ঘতর বন্দুর পথ অনায়াসে অতিক্রম করে যেতেন। দীনেন্দ্র বাবুও এরূপ কাহিনী জানেন বলেই আমার বিশ্বাস।

মায়াবতী হতে প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনীতে তাঁর দেরাদুনে অবস্থান সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা আমার কাছে একান্ত অসঙ্গত বলেই মনে হয়। একজন পীড়িত সন্ন্যাসীকে নিয়ে স্বামীজীকে আশ্রয়ের জন্য সে যুগে দেরাদুনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে হতাশ হ'তে হয়েছিল, এ কথা মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জোর করেই বলতে পারি যে গৈরিকধারীকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করবার মত নাস্তিক্য বুদ্ধি সে যুগের ভারতবাসী হিন্দুদের মধ্যে তখনও দেখা দেয়নি—অবস্য বিশেষ কোন গ্রাম বা পরিবার ছাড়া। কিন্তু সে যাই হোক আমি জিজ্ঞাসা করি, পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ দেরাদুনে স্বামী অখণ্ডানন্দকে একখানি পৃথক বাড়ী ভাড়া করে রাখলেন, উপযুক্ত পথ্য ও গরম কাপড় সরবরাহ করলেন, আর তাঁর গুরুভাইরা তাঁকে সেই বাড়ীতে একলা রেখে—"the others stayed else where and begged their meals as fortune favoured them." এ কেমন করে সম্ভব হতে পারে? দেরাদুনের করণপুরে তখন অনেক বাঙ্গালীর বাস ছিল। আমরা যেই শুনলেম যে স্বামীজী কয়েকজন সন্ন্যাসীদের নিয়ে দেরাদুনের কালীবাড়ীতে অবস্থান করছেন, আমরা তৎক্ষণাৎ ছুটে গেছলেম তাঁদের নিয়ে আসতে। সুতরাং তিনি দেরাদুনের দ্বারে দ্বারে আশ্রয়ের জন্য ঘুরে ব্যর্থকাম হোয়েছিলেন এ কথা কিরূপে স্বীকার করা যেতে পারে? সম্ভবতঃ মায়াবতীর জীবনী লেখক স্বামীজীর সমভিব্যাহারী সে দিনের কোন সন্ন্যাসীর নিকট দেরাদুনের কাহিনী সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন নি। করলে এত বড় ভুল কখনই হতে পারত না। আমার সে দিনের সঙ্গী ও দেরাদুনের বন্ধু বিমলাচরণ বাবু, যাঁদের গৃহে স্বামীজী গুরু-ভ্রাতৃগণ সহ অবস্থান করেছিলেন তিনি আজও জীবিত আছেন এবং ঐ ঘটনার সাক্ষ্য

দিতে পারেন। মায়াবতীর প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী যে আদ্যোপান্ত নির্ভুল বলে মেনে নেওয়া চলে না, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি একাধিক পাচ্ছি, তাছাড়া "ভারত" নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত বিবেকানন্দ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী অমৃতানন্দের লেখা 'শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে সে দিন চোখ বুলুতে গিয়ে দেখছিলেম, তিনিও মায়াবতীর প্রকাশিত এই বইটির কয়েকটি অসঙ্গতির দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ("ভারত" ২য় বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৪২, পৃঃ ৪২৮, ঐ ৩৩ সংখ্যা ৩০শে মাঘ, পৃঃ ৬৪৫ দ্রষ্টব্য)

যে সন্ন্যাসী হৃষীকেশ মুমূর্ষ স্বামীজীকে ঔষধ সেবন করিয়েছিল সে আজ বৃদ্ধ হয়েছে এবং সন্ন্যাসীর গর্ব্ব ও গৌরব আজ আর তার নেই, কিন্তু সে দিন ছিল সে এক পরিণত-যৌবন বলিষ্ঠ পরিব্রাজক। 'প্রাচীন' সাধু নয়, "বৃদ্ধ"ও নয়। দীনেন্দ্রকুমারের উদ্ধৃত দুখানি পুস্তকের বর্ণনা পরস্পর সামঞ্জস্যহীন। ইংরাজিতে আছে,—And before the entrance of the hut, Stood a Sadhu বাংলায় আছে—"এমন সময় সহসা একজন "প্রাচীন" সাধু তথায় উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার নিকট ঔষধ ছিল।" বাংলায় 'পিপুল মধুর' উল্লেখ নাই কিন্তু ইংরাজিতে আছে এখন কোনখানিকে তিনি প্রামাণ্য বলে মানতে চান?

আমার "স্মৃতিতর্পণের" মধ্যে কোথাও 'তুলসী পত্রের' উল্লেখমাত্র নাই। তা'সত্ত্বেও দেখছি দীনেন্দ্র বাবু একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের কাছ থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করে অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয় জানেন যে সেই সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আমার একজন বহুদিনের পরিচিত বন্ধু। পাতার নামটা জানবার জন্য তাঁর একান্ত আগ্রহ দেখে আমি তাঁর কাছে তদণ্ডলে দুষ্প্রাপ্য 'তুলসী পাতার' নামটা যে রহস্যচ্ছলেই বলেছিলাম, আশা করি এটুকু বোঝবার মত বয়স দীনেন্দ্র বাবুর হয়েছে।

স্বামীজীর জীবন সঙ্কটকালে, তাঁর কাছে যে আমি দৈবাৎ উপস্থিত হয়েছিলেম এবং সামান্য কিছু তাঁর সেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেম, এ কাহিনী আমি এই 'স্মৃতিতর্পণে' উল্লেখ করবার ৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও টাউন হলে তাঁর স্মৃতিসভায় উল্লেখ করেছিলেম, এ কথা দীনেন্দ্র বাবুও তাঁর স্বকীয় ভঙ্গীতে কতকটা স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন দেখলুম। সুখের বিষয় যে সে দিনের সভায় দীনেন্দ্র বাবুই একমাত্র শ্রোতা ছিলেন না। সেখানে স্বামীজীর ভক্ত আরও এমন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা আমার সেই বক্তৃতা শুনে আমার সঙ্গে অযাচিত সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় করেছিলেন। তাঁরা কেউ কেউ আজও জীবিত আছেন। এঁদের মধ্যে শ্রীমান গুণেন্দ্র মহারাজের নাম করা যেতে পারে—'টাউন হ'ল মিটিং' সম্বন্ধে দীনেন্দ্র বাবুর বর্ণনা ঠিক কি না, সে বিষয়ে সম্ভবতঃ তিনি সাক্ষ্য দিতে পারবেন। পুরাতন 'বসুমতীর' ফাইল খুঁজলেও হয় ত আমার সেই বক্তৃতার সারাংশ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমার সে সব সংগ্রহ করিয়া উদ্ধৃত করবার সামর্থ্য ও অবকাশের একান্ত অভাব। আর একটা বিষয়ে দীনেন্দ্র বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার বিবেচনা করি। স্বামী অখণ্ডানন্দ বসুমতী

আফিসে এসে দীনেন্দ্র বাবুর কল্পিত ওরূপ কোন অশিষ্ট উক্তি আমার প্রতি প্রয়োগ করতেই পারে না; কেন না, হৃষিকেশের ঘটনার সময় স্বামী অখণ্ডানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যে সে সময়ে শাহারানপুর হয়ে মীরাট যাত্রা করেছিলেন এ কথা দীনেন্দ্র বাবুর আলোচনার মধ্যেই রয়েছে। সুতরাং বেলুড় মঠের বর্ত্তমান ধর্ম্মগুরু স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজকে এর মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করাটা বা স্বামী অভেদানন্দের নাম উল্লেখ করে তাঁর উক্তিতে একটা গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করাটা নিতান্ত অবান্তর হয়ে পড়েছে। আমার যতদূর স্মরণ আছে, দেরাদুনে স্বামীজীর সঙ্গে কালীমহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) ছিলেন না। সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে কিছু বলতেই পারেন না। যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের কথা আমার অস্পষ্ট মনে পড়ে। ইনি স্বামীজীর অসুস্থতাকে তাঁর 'সমাধি-অবস্থা' বলে গুরু ভাইদের প্রবোধ দেবার জন্য বিসেষ চেষ্টা করছিলেন। আমার নাম ধাম জানবার জন্যও তিনি একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পাছে আমায় তাঁরা চিনতে পারেণ এই আশঙ্কায়—আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি তাঁকে আমার নামের পরিবর্ত্তে আমারই তদানীন্তন এক পরিচিত সাধুর নাম বলেছিলেম। তিনি যুক্ত প্রদেশের প্রসিদ্ধ অবধূতাচার্য্য—'শ্রীভগবান পুরী'।

স্বামীজীর সেই সঙ্গীটী আজও জীবিত আছেন কি না জানি না। বহুকাল পূর্ব্বে একবার ওঁদের খবর নিতে গিয়ে শুনেছিলাম তিনি নাকি সন্ন্যাস আশ্রম পরিত্যাগ কোরে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে গেছেন। তিনি জীবিত থাকলে হয়ত এ ঘটনা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারতেন। কিন্তু সে যাই হোক, একটা বিষয়ে আমার স্মৃতি বিভ্রম সংশোধন করে দেওয়ার জন্য আমি যথার্থই দীনেন্দ্র বাবুর নিকট কৃতজ্ঞ। আমি বদরিকা ঘুরে দেরাদুনে ফিরে আসবার পর স্বামীজী দেরাদুনে এসেছিলেন এবং দেরাদুন থেকেই পরে তিনি হৃষিকেশে গেছলেন। আমি আমার বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বল স্মৃতির দোষে এই ঘটনাকে উল্টে ফেলে আগে পরে করে বসেছিলাম—এজন্য আমি লজ্জিত।

এইবার দীনেন্দ্রকুমারের অন্যান্য দুএকটি অপবাদের উত্তর দিয়ে আমি নিরস্ত হতে চাই। আমার এই "স্মৃতি তর্পণের" মধ্যে কোথাও এ কথা বলিনি যে আমি "ছাত্রবৃত্তি" পাশ করেছিলেম। গ্রামের স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পড়েছিলেম মাত্র। পরে গোয়ালন্দ চলে যাই। আমার আবৃত্তি শুনে ভূদেব বাবু আমাকে যে পারিতোষিক দিয়েছিলেন তাঁর সেই ব্যক্তিগত উপহারকে, "ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার প্রাইজ" বলে চালাবার দুশ্চেষ্টা দীনেন্দ্র বাবু তাঁর প্রয়োজনের অনুরোধে করতে পারেন, কিন্তু আমার রচনার মধ্যে কোথাও আমি (তাঁর ভাষায়) এ 'ধৃষ্টতা' করিনি। 'ছাত্রবৃত্তি' পরীক্ষা না দিয়েও যে 'মাইনর' পরীক্ষা পাস করা যায়, আশা করি দীনেন্দ্র বাবু এটা এখনও বিস্মৃত হ'ন নি। দ্বিজেন্দ্রলাল ও আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে "এক ব্রাকেটে স্কলারশিপ" পেয়েছিলেম আমার এ ভ্রান্ত ধারণার জন্য স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় বন্ধু

দ্বিজেন্দ্রলালই দায়ী। কারণ তাঁরই মুখে একাধিকবার একাধিক ব্যক্তির কাছে এ কথা তাঁকে বলতে শুনে আমার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল যে তিনিও তবে আমারই ন্যায় 'দশ টাকা' মাত্র স্কলারসিপ পেয়েছিলেন। আমি তাঁর কথায় কোনো দিন সন্দিহান হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার হাতড়ে দেখিনি বা 'কলিকাতা গেজেটের' ফাইল খুঁজিনি তার কোনো প্রয়োজনও বোধ করি নি, যেহেতু তাঁর প্রতি বা অপর কোন সতীর্থ সাহিত্যিকের প্রতি আমার মনে কোন দিন আমি কিছুমাত্র বিদ্বেষভাব পোষণ করিনি। আজ বন্ধুবর দীনেন্দ্রকুমার সে পরিশ্রম স্বীকার করে আমার ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করায় আমি তাঁর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতর আমার স্বর্গগত বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল ১৫৲ টাকা স্কলার-শিপ পেয়েছিলেন জেনে আমি আজ অধিকতর গর্ব্ব অনুভব করছি।

উপসংহারে, কংগ্রেস ব্যাপারটার উল্লেখ না করলে সুহৃদ্বর দীনেন্দ্রকুমার হয়ত তাঁর ভুল বিশ্বাস নিয়েই বসে থাকবেন। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতিয় অধিবেশনে যোগ দিতে এসে আমার পরিচয়পত্রে মাত্র দুটি কথার উল্লেখ করেছিলেন 'Teacher Goalundo' দীন দরিদ্র জলধর চিরদিনই ভিখারী, ভূস্বামী বলে বা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ন্যায় এক অভিজাত প্রতিষ্ঠানের সভ্য বলে পরিচয় দেবার স্পর্দ্ধা ও দুঃসাহস সে কোনো দিনই করেনি। তবে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ গভর্ণমেন্টকে তাঁদের এই অধিবেশনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করবার উদ্দেশ্যে যদি কোনো রিপোর্টে সমবেত প্রতিনিধিবর্গের জমকালো ও ভড়কালো পরিচয় দিয়ে সভার মর্য্যাদাবৃদ্ধি করে থাকেন তবে সে জন্য এই অধীনকে দায়ী করা অনুচিত।

এ সমস্ত জেনেও তথাপি যখন বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু দীনেন্দ্রকুমার তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আমাকে অজস্র ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, তীব্র পরিহাস, ও আক্রমণ করেছেন, জানি না এতে তাঁর কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে এবং এরূপ ব্যবহারে তাঁর গৌরব কতদূর বৃদ্ধি পাবে তবে আমি এ সমস্ত অপমান তাঁর বৃদ্ধ বয়সের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত "গুরুদক্ষিণা" বলেই প্রশান্ত অন্তরে গ্রহণ করলেম।

ইতি তাঃ ২০শে শ্রাবণ ১৩৪৩
বিনীত
শ্রীজলধর সেন

জলধর বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের পক্ষপাতী। এজন্য রায় বাহাদুরের প্রতিবাদটি যথাযথভাবেই প্রকাশিত হইল। তাঁহার মত সুপ্রবীণ সাহিত্যিকের বর্ণাশুদ্ধিগুলি সংশোধন করিতে সাহস করিলাম না। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের এই প্রবন্ধের প্রতিবাদটি এ মাসে স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মাসিক বসুমতী-সম্পাদক।

[মাসিক বসুমতী, ১৫শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃঃ ৭২০-৭২২]

[মাসিক বসুমতীর ১৫শ বর্ষ (১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা), শ্রাবণ, ১৩৪৩ (পৃঃ ৫৫৩-৫৬৫) সংখ্যায় দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'জলধর-স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা : দ্বিতীয় প্রস্তাব' প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে সেটির কোন সম্পর্ক না থাকায় তা এখানে উপস্থাপন করা হলো না। শুধু পরবর্তী (তৃতীয়) 'প্রস্তাব'-এর সংযোগ-সূত্র হিসেবে 'দ্বিতীয় প্রস্তাব'-এর সূচনার কিয়দংশ উল্লিখিত হচ্ছে : " 'মাসিক বসুমতীর' আষাঢ় সংখ্যায় রায় জলধর সেন বাহাদুরের স্মৃতিতর্পণ-মহাভারতের আদি, সভা, বনপর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুশীলন করিয়া, আশা করিয়াছিলাম যে, এ বার বিরাট ও উদ্যোগপর্ব্ব সারিয়া যুদ্ধপর্ব্বে অবতীর্ণ হইতে পারিব। কিন্তু 'মাসিক বসুমতীর' কোন কোন সুধী পাঠক পত্র লিখিয়া অনুযোগ করিয়াছেন যে, মাষ্টার মহাশয়ের স্মৃতিতর্পণ করিতে গিয়া, স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সংকলন করিয়া দিলাম কিন্তু মনীষী ভূদেব বাবুর পুণ্যজীবনী আলোচনার অবকাশ পাইলাম না। তাঁহাদের অনুরোধে এ শ্রম-লাঘব প্রয়াসে কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য লজ্জিত হইলাম।...সেই জন্য আবার আদিপর্ব্বে অনুবর্ত্তন করিতে হইল।..."—সম্পাদক : স্মৃঃ আঃ স্বাঃ]

দীনেন্দ্রকুমার রায়

জলধর স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা

তৃতীয় প্রস্তাব

'মাসিক বসুমতীর' আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় রায় জলধর সেন বাহাদুরের স্মৃতি-তর্পণ-মহাভারতের আদি-সভা বন-বিরাট পর্ব্বের মহিমা-বিশ্লেষণ পাঠ করিয়া, কোন কোন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অনুযোগ বা অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের সার্ব্ব-জনীন "দাদা" জলধরবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন—তিনি শেষ জীবনে যে পাথেয় সঞ্চয় করিতেছেন, তাহাতে বাধা দেওয়া সমীচীন নহে। রায় বাহাদুর নিজেও প্রতিবাদ-সূচনায় লিখিয়াছেন,—

"বয়স আমার আশীর কোঠায় গড়িয়ে আসছে। জীবন প্রদীপ স্তিমিতপ্রায়। এ সময়ে এরূপ অকারণ বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত হবার মত উৎসাহ বা প্রবৃত্তি কোনটাই আমার নেই।" ('মাসিক বসুমতী', ১৩৪৩ শ্রাবণ, ৭২০ পৃষ্ঠা)

কিন্তু বৃদ্ধত্বের দাবী কাহাকেও অনর্গল মিথ্যা কথা লিখিবার নিরঙ্কুশ অধিকার প্রদান করে বলিয়া আমাদিগের জানা নাই। বোধ হয়, সাহিত্য-সুরসিক—সুধীজন-সমাজও এ বিষয়ে আমার সহিত একমত হইয়া, 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্' নীতির অনুসরণে জলধরবাবুর মিথ্যার প্রবলধারা-বর্ষণে বিভ্রান্ত হইবেন না।

আর অনুতের কুহকজাল বিস্তারের সময় ত' জলধরবাবুর উৎসাহের অন্ত ছিল না। এখন সত্যের দিব্যপ্রভায় সে মায়া-প্রহেলিকা অপসারিত হইতে দেখিয়াই কি রায় বাহাদুরের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তিও অন্তর্হিত হইল ?

জলধরবাবু 'স্মৃতি তর্পণ সম্বন্ধে দু'একটি কথায়' আমার "জন্য একান্ত অনুকম্পাবোধ" করিয়া লিখিয়াছেন—

"আমার স্মৃতিতর্পণে বহু স্থলে বার বার আমি একথা বলেছি যে অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল পরে 'স্মৃতিতর্পণ' লিখ্‌তে বসে আমি কোন ঘটনারই সন তারিখ সঠিক বলতে পারবো না। ...মাঝে মাঝে দু'একটা বিষয়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনা আলোচনা করে কোন কোন প্রসঙ্গের একটা সময় নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু সেটা যখন নিতান্তই আন্দাজি তখন ভ্রম প্রমাদপূর্ণ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।...কিন্তু এ-সব কথা স্পষ্ট কবুল থাকা সত্ত্বেও দীনেন্দ্রবাবু দেখছি এই অশীতিপর বৃদ্ধের ক্ষীণস্মৃতি প্রসূত দুর্ব্বল সন তারিখ গুলোকেই আঁকড়ে ধরে অকারণ অনেকখানি উৎসাহ ও সময় নষ্ট করেছেন।" ('মাসিক বসুমতী' ১৩৪৩ শ্রাবণ, ৭২০ পৃষ্ঠা)

অথচ জলধরবাবু ১৩৪০ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতীতে'—সবিনয়ে অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছেন, "এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত উচ্চ গণিতের চর্চ্চা ক'রে আনন্দ পাই।"

তাঁহার এই সদম্ভ স্বীকার-উক্তি পড়িয়া, তিনি নিজে যে শট্‌কে গণিতে হাঁপাইয়া উঠেন, এমন অনুমান করা যায় কি ? যিনি অঙ্কশাস্ত্র-বিশারদ—সাইমাল্‌টেনিয়াস্‌ ইকোয়েসন প্রভাবে অনায়াসে দু'তিনটি সংখ্যা নির্ণয়ে সমর্থ, তিনি দুইটি ঘটনার সন তারিখ মিলাইয়া কতটা পার্থক্য তাহা নিরিখ করিতে পারেন না—সম্ভব অসম্ভব বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, ইহা বিশ্বাস করিতে বলিতেও তিনি লজ্জিত হন নাই! অবশ্য জলধরবাবু যেমন হলফ করিয়া বলিয়াছেন যে, চোদ্দ গণিয়া কোন দিন দু'লাইন পদ্যও তিনি লিখিতে পারেন নাই, তেমনই যদি স্বীকার পাইতেন যে, শট্‌কের নাম শুনিলেই তিনি সট্‌কাইয়া পড়েন, তাহা হইলে আর কোন বালাই থাকিত না।

কিন্তু জলধরবাবু যে, রীতিমত ডায়েরী রাখিয়া হিমালয় পরিভ্রমণ করিয়াছেন—তাহা ত' কোন মতেই তাঁহার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার স্বনামে প্রচারিত 'হিমালয়', 'হিমাদ্রি', 'পথিক' পুস্তক-সূচনায় খৃষ্টাব্দ মুদ্রিত—প্রতি পৃষ্ঠায় তারিখ ও বার সন্নিবেশিত। হিমালয়-ভ্রমণ সময়ে কাঙ্গাল হরিনাথের গানের বহির সহিত বাঁধান সাদা কাগজে তিনি যে ডায়েরী লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই তারিখযুক্ত দিনলিপির সংক্ষেপ দিক্‌নির্ণয়মাত্র অবলম্বন করিয়াই ত' উক্ত ভ্রমণকাহিনীত্রয় কল্পনার বর্ণচ্ছটায় সুরঞ্জিত করিয়া বিরচিত—মুদ্রিত—প্রকাশিত হইয়াছে। রায় বাহাদুর ১৩৪০ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতীতে'—১৩২৩ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'ভারতীতে'—

'হিমালয়' পুস্তকের ৩য় পৃষ্ঠায়—'হিমাদ্রির' (জলধর গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ডের) ২য় পৃষ্ঠায়—'পথিক' পুস্তকের ১০ম পৃষ্ঠায় নিজেই ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সেই ডায়রীখানি আজও ত' জলধরবাবুর সঙ্গের সাথী। তাঁহার স্বনামে প্রচারিত 'পথিক' পুস্তকের 'যাত্রা আরম্ভে' প্রকাশ—

"এই অদৃশ্য প্রায় হস্তলিপি হিমালয়ের সেই সুন্দর মনোমোহন ছবি নয়ন সম্মুখে অতুল শোভার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এখনও এই শস্য-শ্যামলা জন্মভূমির একপ্রান্তে বসিয়া যখনই আমার সেই জীর্ণ খাতাখানি খুলিয়া বসি, তখনই তাহার প্রত্যেক অক্ষর আমার মানস নয়নে হিমালয়ের পবিত্র দৃশ্য প্রসারিত করিয়া দেয়;… এই ক্ষুদ্র খাতার মধ্যে আমার জীবনের কত সুখ দুঃখ, কত বিরহ কাতরতা, কত বেদনা বিষাদের সুদীর্ঘ কাহিনী অব্যক্ত অলিখিত ভাষায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বিশালদেহ, উন্নতশীর্ষ বৃক্ষমূলে কত বিনিদ্র রজনী যাপনের মৌন ইতিহাস ইহার পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় অঙ্কিত।"

তবে রীতিমত সন তারিখযুক্ত দিনলিপি রাখিয়া—পরে অন্যের "যৌবনসুলভ উচ্ছ্বাসে" সুসজ্জিত করাইয়া—প্রতি পৃষ্ঠায় তারিখ বারের বাহার দিয়া, যিনি তিনখানি ভ্রমণকাহিনী ছাপাইয়াছেন—সেই "অশীতিপর বৃদ্ধের ক্ষীণস্মৃতি প্রসূতে দুর্ব্বল সন তারিখ গুলোর" স্মৃতি বিচ্যুত হইবার অবকাশ কোথায়? জলধরবাবু "মাঝে মাঝে দু'একটা বিষয়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনার আলোচনা করে কোন কোন প্রসঙ্গের একটা সময় নির্ণয়ের" যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার অনুসরণ করিয়া, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে—পরিণত যৌবনে যখন তাঁহার স্মৃতি-দৌর্ব্বল্যের কোন সম্ভাবনা হয় নাই—তখন তিনি হিমালয়-ভ্রমণের ডায়েরীতে যে সকল সন তারিখের নজীর মুদ্রিত করাইয়াছেন, তাহারই অনুশীলনে কি তাঁহার স্মৃতিতর্পণের মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করি নাই? আর মিথ্যা কথা চালাইয়া ধরা পড়িবার আশঙ্কায় সন তারিখ ভুলিয়া যাইবার অভ্যাস ত' জলধরবাবুর নূতন নহে—চিরাচরিত। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে হইতে—যখন তাঁহার বয়স "আশীর কোঠায় গড়িয়ে" আসে নাই, তখন হইতেই ত' তিনি এ কসরতি দেখাইতেছেন।

'শুক্রবার'—একখানি অতি ক্ষুদ্র খাতায় এ পথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যখন খাতাখানিতে পেন্সিল দিয়া লিখি, তখন হয় ত মনে করিয়াছিলাম, 'শুক্রবার' লিখিয়া রাখিলেই মাস বৎসর তারিখ সমস্ত স্মরণ হইবে; এখন দেখিতেছি তাহার কিছুই মনে নাই। ('পথিক' ৩য় সং, ১০ পৃষ্ঠা)

কিন্তু এ বার যে সীমাবদ্ধ গন্ডীর ভিতর তিনি আত্মপ্রশংসার উল্লাসে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, তাহাতে যে সে মামুলী কৌশল প্রয়োগের সুযোগ নাই, তাহাও কি তাঁহার মত সুচতুর-চূড়ামণিকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে?

আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে গিয়া জেরার দাপটে ধরা পড়িলে, শত মিথ্যা কথা বলিয়াও যেমন সে মিথ্যার সংশোধন করা যায় না—জলধর বাবুর সেইরূপ বে-সামাল অবস্থা কি না—তাঁহার "স্মৃতি তর্পণ সম্বন্ধে দু'একটি কথার" প্রতি কথার উত্তরে তাহাই পর পর দেখাইবার প্রয়াস পাইতেছি।

অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল দীনতার অভিনয়ে সিদ্ধিলাভে ধন্য—সুদক্ষ অভিনেতা রায় বাহাদুর উচ্ছ্বসিত অশ্রুর অদম্য আবেগ রোধ করিতে গিয়া, স্বরভঙ্গ-বিকম্পিত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছেন,—

"এমন কি অনেক স্থলে আমি ঘটনার পারম্পার্য্য পর্য্যন্ত যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারিনি।...সন্তানের জন্মতারিখ যদি কোন পিতার স্মরণ না থাকে তাহলে পিতৃ-পরিচয় থেকে তাঁকে কি বঞ্চিত হতে হবে? কোন্‌টা আগে ঘটেছিল আর পরে ঘটেছিল কোন্‌টা—এ যদি আমি গুছিয়ে বলতে না পেরে থাকি সে জন্য কি ঘটনাগুলিও মিথ্যা হয়ে যাবে?"

এই সঙ্গে জলধর বাবু ত' অনায়াসেই তাঁহার পকেটস্থ অশ্রু-পাম্প টিপিয়া, চার্লি চাপলিনের মত চোখের জলের অজস্রধারায় বক্ষ ভাসাইয়া বলিতে পারিতেন;—"স্বামী বিবেকানন্দ। হৃষীকেশের গঙ্গাতীরের ক্ষুদ্র কুটীরে...সংজ্ঞা শূন্য"—এ দুঃসংবাদ কে যেন বে-তার বার্ত্তাবর্ত্তে আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চালিত করেছিল—আমি পায়ে পাখা বেঁধে, দিক্‌বিদিক জ্ঞানহারা হ'য়ে হিমালয়ের জঙ্গলের কাঠকাটবার সংকীর্ণ, বন্ধুর, 'একপেয়ে' পথ ধরে যেন বায়ুমার্গে উড়ে ছুটেছিলাম হৃষীকেশে;—গ্রীষ্মের "প্রায়ান্ধকার গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় সেই গাছের অনুসন্ধান করে সৌভাগ্যক্রমে অনতি-দূরেই সেই গাছ পাই; তারি ২।৩টী পাতা এনে হাতে রগড়ে রস বের করে স্বামীজীর মুখে দেই—প্রায় আধঘণ্টা পরে স্বামীজী চৈতন্যলাভ করলেন";—বুদ্ধত্বের দাবীতে ইহার গৌরব-গর্ব্বমাত্র আমার প্রাপ্য; কিন্তু সে জন্য ঠিক সেই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ হৃষীকেশে অচৈতন্য হ'তে যাবেন কেন?—আর মহাত্মা ভূদেব কুমারখালির বঙ্গবিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি প্রথম শ্রেণীতে, কাঙ্গাল হরিনাথের নির্দ্দেশে, আমার কবিতা আবৃত্তি শুনে কেঁদে আকুল হ'য়েছিলেন—অশ্রু-নিদর্শন স্বরূপ 'স্পেক্টেটর' বইখানি উপহার দিয়ে এসেছিলেন—"বই আর নেই—জ্যেঠাইমার পুরাতন কাঠের সিন্দুকে পোকায় কেটে তাকে একেবারে শেষ করেছে; বইখানি থাকলে আজ আমি পরম গর্ব্বভরে আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার সকলকে দেখাতাম;"—কিন্তু সে জন্য ভূদেবাবুকে পরিদর্শন-কেন্দ্রসীমা অতিক্রম ক'রে কুমারখালির বঙ্গবিদ্যালয়েই বা যেতে হবে কেন?

একটু বেশীমাত্রায় চোখের জল প্রবাহিত করিতে পারিলেই যখন সকল আপদের শান্তি হয়—সকল তর্কের অবসান হয়—আর সেই অশ্রু-নির্ঝরধারা যখন জলধর বাবুর চুরুটের ধোঁয়ার মত অফুরন্ত—মিথ্যা কথার মত অজস্র—তখন তিনি এমন সঙ্কটকালে সেই চিরআজ্ঞাবহ অশ্রু-বন্যাকে সুনিয়োগ করিতে বিস্মৃত হইলেন কেন?

"সন্তানের জন্ম তারিখ যদি কোন পিতার স্মরণ না থাকে তাহলে পিতৃ-পরিচয় থেকে তাঁকে বঞ্চিত হতে" হয় না সত্য,—কিন্তু জলধরবাবু অনেকগুলি সন্তানের পিতা বলিয়া, কোন্‌টির পর তাঁহার কোন্ পুত্রটি জন্মিয়াছেন, তাহাও কি তিনি বলিতে পারিবেন না ? সত্য ঘটনা লিখিতে গিয়া কোন্ ঘটনার পর কোন্‌টি ঘটিয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয় কি ?

বনপর্ব্ব—হিমালয়ে—স্বামীজীর জীবনদান পর্ব্বাধ্যায়

সংসারের কর্ম্মকোলাহল হইতে বহুদূরে—তপস্যার নিভৃত নিকেতন আলমোড়া মায়াবতীর তপোবনে দ্বাদশবর্ষব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনায় আত্মনিবেদন করিয়া, ত্যাগ-বৈরাগ্যসম্পন্ন সন্ন্যাসিগণ, স্বামীজীর তপস্যাসঙ্গী—লীলাসহচর—গুরুভ্রাতৃবৃন্দ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিশিষ্ট ভক্তগণের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া, বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের যে প্রামাণ্য জীবনী সঙ্কলন করিয়াছেন—সেই অতুলনীয়, অমূল্য মহাগ্রন্থ হইতে স্তরে স্তরে নিদর্শন উদ্ধৃত করিয়া যাহা সুপ্রমাণিত করিয়াছি—তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার দুরাশায় রায় বাহাদুর অসীম স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

"আমি শুধু দৃঢ়তার সঙ্গে এই একটি কথাই বলতে চাই যে আমার বর্ণিত ঘটনাগুলি, বিশেষতঃ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে বর্ণিত ব্যাপার দিবা-লোকের ন্যায় সম্পূর্ণ সত্য। উহার মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নাই।"

কিন্তু স্বামীজীর জীবনদানের গৌরবলাভের আশায় উদ্‌ভ্রান্ত জলধর বাবুর কল্পিত বিবরণ "দিবালোকের ন্যায় সম্পূর্ণ সত্য" ; না, তাঁহার মিথ্যার কুহেলিকা-বিস্তার সত্য-সূর্য্য সমুদয়ে মুহূর্ত্তে অপসারিত—তাহা আষাঢ়-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতীতে' জলধর স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনার প্রথম প্রস্তাবে বিস্তৃত ভাবে সুপ্রমাণিত হইয়াছে —সেই জন্য এ বার সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি। রায় বাহাদুর-কল্পিত মৃত-সঞ্জীবন গাছের ২।৩টি পাতার রস খাওয়াইয়া স্বামীজীর চৈতন্যসঞ্চারের কাহিনীটি এমনই নিদারুণ সত্য যে, প্রতিবাদে তিনি আর দ্বিতীয় বার কাহিনীটির উল্লেখ করিতে সাহস পান নাই—"স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বর্ণিত ব্যাপার" বলিয়াই সারিয়াছেন।

রায় বাহাদুরের শ্রীমুখনিঃসৃত কথা—অলীক—অলৌকিক—অসম্ভব—কল্পনাতীত —ধারণাতীত হইতেই পারে না—তাঁহার শ্রীকথা অতুল্য—অমূল্য—বেদবাক্যেও উপমার যোগ্য কি না সন্দেহ—তাহাতে কোনরূপ প্রমাণ প্রয়োগের বালাই থাকিতেই পারে না। আর 'অতিরঞ্জনে'—রায় বাহাদুর আকাশ-কুসুমের বর্ণভাতি ব্যতীত অন্য কোন রং যে 'বিন্দুমাত্র' ব্যবহার করেন নাই, আশা করি, তাহা সকলেই স্বীকার করিতে পারিবেন।

অলৌকিক সুতীব্র অনুভূতি-প্রভাবে স্বামীজীর জীবনসঙ্কট বুঝিয়া, জীবন-

দানের জন্য ব্যাকুল জলধর বাবু 'পায়ে পাখা বেঁধে' কি ভাবে পুরাকালে প্রসিদ্ধ 'ঢেঁসুকেল দে কটক' যাইবার মত সহজ সঙ্কীর্ণ পথে উড়িয়া, হিমালয় অতিক্রম করিয়াছিলেন দেখুন ঃ—

"হৃষিকেশ যাবার একটি প্রসস্ত পথ ছিল, যে পথে গাড়ীঘোড়া, লোক-জন ও মালপত্র যাতায়াত করত'। এ ছাড়া জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আর একটা 'একপেয়ে' সোজা-পথ ছিল, কাঠুরিয়ারা জঙ্গলে কাঠ কাটবার জন্য এই সংকীর্ণ পথ ধরেই বনের মধ্যে যেত। সাহসী গ্রামবাসীরাও অনেকে প্রয়োজন হলে এ পথ ব্যবহার করত। আমি একাধিকবার এই পথ বেয়ে বেলা একটা দেড়টায় বেরিয়ে দেরাদুন থেকে হৃষিকেশে পৌঁছিচি সন্ধ্যার প্রাক্কালেই। এ পথ সুরু হয়েছে দেরাদুনের 'দহিয়ালা' বা ঐরূপ একটা কি নামের গণ্ডগ্রাম থেকে। এ পথের দৈর্ঘ্য হবে অনুমান ২৫।২৬ মাইল মাত্র। আমি সে বয়সে ঘণ্টায় পাঁচ ছয় মাইল পথ অবলীলায় চলে যেতে পারতেম এটা কিছু-মাত্র বাহাদুরীও নয়, কারণ, আমারই জানিত একাধিক সাধু প্রতি ঘণ্টায় গড়ে এর চেয়েও দীর্ঘতর বন্দুর পথ অনায়াসে অতিক্রম করে যেতেন। দীনেন্দ্র বাবুও এরূপ কাহিনী জানেন বলেই আমার বিশ্বাস।"

উঃ! কি দুর্দ্দান্ত দুঃসাহস! অতঃপর কোন্ ভরসায় বলিব, সে যুগে বাঙ্গালীর জীবনে adventure ছিল না। গাছের পাতার প্রাণদায়িনী সুধারসে মুমূর্ষু স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদানের জন্য জলধরবাবু উন্মত্ত আবেগে, পায়ে পাখা বাঁধিয়া, শ্বাপদ-সঙ্কুল জঙ্গলাকীর্ণ বন্ধুর পার্ব্বত্যপথে একাকী উড়িয়া চলিয়াছেন। যৌবনকালে পৃথিবীর অদ্বিতীয় মহাবীর নেপোলিয়ানের আল্পস্ উল্লঙ্ঘন—রুসিয়া-অভিযান কাহিনীর অনুবাদ করিয়াছিলাম—আর এই বৃদ্ধ বয়সে রায় বাহাদুরের হিমালয় অভিযানের অসম্ভব অসমসাহস দেখিবার সৌভাগ্যলাভে ধন্য হইলাম। বিশেষতঃ নেপোলিয়ান সশস্ত্র—বীরেন্দ্রবৃন্দ-পরিবৃত—তেজস্বী অশ্বে আরোহী—আর আমাদের জলধরবাবু একাকী—পদচারী—লাঠিকম্বলমাত্র সম্বল। কিন্তু তাঁহার হিমালয় ভ্রমণ-কাহিনীতে তিনি অন্য কোন বার একাকী অভিযান করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাই নাই। বিলাতী উপন্যাসের আজগুবি প্রহেলিকার কল্পনালীলা অপেক্ষা—এ বাস্তব কাহিনী কত বড় মিথ্যার হিমালয়—অসম সাহসের গৌরীশঙ্কর অভিযান!

জলধরবাবুর দৌড়বাজির বিক্রম আমি জানি বলিয়া অসঙ্কোচে নজীর দিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে প্রতি "ঘণ্টায় পাঁচ ছয় মাইল" বেগে জঙ্গলময় পার্ব্বত্য পথে "অবলীলায় চলে যেতে পারতেন", আমি বাঙ্গালার সমতল প্রদেশেও তাঁহার সঙ্গের সাথী হইয়া কোন দিন তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ করি নাই।

ডেরাদুন হইতে হৃষীকেশের দূরত্ব কমাইবার জন্য গণিত-বিশারদ মাষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"এ পথ সুরু হয়েছে দেরাদুনের 'দহিয়ালা' বা ঐরূপ একটা কি নামের গণ্ডগ্রাম থেকে। এ পথের দৈর্ঘ্য হবে অনুমান ২৫।২৬ মাইল মাত্র।"

এই কৌশলে জলধরবাবু ডেরাদুন হইতে 'দাহিয়ালার' দূরত্বটা অনুগ্রহ করিয়া অসঙ্কোচে বাদ দিয়াছেন। কিন্তু Mr. H. G. Walton I. C. S. সঙ্কলিত ডেরাডুন জেলার সরকারী গেজেটিয়ারের ২২৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ—

"Doiwala—a village...It has given its name to a station of the Dehra-Hardwar railway about 12 miles from the former place."

এই ১২ মাইল রাস্তা জলধর বাবুর বর্ণিত '২৫।২৬ মাইল মাত্রের' সহিত যোগ করিলে কত মাইল হয় ?

সরকারী গেজেটিয়ারের পরিশিষ্টে ডেরাদুন হইতে হৃষীকেশের রাস্তার দূরত্বের যে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর গমনযোগ্য পার্ব্বত্য পথের—"6th class road, cleared only"—তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—

ডেরাদুন হইতে ভোগপুর—	১৫ মাইল
ভোগপুর হইতে রাণীপুকরী—	৮ মাইল
রাণীপুকরী হইতে হৃষীকেশ—	১০ মাইল
	মোট ৩৩ মাইল

দুরধিগম্য জঙ্গলাকীর্ণ পথের দূরত্ব—যাহা গেজেটিয়ারে উল্লিখিত হয় নাই—তাহা ইহার সহিত যোগ করিলে নিশ্চয়ই ৩৭।৩৮ মাইলের উপরই হইবে।

কলিকাতার অটোমোবাইল এসোসিয়েশন মোটর অভিযানের জন্য পথঘাটের মানচিত্র ও পরিমাপ সংকলন করিয়াছেন। অনুরোধক্রমে তাঁহারা ১৩ই আগষ্ট তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন—ডেরাদুন হইতে হৃষীকেশ ৩৩ মাইল। ইহার সহিত করণপুরের দূরত্ব যোগ করিলে ৩৬।৩৭ মাইলই হইবে।

ডেরাদুনের কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার অনুগ্রহ করিয়া ১৭ই আগষ্ট তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন ঃ—

"ডেরাদুন থেকে দইয়ালা ১২ মাইল। তারপর দইয়ালা থেকে দুইটি রাস্তা, একটি District Board Road এবং অপরটি Forest Road ; এই Forest Road দুইটির (2a) একটি Borkot forest হ'য়ে সত্যনারায়ণ এবং (2b) অপরটি Kansraoএর আগে হয়ে ফিরে হৃষীকেশ। (2a) দইয়ালা দিয়ে রাণীপোখরী—ভোগপুর—বরকোট দিয়ে সত্যনারায়ণের পাশ দিয়ে হৃষীকেশ। রাস্তা এখনি ভীষণ জঙ্গল ; ৩৫ বৎসর আগে কি ছিল জানি না—Tiger infested (ব্যাঘ্রভীতিসঙ্কুল)। (2b) রাস্তা District Boardএ পরে যেটী Kanosrao Foreat Roadএ মিলে বড় রাস্তা যেটা Roywalla station থেকে হৃষীকেশে যায়—তাতে পড়েছে। (2a) এখান থেকে দইয়ালা ১২ মাইল এবং তার পর ২০ মাইল, একুনে ৩২ মাইল। (2b) দইয়ালা ১২ মাইল—D. B. Road হয়ে হৃষীকেশ ২৫ মাইল একুনে ৩৭ মাইল। কাজেই রাস্তা খুব জানা না থাকলে এবং

quickness না থাকলে ৬।৭ ঘণ্টায় যাওয়া খুবই মুস্কিল। আর quick marchএর অভ্যাস থাকা দরকার।...মানুষ নিজেকে একটা হোমরা-চোমরা কর্ত্তে সব কর্ত্তে পারে।”

আর জলধরবাবুর এই ৩৭ মাইল জঙ্গলময় পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে ৬।৭ ঘণ্টা কেন—সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশী সময় যে লাগে নাই—তাহা পরে দেখাইতেছি।

সে যুগে যে সকল তপস্যাব্রতী সন্ন্যাসী ডেরাদুন হইতে হৃষীকেশে পদব্রজে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট সন্ধান লইয়া জানিয়াছি যে, তাঁহারা কেহই দুই দিনের কমে এই জঙ্গলময় পথ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। হরিদ্বারে সেবাব্রতে আত্ম-নিবেদিত কোন সন্ন্যাসী অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়াছেন—করণপুর হইতে হৃষীকেশ ৩৮ মাইল—সাধুরাও কেহ এই সুদীর্ঘ পথ ৯-১০ ঘণ্টায় অতিক্রম করিতে পারেন না।

জলধরবাবুর মত মিথ্যাশ্রয়ী যখন মায়াবতী-সংস্করণ স্বামীজীর প্রামাণ্য জীবনী বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারেন নাই—তখন সরকারী গেজেটিয়ার,—ডেরাদুনের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারের উক্তি,—সন্ন্যাসীদের কথা যে অনায়াসে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বদ্রিনারায়ণ যাত্রাকালে জলধর বাবু দুই দিনে—অন্ততঃ ১৮ ঘণ্টায়—তাঁহার পাখাবাঁধা পাদুখানি সবেগে চালাইয়া ডেরাদুন হইতে হৃষীকেশে পৌঁছিয়াছিলেন—সে বিবরণ তাঁহার স্বনামে প্রকাশিত ‘হিমালয়’ পুস্তক হইতে ‘মাসিক বসুমতীর’ আষাঢ় সংখ্যায় ৩৭১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। এ বার তাঁহার স্বনামে প্রচারিত ‘পথিক’ পুস্তক হইতে হৃষীকেশ অভিযান-কাহিনী সংক্ষেপে সঙ্কলন করিতেছি ঃ—

“হৃষীকেশ হরিদ্বার হইতে বার মাইল উপরে, একটী পার্ব্বতীয় তীর্থস্থান। কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল যাত্রী তীর্থ দর্শনোপলক্ষে হরিদ্বার পর্য্যন্ত গমন করেন, তাঁহারা হৃষীকেশ পর্য্যন্ত যাইতে চাহেন না ; কেন না পথ বড়ই দুর্গম ;...আমি যেখানেই যাই, আমার প্রধান আড্ডা দেরাদুন।...বহু প্রলোভনে এক জন হিন্দুস্থানী বন্ধুকে হস্তগত করা গেল এবং একখানা বয়েল গাড়ী ভাড়া করিয়া, বেলা দুই প্রহরের সময় কম্বল ও লোটা লইয়া যানারোহণ করিলাম।

“দেরাদুন হইতে হরিদ্বার যাইবার একটি ভাল রাস্তা আছে। সে রাস্তাটী বারমাস থাকে না, বৃষ্টির সময় ঝরণাগুলি প্রবল হইয়া উঠিলে সে রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়।...এ পথ ছাড়া হৃষীকেশে যাইবার আরও একটা পথ আছে, হরিদ্বারের রাস্তায় ১৪ মাইল আসিয়া তাহার পর জঙ্গলে নামিয়া যাইতে হয়। জঙ্গলে রাস্তা নাই। জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনিবার জন্য কণ্ট্রাক্টরেরা গাড়ী লইয়া যায়।...তাহা ছাড়া অরণ্য-প্রদেশে লোকজনের দেখা-সাক্ষাৎ পাওয়া একরকম অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

“বেলা দুই প্রহরের সময় বাসা হইতে বাহির হইয়া অপরাহ্ন প্রায় ৪ টার সময় হরিদ্বারের রাস্তা ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে নামিলাম। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ঝরণা ;... কোন রকমে স-গাড়ী ঝরণা পার হওয়া গেল। আমরা যেখানে পার হইলাম, সেখানে

মানুষের হাটিয়া পার হইবার যো নাই, জলের এত তেজ। ঝরণা পার হইয়া রাস্তা পাওয়া গেল ; রাস্তা ত ভারি—সেই চক্রনেমির দাগ। সম্মুখে জঙ্গল দেখিলাম, …মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের রশ্মিও তাহার ভিতর কদাচ প্রবেশ করিতে পারে।…

"…দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, এই অরণ্য-পথ আমাদের গাড়োয়ানের বিশেষ পরিচিত ; তাই সে কোনরকমে পথ না হারাইয়া এই জঙ্গল উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যার পর 'রাণীপুকুর' নামক একটা গ্রামে গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল।…আহারান্তে আমরা শয়ন করিতে গেলাম।

"প্রভাতে উঠিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে আমাদের একটু বিলম্ব হইয়া গেল…কিন্তু গাড়োয়ান খুব জোরে গাড়ী হাঁকাইতে লাগিল ; তখন পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়াছে মাত্র। সম্মুখে প্রকাণ্ড জঙ্গল। আমরা শীঘ্রই মহারণ্যে প্রবেশ করিলাম।…এই সুবিশাল অরণ্যে প্রবেশ করিয়া আমার মনে হইল, পৃথিবী ত্যাগ করিয়া সহসা যেন চির-অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন, অনন্ত-স্তব্ধতা-পরিব্যাপ্ত পাতালপুরে প্রবেশ করিয়াছি।…

"আমি চলিতে আরম্ভ করিলাম, গাড়ী পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল। চারিদিকে যে কি নিবিড় অরণ্য, তা বর্ণনা করা যায় না। উপন্যাসে বড় বড় জঙ্গলের বর্ণনায় তাহার একটু ক্ষীণ আভাস অনুভব করা যায় মাত্র। হিমালয়ের পাদদেশে আগাগোড়া এই রকম বহুদূর বিস্তৃত জঙ্গল ; কিন্তু…হৃষীকেশের এই জঙ্গলের ন্যায় ভয়ানক জঙ্গল প্রায় দেখা যায় না।…জঙ্গল দেখিয়া প্রাণে…ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল,…একে গাছগুলি খুব ঘন-সন্নিবিষ্ট বলিয়া তাহাদের মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি হইয়া আছে, তাহার উপর আবার নানারকমের পরগাছা তাহাদের মাথাগুলি জড়াইয়া ফেলিয়াছে।…এই অরণ্যে নানাপ্রকার তৃণ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় লতাগুল্মের এমন একটা সমাবেশ, আর সেগুলি এত উচ্চ যে, তাহার ভিতর হাতী লুকাইয়া থাকিলেও বুঝিবার যো নাই। শুনিয়াছি এ অরণ্যে সকল রকম জন্তুই বাস করে ; আমার সৌভাগ্য যে দূরে হস্তিযূথ ছাড়া আমার অদৃষ্টে আর কোন ভীষণ জন্তু দর্শন ঘটে নাই। এ নিবিড় বনে অনেকে হিংস্র জন্তুর হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন,…এমন কি আমার পরিচিত কয়েকজন বাঙ্গালীও প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন…। এই সকল কথা মনে হইতে লাগিল। তখন আরও ভীত হইয়া পড়িলাম। খানিকদূর অগ্রসর হইয়া দেখি গাড়ী নাই।…পথে জনমানবের সম্পর্ক নাই ; বনের মধ্যে একটু শব্দ হইলেই গা কাঁপিয়া উঠে।…কিন্তু যত চলি, পথ কিছুতেই সংক্ষেপ হয় না ; আমি প্রাণপণ শক্তিতে দ্রুতপদে সোজা চলিতে লাগিলাম।…ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অধীর হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটিতে লাগিলাম। হঠাৎ দূরে একটা শব্দ শুনিয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম।…এ কি কোন ভৌতিক ব্যাপার ?—কিয়দ্দূরে গিয়া দেখিলাম অল্পদূরে…একটি রোরুদ্যমানা বালিকা।…আমি নিজে পথভ্রান্ত, আমার স্কন্ধে একটি ষোল সতের বৎসরের পথভ্রান্তা সুন্দরী। অনেক ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে এক কাঠুরিয়ার আড্ডায় উপস্থিত ;

তাহারা একজন লোক সঙ্গে দিয়া পথ দেখাইয়া দিলে তবে অপরাহ্ন তিনটার পর হৃষীকেশে পৌঁছান গেল।" ('পথিক', ৩য় সং, ৮৩ হইতে ৯৩ পৃষ্ঠা)

তাহা হইলে জলধর বাবু গাড়ী করিয়াও ত' এই সংক্ষেপ জঙ্গল-পথ দুই দিনে ১৮ ঘণ্টার কমে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। অথচ তিনি প্রতিবাদেও লিখিতেছেন—

"আমি একাধিকবার এই পথ বেয়ে বেলা একটা দেড়টায় বেরিয়ে দেরাদুন থেকে হৃষীকেশে পৌঁছেচি সন্ধ্যার প্রাক্কালেই।"

এই 'একাধিকবারের'—তাঁহার এক বারের অভিযানে 'হিমালয়' হইতে দেখাইয়াছি যে, তিনি দুই দিনে অন্ততঃ ১৮ ঘণ্টায় ডেরাদুন হইতে হৃষীকেশে পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহার স্বনামে প্রচারিত—জলধর গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত—'হিমাদ্রি' পুস্তক —যাহার সম্বন্ধে জলধর বাবুর প্রখ্যাতনামা উকিল শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব অনুগ্রহ করিয়া স্বীকার করিয়াছেন ঃ—

"সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে ভার লইয়া হিমালয়ের একটি সাধুভাষার সংস্করণ সঙ্কলন করিয়া দেন। এবং তাহা 'হিমাদ্রি' নামে প্রকাশিত হয়।" ('মাসিক বসুমতী' ১৩৪০, মাঘ, ৬৪৯ পৃষ্ঠা)

তাহাতেও দুই দিনে ১৮ ঘণ্টায় ডেরাদুন হইতে হৃষীকেশে জলধরবাবুর শুভাগমনের বিবরণ সমর্থিত। 'পথিক' পুস্তকেও দেখা যায়, "সংক্ষেপ জঙ্গল পথে খুব জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া" এবং "প্রাণপণ শক্তিতে দ্রুতপদে—ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটিয়াও" জলধরবাবু দুই দিনে ১৮ ঘণ্টার পূর্ব্বে ডেরাদুন হইতে হৃষীকেশে উপনীত হইতে পারেন নাই। তবে এই ব্রাহ্মস্পর্শের পরও এক শনিবারের বারবেলায় তিনি "এই পথ বেয়ে বেলা একটা দেড়টায় বেরিয়ে দেরাদুন থেকে হৃষিকেশে সন্ধ্যার প্রাক্কালেই", পৌঁছিলেন কিরূপে?

ইহার পর মায়াবতী-সংস্করণ স্বামীজীর জীবনীর অসঙ্গতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন ঃ—

"এক জন পীড়িত সন্ন্যাসীকে নিয়ে স্বামীজীকে আশ্রয়ের জন্য সে যুগে দেরাদুনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে হতাশ হ'তে হয়েছিল, একথা মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জোর করেই বলতে পারি যে গৈরিকধারীকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করবার মত নাস্তিক্য বুদ্ধি সে যুগের ভারতবাসী হিন্দুদের মধ্যে তখনও দেখা দেয়নি।"

কোন ধর্ম্ম বা কোন সমাজের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব—অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়াও অনায়াসে বলা যাইতে পারে—ডেরাদুনে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজের প্রভাব

অত্যধিক। জলধরবাবু ব্রাহ্ম-পরিচয়ে, এবং সে সময় করণপুর স্কুলে সুযোগ্য শিক্ষকের অভাবে ব্রাহ্ম পরিবারে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ সে সুবিধা পান নাই। আর "গৈরিকধারীকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করবার মত নাস্তিক্য বুদ্ধির" যে প্রকৃষ্ট পরিচয় জলধরবাবুর স্বহস্ত-লিখিত ডায়েরী অবলম্বনে রচিত 'হিমালয়'—'হিমাদ্রি' পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় প্রকটিত হইয়াছে—তাহাই ইহার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন—যথাযোগ্য উত্তর। অন্য প্রসঙ্গে জলধর বাবুর সেই নাস্তিক্য বুদ্ধির পরিচয় তাঁহার স্বনামে প্রচারিত পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়া দিবার বাসনা রহিল।

জলধরবাবু শুনিয়া নিশ্চয়ই আরও বিস্মিত হইবেন যে, সেযুগে—চিকাগোর ধর্ম্ম-মহাসম্মেলনের পূর্ব্বে—স্বামী বিবেকানন্দের নাম জগতে সুপ্রচারিত হইবার পূর্ব্বযুগ ত' দূরের কথা—কিছুদিন পূর্ব্বে ডেরাদূনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে শতবার্ষিক উৎসব হইয়াছিল—স্থানীয় হিন্দুস্থানী ভক্তগণ ব্যতীত মাত্র দুই জন ডেরাদূনবাসী বাঙ্গালী ভক্ত তাহার উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

ইহার পর—স্বামীজী জলধরবাবুর মত সুবিধা গ্রহণের মনোবৃত্তি লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া, রায় বাহাদুর উল্লসিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ঃ—

"...পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ দেরাদুনে স্বামী অখণ্ডানন্দকে একখানি পৃথক বাড়ী ভাড়া করে রাখলেন, উপযুক্ত পথ্য ও গরম কাপড় সরবরাহ করলেন। আর তাঁর গুরুভাইরা তাঁকে সেই বাড়ীতে একলা রেখে—"the other stayed else where and begged their meals as fortune favoured them" এ কেমন করে সম্ভব হতে পারে?"

ডেরাদূনে স্বামীজী কেবল তাঁহার অসুস্থ গুরুভ্রাতা—স্বামী অখণ্ডানন্দের জন্যই আশ্রয় ও পথ্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা পরম বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি—ডেরাদূনের বহু গৃহে তাঁহারা নিরাশ হইলে স্বামীজীর অনুরোধে পণ্ডিত আনন্দ-নারায়ণ তাঁহার বাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী একখানি ছোট ভাড়াটিয়া বাড়ীর একটি প্রকোষ্ঠে স্বামী অখণ্ডানন্দকে আশ্রয় প্রদান করেন। পণ্ডিতজী তাঁহার গৃহ হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দের জন্য দুইবেলা খাবার পাঠাইতেন, এবং প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র দিয়াছিলেন। স্বামীজী ও অপর গুরুভ্রাতৃত্রয় প্রথমে গঙ্গামন্দিরে—পরে স্থানীয় এক লালা ও বেণের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া, স্থানীয় ভদ্রলোকদের গৃহে আহার্য্য ভিক্ষা করিতেন। রাত্রিতে এক জন গুরুভ্রাতা আসিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট শয়ন করিতেন। স্বামী অখণ্ডানন্দও প্রায় প্রত্যহ দিনমানে স্বামীজী ও গুরুভ্রাতৃগণের নিকট বেড়াইতে যাইতেন।

স্বামীজী যে এই শুভ সুযোগে সদলে এবং সবলে পণ্ডিত আনন্দনারায়ণের

দীর্ঘকালব্যাপী আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই—ইহাতে জলধরবাবু "নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা" স্মরণ করিয়া অবশ্যই বিচলিত হইতে পারেন। এমন সুবিধা গ্রহণে স্বামীজীর অক্ষমতা দেখিয়া রায় বাহাদুরের উল্লসিত—বিস্মিত হইবারই কথা। বেকার অবস্থায় জলধরবাবু 'সাহিত্য'-সুহৃদ—সমালোচক স্বর্গীয় নলিনীভূষণ গুহ মহাশয়ের চেতলার বাড়ীতে সানুনয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে জলধর বাবু বন্ধুত্বের অভিনয়ে পসার জমাইয়া, তাঁহার গৃহে সপুত্র—সময় সময় সস্ত্রীক ভাবে চার পাঁচ বৎসর অধিষ্ঠান করেন। নলিনীবাবু তাঁহাকে আশ্রয় ও আহার প্রদান করিয়াই নিষ্কৃতি পান নাই—পরিধেয় হইতে পকেট খরচা পর্য্যন্ত যোগাইয়া ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি এখন স্বর্গীয় হইলেও তাঁহার পুত্র পরিজন এবং চেতলাবাসী বহু প্রবীণ ভদ্রলোক জলধর বাবুর সে পরম আতিথ্যগ্রহণের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সু-অবগত আছেন। স্পর্দ্ধার শিখরে উঠিয়াই—প্রতিদানে রায় বাহাদুর একখানি উপন্যাসে এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের অতি কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আমরা এই ভদ্র-পরিবারের সম্ভ্রমহানির আশঙ্কায় জলধর বাবুর সেই উপন্যাসখানির নামোল্লেখ করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিলাম না। ৪।৫ বৎসর সপুত্র আতিথ্যগ্রহণের বিনিময়ে এমন কৃতঘ্নতার নিদর্শন বঙ্গসাহিত্যে আর কখনও দেখিয়াছেন কি? 'সাহিত্যিক-দিগের ইতিহাসের কিছু মাল-মসলা জমা' করিবার প্রয়াসে জলধর বাবু পরম অনুকম্পায় স্মৃতি-তর্পণে নলিনী বাবুর নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। আশা করি, এখন তিনি পূজনীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের সেই পরম বন্ধুর কথা বেশ স্মরণ করিতে পারিবেন।

অতঃপর রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

"দেরাদুনের করণপুরে তখন অনেক বাঙ্গালীর বাস ছিল। আমরা যেই শুনলেম যে, স্বামীজী কয়েকজন সন্ন্যাসীদের নিয়ে দেরাদুনের কালীবাড়ীতে অবস্থান করছেন, আমরা তৎক্ষণাৎ ছুটে গেছলেম তাঁদের নিয়ে আসতে। সুতরাং তিনি দ্বারে দ্বারে আশ্রয়ের জন্য ব্যর্থকাম হোয়েছিলেন, এ কথা কিরূপে স্বীকার করা যেতে পারে?"

জলধর বাবু নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন—সে যুগে ডেরাদুন অপেক্ষা কলিকাতায় অধিক সংখ্যক বাঙ্গালী বাস করিতেন। কিন্তু ঠাকুরের লীলা-সম্বরণের পর, ভক্তপ্রবর সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং তাঁহার দেহান্তের পর বলরাম বাবু ব্যতীত অপর কেহই ত' সে যুগে বরাহনগর মঠে শ্রীরামকৃষ্ণপদে সমর্পিতপ্রাণ—কঠোর তপস্যানিষ্ঠ এই নবীন সন্ন্যাসিগণকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন নাই। স্বামীজীর শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথায় তাহার পরিচয় দিতেছি :—

"We are sannyasins,...We never thought of the morrow. We used to live on what little came by begging. To-day Suresh Babu

is not with us, and Balaram Badu has also passed away. Had these two been alive they would have danced with joy at the sight of this Math !···You have heard of Suresh Babu's name...know him to be the source of this Math. It was he who helped to found the Baranagore Math. O it was Suresh Mittra who at that time was most anxious to meet our needs !...There were days at the Baranagore Math when we were so much in want that we had nothing to eat. If the rice was procured by begging, there was no salt. On some days, we had only rice and salt, but no one would mind that"...

(Life of the Swami Vevekananda,
vol II, page 27-28.)

কিন্তু জলধর বাবু নিশ্চয়ই চুরুটের ধোঁয়ার মতই এ সকল বিবরণ উড়াইয়া দিবেন। সে যুগে ডেরাদুনে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 'মাসিক বসুমতীর' আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'জলধর-স্মৃতি-সম্বর্ধনার' উত্তরে জলধর বাবু তাঁহার অনেকগুলি মিথ্যা উক্তির প্রতিবাদ করিতেও সাহস করেন নাই। সেগুলির ভিতর ৩৮২ পৃষ্ঠার প্রথম প্যারায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—সে যুগে—"জলধর বাবু কোন্ কোন্ সংবাদপত্র পাঠে ও কোন্ কোন্ বন্ধুর নিকট স্বামী বিবেকানন্দের নাম জানিতে পারিয়াছিলেন"? এই প্রসঙ্গে তিনি ইহার সদুত্তর দিবেন কি?

ইহার পর রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

"সম্ভবতঃ মায়াবতীর জীবনী লেখক স্বামীজীর সমভিব্যাহারী সে দিনের কোন সন্ন্যাসীর নিকট দেরাদুনের কাহিনী সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন নি। করলে এত বড় ভুল কখনই হ'তে পারত না।"

না, জলধর বাবু যখন বলিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই মায়াবতীর সন্ন্যাসিগণ স্বামীজীর জ্ঞান-কর্ম ভক্তি-সাধনার জ্যোতির্বিম্বিত পরিব্রাজক-জীবন-কাহিনী আকাশে ফাঁদ পাতিয়া ধরিয়া—এই ১৭০০ পৃষ্ঠাব্যাপী বিরাট ইংরেজী গ্রন্থ চারিখণ্ডে সুসম্পূর্ণ করিয়াছেন। রায় বাহাদুর কৃপা করিয়া, এই মহাগ্রন্থখানি এক বার উল্টাইয়া দেখিলে কখনই এমন দুঃসাহস প্রকাশের ভরসা পাইতেন না। স্বামীজী যখন যে স্থানে গিয়াছেন—তাঁহার তপস্যাসঙ্গী গুরুভ্রাতৃগণ—সেই স্থানের বিশিষ্ট ভক্তগণের নিকট হইতে সে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া, মায়াবতীর সন্ন্যাসিগণ দ্বাদশবর্ষব্যাপী সুকঠোর সাধনায় যে তাঁহার এই প্রামাণ্য জীবনী সঙ্কলন করিয়াছেন;—তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই গ্রন্থের বহু পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান। রায় বাহাদুরের প্রয়োজন হইলে তাহার তালিকা

সঙ্কলন করিয়া দিব। এই প্রামাণ্য গ্রন্থের মুখবন্ধ মাত্র পাঠ করিলেই তিনি এ কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিশেষতঃ স্বামীজীর সে বারের হিমালয়ের সাধনসঙ্গী গুরুভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে —'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের' সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বেদান্ত-অধ্যাপক—পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দ—হৃষীকেশে সে দিনের তপস্যাসঙ্গী হরি মহারাজ এই প্রামাণ্য জীবনী সঙ্কলন-সময়ে আলমোড়া ও মায়াবতীতে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সুযোগ্য সেক্রেটারী—'লীলাপ্রসঙ্গ'-রচয়িতা—পরম পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ —হৃষীকেশে স্বামীজীর সাধনসঙ্গী শরৎ মহারাজ 'উদ্বোধন' কার্য্যালয় হইতে স্বামীজীর পরিভ্রমণ বিবরণ পাঠাইয়াছিলেন। বেলুড়মঠের বর্ত্তমান ধর্ম্মগুরু— সর্ব্বজনবরেণ্য স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামীজীর হিমালয়সাথী পরিব্রাজক গঙ্গাধর মহারাজ, যিনি সে সময়ে অসুস্থ হইয়া ডেরাদুন হইতে মীরাটে গিয়াছিলেন, তিনি আজও সশরীরে বিদ্যমান। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালাভে ধন্য—কৃপানন্দ— স্বামীজীর হৃষীকেশের অন্যতম তপস্যাসঙ্গী পূজনীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয়—জলধর বাবুর আকাঙ্ক্ষামত আজও স্বর্গীয় হইতে পারেন নাই। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পত্র পড়িলেই জলধরবাবুর সকল ইন্দ্রজাল মুহূর্ত্তে অপসারিত হইবে। ইহার পরও জলধর বাবু বলিয়াছেন ঃ—

"যে সন্ন্যাসী হৃষীকেশে মুমূর্ষ স্বামীজীকে ঔষধ সেবন করিয়েছিল সে আজ বৃদ্ধ হয়েছে……বাংলায় 'পিপুল মধুর' উল্লেখ নাই কিন্তু ইংরাজিতে আছে এখন কোন্ খানিকে তিনি প্রামাণ্য বলে মানতে চান ?"

মায়াবতীর অদ্বৈতাশ্রম-প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী ইংরেজী ছোট অক্ষরে ১৭০০ পৃষ্ঠায়, ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ। 'উদ্বোধন' কার্য্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'স্বামী বিবেকানন্দ' পুস্তকখানি বাঙ্গালা বড় অক্ষরে মাত্র ৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে মায়াবতী হইতে প্রকাশিত স্বামীজীর সুবৃহৎ জীবনী গ্রন্থের বিশদ বিবরণের সকল কথা সবিস্তারে অনূদিত হওয়া সম্ভবপর কি ? জলধরবাবুর শ্রমকাতরতার কথা বিশেষভাবে জানি বলিয়া আমরা আষাঢ়ের প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম—

"এই সংক্ষিপ্ত জীবনী…হইতে সম্ভবতঃ জলধরবাবু এই কাহিনীটি আত্মসাৎ করিয়াছেন।"…"কিন্তু তাহাতেও দেখা যায়," প্রাচীন সাধু এবং তিনিও ঔষধ দিয়াই স্বামীজীর চৈতন্য-সঞ্চার করিয়াছিলেন,—তাহা জলধরবাবু কল্পিত গাছের ২।৩টি পাতার রস নহে। বিশদ ইংরেজী জীবনীতে পিপুলচূর্ণ ও মধুর উল্লেখ থাকিলেও তাহা কি ঔষধ নামে অভিহিত হইতে পারে না ? এই সুযোগে জলধরবাবু স্বামীজীর কোন্ জীবনীখানিকে অপ্রামাণ্য করিয়া ফেলিলেন ?

তাহার পর 'তুলসী পাতা' প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর বলিতেছেন ঃ—

…"সেই সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আমার একজন বহুদিনের পরিচিত বন্ধু।…তুলসী পাতার নামটা যে রহস্যচ্ছলেই বলেছিলাম, আশা করি, এটুকু বোঝবার মত বয়স দীনেন্দ্র বাবুর হয়েছে।"

বয়স আমার যতই হউক, এখনও বাহাত্তরের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া, 'আশীর কোঠায় গড়িয়ে' আসে নি, এবং সেই উপলক্ষে 'অশীতিপর' হইবার সুযোগ গ্রহণেরও বিলম্ব আছে—জলধরবাবু অতি সাবধানে—পরম গম্ভীরভাবে—অন্যের শুনিবার আশঙ্কায় চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া, তুলসী-পাতার নামটি বেফাঁস করিয়াছিলেন বলিয়াই শুনিয়াছি। তাঁহার 'বহুদিনের পরিচিত বন্ধু'কে ধাপ্পা দিবার জন্য রহস্য করিবার মত প্রীতি-মধুর সম্বন্ধের কথা বুঝিতে পারি নাই। বরং ভাবিয়াছিলাম, হাতে রগড়ে দু'তিনটি তুলসী পাতার রস—তাহা বিন্দুমাত্র হইলেও—সেইটুকু মুখে দিয়াই যখন মুমূর্ষু স্বামী বিবেকানন্দ জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তখন অন্তিমকালে তুলসীতলায় শেষ শয্যা পাতিয়া তুলসী গাছের হাওয়ায় নিশ্চয়ই নব-জীবন লাভ করিতে পারিব। জলধরবাবু সে আশায় নিরাশ করিলেন। এখন বেশ বুঝিলাম, জলধরবাবুর এই ধাপ্পা-বাজিও মিথ্যারই একটা রকমফের।

কিন্তু তিনি ত' সে প্রাণ-সঞ্চারক গাছের নাম জানেন—সন্ধানও লইয়াছেন—গাছও বিশেষভাবে চেনেন। কলিকাতায় বা বাঙ্গালা দেশে জলধরবাবু-বর্ণিত সে গাছ নিশ্চয়ই পাওয়া সম্ভব নহে। আমি অক্ষম সাহিত্যিক হইলেও—জলধরবাবু যদি "প্রশান্ত অন্তরে গ্রহণ" করেন, তাঁহাকে হৃষীকেশে যাইবার রেলভাড়া দিতে সম্মত আছি। তিনি অনুগ্রহ করিয়া হিমালয় হইতে সেই মৃত-সঞ্জীবন গাছ আনিয়া তাঁহারই হাতে রগড়ে তাহারই ২।৩টি পাতার রসে হাসপাতালের কোন মুমূর্ষু রোগীর জীবন দান করুন। এই প্রকৃষ্ট নিদর্শনে সকল তর্কের অবসান—তাঁহার কথায় সকল অবিশ্বাস মুহূর্ত্তে দূর হউক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই বিশাল দানে চিকিৎসা-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ—উদ্ভিদ্-বিদ্যা গৌরবান্বিত হউক। রায় বাহাদুরের অপরিসীম করুণায় বিশ্বের মুমূর্ষু মানবগণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া, তাঁহার মহিমা-গানে জগৎ মুখরিত করুক। অতুল ঐশ্বর্য্য ও যশের অধীশ্বর হইবার জন্য তিনি কি মানব-সমাজের এই পরম কল্যাণ সংসাধন করিবেন না? তাঁহার এই ভূতলে অতুল আবিষ্কার-প্রভাবে আগামী বর্ষের নোবেল প্রাইজের বিজয়মাল্যও ত' বিনা আয়াসে রায় বাহাদুরের পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইয়া সম্মানিত হইতে পারিবে। আর তাঁহার এই বিস্ময়াবহ আবিষ্কারে যে সমৃদ্ধিলাভ সহজসাধ্য, তাহার তুলনায় নোবেল প্রাইজের লক্ষাধিক মুদ্রাও নিতান্ত তুচ্ছ—উপেক্ষার যোগ্য।

মায়াবতী সংস্করণের একটি মাত্রও অসঙ্গতি সপ্রমাণ করিতে না পারিলেও রায় বাহাদুর অসঙ্কোচে বলিয়াছেন—

"মায়াবতী প্রকাশিত স্বামীজীর জীবনী যে আদ্যপান্ত নির্ভুল বলে মেনে নেওয়া চলে না, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি একাধিক পাচ্ছি, তাছাড়া 'ভারত' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত বিবেকানন্দ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী অমৃতানন্দের লেখা 'শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে সে দিন চোখ বুলুতে গিয়ে দেখেছিলেম, তিনিও মায়াবতীর প্রকাশিত এই বইটির কয়েকটি অসঙ্গতির দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।"

কিন্তু এই প্রমাণগুলি এতই ভঙ্গুর যে, জলধরবাবুও তাহা উদ্ধৃত করিতে সাহস পান নাই। এই প্রসঙ্গে স্বামী অমৃতানন্দের পরিচয় জানিতে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। স্বামী অমৃতানন্দের পূর্ব-পরিচয়—তিনি বিজ্ঞ-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের সহোদর শ্রীযুক্ত নলিনী দেব। মত-বিরোধের ফলে যে সকল নবীন সন্ন্যাসী বেলুড় মঠ ত্যাগ করিয়া, বাগবাজারের বিবেকানন্দ মিশনে যোগদান করিয়াছেন—ইনি তাঁহাদের অন্যতম। কিন্তু সেজন্য আমরা তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা—অসম্মান প্রদর্শন করিতেছি, এমন কথা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। তাঁহারাও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত—পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী—মহাপুরুষ শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামী ও পূজনীয় শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীর শিষ্য। কিন্তু জলধরবাবু উল্লিখিত 'ভারত' পত্রের ২২ ও ৩৩ সংখ্যায় স্বামী অমৃতানন্দ সমালোচনা প্রসঙ্গে বহু-সাধনা-সংগৃহীত মায়াবতী-সংস্করণ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সংগঠনের তথ্যনিচয় সঙ্কলন করিয়াছেন বলিয়াই ত' বোধ হইল। 'ভারত' পত্রের ২২ সংখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—মায়াবতী-সংস্করণ স্বামীজীর জীবনীর ১ম খণ্ডের ৩৮৮-৩৮৯ পৃষ্ঠায় "স্বামী বিজ্ঞানানন্দের নাম নেই।" এরূপ সুপ্রকাণ্ড গ্রন্থ সুদূর মায়াবতী হইতে কলিকাতার প্রেসে ছাপাইতে সন্ন্যাসিগণের নাম ও পরিচয়-তালিকা হইতে মুদ্রাকর-প্রমাদে একটি নাম ছাড় হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম খণ্ডের ২০২ পৃষ্ঠায় এই ছাড়টি সংযোজিত হইয়াছে। স্বামী অমৃতানন্দের এই প্রবন্ধটি 'ভারত' পত্রে ১৩৪২ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ অর্থাৎ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নবেম্বর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণটি দেখিতে পারিতেন। 'ভারত' পত্রিকার ৩৩ সংখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন, স্বামীজীর জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৯৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত স্বামীজীর পত্রে "(in that sense)" কথাটি প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু স্বামী অমৃতানন্দ এক্ষণে নূতন দল সংগঠনের পক্ষপাতী বলিয়াই কি ঐ প্রক্ষিপ্ত অংশ যে বন্ধনীমধ্যস্থ, তাহা লক্ষ্য করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন? উদ্ধৃত অংশের ভিতর বন্ধনী দিয়া স্বরূপ অর্থব্যঞ্জক শব্দ-সংযোগরীতি ত' সাহিত্যে সুপ্রচলিত আছে বলিয়াই জানি।

বলা বাহুল্য, স্বামী অমৃতানন্দের সমালোচিত অংশের সহিত স্বামীজীর হৃষীকেশে

তপস্যার সময়ের বা পরিব্রাজক-জীবনকাহিনীর কোনরূপ সংস্রব নাই। রায় বাহাদুর যে 'অবধূতাচার্য্য শ্রীভগবান পুরী' সাজিয়া হৃষীকেশে ২১৩টি গাছের পাতার রস খাওয়াইয়া স্বামী বিবেকানন্দের জীবন দান করিয়াছিলেন, এ কথা মুক্তিকামী সন্ন্যাসী স্বামী অমৃতানন্দও নিশ্চয়ই অসঙ্কোচে স্বীকার করিতে পারিবেন না।

ইহার পর, টাউনহলে স্বামীজীর স্মৃতিসভার প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন ঃ—

"স্বামীজীর জীবন সংকটকালে, তাঁর কাছে যে আমি দৈবাৎ উপস্থিত হয়েছিলেম এবং সামান্য কিছু তাঁর সেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেম, এই কাহিনী আমি 'স্মৃতিতর্পণে' উল্লেখ করবার ৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও টাউন হলে তাঁর স্মৃতিসভায় উল্লেখ করেছিলেম, একথা দীনেন্দ্র বাবুও তাঁর স্বকীয় ভঙ্গীতে কতকটা স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন দেখলুম।"

আষাঢ় সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী' আজও দুষ্প্রাপ্য নহে—পাঠক মহাশয়গণকে এক বার 'জলধর-স্মৃতি-সম্বর্দ্ধনা' প্রবন্ধের ৩৮২ পৃষ্ঠাটি অনুগ্রহ করিয়া পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে টাউন হলে স্বামীজীর শোক-সভায় জলধরবাবু বলিয়াছিলেন, "হিমালয়ে এক দিন স্বামী বিবেকানন্দ আমার উরুর উপর মাথা রেখে আটদশ ঘণ্টা বড় আরামে ঘুমিয়েছিলেন"। ইহাও যে জলধরবাবুর মিথ্যা কথা, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি নাই। মহাবীর কর্ণের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার অস্ত্রগুরু পরশুরামের দীর্ঘ নিদ্রার পর আর এমন কথা শুনা যায় নাই। কিন্তু টাউন হলে জলধরবাবুর শ্রীমুখের উক্তি হিমালয়ে তাঁহার ক্রোড়ে স্বামীজীর ৮।১০ ঘণ্টা ব্যাপী পরম আরামের নিদ্রা—৩৫ বৎসর পরে স্মৃতি-তর্পণ সময়ে সহসা যে কেমন করিয়া হৃষীকেশে জলধরবাবু সংগৃহীত গাছের ২১৩টি পাতার রসে চৈতন্যসঞ্চারে পরিণত হইল, তাহা—"স্বকীয় ভঙ্গীতে স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য" হওয়া দূরের কথা—মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, রায় বাহাদুরের সে ভেল্কী বুঝিবার মত বুদ্ধিও আমার নাই।

এই প্রসঙ্গে তিনি "শ্রীমান গণেন্দ্র মহারাজকে" সাক্ষ্য মান্য করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশেষভাবে জানি, শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কার্য্যে তখনও যোগদান করেন নাই। ইহার পর গগনস্পর্দ্ধিনী স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন ঃ—

"স্বামী অখণ্ডানন্দ বসুমতী আফিসে এসে দীনেন্দ্রবাবুর কল্পিত ওরূপ কোন অশিষ্ট উক্তি আমার প্রতি প্রয়োগ করতেই পারে না। কেন না, হৃষিকেশের ঘটনার সময় স্বামী অখণ্ডানন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যে সে সময়ে শাহারাণপুর হয়ে মীরাটে যাত্রা করেছিলেন একথা দীনেন্দ্রবাবুর আলোচনার মধ্যেই রয়েছে।"

জলধর বাবু 'অতিথি' শব্দের অর্থবিপর্য্যয় করিয়া সত্যের প্রতীক, বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের মুখে যখন অসঙ্কোচে মিথ্যা কথার আরোপ করিতে পারিয়াছেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-সম্প্রদায়পূজ্য স্বামী অখণ্ডানন্দের কথাকে তিনি যে অনায়াসে 'অশিষ্ট উক্তিতে' বিশেষিত করিয়া ধৃষ্টতার পরিচয় প্রকট করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায় ? আমরা আষাঢ়ের প্রবন্ধে টাউন হলে স্বামীজীর স্মৃতিসভা প্রসঙ্গেই পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহাতে জলধরবাবুর কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিলে স্বামী অখণ্ডানন্দের মত ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর প্রতি এরূপ অসম্মানকর সদম্ভ উক্তি প্রয়োগ না করিয়া, তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়া সত্য নির্ণয় করিলেই শোভনীয় হইত না কি ?

হৃষীকেশে অচৈতন্য হইবার পর স্বামীজী মীরাটে আসিয়া স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ—স্বামী সারদানন্দ—স্বামী কৃপানন্দ—স্বামী অদ্বৈতানন্দ প্রভৃতি গুরুভ্রাতৃগণের সহিত তিন মাসের অধিক কাল পরমানন্দে ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন। সেই সময়েও কি কোন দিন তাঁহারা হৃষীকেশে জলধরবাবুর করুণায় স্বামীজীর জীবনলাভের কথার আলোচনা করেন নাই ?

ইহার পর রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন ঃ—

"সুতরাং বেলুড় মঠের বর্ত্তমান ধর্ম্মগুরু স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজকে এর মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করাটা বা স্বামী অভেদানন্দের নাম উল্লেখ করে তাঁর উক্তিতে একটা গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করাটা নিতান্ত অবান্তর হয়ে পড়েছে। আমার যতদূর স্মরণ আছে দেরাদুনে স্বামীজীর সঙ্গে কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) ছিলেন না। সুতরাং তিনি এসম্বন্ধে কিছু বলতেই পারেন না।"

স্বামী অভেদানন্দ সে বার যে হৃষীকেশে স্বামীজীর তপস্যাসঙ্গী ছিলেন, এ কথা আমরা আষাঢ়ের প্রবন্ধে কোথাও উল্লেখ করি নাই। তথাপি জলধরবাবু তাঁহার মিথ্যাভার-প্রপীড়িত দুর্ব্বল স্মৃতি আলোড়নের সুযোগ লইলেন কেন ? কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ তাহার পরে ত' বহুদিন স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণের সঙ্গ করিয়াছেন—সেই সূত্রেও কি হৃষীকেশে জলধরবাবুর পরম কীর্ত্তির কথা জানিবার অবকাশ পান নাই ?

যাহা হউক, অসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি যে, আত্মপ্রশংসার দম্ভে আত্মহারা জলধরবাবুর বেপরোয়া মিথ্যারাশির প্রতিবাদ প্রসঙ্গে আমরা এই সকল সর্ব্বজনবরেণ্য —ব্রহ্মবিদ্ সন্ন্যাসীর নামোল্লেখ করিয়া—তাঁহাদের অসম্মাননার কারণ হইয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি।

স্বামীজীর পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও ত' দীর্ঘকাল স্বামীজীর সঙ্গলাভ করিয়া, তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রসঙ্গগুলি সঙ্কলন করিয়া দুই খণ্ডে 'স্বামি-

শিষ্যসংবাদ' প্রকাশ করিয়াছেন—তিনিও ত' হৃষীকেশে স্বামীজীর জীবনদানে জলধরবাবুর মহিমময় কীর্ত্তির কথা জানিতে পারেন নাই।

জলধরবাবু যদি সত্যই হৃষীকেশে স্বামীজীর প্রাণ দান করিতেন, তাহা হইলে স্বামীজী—তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ—বিরাট শিষ্য-সম্প্রদায় নিশ্চয়ই রায় বাহাদুরকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মানে বঞ্চিত করিতেন না—চিরদিন তাঁহাকে পরম সমাদর করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার গুরু-ভ্রাতৃগণ কখন কাহারও নিকট সামান্য উপকার পাইলে তাহা স্বীকার করিতে—প্রত্যুপকার করিতে কোন দিন কুণ্ঠিত হইয়াছেন কি ?

জলধরবাবু Eye witness চান, তাঁহার নিকট যখন Hearsay is no evidence, তখন শোনা কথায় আর কাজ নাই। জলধরবাবুর এই মহিমময় কাহিনী এক জন জানেন বলিয়া রায় বাহাদুরও স্বীকার করিয়াছেন :—

"যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনের কথা আমার অস্পষ্ট মনে পড়ে। ইনি স্বামীজীর অসুস্থতাকে তাঁর 'সমাধি অবস্থা' বলে গুরুভাইদের প্রবোধ দেবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করছিলেন। আমার নামধাম জানবার জন্যও তিনি একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু পাছে আমায় তাঁরা চিনতে পারেন এই আশঙ্কায়—আমার যতদূর মনে পড়ে, আমি তাঁকে আমার নামের পরিবর্ত্তে আমারই তদনীন্তন এক পরিচিত সাধুর নাম বলেছিলেম। তিনি যুক্ত প্রদেশের প্রসিদ্ধ অবধূতাচার্য্য—'শ্রীভগবান পুরী'।"

জলধরবাবু যাঁহার কথা বলিয়াছেন, ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য সেই স্বামী কৃপানন্দ—পূজনীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয় প্রথমে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গী হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা উভয়ে যে আলমোড়া হইতে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের হিমালয়ের তপস্যা-সঙ্গী হইয়াছিলেন, তাহা আষাঢ় সংখ্যার ৩৭৮ পৃষ্ঠায় বিবৃত করিয়াছি। ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র সঙ্কলিত 'স্বামী সারদানন্দ' জীবনী গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠায় ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্টের আলমোড়া পোষ্টাফিসের শীলমোহরের প্রতিলিপিযুক্ত যে পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা "শরৎ ও সান্ন্যাল" মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত। সুতরাং জলধরবাবুর উল্লিখিত ব্যক্তি যে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। মায়াবতী-সংস্করণ স্বামীজীর জীবনীর ২য় খণ্ডের ১২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ :—

"The Swami remained at Dehra Dun for about three weeks, and then advising Akhandananda to go to a friend's house in Allahabad, and leaving Kripananda to look after him, he with the others went

to Hrishikesh. Kripananda joined them a few days later, when Akhandananda went down to Saharanpur on his way to Allahabad."

স্বামী কৃপানন্দ নামে স্বামীজীর তপস্যাসঙ্গী পূজনীয় সান্ন্যাল মহাশয় যে হৃষীকেশে স্বামীজীর জীবনসঙ্কট অবস্থায় উপস্থিত ছিলেন, এ বিষয়ে জলধরবাবুও নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছেন; এবং তাঁহার নিকট "তিনি যুক্তপ্রদেশের প্রসিদ্ধ অবধূতাচার্য্য—শ্রীভগবানপুরী" নামে আত্মপরিচয় দিয়া মিথ্যানিষ্ঠা প্রকট করিয়াছিলেন। জলধরবাবু দীর্ঘকাল 'বসুমতী' 'হিতবাদী' প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদক নামে অভিহিত হইয়াও কোন দিন—সম্পাদকীয় প্রবন্ধ—মন্তব্য রচনা না করিয়া—কেবল সংবাদ-সংকলনে সহযোগী সম্পাদকের কার্য্য করিতেন। এই সূত্রে জলধরবাবু অসংখ্য ফৌজদারী মামলার বিবরণের অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু "যুক্তপ্রদেশের প্রসিদ্ধ অবধূতাচার্য্য শ্রীভগবান পুরীর নাম" গ্রহণ করা যে "False personation"—ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ৪১৯ ধারায় নির্দ্দেশিত অপরাধ এবং ফৌজদারীর আইনে যে তামাদি নাই, ইহাও কি তিনি জানেন না? আর দায়ে পড়িয়া তাঁহাকে যখন অন্যের নাম গ্রহণ করিতেই হইল—তখন ভিক্ষালব্ধ অর্থে যিনি সমগ্র হিমালয়ে পথ, সেতু, চটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন,—হৃষীকেশে—স্বর্গাশ্রমে—বদরিকাশ্রমের পথে অসংখ্য ধর্ম্মশালা—সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়া অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন—সাধুসেবা-ব্রতে আত্মনিবেদিতপ্রাণ সেই বাবা কালীকমলীওলার নামটি গ্রহণ করিলেই ত' পারিতেন। তিনিও ত' সে যুগে বিদ্যমান ছিলেন এবং সম্প্রতি হাইকোর্টে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সদাব্রত—ধর্ম্মশালাগুলি পরিচালনার জন্য যে মামলা চলিতেছে, জলধরবাবু তাহাতে হাজির হইয়া, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার মত সেই মামলাটিকে চমকপ্রদ করিয়া, হয়ত বা তাহার গতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতেন।

স্বামীজীর জীবনদান-কাহিনীটি 'স্মৃতি-তর্পণে' প্রথম প্রকাশের সময় জলধরবাবু লিখিয়াছিলেন—

"আমি দুয়ারের কাছ থেকে এই কথা শুনে, ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আমার সদাব্রতে এসে উপস্থিত হলাম।"

এ বার তিনি বলিয়াছেন—"অবধূতাচার্য্য শ্রীভগবানপুরী" "এক পরিচিত সাধুর নাম বলেছিলেম"—ইহার কোন্‌টি সত্য? পরমহংস অবস্থার মত অবধূতও সন্ন্যাসীর একটি মায়ামুক্ত অবস্থা। অব-ধৌতিক চিকিৎসকের সাইনবোর্ড দেখিয়াই কি জলধরবাবু 'অবধূতাচার্য্য' নামটি গ্রহণ করিয়াছিলেন?

ইহার পর সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল রায় বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

"স্বামীজীর সেই সঙ্গীটি আজও জীবিত আছেন কি না জানি না। বহুকাল পূর্ব্বে একবার তাঁদের খবর নিতে গিয়ে শুনেছিলাম তিনি নাকি সন্ন্যাস-আশ্রম পরিত্যাগ কোরে গৃহস্থাশ্রমে ফিরে গেছেন। তিনি জীবিত থাকলে হয়ত এ ঘটনা সম্বন্ধে সাক্ষী দিতে পারতেন।"

রায় বাহাদুর শুনিয়া পরম আশ্বস্ত—আনন্দিত হইবেন যে, তিনি এখনও স্বর্গীয় হইয়া জলধরবাবুকে মিথ্যাকথা প্রচারের সুযোগ দিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার কলিকাতার নিজ বাটীতে—বাগবাজার ২০ নং বসুপাড়া লেনে ঊনআশী বৎসর বয়সে সুস্থ শরীরে—ঠাকুরের লীলাধ্যানে পরমানন্দে অবস্থান করিতেছেন। জলধরবাবুর সন্দেহভঞ্জনের জন্য—পূজনীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত পত্রখানির প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

[বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের স্বহস্ত-লিখিত পত্রটির ফটোকপি পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত হলো।

—সম্পাদক ঃ স্মৃঃ আঃ স্বাঃ]

[পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা নিচে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের স্বহস্ত-লিখিত পত্রটি পাঠোদ্ধার করে দিলাম।—সম্পাদক : স্মৃঃ আঃ স্বাঃ।

২০নং বোসপাড়া লেন

১ ভাদ্র। ৪৩

পরম কল্যাণবরেষু—

হৃষিকেশের ধুনি-প্রজ্বলিত কুটির মধ্যে স্বামীজী মৃতপ্রায় অবস্থায়, আর জলধর বাবু তাঁকে গাছের পাতার রস খাইয়ে পুনর্জীবিত করেন, এবং দেড়াদুনে স্বামীজী তাঁহার প্রাণদাতাকে চিনিতে পারেন নি, সাধুভাষায় কবিকল্পনা, চলতি কথায় গাঁজাখুরি কথা। হৃষিকেশ ছাড়িয়া প্রথম হরিদ্বার তারপর সাহারাণপুর হইয়া মিরাটে অনেকদিন অবস্থান। হৃষিকেশে স্বামীজীর সঙ্গে আমরা তিনজন ছিলাম। হরিভাই তুরীয়ানন্দ, শরৎ সারদানন্দ ও আমি সাণ্ডেল কৃপানন্দ।

স্বামীজী চিরদিনই ধ্যাননিষ্ঠ, তারপর অতি নিকটে (?) হৃষিকেশ পেয়েত কথাই নাই। একদিন বৈকালে ঝুপড়ির ভিতর কিছুক্ষণ ধ্যানকরবার পর অচেতন হয়ে কম্বলাসনে শুয়ে পড়েন, দুটি প্রলাপ, তুমি বল আমি মরি। তারপর সব ঠাণ্ডা ও বাক্‌শূন্য—ব্যাপার বুঝতে না পেরে আমরা হতভম্ব। ফকিরাবাদ স্থানে ঔষধ বা চিকিৎসক নাই। হরিভাই আরোগ্য কামনায় আদিত্য-হৃদয় স্তব পড়িতে থাকেন, আর আমরা ঠাকুরকে ডাকতে থাকি। এমন সময় হরিভায়ের বন্ধু পরে আমাদেরও বন্ধু ভগবান পুরী নামে এক পঞ্জাবী ফুর্তিবাজ সাধু হরিভায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলে, তাঁকে স্বামীজীকে দেখবার জন্য অনুরোধ করি ; কারণ ইনি পূর্ব্বে চিকিৎসক ছিলেন, ও কালীভায়ার (অভেদানন্দের) অসুখে পূর্ব্বে একটু ঔষধও দেন।

স্বামীজীকে বেশ করে দেখে বলেন কি যে রোগ, বুঝতে পারছি না, ঔষধও নেই যে দেব। তবে মধুতে পিপুল ঘসে অনবরত জিবে লাগালে দেহ গরম ও চৈতন্য হতেও পারে।

আমি তৎক্ষণাৎ ভরতজীর মোহান্তর নিকট হতে পিপুল মধু আনিয়া পাথরে ঘসিয়া স্বামীজীর মুখে লাগাতে থাকি। তখন কোথায় বা জলধর বা মাথায় পাগড়ী 'ঙ' ? সে সময় আমাদের যে কি আকুল অবস্থা তাহা বর্ণনাতীত। তখন নির্ব্বিকল্প সমাধির কথা ভাবিবারও নয়।

ভোর রাত্রে স্বামীজী আমাদের অতি ক্ষিণস্বরে বলেন—তোমরা হয়ত ভেবেছ আমার ভারি অসুখ হয়েছে ও আমি মরে যাব। এতকালের পর প্রভুর কৃপায় এই হৃষিকেশ তীর্থে পুনরায় নির্ব্বিকল্প সমাধি পেয়েছি।

কোন বাতাসে জলধরবাবু আমাদের বন্ধু ভগবান পুরীর কথা শোনেন, আর কোন মায়াতে তিনি ঐ পুরীজীর নাম করে দিনের বেলায় আমাদের চোখে ধুলি দিয়ে নাম জাহির করেন, ইহা ভেল্কি ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। জলধরবাবু কাল, ভগবান পুরী গৌরাঙ্গ।

হিমালয় হতে নামিয়া রাত্রে আমরা গঙ্গা মন্দিরে রাত্রি যাপন করি, পরদিন প্রাতে এক জন ভক্ত লালার নবনির্মিত বাটীতে নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠানের সময়, তাঁহার আলয়ে ৪/৫ দিন বাস ও ভিক্ষা করি। একদিন ফরেষ্ট আপিসের বাবু করণপুরায় শশী ও অম্বিকাবাবুর বাটীতে ভিক্ষা করি, তখন জলধর বলে কোন পদার্থই তথায় ছিল না।

ঝুপড়িতে ধুনি জ্বালান ছিল না তা সম্ভবও নয়।

নির্জ্জলা মিথ্যাকে গহনা পরায়ে লোক সমাজে বার করা যদি সাহিত্যের শিল্পকলা হয়, তাহলে এমন কলা কলাপোড়া খাক।

আশীর্বাদক

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল]

ইহার পরই রায় বাহাদুর সার্কাসের ক্লাউনের মত একটি প্রচণ্ড ডিগবাজি খাইয়া উঠিয়া, আমাকে সার্কাসী কেতায় সুদীর্ঘ অভিবাদন করিয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্তরালে নূতন মিথ্যার কসরতি দেখাইতেও বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু এক ডিগবাজি কৌশলে এই সর্ব্ববিধ মিথ্যা কি "দিবালোকসম সত্যে" পরিণত হইবে? তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"আমি আমার বার্দ্ধক্যজনিত দুর্ব্বল স্মৃতির দোষে এই ঘটনাটা উল্টে ফেলে আগে পরে করে বসেছিলাম—এজন্য আমি লজ্জিত।"

পাহাড়ে মিথ্যাবাদী জলধরবাবুর প্রতি নিশ্চয়ই "Liar must have strong memory"—মিথ্যাকথার সেই প্রসিদ্ধ নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ডেরাদুনে স্বামীজীর আতিথ্যগ্রহণ প্রসঙ্গে 'স্মৃতিতর্পণে' পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—

"এ স্মৃতি কি ভুলবার। এই যে আমাদের সেদিনকার এত আনন্দ—এর মধ্যে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও হৃষীকেশে আমার সেই অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিত ভাবে স্বামীজীর দর্শনলাভের কথার উল্লেখ করি নি। স্বামীজী ত ন'নই, তাঁর সঙ্গীরাও আমাকে চিনতে পারেন নি—পারবার কথাও নয়; তখন আমি নগ্নপদ কম্বল সম্বল সন্ন্যাসী, আর ডেরাডুনে আমি ভদ্রবেশী, প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী মাষ্টারজী।"

কিন্তু জলধরবাবুর ললাটে জয়টীকা-স্বরূপ যে বিশেষ চিহ্নটি পরিস্ফুট—তাঁহার ভ্রূযুগলমধ্যে অবস্থিত যে বর্ত্তুলাকার আবটি শ্রীমুখের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা তিনি কিরূপে ঢাকিয়াছিলেন, তাহা ত' এই প্রসঙ্গে বিবৃত করা উচিত ছিল। পাগড়ী দিয়া তাহা ঢাকিতে হইলে চোখের উপরাংশ পর্য্যন্ত যে আচ্ছাদিত করিতে হয়। জলধরবাবু এ বার বলিতেছেন ঃ—

"আমি বদরিকা ঘুরে দেরাদুনে ফিরে আসার পর স্বামীজী দেরাদুনে এসেছিলেন এবং দেরাদুন থেকেই তিনি হৃষিকেশে গেছলেন।"

'হিমালয়ে' প্রকাশিত জলধরবাবুর ডায়েরীর অনুসরণে 'মাসিক বসুমতীর' আষাঢ় সংখ্যার ৩৮১ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করিয়াছি যে, জলধরবাবু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন বদরিকা হইতে ডেরাদুনে ফিরিয়াছিলেন—এবং তিনি যে গ্রীষ্মকালের প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় হৃষীকেশে সহসা উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর জীবন দান করিয়াছিলেন, বারংবার উল্লেখে তাহা সকলেরই বেশ স্মরণ আছে। বিভিন্ন প্রদেশের লাটসাহেবগণ বর্ষসমাগমে

প্রতি বৎসর জুলাই মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে গ্রীষ্মের শৈলাবাস হইতে নামিয়া আসেন। জলধরবাবুর 'পথিক' পুস্তকের ৮৫ পৃষ্টায় হৃষীকেশ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

"সে রাস্তাটি বারমাস থাকে না, বর্ষার সময় ঝরণাগুলি প্রবল হইয়া উঠিলে সে রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়।"

সুতরাং ডেরাদুনে জলধরবাবুর সহিত স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণকে দেখা করিতে হইলে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের ২৪শে হইতে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহের ভিতর স্বামীজীকে গুরুভ্রাতৃগণসহ ডেরাদুনে যাইতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বামীজী সদলে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর ডেরাদুনে পেঁীছিয়া প্রায় তিন সপ্তাহ অর্থাৎ ৪ঠা নভেম্বর পর্য্যন্ত ডেরাদুনে ছিলেন, মায়াবতীর প্রামাণ্য জীবনী হইতে তাহাও উক্ত প্রবন্ধের ৩৮১ পৃষ্ঠায় সুপ্রমাণিত করিয়াছি।

জলধরবাবু মায়াবতী-সংস্করণ স্বামীজীর প্রামাণ্য জীবনী বিশ্বাস করেন না। কিন্তু 'স্বামী সারদানন্দ' গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠায় স্বামীজীর হিমালয় যাত্রার সূচনায়, পূজনীয় শরৎ মহারাজের স্বহস্ত-লিখিত যে পত্রখানি—আলমোড়া ডাকঘরের শীল-মোহরের প্রতিলিপিতে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ—তারিখ যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং যে পত্রখানি আমরা ৩৭৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি—জলধরবাবু তাহা অস্বীকার করিবেন কিরূপে? জলধরবাবু ইচ্ছা করিলে এই পত্রখানি বেলুড় মঠে দেখিয়া আসিতে পারেন।

আর জলধরবাবু "গ্রীষ্মের···সন্ধ্যার প্রাক্কালে" হৃষীকেশে সহসা উড়িয়া আসিয়া গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় সংগৃহীত গাছের ২।৩টি পাতার রসে স্বামীজীর জীবন দান করিয়াছিলেন;—কিন্তু স্বামীজী যে ৪ঠা হইতে ১২ই নভেম্বরের মধ্যে হৃষীকেশে অচৈতন্য হইয়া ছিলেন, তাহাও ঐ প্রবন্ধের ৩৮১ পৃষ্ঠাতেই দেখাইয়াছি। এখন ডিগবাজীর কৌশলে জলধরবাবু যদি "গ্রীষ্মের সন্ধ্যার প্রাক্কাল" অতিক্রম করিয়া নভেম্বর মাসের হিমালয়ের প্রচণ্ড শীতেই স্বামীজীর জীবনদানের দাবী করেন, তাহা হইলে "গ্রীষ্মের সন্ধ্যার প্রাক্কাল"—৭টার পরিবর্ত্তে ৫টা—জোর ৫।৷টা পর্য্যন্ত শীতকালের "প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যা" বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জলধরবাবু "প্রায় শনিবারই অপরাহ্ন দু'টার সময় স্কুল থেকে ফিরে এসে···মহানন্দে বেরিয়ে" পড়তেন। এই শনিবার যদি স্বামীজীর জীবনদানপর্ব্ব উপলক্ষে তিনি ব্যস্ত হইয়া "একটা দেড়টায় বেরিয়ে দেরাদুন থেকে হৃষিকেশে···সন্ধ্যার প্রাক্কালেই" পৌছিয়া থাকেন, তাহা হইলে সাড়ে তিন ঘণ্টা, জোর চার ঘণ্টায় তাঁহাকে ৩৬।৩৭ মাইল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে হয়। ইহা কেবল যে কল্পনাবলে সম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

জলধরবাবু "সে বয়সে ঘণ্টায় পাঁচ ছয় মাইল পথ অবলীলায় চলে যেতে" পারতেন। কিন্তু তার বেশী পারিতেন কি? তাঁহার ভ্রমণ-ডায়েরী হইতে সঙ্কলিত 'পথিক'

পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, তিনি দুই দিনে আঠারো ঘণ্টায় 'বয়েলগাড়ী' করিয়া ডেরাদুন হইতে হৃষীকেশ অভিযান করিয়াছেন। তাঁহার 'হিমালয়ের' ৩য় পৃষ্ঠায় প্রকাশ—

"সামান্য দূরে ক্ষুদ্র এক চড়াইয়ে উঠ্‌তে হ'লেই আমার ডাণ্ডীর দরকার হয়।"

অন্য যাত্রায় তিনি তিহরী হইতে মসুরীতে কি ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন দেখুন ঃ—

"আজ পাহাড়ী ডাণ্ডীতে চড়িয়া চলিতেছি।…চারিজন প্রকাণ্ডকায় পাহাড়ী আমার ডাণ্ডীবাহক।…একখানি মোটা লম্বা বাঁশ অবশ্য বাঁধুনী খুব দৃঢ়, আর একখানি কম্বল, আর দুইগাছি শক্ত দড়ি, এই তিনটি দ্রব্য আমার ডাণ্ডীর উপকরণ। পর্ব্বতবাসিগণ সেই বাঁশের দুই দিকে খানিকটা স্থান বাহিরে রাখিয়া কম্বলখানি দড়ি দিয়া সেই বাঁশের সঙ্গে বেশ করিয়া বাঁধিয়া লইল। আমি সেই কম্বলের মধ্যে বসিয়া বুকের মধ্যে বাঁশটি লইয়া দুই হাত দিয়া চাপিয়া, বসিয়া রহিলাম।"

('পথিক' ৩য় সং, ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা)

"ডাণ্ডীওয়ালারা আমাকে তাহাদের একজনের পিঠে চড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিতে বলিল; কিন্তু আমি…সে ভাবে যাইতে অস্বীকৃত দেখিয়া তাহারা আমাকে কম্বলে জড়াইয়া একজন তাহার পিঠের সঙ্গে বাঁধিল। ('পথিক' ৩য় সং, ৮১ পৃষ্ঠা)

ইহাতে তিনি অবশ্যই সদম্ভে বলিতে পারেন—"গর্ব্ব ক'রে বলতে পারি যে হাঁটার সব প্রতিযোগিতায় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হতাম।"

আর "অসংখ্য বাক্‌বিস্তারের" প্রয়োজন নাই—গৌরব-গর্ব্বে আত্মবিস্মৃত জলধরবাবুর লিখিত "পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বর্ণিত ব্যাপার" যে কিরূপ ভাবে "দিবালোকের ন্যায় সম্পূর্ণ সত্য"—বোধ হয়, তাহাতে কাহারও লেশমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ আর নাই। আত্মপ্রশংসার উন্মাদনায় হিমালয়সম মিথ্যার এমন বিরাট বাহার যে আর কখনও দেখেন নাই, আশা করি সকলেই তাহা অসঙ্কোচে স্বীকার করিতে পারিবেন। একটা মিথ্যা ঢাকিতে গিয়া অন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণের দৃষ্টান্ত রায় বাহাদুরের এই প্রতিবাদের ছত্রে ছত্রে বিরাজিত; কিন্তু নূতন মিথ্যার সাহায্যেও যাহা ঢাকা পড়িবার সম্ভাবনা নাই, সে স্থানে তিনি সম্পূর্ণ নীরব; সে সকল কথার প্রতিবাদ করিতেও জলধরবাবু সাহস পান নাই।…

[দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পরবর্তী বক্তব্য (পৃঃ ৮১০-৮১৫) বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে বাদ দেওয়া হল।—সম্পাদক ঃ স্মৃঃ আঃ স্বাঃ]

মহালয়ার তর্পণ-পর্ব্বের পূর্ব্বেই রায় বাহাদুর স্মৃতিতর্পণ সমাপন করিতে বাধ্য হইলেন বলিয়া মনে হইতেছে। অতঃপর 'মাসিক বসুমতীতে' যদি জলধরবাবুর

জীবনস্মৃতি-মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্ব হইতে গদাপর্ব্ব পর্য্যন্ত—বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁহার শিখণ্ডীলীলার মহিমা বিশ্লেষণের সুযোগ না পাই—অন্যত্র প্রয়াস পাইব।

জলধর বাবু!—

"কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে?"

শ্রীদীনেশচন্দ্রকুমার রায়।

[মাসিক বসুমতী, ১৫শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৩, পৃঃ ৮৭৯-৮৯৫]

স্বামীজীর কথা

[স্বামী শুদ্ধানন্দের চয়ন]

আমি নিজে অবশ্য বেদের ততটুকু মানি, যতটুকু যুক্তির সঙ্গে মেলে। বেদের অনেক অংশ তো স্পষ্টই স্ববিরোধী। Inspired বা প্রত্যাদিষ্ট বলতে পাশ্চাত্যদেশে যেরূপ বুঝায়, বেদকে আমাদের শাস্ত্রে সেরূপভাবে প্রত্যাদিষ্ট বলে না। তবে তা কি? না, ভগবানের সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি। এই জ্ঞানসমষ্টি যুগারম্ভে প্রকাশিত বা ব্যক্ত এবং যুগাবসানে সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত ভাব ধারণ করে। যুগের আরম্ভ হলে উহা আবার প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রের এই কথাগুলি অবশ্য ঠিক, কিন্তু কেবল 'বেদ' নামধেয় গ্রন্থগুলিই এই জ্ঞানসমষ্টি, এ কথা মনকে আঁখিঠারা মাত্র। মনু এক স্থলে বলেছেন, বেদের যে অংশ যুক্তির সঙ্গে মেলে তাই বেদ, অপরাংশ বেদ নয়। আমাদের অনেক দার্শনিকেরও এই মত।

অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে যত তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে, তার মোদ্দাকথা এই যে এতে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের স্থান নেই। আমরা আনন্দের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে খুব প্রস্তুত আছি।

বেদান্তের প্রথম কথা হচ্ছে—সংসার দুঃখময়, শোকের আগার, অনিত্য ইত্যাদি। বেদান্ত প্রথম খুললেই 'দুঃখ দুঃখ' শুনে লোক অস্থির হয়, কিন্তু তার শেষে পরম সুখ—যথার্থ সুখের কথা পাওয়া যায়। বিষয়-জগৎ, ইন্দ্রিয়-জগৎ থেকে যে যথার্থ সুখ হতে পারে, এ কথা আমরা অস্বীকার করি, আর বলি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতেই যথার্থ সুখ। আর এই সুখ, এই আনন্দ সব মানুষের ভেতরই আছে। আমরা জগতে যে 'সুখবাদ' দেখতে পাই, যে মতে বলে জগৎটা পরম সুখের স্থান, তাতে মানুষকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়।

আমাদের দর্শনে ত্যাগের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বাস্তবিক ত্যাগ ব্যতীত আমাদের কোন দর্শনেরই লক্ষ্য বস্তু পাওয়া অসম্ভব। কারণ ত্যাগ মানেই হচ্ছে

—আসল সত্য যে আত্মা, তার প্রকাশের সাহায্য করা। উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চায়, তার ভাব এই যে, সে সত্য-জগতের জ্ঞান লাভ করে।

জগতে যত শাস্ত্র আছে, তার মধ্যে বেদই কেবল বলেন যে, বেদপাঠ—অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা হচ্ছে, যার দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। সে পড়েও হয় না, বিশ্বাস করেও হয় না, তর্ক করেও হয় না, সমাধি-অবস্থা লাভ করলে তবে সেই পরমপুরুষকে জানা যায়।

জ্ঞানলাভ হলে আর সাম্প্রদায়িকতা থাকে না; তা বলে জ্ঞানী কোন সম্প্রদায়কে যে ঘৃণা করেন, তা নয়। সব নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং এক হয়ে যায়, সেইরূপ সব সম্প্রদায়—সব মতেই জ্ঞান লাভ হয়, তখন আর কোন মতভেদ থাকে না।

জ্ঞানী বলেন, সংসার ত্যাগ করতে হবে। তার মানে এ নয় যে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে ভাসিয়ে বনে চলে যেতে হবে। প্রকৃত ত্যাগ হচ্ছে সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকা।

মানুষের পুনঃপুনঃ জন্ম কেন হয়? পুনঃপুনঃ শরীর-ধারণে দেহমনের বিকাশ হবার সুবিধে হয়, আর ভেতরের ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ হতে থাকে।

বেদান্ত মানুষের বিচার-শক্তিকে যথেষ্ট আদর করে থাকেন বটে, কিন্তু আবার এও বলেন যে, যুক্তি-বিচারের চেয়েও বড় জিনিস আছে।

ভক্তিলাভ কিরূপে হয়?—ভক্তি তোমার ভেতরেই আছে, কেবল তার ওপর কামকাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে রয়েছে, তা সরিয়ে ফেললেই ভক্তি আপনা-আপনি প্রকাশ হবে।

জিব চললেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় চলবে।

জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম—এই চার রাস্তা দিয়েই মুক্তিলাভ হয়। যে যে পথের উপযুক্ত, তাকে সেই পথ দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু বর্তমান কালে কর্মযোগের ওপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিতে হবে।

ধর্ম একটা কল্পনার জিনিস নয়, প্রত্যক্ষ জিনিস। যে একটা ভূতও দেখেছে সে অনেক বই-পড়া পণ্ডিতের চেয়ে বড়।

এক সময়ে স্বামীজী কোন লোকের খুব প্রশংসা করেন, তাতে তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'কিন্তু সে আপনাকে মানে না।' তাতে তিনি বলে উঠলেন, 'আমাকে মানতে হবে, এমন কিছু লেখাপড়া আছে? সে ভাল কাজ করছে, এই জন্যে সে প্রশংসার পাত্র।'

আসল ধর্মের রাজ্য যেখানে সেখানে, লেখাপড়ার প্রবেশাধিকার নেই।

কেউ কেউ বলেন, আগে সাধন ভজন করে সিদ্ধ হও, তারপর কর্ম করবার অধিকার; কেউ কেউ বা বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম করতে হবে। এর সামঞ্জস্য কোথায়?

—তোমরা দুটো জিনিস গোল করে ফেলছ। কর্ম মানে—এক জীব-সেবা, আর এক প্রচার। প্রকৃত প্রচারে অবশ্য সিদ্ধপুরুষ ছাড়া কারও অধিকার নেই। সেবায়

কিন্তু সকলের অধিকার ; শুধু অধিকার নয়, সেবা করতে সকলে বাধ্য, যতক্ষণ তারা অপরের সেবা নিচ্ছে।

ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভেতর যেদিন থেকে বড়লোকের খাতির আরম্ভ হবে, সেই দিন থেকে তার পতন আরম্ভ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে ভাবের (feelings) যেরূপ বিকাশ হয়েছিল, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

অসৎ কর্ম করতে ইচ্ছা হয়, গুরুজনের সামনে করবে।

গোঁড়ামি দ্বারা খুব শীঘ্র ধর্ম-প্রচার হয় বটে, কিন্তু সকলকে মতের স্বাধীনতা দিয়ে একটা উচ্চপথে তুলে দিতে দেরি হলেও পাকা ধর্মপ্রচার হয়।

সাধনের জন্য যদি শরীর যায়, গেলই বা।

সাধুসঙ্গে থাকতে থাকতেই (ধর্মলাভ) হয়ে যাবে।

গুরুর আশীর্বাদে শিষ্য না পড়েও পণ্ডিত হয়ে যায়।

গুরু কাকে বলা যায় ?—যিনি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু।

আচার্য যে-সে হতে পারেন না, কিন্তু মুক্ত অনেকে হতে পারে। মুক্ত যে, তার কাছে সমুদয় জগৎ স্বপ্নবৎ, কিন্তু আচার্যকে উভয় অবস্থার মাঝখানে থাকতে হয়। তাঁর জগৎকে সত্য জ্ঞান করা চাই, না হলে তিনি কেন উপদেশ দেবেন ? আর যদি তাঁর স্বপ্নজ্ঞান না হলো তবে তিনি তো সাধারণ লোকের মতো হয়ে গেলেন, তিনি কি শিক্ষা দেবেন ? আচার্যকে শিষ্যের পাপের ভার নিতে হয়। তাতেই শক্তিমান আচার্যদের শরীরে ব্যাধি-আদি হয়। কিন্তু কাঁচা হলে তাঁর মনকে পর্যন্ত তারা আক্রমণ করে, তিনি পড়ে যান। আচার্য যে-সে হতে পারেন না।

এমন সময় আসবে, যখন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় বলে বুঝতে পারবে।

সূত্রনির্দেশ

পরিশিষ্ট

যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস ঃ স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন

নৃপবালা ঘোষ ঐ

নিত্যানন্দ বসু ঃ ঐ

প্রিয়নাথ সিংহ ঃ উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, ১ ভাদ্র, ১৩১২

ঐ ঐ ১৫শ সংখ্যা, ১৫ ভাদ্র ১৩১২

জ্যোতির্ময়ী দেবী ঃ উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা, পৌষ, ১৩৭০

স্বামী নিরাময়ানন্দ ঃ উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিক সংখ্যা, পৌষ, ১৩৭০ ('তীর্থ মধুপ' ছদ্মনামে লেখা 'স্বামীজীর সন্ধানে' রচনা দ্রষ্টব্য)

স্বামী শুদ্ধানন্দ ঃ উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৫, ফাল্গুন, ১৩০৯

ঐ ঐ ৮ সংখ্যা, ২৫ বৈশাখ, ১৩১০

ঐ ঐ ১৫ সংখ্যা, ১ আশ্বিন, ১৩১০

নির্দেশিকা

[পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হওয়ার জন্য স্বামীজীর নাম নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। যাঁদের স্মৃতিকথা সঙ্কলিত হয়েছে তাঁদের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়নি; বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট স্মৃতিকথায় তাঁদের উল্লেখ নির্দেশিকার পরিধির বাইরে রাখা হয়েছে।]